শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী

নটরাজন

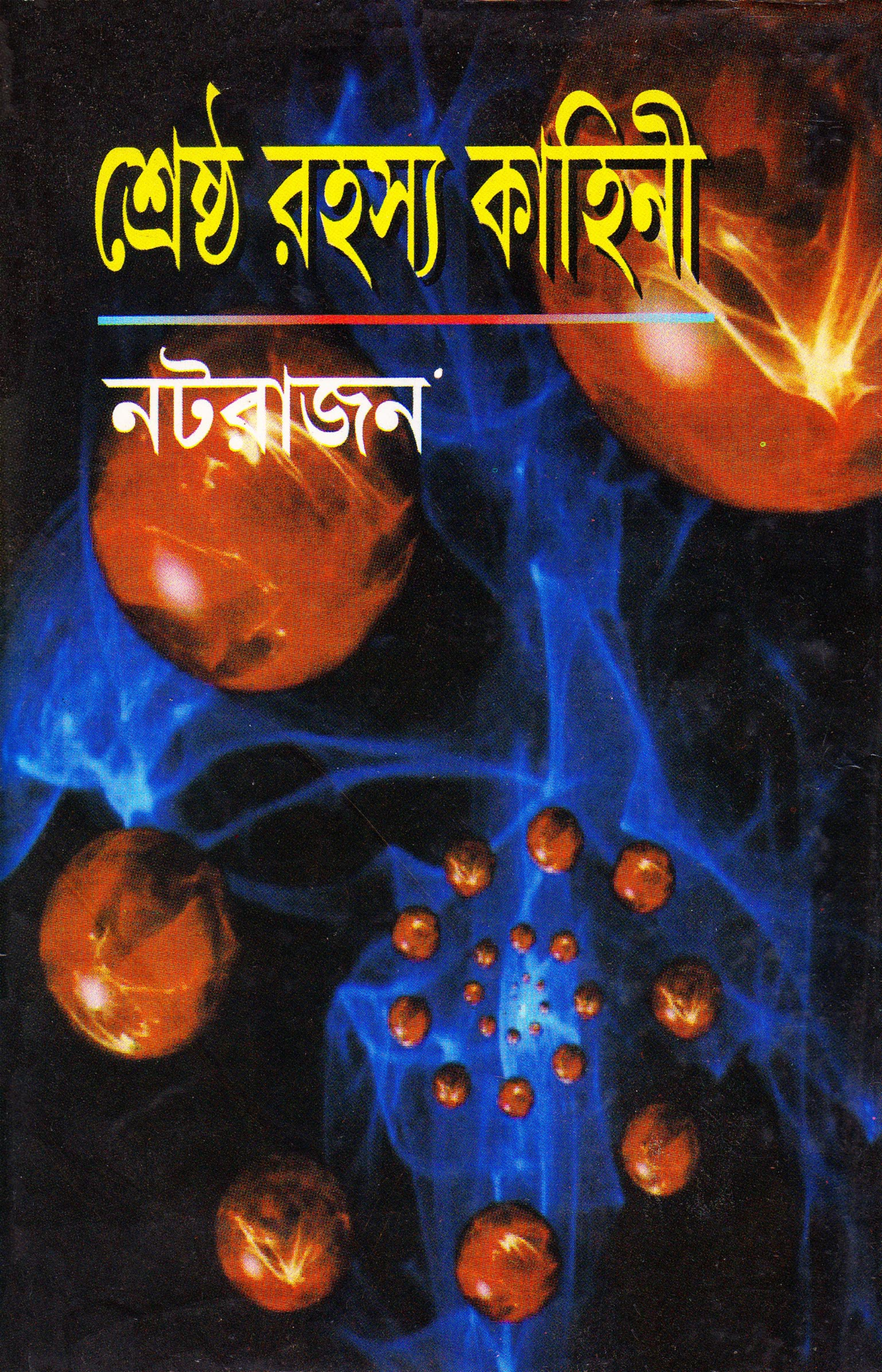

শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী

নটরাজন

শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী

banglabooks.in

শ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী

নটরাজন

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SRESTHA RAHASYA KAHINI
A Collection of Crime & Detective stories by NATARAJAN
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs.125

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭,

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : ১২৫ টাকা

ISBN–81-7612-761-2

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : বীণাপাণি প্রেস
১২/১এ বলাই সিংহ লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার শিক্ষাগুরু শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীচরণেষু,

banglabooks.in

লেখকের অন্যান্য বই

পুলিশ সাহেব
বাঁশরিয়া
স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড
পুলিশেশ্বর
পুলিশোত্তম
পুলিশাসুর
লালবাজার
মন্দাকিনী
ওরা সেই পুলিশ
থানার মাটি নোনা
ডাউরি
পদ্মা নদীর পানি
রক্ত রহস্য রমনী
সম্রাট
কালের কপোল তলে
প্রেম অভিসারে
প্রমীলা মহল
রাজনাগিনী
বিপ্লবেশ্বর
বহ্নিলিপি
আমি পাকিস্তানী গুপ্তচর
চক্রী ও চক্রান্ত
লগ্নভ্রষ্টা
লুপ্তগান্ধার
বলয়গ্রাস
মেয়ে পুলিশের ডায়েরী

ছোটদের জন্য ঃ

বর্গী এলো দেশে
ডানপিটে ভগবান

সূচীপত্র

ছদ্মবেশী	৯
গাজীমস্তান	৪৭
পত্রবিষ	৬৩
বেইমান	৭৪
জালিয়াতি	১১১
রক্তলেখা	১২০
একগ্লাশ সরবৎ	১৪১
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী	১৭৭
মাকড়সার জাল	১৯৭
পারলৌকিক	২৩১
সমুদ্রসুন্দরী	২৬৩
পঞ্চম রামেসিসের মমি	৩০২

এই গ্রন্থের জাল,
জালিয়াতি ইত্যাদি কাহিনীগুলোর
প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ মৌলিক ও সত্যের
ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোয়েন্দা কাহিনী-
গুলো মৌলিক হলেও সমস্যার সমাধানে কোন
কোন ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু বিচ্ছিন্ন ইংরেজি রচনার ইঙ্গিত।

—লেখক

ছদ্মবেশী

দক্ষিণ কলকাতার সম্ভ্রান্ত অঞ্চল বলতে যে জায়গাটা বোঝায় সেখানের ধনী ব্যক্তিদের নামের যদি একটা লিস্ট তৈরি করা যায়, তবে সেই লিস্টের প্রথম দশজনের মধ্যে নিশ্চয়ই মহাদেববাবুর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে।

মহাদেব চৌধুরী। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু জরা কিংবা ব্যাধি এখনও তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারেনি। সাধারণ দোহারা চেহারা। ফরসা গায়ের রং। ঘাড়ের ও কানের কাছে কিছু চুলে সামান্য পাক ধরেছে মাত্র। আর কপালের বলীরেখাদুটো একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাড়ায় জনপ্রিয় ব্যক্তি এই মহাদেব চৌধুরী। সদাহাস্যময়। নিজে প্রচুর বিত্তের মালিক হলেও নিরহংকারী। সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মেশেন। সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলিতে তাঁর উন্মুক্ত হস্ত। তাই পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেদের কাছেও তাঁর প্রচুর খাতির। শহরের অনেকগুলো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত। বন্যাত্রাণ তহবিল থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার সরকারী বেসরকারী তহবিলে তাঁর মোটা অঙ্কের দান।

মহাদেব চৌধুরী এ পাড়ায় বাড়ি কিনে বসবাস করছেন প্রায় বছর পনের হল। তার আগে নাকি তিনি বোম্বেতে থাকতেন। সেখানে সিনেমা লাইনে তাঁর প্রচুর পয়সা খাটত। কিন্তু কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রচুর অর্থ লোকসান দিয়ে বম্বে ছেড়ে সপরিবারে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু এখন অন্য ব্যবসায় তাঁর পয়সা খাটছে। বম্বে ছেড়ে চলে এলেও সেখানকার নামজাদা চিত্রতারকাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও বর্তমান। সুতরাং পাড়ার হবু চিত্রতারকারা কারণে অকারণে মহাদেববাবুর বাড়ি এসে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে অত্যন্ত যত্নবান।

ব্যবসাক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত নিয়মে বিশ্বাসী তিনি। তাঁর মতে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের কর্মচারীরা যখন কাজ করে তখন মালিকের পক্ষে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকলে যতটা না কাজ হয় তার চেয়ে হইচই হয় অনেক বেশী। তাই তিনি নাকি প্রতিদিন বিকেল চারটায় নিজের অফিসে যান। প্রতিটি কর্মচারীর সারাদিনের কাজ খুঁটিয়ে দেখেন। প্রত্যেকটি কর্মচারীর পরের দিনের কাজ সম্পর্কে নির্দেশ লিখে রাখেন। তারপর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে আসেন। মহাদেববাবু বলেন এই পদ্ধতিতে তিনি নাকি কর্মচারীদের কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। আর কর্মচারীরাও মালিকের উপস্থিতির জন্যে অযথা আড়ষ্ট হয়ে না থেকে দিব্যি সহজভাবে নিজেদের কাজ করে যেতে পারে।

সেদিন মহাদেববাবুর দিবানিদ্রা ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ঘড়িতে তখন চারটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকী। মুখে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে পালঙ্ক ছেড়ে নামলেন মহাদেববাবু। ইস্‌ ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে!

ঠিক এমন সময় উড়ে চাকর বনমালী সামনে এগিয়ে এসে সসম্মানে একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় তাঁর কাছে।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করেন — "কার চিঠি?" কিন্তু জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে খামখানা খুলে পড়তে থাকেন চিঠিখানা।

দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি। খামের মধ্যে কাগজখানা রাখতে রাখতে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করেন —"কখন এসেছে চিঠিখানা?"

—"দুপুরবেলা।" — ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় বনমালী।

—"কটার সময় তাই বল্!" — ঝাঁঝিয়ে ওঠেন তিনি।

—"তখন বোধহয় গোটা দুয়েক হবে।" — একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় বনমালী।

রেগে ওঠেন মহাদেববাবু—"দুটোয় চিঠি এসেছে, আর চারটের সময় সেই চিঠি আমার হাতে এল!"

চুপ করে থাকে বলমালী। বলতে থাকে মহাদেববাবু — "এমন জরুরী চিঠি এতক্ষণ আমাকে দিসনি কেন?"

আমতা আমতা করে জবাব দেয় বনমালী — "আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, তাই ...."

—"আমাকে ডেকে দিতে পারলি না হতভাগা ! তোর মা কোথায়?"

—"বাগানে মালীর কাজ দেখছেন।"

—"যত্ত সব....." বলতে বলতে একটা মুখভঙ্গি করে বাথরুমে ঢোকেন তিনি।

দ্রুতহাতে পোশাক পরিবর্তন করেন মহাদেববাবু। পাটভাঙা ধুতির ওপর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরেন। বনমালী চকচকে কালো রংয়ের পাম্পসু জোড়া এনে এগিয়ে দেয়।

ঠিক এমনি সময় ঘরে ঢোকে স্ত্রী অমলা। ব্যস্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে— "এত তাড়াতাড়ি করছ কেন আজ?"

আঙুল দিয়ে দেয়ালঘড়িটা দেখিয়ে মহাদেববাবু বলেন — "কটা বেজেছো দেখেছো?" তারপর একটু থেমে আবার বলতে থাকেন — "তোমরা এতগুলো লোক বাড়িতে থাকতে এমন জরুরী চিঠিটা এসে পড়ে রইলো, আর তোমরা আমাকে একবার ডেকে দিতে পারলে না?"

স্ত্রী অমলা চুপ করে থাকে। বাঁ হাতের কবজিতে হাতঘড়িটা বাঁধতে বাঁধতে জুতোয় মচমচ শব্দ জাগিয়ে বেরিয়ে যান মহাদেববাবু।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ট্যাক্সির খোঁজ করতে থাকেন তিনি। অদ্ভুত স্বভাব তাঁর। নিজের অতবড় গাড়িটা থাকতেও ট্যাক্সিতেই তিনি যাতায়াত করেন। কেবল ছুটিছাটার দিনে ওটা ব্যবহৃত হয়।

মহাদেব চৌধুরী রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই একটা ট্যাক্সি ফুটপাথ ঘেঁষে সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে ঢুকে দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। একটা মৃদু গুঞ্জন তুলে পেছনে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ট্যাক্সিটা।

।। ২।।

ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকটির সঙ্গে। এর আগে মুকুন্দবাবু লোকটিকে কখনও দেখেনি। তবে প্রথম আলাপেই লোকটির সঙ্গে কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে।

একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় মেদিনীপুর থেকে কলকাতা আসছিল মুকুন্দ দত্ত। ব্যবসায়ী মানুষ। আড়তদার। হাজার কুড়ির মত টাকা ছিল সঙ্গে। তবে খুব হুঁশিয়ার মানুষ সে। কাপড়ের থলিতে কোমরে বাঁধা ছিল টাকাটা। বড়বাজারের মহাজনের টাকা পরিশোধের জন্যেই টাকাটা সঙ্গে নিয়েছিল সে। সেই সঙ্গে নতুন করে জিনিসপত্রের অর্ডারও দিতে হবে।

খড়গপুর স্টেশন আসতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। নিজের সীটে বসে বসে মুকুন্দ দত্ত ভাবছিল এখন এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত। কিন্তু ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চা-ওয়ালার টিকিও দেখা গেল না। ইতিমধ্যে পাশের ভদ্রলোকটিও উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় সেও চায়ের প্রত্যাশী। কিন্তু চা-ওয়ালার দেখা নেই।

স্টেশনের ঘন্টা বেজে উঠলো। বাঁশি বাজিয়ে চলতে আরম্ভ করলো ট্রেন।

হঠাৎ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভদ্রলোকটি চেঁচিয়ে উঠলো — "এই চা, এদিকে এদিকে —"

চাওয়ালা কাছে এগিয়ে আসতেই তার থালায় পয়সা ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললে — "দেখি দু'কাপ চা, জলদি।"

ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে চা-ওয়ালা মাটির খুরিতে চা ঢালতে থাকে। ভদ্রলোক থালা থেকে খুরি দুটো তুলে নিতেই মুকুন্দবাবু দরজার সামনে এগিয়ে আসে।

—"এই চা, আর একটা খুরি......" — বলতে বলতে পকেটে হাত ঢোকায় মুকুন্দবাবু। কিন্তু ততক্ষণে চা-ওয়ালাকে পেছনে ফেলে ট্রেনটা জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

বিমর্ষচিত্তে মুকুন্দবাবু এসে নিজের জায়গায় বসে পড়ে। ধূমায়িত চায়ের খুরিদুটো দু'হাতে নিয়ে ভদ্রলোকটিও পাশে এসে বসে।

তারপর মুকুন্দবাবুর দিকে একটা খুরি এগিয়ে দিয়ে বলে, —"আপনি একটা নিন।"

চমকে ওঠে মুকুন্দবাবু — "সেকি! আপনি দুটো নিলেন, আমি আবার তাতে ভাগ বসাব কেন?"

— "আহা, তাতে কী হয়েছে! আমি তো নিজের জন্যেই দুটো নিয়েছি। আপনি নাহয় একটা নিলেন।"

মুকুন্দবাবু কিছুতেই নেবে না। ভদ্রলোকটিও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মুকুন্দবাবুকে একটা খুরি নিতেই হলো।

এমনিভাবেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হলো মুকুন্দবাবুর। কথায় কথায় মুকুন্দ জানতে পারলো লোকটির নাম হচ্ছে আনন্দ মিশ্র। সে এসেছে বাঁকুড়া থেকে। যাচ্ছে কলকাতায়। সেও ব্যবসাদার। ব্যবসাসূত্রেই সে কলকাতা যাচ্ছে।

আনন্দও ব্যবসায়ী জেনে মুকুন্দ একটু ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ করতে থাকে তার সঙ্গে। একসময় আনন্দ জিজ্ঞেস করে—" আপনি বোধহয় কলকাতায় গিয়ে কোন আত্মীয়ের বাড়ি ওঠেন?"

—"না, তেমন আর আত্মীয় কই সেখানে!" একটা হোটেলের নাম করে সে আবার বলে, "ওখানেই উঠি আমি।"

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ভদ্রলোক— " কি আশ্চর্য, আমিও যে সেখানেই উঠবো বলে ঠিক করেছি।"

আনন্দের কথাবার্তা এত চমৎকার যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুকুন্দ কেবলমাত্র মুগ্ধই হয়ে যায় না, তার বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

মেচাদা স্টেশনে দুজনে নেমে চা ও মিষ্টি খেয়ে নেয়। মুকুন্দর বারণ সত্ত্বেও আনন্দই পয়সাটা মিটিয়ে দেয়।

হাওড়া স্টেশনে নেমে আনন্দই উদ্যোগী হয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনে। তারপর সেই নবপরিচিত বন্ধুযুগল হোটেলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়।

হোটেলের তিনতলায় একটা ডবল্-সীটের রুম বেছে নেয় তারা। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আনন্দ একসময় বলে—"আজ আর বোধহয় বড়বাজার অঞ্চলে যাবেন না?"

—"নাঃ, আজ আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কাল একটু তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে বেরোব।"

—"তা'হলে এখন হোটেলে বসে না থেকে চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।"

—"কোথায়?"

—"আরে চলুন না। শুনেছি মেট্রোতে নাকি একটা চমৎকার ইংরেজী হাসির ছবি এসেছে। টিকিট পাই তো ঢুকে পড়বো সেখানে, কী বলেন?"

ব্যবসাদার মানুষ মুকুন্দ দত্ত। ইংরেজীতে কোনরকমে মাত্র নাম সই করতে জানে। তাই ইংরেজী বই শুনে তেমন উৎসাহ দেখালো না সে। কিন্তু আনন্দ মিশ্র বুদ্ধিমান। মুকুন্দর মনের কথা টের পেয়েই যেন সে বললে— "কিচ্ছু ভাববেন না, ইংরেজীতে আমার বিদ্যের দৌড়ও সেই গাঁয়ের মাইনর স্কুলের ক্লাস ফোর পর্যন্ত। কিন্তু হলে গিয়ে দেখতে পাবেন কথাবার্তা ঠিকমত বুঝতে না পারলেও আসল ঘটনাটা বুঝতে কোনই অসুবিধে হবে না।"

অগত্যা উঠতে হলো মুকুন্দকে। মাঝে মাঝে দু'চারটা বাংলা হিন্দী বই দেখলেও ইংরেজী বই দেখার সুযোগ হয়নি তার কখনও। তাছাড়া আনন্দ যখন এত করে বলছে।

মেট্রোর সামনে এসে মুকুন্দকে একটু দাঁড়াতে বলে আনন্দ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর ব্যালকনির দুখানা টিকিট কেটে এনে দুই বন্ধুতে ঢুকে পড়ে হলে।

রাত আটটা নাগাদ শো শেষ হয়। হাসতে হাসতে দুই বন্ধু এসে বাইরে দাঁড়ায়।

মুকুন্দ খুব খুশী। এমন চমৎকার হাসির ছবি সে জীবনে দেখেনি। হলের ভেতর হাসতে হাসতে তার পেটে ব্যথা ধরে গিয়েছিল।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে মুকুন্দকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরায় আনন্দ। তারপর জোরে একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে— "এবার কী করবেন? হোটেলে ফিরে যাবেন?"

আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দর উত্তর দেয়— "হ্যাঁ তা'ছাড়া আর এত রাতে কোথায় যাব?"

মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে আনন্দ বলে —'এত রাত? বলেন কি? মাত্র তো আটটা। কলকাতায় এখন তো সবে সন্ধ্যা?"

মুকুন্দ চুপ করে সিগারেট টানতে থাকে। একসময় আনন্দ আবার বলে —"চলুন একটা ভাল জায়গায় যাই।"

—"কোথায়?"

—"আগে চলুন না।" — বলতে বলতে একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে উঠে পড়ে তাতে।

পার্ক স্ট্রীট ধরে ছুটে চলে ট্যাক্সি। দু'দিকে বড় বড় বাড়ি সাজানো-গুছানো ঝকঝকে তকতকে দোকান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুটপাতে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী— ধুতি পাঞ্জাবির চেয়ে প্যান্ট কোটের আর শাড়ির চেয়ে স্কার্টের আধিক্য এই অঞ্চলে ।

ট্যাক্সির ভেতর মুকুন্দ দত্ত একবার জিজ্ঞেস করে —"কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

একটু মৃদু হেসে জবাব দেয় আনন্দ মিশ্র—“বেড়াতে, আর সেই সঙ্গে কিছু আয় করতে!”

আনন্দের কথার অর্থ ঠিক বোধগম্য হয় না মুকুন্দের। সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আনন্দ আরও একটু কাছে সরে এসে অন্তরঙ্গ গলায় বলে—“আসল কলকাতার রূপ তো আর দেখলেন না কোনদিন। এখানে এসে কেবল হাওড়া স্টেশন আর বড়বাজারেই সময় কেটে গেল আপনার। তাই একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।”

মুকুন্দ একটা কিছু জবাব দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্যাক্সিটা।

সোৎসাহে আনন্দ বলে ওঠে—“এই তো আমরা এসে গেছি?” — বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে এসে মুকুন্দকে ডাকে—“চলে আসুন।”

বাইরে এসে এদিক ওদিক দেখতে থাকে মুকুন্দ। যথারীতি ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মুকুন্দকে নিয়ে আনন্দ পাশের ছোট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে।

একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় দুজনে। সামনের দরজা বন্ধ। ভেতরে কী আছে বোঝা শক্ত। দরজার একখানা সাইনবোর্ডে ইংরেজীতে যা' লেখা আছে আধো আলো আধো অন্ধকারে তা পড়তে পারে না মুকুন্দ।

একটু চাপ দিতেই দরজাটা খুলে যায়। মুকুন্দকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে আনন্দ।

একটা প্রশস্ত হলঘর। তার একদিকে কাউন্টার। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক—গালপাট্টা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। ঠিক তার পেছনে থরে থরে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির বোতল। হলের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল — তার চার পাশে চারখানা করে সুন্দর চেয়ার সাজানো। কিছু স্ত্রী-পুরুষ এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে রঙিন তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রে চুমুক দিচ্ছে। কোন অদৃশ্য স্থান থেকে বিলিতী বাজনার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে।

মুকুন্দর আর বুঝতে বাকী থাকে না আনন্দ তাকে কোথায় এনেছে। কেমন যেন একটু ভীত হয়ে ওঠে সে। হাত দিয়ে কোমরের টাকার থলিটা একবার স্পর্শ করে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরদুর করতে থাকে তার। এমন পরিস্থিতির মধ্যে জীবনে সে কখনও পড়েনি। ব্যবসায়ী মানুষ সে। স্বভাবতই একটু সাবধানী। একমুহূর্তে নানারকম সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হয় তার। তবে কী আনন্দ মিশ্র তার টাকার কথা জানতে পেরে তার কাছ থেকে ঐ টাকা কেড়ে নেবার মতলবে আছে? তবে কী আনন্দর সবকিছুই অভিনয়? কথাগুলো মনের কোণে এসে জমা হতেই দারুণ চমকে ওঠে মুকুন্দ দত্ত। একবার ইচ্ছে হয় ছুটে বাইরে চলে যায়। আবার, একা একা যেতেও মন সায় দেয় না। দরজার সামনেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে সে।

দু'চার পা এগিয়ে গিয়েছিল আনন্দ। পেছনে তাকিয়ে মুকুন্দকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আবার ফিরে আসে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে— “কী, ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ভেতরে আসুন।”

স্থিরচোখে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি মৃদুকণ্ঠে মুকুন্দ দত্ত জবাব দেয়, — “আপনি মদ খান নাকি?”

হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা করে দিতে চেষ্টা করে আনন্দ। জবাব দেয় —“পাগল

নাকি! মদ খাবো আমি! জাত বেনের ছেলে আমি, ওসব অখাদ্য খেয়ে পয়সা ওড়াতে শিখিনি।"

মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয় মুকুন্দ। বলে—" তবে এখানে এলেন কেন?"

—"আসুন ভেতরে, দেখতে পাবেন।"— বলতে বলতে মুকুন্দকে নিয়ে হলঘরের শেষপ্রান্তে এগিয়ে যায় আনন্দ। যেতে যেতে কাউন্টারের সামনে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক কেমন যেন চোখের একটা ইশারা করে। আনন্দও মৃদু হেসে এগিয়ে যায়।

আনন্দ দেয়ালের ওপর চাপ দিয়ে দরজা না খুললে মুকুন্দ হয়ত বুঝতেই পারতো না যে হলঘরের এপাশেও একটা দরজা আছে।

আনন্দ মিশ্র মুকুন্দ দত্তকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

।।৩।।

গভীর রাতে সেই আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে এসে মুকুন্দ দত্ত বুঝতে পারে তার নিজের আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আনন্দ মিশ্র ঘুণাক্ষরেও তার টাকাপয়সার কোন কথাই উল্লেখ করেনি। আনন্দকে শুধু শুধু সন্দেহ করায় নিজেই নিজের কাছে একটু লজ্জিত হয় মুকুন্দ দত্ত।

হলঘরের ওপাশে যে জগৎটা এই মাত্র মুকুন্দ দেখে এলো, তার সঙ্গে পূর্বে তার কোন পরিচয়ই ছিল না। অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। প্রতিটি ঘরেই সুন্দর বেশভুষায় সজ্জিত চারপাঁচজন করে লোক টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে তাস খেলছে। টেবিলের মধ্যখানে টাকার স্তূপ—কাঁচা টাকা নয়—কেবল নোট।

অনিচ্ছুক মুকুন্দকে নিয়ে আনন্দ মিশ্র একটা ঘরে ঢুকতেই দুজন লোক মুখ তুলে তাকায় তাদের দিকে। ঘরে মাত্র ঐ দুজন লোকই উপস্থিত ছিল তখন। আনন্দর দিকে তাকিয়ে একজন বলে—"এই যে আনন্দবাবু, অনেকদিন পরে এলেন এবার" বলেই পেছনে মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"সঙ্গে ইনি কে?"

জবাব দেয় আনন্দ মিশ্র—"আমার বন্ধু।"

মুকুন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে আনন্দর সঙ্গে কথা বলতে থাকে তারা।

আনন্দ জিজ্ঞেস করে—" আপনাদের দেখছি, কিন্তু কুমার বাহাদুরকে তো দেখছি না। তিনি কোথায়?"

—"তিনি এলেন বলে" — একজন জবাব দেয়—" তবে আপনি যখন এসেছেন তখন কুমার বাহাদুর আপনাকে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গেই আজ খেলবেন না, এটা নিশ্চিত।"

একটু হেসে জবাব দেয় আনন্দ—"না, আজ আমি খেলতে আসিনি। সঙ্গেও তেমন পয়সাকড়ি নেই।"

অন্য লোকটি বলে—"কুমার বাহাদুর আপনাকে ছেড়ে দেবেন, মনে করেছেন?"

একটু থেমে লোকটি আবার বলতে থাকে—"সত্যি, আশ্চর্য দুর্বলতা আপনার ওপর কুমার বাহাদুরের। আপনাকে পেলে আর অন্য কারুর সঙ্গেই তিনি খেলবেন না।"

—"আরে দুর্বলতা না, নেশা—নেশা। আনন্দ মিশ্রের সঙ্গে খেলে মনে যে আনন্দ পাই অন্য কারুর সঙ্গে খেলে তা' পাই না। আনন্দ মিশ্রের কাছে হেরে গিয়েও সুখ আছে, বুঝলে?" — বলতে বলতে একটি ফরসা মাঝবয়সী ভদ্রলোক ঘরে ঢোকে। ধুতির ওপর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে চকচকে পাম্পসু।

কুমার বাহাদুরকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়ায়। কুমার বাহাদুর আনন্দর একটা হাত ধরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—"এস আনন্দ, অনেকদিন পর তোমাকে পেয়েছি আজ।"

আমতা আমতা করে আনন্দ মিশ্র জবাব দেয়— "আজ আমি ঠিক খেলতে আসিনি"—মুকুন্দকে দেখিয়ে সে বলতে থাকে —"এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম....."

আনন্দর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুমার বাহাদুর বলে—"আরে ওসব বাজে অজুহাত রাখ। খেলতে তোমাকে হবেই"— বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কুমার বাহাদুর বসে পড়ে।

আনন্দ মিশ্রের মুখে চোখে একটা অনিচ্ছার ভাব ফুটে ওঠে। মৃদুকণ্ঠে সে কেবলমাত্র উচ্চারণ করে—" তেমন পয়সাকড়িও আজ সঙ্গে নেই।"

—"কত আছে?" — জিজ্ঞেস করে কুমার বাহাদুর।

আনন্দ জবাব দেয় —"হাজার তিনেকের মত মাত্র।"

—"বেশ ওতেই হবে। আজ কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না।"

মুকুন্দর মুখের দিকে একটা নিরুপায়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ারে বসে পড়ে আনন্দ। বাধ্য হয়ে মুকুন্দকেও বসতে হয় পাশে।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেদিনীপুরের ব্যবয়াসী মুকুন্দ দত্ত দেখতে থাকে কেমন করে তাসের সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে নোটগুলো হাতবদল হতে থাকে।

গভীর রাতে যখন খেলা শেষ হয় তখন আনন্দের হাতে বার হাজার টাকা এসে গেছে। কুমার বাহাদুরকে কিন্তু তেমন দুঃখিত বলে মনে হয় না। মুকুন্দ ভাবতে থাকে এটাই বোধহয় এই লাইনের রেওয়াজ। হেরে গেলেও হাসিমুখে থাকতে হয় এখানে।

কিন্তু মুকুন্দ দত্ত সাংঘাতিক আশ্চর্য হয়ে গেল যখন কুমার বাহাদুর আনন্দের ঘাড়ে হাত রেখে তাকে পরের দিন আবার আসতে অনুরোধ জানালো।

হোটেলে ফিরে এসে নিজেদের ঘরে ঢাকা দেওয়া খাবার খেতে খেতে মুকুন্দ দত্ত বলে —"নিট ন'হাজার টাকা লাভ, কি বলেন!"

জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে আনন্দ।

মুকুন্দ আবার জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা, এই কুমার বাহাদুরটি কে?"

দাঁত ও হাতের সাহায্যে একখানা মাংসের হাড় আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে আনন্দ জবাব দেয়—"শুনতে পাই এককালে নাকি কোন্ নেটিভ স্টেটের রাজকুমার ছিলেন। রাজত্ব চলে যাওয়ার পর এখন নাকি ব্যবসা করছেন।"—একটু থেমে আবার সে বলতে থাকে "প্রচুর পয়সার মালিক এই কুমার বাহাদুর। আর অদ্ভুত একগুঁয়ে স্বভাবের লোক। আমার সঙ্গে খেলতে বসে কোনদিনই জিততে পারেন না, তবুও আমার সঙ্গে খেলা চাই।"

কোন কথা না বলে একমনে খেয়ে যেতে থাকে মুকুন্দ দত্ত। তার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে ঐ একটিমাত্র কথা — তিন হাজার টাকা দিয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিট ন'হাজার টাকা লাভ!

আনন্দ মিশ্র মুকুন্দ দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব আন্দাজ করতে চেষ্টা করে বলে—"এসব ব্যাপারে মোটা দাঁও মারতে হলে চাই প্রচুর টাকা, বুঝলেন? এই ধরুন না কাল যদি আমার কাছে তিন হাজার টাকা না থেকে নগদ তিরিশ হাজার টাকা থাকতো তো নির্ঘাত কমসে কম লাখ খানেক টাকা পেতে পারতাম।"

খাওয়া থামিয়ে আনন্দর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মুকুন্দ দত্ত। নিজের

অজ্ঞাতেই এক সময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে —'বলেন কী? এক লাখ টাকা?"

আনন্দ বললে —"হ্যাঁ। আরও বেশী হতে পারতো?"

—"তা কলকাতা আসার সময় মোটা টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এলেই তো পারেন।" মুকুন্দ বলে।

একটু বিষণ্ন হাসি হেসে জবাব দেয় আনন্দ—"কোথায় পাব মোটা টাকা বলুন? বাঁকুড়ার ব্যবসা আমার দাদার হাতে। কলকাতায় যখন বেশী টাকা নিয়ে আসতে হয় তখন দাদা নিজেই আসেন, কাজেই ...।" — কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সে।

রাতে ভাল ঘুম হয় না মুকুন্দর, সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করে। মাথার ভেতর জট পাকাতে থাকে নানা চিন্তা। এতদিন পর সে যেন সেই কথাটার মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে — 'কলকাতায় পয়সা উড়ে বেড়ায়। যার বুদ্ধি আছে সে ধরে নিতে পারে।' একটা টাকা আয় করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, আর এখানে শত শত হাজার টাকা উড়ছে। সত্যি, আনন্দ মিশ্রর বুদ্ধি আছে। শুধু বুদ্ধি নয়, সেই সঙ্গে আছে ক্ষমতা। লোকটার যদি টাকা থাকত তবে সে তাই দিয়ে এতদিনে লক্ষপতি হতে পারতো।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু মুকুন্দ দত্ত বড়বাজারে তার মহাজনের কাছে যাওয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। আনন্দকে জিজ্ঞেস করে —"আজ সন্ধ্যায় আবার যাবেন নাকি ওখানে?"

জবাব দেয় আনন্দ—"ইচ্ছে তো আছে। তবে হাতে আরও কিছু টাকা থাকলে কাজ হতো।"

—"কত টাকা?" — জিজ্ঞেস করে মুকুন্দ।

—"আমার কাছে সেই কালকের বার হাজার টাকা আছে। আর দশ-বিশ হাজার হলে কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে মোটামত দাঁও মারা যেত আজ।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় মুকুন্দ—"বেশ, আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি।"

খুশিতে আনন্দর চোখদুটো চকচক করে ওঠে।

সেদিন রাতেও কুমার বাহাদুরের সঙ্গে খেলতে যায় আনন্দ মিশ্র। বলা বাহুল্য, মুকুন্দ দত্তও সঙ্গে থাকে।

আনন্দ মিশ্রর বরাত ভাল বলতে হবে। সেদিনও সে কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে নিট দশ হাজার টাকা লাভ করে।

হোটেলে ফিরে এসে আনন্দ মুকুন্দ দত্তর পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করে। আর সেই সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেয় তার হাতে।

বিস্মিত মুকুন্দ জিজ্ঞেস করে—"আমাকে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন?"

—"বাঃ আপনার পাঁচ হাজার টাকা পেয়েই তো আজ এতগুলো টাকা লাভ করতে পেরেছি।"

মুকুন্দ দত্ত একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ে এতক্ষণে। আনন্দকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলে—"আমার কাছে এখন মোট পঁচিশ হাজারের মত টাকা আছে। আপনি কাল এই সবটা দিয়ে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে খেলুন, কেমন?"

আনন্দ মিশ্র কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখায় না। জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

মুকুন্দ আবার জিজ্ঞেস করে —"কী, কথা কইছেন না যে?"

—"ভাবছি, গত দু'দিনে এতগুলো টাকা লোকসান দিয়ে আবার বেশী টাকার ঝুঁকি নিতে রাজী হবেন কি না কুমার বাহাদুর।" তারপর একটু চিন্তা করে আবার বলতে থাকে— "বোধহয় গররাজী হবেন না তিনি। সাংঘাতিক একগুঁয়ে লোক তো! একবার একটু তাতিয়ে দিতে পারলেই হলো। তা'ছাড়া এককালে রাজা ছিলেন, তাই নজরটাও খুবই উঁচু। দশ-বিশ হাজারকে টাকা বলেই মনে করেন না তিনি।"

।। ৪ ।।

মহাদেব চৌধুরী ট্যাক্সির ভিতর বসে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে আর একবার পড়েন। ছোট্ট চিঠি। মাত্র দু'তিন লাইন লেখা! মনে মনে ভাবতে থাকেন তিনি—খুব দেরি হয়ে গেছে আজ। কোথায় আজই একটু তাড়াতাড়ি যাবার দরকার ছিল, তা না আজই দেরি হয়ে গেল সবচেয়ে বেশী। স্ত্রী অমলা ও চাকর বনমালীর ওপর আর একদফা মনে মনে রেগে ওঠেন মহাদেব চৌধুরী।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি । হঠাৎ একসময় তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—"এই দাঁড়াও, দাঁড়াও, এইখানেই দাঁড়াও।"

বৃদ্ধ ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে —"এইখানেই দাঁড় করাবো, স্যার?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানেই। রোজ আস, তবুও ভুলে যাও কেন?" বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মহাদেব চৌধুরী। তারপর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুটপাথ ধরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে থাকেন।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়লো তাঁর। রাস্তা পার হয়ে এপাশের ফুটপাথের কাছে ছোট্ট পানের দোকানের সামনে এসে তিনি দাঁড়ান।

মহাদেব চৌধুরী কিছু বলবার আগেই উড়ে পানওয়ালা একগাল হেসে জিজ্ঞেস করে— "ক' প্যাকেট দিব, বাবু?"

—"তিন প্যাকেট?"

গোল্ডফ্ল্যাক সিগারেটের প্যাকেট তিনটি পকেটে ফেলে আবার ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকেন মহাদেব চৌধুরী।

*   *   *   *

গভীর রাত। হলঘরের খদ্দেররা সকলেই একে একে বিদায় নিয়েছে। ভেতরের ঘরগুলোও প্রায় সবই ফাঁকা। কেবল একটি মাত্র ঘরে তখনও খেলা চলছে পুরোদমে। কুমার বাহাদুরের পাশে বসে আছে তার দুজন সঙ্গী। উলটোদিকে আনন্দ মিশ্রের পাশে মুকুন্দ দত্ত। ঘরের একপাশে অন্য একটা চেয়ারে বসে খেলা দেখছে সেই পাঞ্জাবী ম্যানেজার প্রীতম সিং।

খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। পাশার দান উলটে গেছে আজ। আনন্দ মিশ্র ক্রমাগত হেরেই চলছে। উত্তেজনায় পা দুটো থরথর করে কাঁপছে মুকুন্দ দত্তর। এখনও সময় আছে। এই শেষ দানে আনন্দ জিততে পারলে অন্ততঃ আসল টাকাটা উঠে আসতে পারে। টেবিলের ওপর জমেছে নোটের পাহাড়। কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না । হাতের নোটের বান্ডিল থেকে কুমার বাহাদুর ক্রমাগত টাকা দিয়েই যাচ্ছে। আনন্দ মিশ্রও তার ক্ষয়িষ্ণু পুঁজি ঢেলে দিচ্ছে টেবিলের ওপর।

হঠাৎ একসময় থেমে গেল আনন্দ মিশ্র। আর টাকা নেই তার কাছে। নিজের হাতের তাস টেবিলের ওপর ফেলে দিল সে। কুমার বাহাদুরও স্থির, গম্ভীর ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর নিজের হাতের তাস রেখে দিল ধীরে ধীরে।

একমুহূর্ত। মাথাটা ঘুরে উঠল মুকুন্দ দত্তর। কুমার বাহাদুর সেই টাকার পাহাড়টা নিজের কাছে টেনে নিতেই দু'হাত বাড়িয়ে পাগলের মত চিৎকার করতে যাচ্ছিল মুকুন্দ দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে সেই পাঞ্জাবী ম্যানেজার প্রীতম সিং। তারপর ....

নিস্তব্ধ রাত্রি। জনমানবশূন্য রাস্তা। দ্রুতবেগে দু'একখানা মোটরগাড়ি ছুটে যাচ্ছে। দূর থেকে দু'একটা রিক্‌শার টুংটাং শব্দ মাত্র শোনা যায়। উঁচু বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে ফুটপাথে শুয়ে আছে গোটাকয়েক ভিখারী। সাদা পোশাক পরিহিত দুজন পুলিস কনস্টেবল নাল লাগানো বুটজুতোর খটখট শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলছে মন্থর গতিতে, আর নিম্নস্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

মদের দোকানটার সামনে এসে একমুহূর্ত দাঁড়ায় তারা। দোকানের সামনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরেও কোন আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চিন্তমনে কনস্টেবল দুজন এগিয়ে যায় সামনে।

দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী গলিপথে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় একখানা কালো রঙের মোটরগাড়ি। দুজন লোক গাড়ি থেকে নেমে এসে বাইরে দাঁড়ায়।

ঠিক এমনি সময় পাশের মদের দোকানের একটা গরাদহীন জানালা খুলে যায়। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় দুটো মূর্তি— একটা সেই ম্যানেজার প্রীতম সিংয়ের, আর অন্যটা আর একজন লোকের।

সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মনুষ্যদেহ টেনে তোলে তারা সেই জানালাটার ওপর। অসাড় নিঃস্পন্দ দেহ। হাতদুটো ঝুলে পড়েছে মাথার কাছে। তারপর সঙ্গের লোকটির সাহায্যে ম্যানেজার প্রীতম সিং সেই মনুষ্যদেহটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয় নিচে।

ক্ষিপ্র হাতে নিচে দাঁড়ানো লোকদুটো সেই কাপড়ে জড়ানো দেহটা ধরে ফেলে। গাড়ির ভেতর দেহটা ঠেলে তুলতে যাবে ঠিক এমন সময় পেছন থেকে শোনা যায় সেই পুলিস কনস্টেবলদের কণ্ঠস্বর—"কৌন হ্যায়!"

লোকদুটো কিন্তু কোন জবাব দেয় না। দ্রুতহাতে দেহটাকে ঠেলে গাড়ির ভেতর তুলে দিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

আবছা অন্ধকারে কনস্টেবল দুজন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখতে পায়। তীক্ষ্ণ শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেজে ওঠে তাদের বাঁশি। বুটজুতোর খটখট শব্দ করতে করতে তারা আসতে থাকে গাড়িটার দিকে।

লোকদুটো ততক্ষণে গাড়ির ভেতরে উঠে পড়েছে। মৃদু গর্জন করে ওঠে ইঞ্জিনটা। দপ্ করে পেছনের নম্বর প্লেটের আলোটা নিভে যায়। তারপর বিদ্যুৎগতিতে গলিপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়িটা।

কনস্টেবল দুজন ততক্ষণে সেখানে এসে পড়ছে। চিৎকার করতে থাকে তারা—"খুন হো গিয়া, ডাকু ভাগ যাতা, পাকড়ো পাকড়ো!" আর সেই সঙ্গে ঘন ঘন তারা তাদের বাঁশি বাজাতে থাকে।

জানালার কপাট কিন্তু তখনও তেমনি খোলাই রয়েছে। নিজেদের ভেতর আলোচনা করে

একজন কনস্টেবল সেই জানালার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর একজন ছুটে চলে যায় দোকানের বন্ধ দরজার সামনে।

এমন সময় একখানা কালো রংয়ের পুলিসের বেতার গাড়ি এসে দাঁড়ায় সেখানে। কনস্টেবলদের বাঁশির শব্দে আকৃষ্ট হয়েই গাড়িখানা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

একজন পুলিস সার্জেন্ট গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হয়।

কনস্টেবলটি সংক্ষেপে তাকে ঘটনার কথা বলতেই সার্জেন্টটি আবার ছুটে যায় গাড়ির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বেতার যন্ত্রটি চালু হয়ে ওঠে। পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে চলে যায় জরুরী বার্তা।

ততক্ষণে একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে সেখানে। অধিকাংশই পাশের বাড়িগুলোর দারোয়ানশ্রেণীর লোক। দু'চারটে ভিখারীও আছে তাদের মধ্যে।

আসল ঘটনাটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব তারা। কিন্তু কনস্টেবলদের মুখে কোন কথাই নেই। তারা কেবল বলতে থাকে —"ভিড় মৎ করো, হঠ্ যাও, হঠ্ যাও সব।"

সেই খোলা জানালাপথে কিন্তু বাড়িটার মধ্যে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শুধুই অন্ধকার।

এক মিনিট দু'মিনিট করে প্রায় বিশ মিনিট কেটে যায়। দূরে মোটরগাড়ির গর্জন ভেসে আসে। এবার একটু আশ্বস্ত হয় কনস্টেবলরা। সার্জেন্টটিও বেতার গাড়ি থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়। এতক্ষণে বোধহয় পুলিস ফোর্স এসে পড়লো।

তাদের অনুমান মিথ্যে নয়। একখানা পুলিস ট্রাক বোঝাই একদল সশস্ত্র পুলিস এসে হাজির হয় সেখানে। গাড়ি থেকে নেমে আসে দুজন পুলিস অফিসার।

কনস্টেবলরা একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে তাদের কাছে।

তাদের নির্দেশে পুলিস সমস্ত বাড়িটা ঘিরে ফেলে। ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে থাকে দোকানের সামনের দরজার ওপর।

মিনিট পাঁচেক পরে একটি চাকরশ্রেণীর লোক দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে পুলিস ঢুকে পড়ে দোকানের মধ্যে।

নিস্তব্ধ হলঘর। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। হলের একপ্রান্তে মাত্র একটি অল্প-পাওয়ারের আলো জ্বলছে।

পুলিস অফিসারদের মধ্যে একজন সেই চাকরশ্রেণীর লোকটাকে একটা ধমক দিয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করে—"এতক্ষণ দরজা খুলিসনি কেন?"

মৃদুকণ্ঠে লোকটা জবাব দেয়—"শুনতে পাইনি হুজুর!"

রক্তবর্ণ চোখ পাকিয়ে পুলিস অফিসারটি তার কথাই আবার পুনরাবৃত্তি করে—"শুনতে পাওনি, না?"

লোকটা কিন্তু এবার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। পুলিস অফিসার আবার জিজ্ঞেস করে—"এখানের আর সব লোকজন কোথায় গেল?"

—"নিয়মমত খদ্দেররা তো অনেক আগেই চলে গেছে হুজুর। কেউ তো নেই।"

—"তুই একাই মাত্র এখানে আছিস, আর কেউ নেই?"

—"আজ্ঞে, আর ম্যানেজারবাবু আছেন। তিনি তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন।"

চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পুলিস অফিসারটি বলে—"চল্ ম্যানেজারের কাছে নিয়ে চল্ আমাদের।"

একটা টেবিলল্যাম্প জ্বেলে একগাদা খাতাপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যানেজার প্রীতম সিং একমনে কাজ করে যাচ্ছিলো। জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে পুলিস দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পরিষ্কার ইংরেজীতে তাদের অভ্যর্থনা করে।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করে—"এখানে অন্য কোন লোকজন নেই।"

মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে প্রীতম সিং জবাব দেয়—"অনেক আগেই তো দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আর কে থাকবে এখানে!"

—"তা' আপনি এত রাত পর্যন্ত এখানে কী করছেন?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় প্রীতম সিং—"মদের কারবার করি। জানেন তো আবগারী ব্যাপারে আজকাল অনেক ঝামেলা। তাই বসে বসে হিসেবপত্র ঠিক করছিলাম।

পুলিস অফিসারটি তার চোখের দৃষ্টি প্রীতম সিংয়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে বলে — " কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার দোকানের জানালা দিয়ে একটা মৃতদেহ নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানেন?"

বিস্ময়ে প্রীতম সিংয়ের চোখদুটো কপালে ওঠে। মাথা নেড়ে সে বলতে থাকে —"এ হতেই পারে না। আমার দোকানে এত রাতে মৃতদেহ আসবে কোথা থেকে! আর জানালা দিয়ে মৃতদেহ পাচার করবেই বা কে!"

একটু কঠিন স্বরে এবার প্রশ্ন করে পুলিস অফিসার —"তা'হলে আপনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না?"

—"আজ্ঞে না।" — জবাব দেয় প্রীতম সিং।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে পুলিস অফিসারটি বলে —"বেশ, আপনার দোকান আমি সার্চ করবো।"

—"করুন না, আপত্তি কী!"— বলতে বলতে প্রীতম সিং পুলিস-দলকে সমস্ত দোকানটা ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে।

একে একে সমস্ত ঘরগুলো সার্চ করে পুলিস অফিসারেরা। কিন্তু কোথাও কোনো লোকজন কিংবা সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ে না তাদের। দোকানের একেবারে শেষপ্রান্তে বাথরুম-সংলগ্ন একটা ছোট্ট দরজা দেখতে পায় তারা। দরজাটা খুলতেই একটা খুব সরু গলিপথ চোখে পড়ে তাদের। পেছনের ছ তলা বাড়িটার সংলগ্ন এই গলিটা এতই অপ্রশস্ত যে পাশাপাশি একজনের বেশী হেঁটে যেতে পারে না।

পুলিস অফিসারটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রীতম সিংয়ের দিকে তাকাতেই প্রীতম সিং জবাব দেয় —"এই পথে মেথর যাতায়াত করে।"

—"আর সেই সঙ্গে দরকার হলে অন্য যে কেউ এই পথে সরে পড়তে পারে, কেমন? একটু শ্লেষের সুরে প্রশ্ন করে পুলিস অফিসার।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে প্রীতম সিং।

পুলিসদল ঘুরতে ঘুরতে সেই ছোট অন্ধকার কক্ষে এসে হাজির হয়। জানালাটা তখনও তেমনি খোলাই রয়েছে।

প্রীতম সিং সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেয়। ছোট্ট একখানা ঘর। একপাশে একটা গডরেজের আলমারি ছাড়া আর অন্য কোন আসবাবপত্র নেই ঘরের কোথাও।

পুলিস অফিসার প্রীতম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—"এই জানালা দিয়েই সেই মৃতদেহ নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

—"হতেই পারে না।"—জবাব দেয় প্রীতম সিং।

—"কিন্তু দুজন সেপাই স্বচক্ষে দেখেছে ব্যাপারটা।"

—"তা'হলে আর আমি কী বলতে পারি বলুন? তবে হয়ত তারা ভুলও দেখতে পারে।"

—" পুলিসের চোখে সাধারণত অত ভুল জিনিস ধরা পড়ে না।" বলতে বলতে পুলিস অফিসারটি জানালার সামনে এগিয়ে যায়। হঠাৎ সে সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—"একটা টর্চ আনো তো শীগ্‌গির।"

টর্চের জোরালো আলোয় জানালার ওপর দেখা যায় ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। পুলিস অফিসারটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর প্রীতম সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে —"এখানে রক্ত এলো কী করে।" প্রীতম সিং কোন জবাব দেবার আগেই সেই গডরেজ আলমারির পাশে পড়ে থাকা একটা ধুতি ও একটা গিলে করা পাঞ্জাবির ওপর নজর পড়ে সেই পুলিস অফিসারের।

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় সেখানে। পাটভাঙা ধুতি ও পাঞ্জাবি। দামী জিনিস। কিন্তু তাতেও ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ।

হাত দিয়ে জিনিসদুটো তুলে ধরে পুলিস অফিসার প্রীতম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"এই রক্তমাখা জামা কাপড় দুটো কার? এ দুটো এখানে এলো কী করে?"

একমুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে প্রীতম সিংয়ের মুখ। একটা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে সে জবাব দেয়—"আমি...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না..... কেমন করে....."

একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে সেই পুলিস অফিসার —"চুপ করুন! ব্যাপারটা সবই আমরা বুঝতে পারছি।" —বলতে বলতে হঠাৎ তার নজর পড়ে প্রীতম সিংয়ের প্যান্টের ওপর। সাদা প্যান্টের ওপরও দু'তিন ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে রয়েছে।

পুলিস অফিসার সেই রক্তের দিকে প্রীতম সিংয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে —" আপনার প্যান্টে রক্ত এলো কী করে, বলুন।"

মাথা নিচু করে নিজের সাদা প্যান্টের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে প্রীতম সিং। তারপর ছোট্ট একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নিজের আঙুল দেখিয়ে জবাব দেয় —"এ রক্ত আমার নিজের। আঙুল কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে।"

—"আর সেই কাটা আঙুল নিয়ে বোধহয় আপনি এই জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবিতে বোধহয় সেই রক্ত মুছেছিলেন, তাই না?"—তীক্ষ্ণ শ্লেষের কণ্ঠে বলে ওঠে সেই পুলিস অফিসার।

প্রীতম সিং কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

হত্যা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো ম্যানেজার প্রীতম সিংকে। দোকানের সেই চাকরশ্রেণীর লোকটাকেও গ্রেপ্তার করা হলো । তারপর তাদের নিয়ে সদলবলে চলে গেল পুলিস লালবাজারের পথে। যাবার আগে তারা কয়েকজন পুলিস কনস্টেবলকে মোতায়েন করে গেল সেই বাড়িতে।

।। ৫ ।।

রাত তখন সাড়ে তিনটা। ঝনঝন শব্দে লালবাজারের এনকোয়ারী অফিসের টেলিফোন বেজে ওঠে। নিদ্রাজড়িত চোখে ডিউটি অফিসার ফোনটা তুলে নিয়ে জবাব দেয়—"হ্যালো, লালবাজার বলছি।"

ওপাশ থেকে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে আসে —" দেখুন আমি লেক অ্যাভিনিউ থেকে বলছি।"

—"হ্যাঁ বলুন......"

—"দেখুন আমার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরে আসেননি।"

গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে এমনধারা টেলিফোন কিছু নতুন নয়। বিশেষ করে একটু ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই এমন খবর পাওয়া যায়। বাড়ির গিন্নী হয়ত কর্তার জন্যে ধরনা দিয়ে রাত জেগে বসে থাকে, আর কর্তা মহাশয় তখন হয়ত অন্য কোথাও স্ফূর্তির জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তাই ডিউটি অফিসার একটু বিরক্তকণ্ঠেই জবাব দেয়—"তা' এই রাতে আমরা এখন কী করতে পারি?" একটু থেমে অনেকটা উপদেশের ভঙ্গীতে সে আবার বলে—"সকাল হতে দিন, হয়ত তিনি নিজেই এসে যাবেন।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে অধৈর্যকণ্ঠে সেই মহিলা জবাব দেয়— " না, না ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ নয়। গত পনের বছরের মধ্যে আমার স্বামী বাইরে কোথাও রাত কাটাননি। সাধারণত একটু বেশী রাতে কাজকর্ম সেরে তিনি বাড়ি ফেরেন। কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত ফেরেননি।"

এবার একটু নড়েচড়ে বসে সেই ডিউটি অফিসার। তারপর জবাব দেয়—"আপনি শহরের হাসপাতালগুলোয় খোঁজ নিয়েছিলেন?"

—"দেখুন, বাড়িতে মাত্র আমি একা মহিলা। তাই এই রাতে একা একা হাসপাতালে যেতে সাহস করিনি। তবে টেলিফোনে যতটা সম্ভব খবর নিয়েছি, কিন্তু কোনো খোঁজ পাইনি তাঁর।"

—"হুঁ"— বলে পুলিস অফিসারটি এক মিনিট চিন্তা করে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে—"আপনার স্বামীর নাম কি?"

—"মহাদেব চৌধুরী।"

—"ঠিকানা?"

—"...... নম্বর লেক অ্যাভিনিউ?"

—"কী করেন তিনি?"

—"ব্যবসা করেন।" — বলে একটু থামে অমলা। তারপর মহাদেব চৌধুরী শহরের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নামগুলো একে একে বলে যেতে থাকে।

এতক্ষণে পুলিস অফিসারটি বুঝতে পারে যে মহাদেব চৌধুরী হচ্ছে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু এই শেষরাতে তার পক্ষে আর কীই বা করা সম্ভব! তাই সে অমলার কাছ থেকে মহাদেব চৌধুরীর বয়স, চেহারার বিবরণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি জেনে নিয়ে আবার জবাব দেয়—"বেশ, আমরা তাঁর খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করছি। সম্ভব হলে সকালের দিকে আপনি একবার নিজে এখানে আসবেন।

পরের দিন খুব সকালে নিজেদের বড় শিভ্রোলেট গাড়িতে অমলা এসে হাজির হয় লালবাজারে। সঙ্গে আসে চাকর বনমালী।

তখনও চারিদিক ভালমত ফরসা হয়নি। বন্দুকধারী সান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে অমলা এনকোয়ারী অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ডিউটি অফিসারটি তখন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু লিখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে অমলাকে দেখে বললে— "আপনিই বোধহয় মিসেস চৌধুরী?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শুষ্কমুখে সাগ্রহে অমলা বললে— "কোন খবর পেয়েছেন নাকি?"

—"না, এখনও কিছু পাইনি, তবে....." — কথাটা শেষ না করে থেমে যায় অফিসারটি।

ব্যাকুলকণ্ঠে অমলা প্রশ্ন করে — "তবে কী?"

একমুহূর্ত চিন্তা করে অফিসারটি বলে — "না, আমি ঠিক বলতে পারবো না। আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। মার্ডার স্কোয়াডের ইনচার্জকে আমি এখনই খবর পাঠাচ্ছি। তিনিই এসে আপনাকে সবকিছু বলবেন।"

দারুণ উৎকণ্ঠায় চেয়ারে বসে ছটফট করতে থাকে অমলা। মার্ডার স্কোয়াডে কেন? তবে কি তার স্বামী......আর ভাবতে পারে না অমলা। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে আসে, চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, তবে?

সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ একটি কনস্টেবল এসে অন্য একটা ঘরে ডেকে নিয়ে যায় অমলাকে।

অমলাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে মার্ডার স্কোয়াডের ইনচার্জ জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা, আপনার স্বামীর কিসের ব্যবসা ছিল, বলতে পারেন?"

—"যতদূর জানি লোহালক্কড়ের ব্যবসা করতেন তিনি।"

—"তাঁর অফিসের ঠিকানা বলতে পারেন?"

—"দেখুন, আমার স্বামীর ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারের কোনকিছুই আমি জানি না। তাঁর অফিসের ঠিকানাও আমার জানা নেই।"—একটু থেমে আবার সে বলতে থাকে — "ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে বাড়ির কারও নাক গলানো তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না, তাই সে সম্বন্ধে আমরা কখনও কোন খোঁজখবর করতাম না।"

—"তা'হলে আপনার স্বামীর ব্যবসা সংক্রান্ত কিছুই আপনি জানেন না?"

—"না।"

একটু সময় চুপ করে থেকে পুলিস অফিসারটি আবার জিজ্ঞেস করে —"আচ্ছা, আপনার স্বামীর অফিসটা কোন্ পাড়ায় বলতে পারেন?"

—"একবার যেন ওঁর মুখে শুনেছিলাম যে সেটা পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে।"

একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে অফিসারটির মুখে, তারপর একসময় আবার জিজ্ঞেস করে —"দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—অবশ্য মিঃ চৌধুরীকে খুঁজে বের করতে খবরটা আমাদের প্রয়োজন বলেই জিজ্ঞেস করছি।"

—"হ্যাঁ বলুন।"

—"আপনার স্বামী কি ড্রিঙ্ক করতেন?"

ভ্রূযুগল একবার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অমলার। ভদ্রলোক কী বলতে চাইছে? তার স্বামী মাতাল কিনা তাই জিজ্ঞেস করছেন? হয়ত শুধু তাই নয়। এরা হয়ত মনে করছে আর পাঁচজন ধনী ব্যক্তির মত তার স্বামীরও মদের সঙ্গে আরও কোন উপসর্গ আছে। কিন্তু এরা তো তার স্বামীকে চেনে না। অমন স্বামীর স্ত্রী হিসাবে সে নিজে গর্বিত। স্বামী হিসেবে অমলার কাছে মহাদেব চৌধুরী একজন আদর্শ পুরুষ।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অনেক কিছুই মনে পড়ে অমলার। সন্তানহীনা নারী সে। নিজের

দুঃখ নিজের মনে চেপে রেখে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতো সে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক মহাদেব চৌধুরীর ম্লান মুখ নজর এড়াতো না তার। একদিন সে মহাদেব চৌধুরীকে বলেই ফেলেছিলো—"দেখ, একটা কথা বলবো?"

—"বল।" মহাদেব চৌধুরী সপ্রেম দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়।

একটা ঢোক গিলে অমলা বলেছিল—"তুমি আর একটা বিয়ে কর।"

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল মহাদেব চৌধুরী। অমলার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে এমনভাবে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো যে স্বামীর ঐ দৃষ্টির সামনে নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো অমলার। মহাদেব চৌধুরী একটিমাত্র ছোট্ট জবাব দিয়েছিল সেদিন—"তা' হয় না, এ জীবনে আমার পক্ষে তা' সম্ভব নয়।"

তার অমন স্বামী সম্বন্ধে এরা কীই বা জানে, তাই অহেতুক সন্দেহ করছে এরা।

অমলাকে চুপ করে থাকতে দেখে পুলিস অফিসারটি বললে —"এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। একটু আধটু ড্রিঙ্ক আজকাল অনেকেই করে থাকেন, তাই ...."

অফিসারটিকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে জবাব দেয় অমলা—"না, না, লজ্জার কথা নয়। আমি ভাবছি আপনারা তো আমার স্বামীর সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাই ঐসব সন্দেহ করছেন। তিনি জীবনে ওসব কোনোদিন স্পর্শ করেননি।"

—"কিন্তু এমনও তো হতে পারে আপনার অজ্ঞাতে বাইরে তিনি ড্রিঙ্ক করতেন।"

এবার কিন্তু একটু বিরক্তই হয় অমলা। ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়—"আপনি বলছেন কী! বাইরে থেকে ওসব ছাইপাঁশ খেয়ে এলেও স্ত্রী হিসেবে আমি তা জানতে পারবো না!"

—"হ্যাঁ...... তা অবশ্য ঠিক........." অনেকটা আমতা আমতা করে জবাব দেয় সেই পুলিস অফিসার।

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করে থাকে। একসময় পুলিস অফিসারটি আবার বলে —"কাল রাতে আমরা একটা বাড়ি থেকে দুটো জামা-কাপড় খুঁজে পেয়েছি। জানি না সে দুটো আপনার স্বামীর কি না। তবে সত্যিই যদি সেগুলো আপনার স্বামীর হয় তো........" —কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সে।

কেমন যেন একটু হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে অমলা। জামা কাপড়! তার স্বামীর জামা-কাপড় এদের হাতে এসে পড়বে কেমন করে! ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরাল হয়ে ওঠে তার কাছে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে তার। তবুও কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে সে।

পুলিস অফিসারটির নির্দেশে একটি কনস্টেবল একটা কাগজের প্যাকেট এনে খুলতে থাকে তার সামনে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অমলা। দারুণ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে তার পাদুটো। অতিকষ্টে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেয় সে।

প্যাকেটটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। একমুহূর্ত স্থির থেকে সে ছুটে যায় প্যাকেটের সামনে। তারপর কম্পিত হাতে তুলে ধরে সেই কালোপেড়ে ধুতিখানা।

কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে অমলার মুখ। কেউ যেন তার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত চুষে নিয়েছে। কাপড়টা নিজের চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সে অস্ফুটকণ্ঠে বলতে থাকে— "হ্যাঁ, তিনিও তো এমনিই একখানা ধুতি পরে বেরিয়েছিলেন।"

হঠাৎ তার নজর পড়ে পাঞ্জাবিটার ওপর। কাপড়টাকে ছেড়ে দিয়ে পাঞ্জাবিটা টেনে নেয় অমলা। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি। বোতামের ঘাটে হাড়ের সাধারণ বোতাম লাগানো। ধনী মহাদেব চৌধুরী সোনার বোতাম ব্যবহার করতেন না। এমনি সাধারণ বোতামই পছন্দ করতেন তিনি।

পাঞ্জাবিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয় অমলা —"হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও তো আমার স্বামীরই পাঞ্জাবি। কিন্তু এ দুটো আপনারা পেলেন কোথায়? বলুন, কোথায় পেলেন আপনারা?"

তারপর হঠাৎ জামার নিচের দিকে শুকিয়ে যাওয়া কালো কালো রক্তের ছাপের দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন মাথাটা ঘুরে ওঠে তার। পায়ের তলায় মজবুত লালবাজারের বাড়িটা যেন দুলতে থাকে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে নেমে আসে একটা কালো রঙের পর্দা। "একী জামায় এত রক্ত কেন? তবে কি - তবে কি আমার স্বামী......" —কথাটা শেষ না করেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠে মেঝেয় অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে অমলা।

।। ৬।।

গভীর নিস্তব্ধ রাত। রাস্তার দু'পাশে কালো দৈত্যের মত বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার অল্প আলোয় সুপ্ত মহানগরী কলকাতাকে আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

তীব্রবেগে ছুটে চলেছে একখানা মোটরগাড়ি উত্তরের দিকে। ফাঁকা রাস্তায় উল্কাগতি. ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা উত্তরদিকে ছুটে চলেছে গাড়িটা।

ডানলপ ব্রীজের কাছে আসতেই হঠাৎ গতি স্তিমিত হয়ে এসে একসময় দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়িটা। পুলিস চেক পোস্ট। শহরে যাতায়াতের সমস্ত গাড়িগুলো চেক হয় এখানে।

দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে একজন পুলিস অফিসার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সেই অফিসারটি —"এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন?"

গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একজন উত্তর দেয়—"আজ্ঞে, ব্যারাকপুর যাচ্ছি আমরা।"

—"এত রাতে ব্যারাকপুর যাচ্ছেন? কোত্থেকে আসছেন?" পুলিস অফিসারটি আবার প্রশ্ন করে।

কলকাতার একটা ঠিকানা বলে আরোহীটি বললে, —" একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে আমার এই সঙ্গের ভদ্রলোকটি একটু বেসামাল হয়ে পড়েন।" একটু মৃদু হেসে লোকটি আবার বলতে থাকে — বুঝতেই তো পারছেন, পার্টিতে এই ভদ্রলোক একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন তাই আচ্ছন্নের মত শুয়ে আছেন এখন। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে লেবুটেবুর জল খাইয়ে দিতে হবে এঁকে।

পুলিস অফিসারটি মাথা নিচু করে গাড়ির মধ্যে একবার তীক্ষ্ণ নজর দেয়। আপাদমস্তক একটি চাদরে ঢেকে গাড়ির একপাশে হেলে পড়ে আছে একজন ভদ্রলোক, আর পাশের অন্য লোকটি এক হাত দিয়ে ধরে আছে তাকে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে পুলিস অফিসারটি তাড়াতাড়ি গাড়ির চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। না, কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য নজরে পড়ে না কোথাও। শেষে তাদের ব্যারাকপুরের ঠিকানা জেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় গাড়িটা।

উত্তর শহরতলির একটা হাসপাতালের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। কোথাও কোন

লোকজন নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল বাড়িটার সামনের অল্প-পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে।

সেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা লোকটির পাশে বসে থাকা আরোহীটি নেমে আসে গাড়ি থেকে। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তারপর এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

বারান্দায় একপাশে একটা দারোয়ানশ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছিল। লোকটি তার সামনে এসে দু'চারবার ডাকতেই সেই দারোয়ানশ্রেণীর লোকটি ধড়মড় করে উঠে বসে। তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে তিরিক্ষি মেজাজে জিজ্ঞাসা করে —"এত রাতে কী চাই আপনার?"

—"আমরা একটি রোগী নিয়ে এসেছি?" লোকটি জবাব দেয়।

—"রোগী? কিসের রোগী?" বিরক্ত কণ্ঠস্বর সেই দারোয়ানের।

—"মাথা ঘুরে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে?"

—"মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে তো হাসপাতালে কেন? চোখে মুখে একটু জলের ঝাপটা দিন। ঠিক উঠে বসবে।"

—"না, না, সাধারণ অজ্ঞান নয়। মাথায় বোধহয় খুব বেশী চোট লেগেছে।"

—"মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে?"

হাসপাতালের দারোয়ানের এমনধারা প্রশ্নে একটু বিরক্তই হয় লোকটি। কিন্তু উপায় নেই। অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিও চোখে পড়ে না কোথাও। তাই বাধ্য হয়ে মনের রাগ মনেই চেপে রেখে লোকটি আবার জবাব দেয়—"না বাইরে থেকে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। কেবল মাথার একদিকে একটু ছড়ে গেছে। কিন্তু......"

লোকটির কথা শেষ হবার আগেই কিন্তু দারোয়ানটি একটি প্রচন্ড হাই তুলে আবার মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে। তারপর পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে —"এখানে এখন কেউ নেই। রোগী ভর্তিটর্তি এখন হবে না। কাল সকালে আসবেন।

—"কিন্তু কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে যদি রোগীর কোন ভালমন্দ কিছু হয় তবে?"

এবার কিন্তু সেই দারোয়ানশ্রেণীর লোকটি রেগে ওঠে। শুয়ে শুয়েই হাত মুখ নেড়ে সে বলতে থাকে—" এমন যদি গরজ তো আর জি. কর-এ চলে যান। এখানে এত রাতে রোগী ভর্তি হবে না।"— বলেই আর একটা হাই তুলে পাশ ফিরে ঘুমোতে চেষ্টা করে।

খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটি আস্তে আস্তে ফিরে আসে গাড়ির কাছে। ড্রাইভারের সীটে যে লোকটি বসে ছিল তার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করে, তারপর আবার সেই দারোয়ানশ্রেণীর লোকটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মৃদুকণ্ঠে দু'একবার ডাক দিতেই মাদুরের ওপর উঠে বসে চিৎকার করে কিছু বলতে যায় সেই দারোয়ানটি। কিন্তু তার আগেই সেই লোকটি নিচু হয়ে তার হাতের মধ্যে কিছু গুঁজে দিতেই দারোয়ানটি উঠে দাঁড়ায়। তারপর অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে —"রোগী কোথায়?"

আঙুল দিয়ে বাইরে দাঁড় করানো গাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটি জবাব দেয়—"ওই গাড়ির মধ্যে।"

লোকটির আপাদমস্তক একবার দেখে নেয় দারোয়ানটি, তারপর বলে—"একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি আমি।"

যথারীতি রোগীকে ভর্তি করে নিয়ে রোগীর নাম ধাম ঠিকানা সব লিখে নেন ডাক্তারবাবু। তারপর বলেন—"ঠিক আছে, আপনারা এখন যেতে পারেন। কাল সকালে একবার এসে খবর নিয়ে যাবেন।"

* * * *

দু'দিন কেটে গেছে তারপর। এই দু'দিনের মধ্যে রোগীর জ্ঞান ফেরেনি। আর আশ্চর্যের ব্যাপার রোগীর বাড়ি থেকে কোন লোকও খবর নিতে আসেনি। এদিকে রোগীর অবস্থা সংকটজনক। তাকে মেডিক্যাল কলেজে ট্রান্স্ফার করা একান্ত দরকার। বাধ্য হয়ে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় হাসপাতালের একটি লোক রোগীর বাড়িতে যায় খবর দিতে। কিন্তু ফিরে এসে সে ডাক্তারকে জানায় যে ঐ নম্বরের কোন বাড়িই নেই ঐ পাড়ায়।

চিন্তিত হয়ে পড়েন ডাক্তারবাবু। এ অবস্থায় কী করা যায়? বাধ্য হয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে সেই অচৈতন্য রোগীকে ট্রান্স্ফার করে নিজের কর্তব্য শেষ করেন তিনি।

।। ৭।।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে অহীন সোম তির্যক দৃষ্টিতে ডেক চেয়ারে উপবিষ্ট তার বন্ধু বরুণ রায়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর পায়ের চটিটা ছেড়ে জুতো পায়ে দিতে দিতে বলে — 'বুঝতে পারছি আজ তোমার বেড়াতে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই, কি বল, বরুণ?"

—"কেমন করে বুঝলে?"— ডেক চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে উঠে বসে বরুণ জিজ্ঞেস করে।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে অহীন বলতে থাকে —"শুধু তাই নয়, তোমার আর এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে, তাই না?"

অহীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একসময় বরুণ জিজ্ঞেস করে— "আচ্ছা অহীন, তুমি কি থট-রীডিং জান নাকি? তা'না হলে এমনিভাবে মনের কথা বলতে পার কী করে?"

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে অহীন।

অহীন সোম কলকাতায় নামজাদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। বাংলা ভাষায় যাকে বলে শখের গোয়েন্দা অহীন কিন্তু তা' নয়। শখ করে গোয়েন্দাগিরি করে না অহীন। এটা তার পেশা। হ্যাঁ পেশাই বলতে হবে। যদিও মৃত্যুকালে তার বাবা তার জন্য যা' রেখে গেছেন তাতে নবাবী চালে পায়ের ওপর পা রেখে সে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু অহীন সে প্রকৃতির মানুষ নয়। বাবা রেখে গেছেন বলেই যে জীবনটা কুঁড়েমি করে বসে বসে কাটিয়ে দিতে হবে তা সে মোটেই পছন্দ করে না।

তার বাবা ছিলেন পশ্চিমবাংলার একজন নামকরা পদস্থ পুলিস অফিসার। অপরাধীদের মনস্তত্ত্বে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শুধু তাই নয়, একজন প্রথমশ্রেণীর তদন্তকারী অফিসার হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। ইংরেজ আমলে সরকারী পয়সায় তাঁকে পাঠানো হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। সেখানে তিন বছর থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইন্ভেস্টিগেশনে তাঁর সাধারণ 'ন্যাক্' আর প্রখর বুদ্ধির তারিফ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছিলেন তখনকার দিনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ্। দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন কঠিন অপরাধের তদন্তভার পড়েছিল তাঁর কাঁধের ওপর এবং নিজের বুদ্ধিবলে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সেগুলোর সমাধান করেছিলেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলার বাইরেও বিশেষ করে তখনকার দিনের দেশীয় রাজ্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হতো বিভিন্ন কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্যে।

এহেন পুলিস অফিসারের পুত্র এই অহীন সোম। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর একমাত্র ছেলে একজন ডাক্তার হবে। কিন্তু ডাক্তার হবার কোন ইচ্ছেই ছিল না অহীনের। বাবার প্রফেশনই তার পছন্দ হতো বেশী। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার অজান্তে দেশবিদেশের নামকরা ডিটেকটিভ বই পড়তো সে। গভীর মনোযোগ দিয়ে বাবাকে লুকিয়ে তাঁর তদন্তের ডাইরীগুলো বাড়িতে বসে সে পড়তো। আর মনে মনে ভাবতো সেও একদিন তার বাবার মত একজন নামকরা তদন্তকারী অফিসার হবে।

বি. এস্. সি পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে সে যখন বাবার পায়ের ধুলো নিতে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো তখন তার বাবা তাকে আশীর্বাদ করে বললেন— "এবার মেডিক্যাল কলেজে অ্যাডমিশনের একটা ব্যবস্থা করি, কি বল?"

"বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস হয়নি অহীনের। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে জবাব দিয়েছিল—"আমার ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছা করে না বাবা।"

—"তবে এবার কী পড়বে?"—গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন তার বাবা।

—"আমি চাকরি করবো।" —মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন অহীন।

—"চাকরি করবে? কেন? তোমার কী এমন জরুরী প্রয়োজন যে তোমাকে এখনই পড়াশুনো ছেড়ে চাকরি করতে হবে?"

খানিকক্ষণ মৌন থেকে জবাব দিয়েছিল অহীন—"আমার ইচ্ছা আমি পুলিসে চাকরি করবো।"

"পুলিসে চাকরি করবে?"—চমকে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তার বাবা। ছেলের মুখে তিনি কী দেখতে পেয়েছিলেন তা' তিনিই জানেন। কিন্তু তিনি শুধু জবাব দিয়েছিলেন —"বেশ, তুমি এখন বড় হয়েছো, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না। তবে পুলিসে চাকরি করতে হলে তোমাকে নিজের যোগ্যতায় তা' যোগাড় করে নিতে হবে। অন্যকে ডিঙিয়ে আমার রেফারেন্সে যে তোমার চাকরি হবে তা আমি চাই না।"

ডাইরেক্ট ডি.এস.পি. পদের জন্যে ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়েছিল অহীন। পাসও করেছিল ভালভাবে, কিন্তু ভাইভাভোসীতে প্রশ্নকর্তার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে তার মতবিরোধ হয়। শুধু তাই না, অহীন তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল যে তিনি নিজেই ভুল করেছেন, অহীনের কথাই ঠিক। এই অপরাধে তার সিলেকশন হলো না।

অহীনের তখন সাংঘাতিক রোখ চেপে গেছে। পুলিসে সে ঢুকবেই। কিন্তু তার কপাল মন্দ। ডাইরেক্ট সাব-ইন্সপেক্টরেও সে সিলেক্টেড হতে পারলো না।

সাংঘাতিক মুষড়ে পড়েছিল অহীন। এবার সে কী করবে ভাবছে, ঠিক এমনি সময় তার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন।

পড়াশুনো করতে আর ইচ্ছা হলো না অহীনের। কিন্তু একটা কিছু তাকে করতেই হবে। বাড়িতে বসে বাবার পয়সায় নবাবী সে কিছুতেই করবে না। ঠিক এমনি সময় মাত্র তিনি মাসের ব্যবধানে তার মাও স্বর্গে চলে গেলেন।

সংসারে একেবারে একা হয়ে পড়লো অহীন। কলকাতার প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনে নিজের নাম লেখালো সে। সেই থেকে শুরু হলো তার প্রাইভেট ডিটেকটিভের জীবন?

কিন্তু যার সত্যিকারের ক্ষমতা আছে সে যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বেই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করলো অহীন। কতগুলো জটিল মামলার কোন কিনারা করতে না পেরে পুলিস যেখানে বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল অহীন সেখানে তদন্তভার গ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে সেই সব জটিল সমস্যার সমাধান করেছিল। শুধু তাই নয়, অপরাধীকেও দীর্ঘদিন পর গ্রেফতার করিয়ে বিচারার্থে তাকে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল আদালতে।

সেই থেকে স্বনামধন্য পিতার মত পুত্রের নামও ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। লোকে বলতো—'বাপকা ব্যাটা।' কেউ কেউ বলতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্রিমিন্যাল সাইকোলজিতে পাণ্ডিত্য ও রহস্যের সমাধানের ক্ষমতায় তার পরলোকগত পিতাকেও নাকি ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে। পুলিস কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত মাঝে মাঝে পরামর্শের জন্যে তার কাছে আসতো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি স্পেশাল কেস হিসাবে সরাসরি তাকে পুলিস ডিপার্টমেন্টের একটা উচ্চপদে বসাতে চেয়েছিল কিন্তু অহীন সোম তাতে রাজি হয়নি। সে নাকি বলেছিল, যে ডিপার্টমেন্টে চেষ্টা করেও সে ঢুকতে পারেনি সেখানে আর কোনদিন সে প্রবেশ করবে না।

অহীন সোমের তদন্তের ব্যাপারে একমাত্র সহকারী তার ছেলেবেলার মাতাপিতাহীন বন্ধু বরুণ রায়। সহকারী বললে ঠিক বলা হবে না, বলতে হয় শিক্ষানবীশ। কিন্তু বরুণের বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক তেমন তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু আগ্রহ তার প্রচুর। অহীন বলে, বরুণের এই আগ্রহই তার ভাল লাগে। বন্ধু হলেও বরুণের কাছে অহীন একজন আদর্শ পুরুষ। তার এতটুকু সমালোচনা সহ্য করতে পারে না সে। একবার নাকি বরুণ একজন ঈর্ষাপরায়ণ পুলিস অফিসারকে অহীন সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করবার জন্যে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বরুণকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, কিন্তু সেই পুলিস অফিসারটিও পরে নিজের সেই বিরূপ সমালোচনার জন্যে লজ্জিত হয়েছিল।

অহীনকে মিটিমিটি হাসতে দেখে বরুণ আবার বলে—"বল না, কী করে বুঝতে পারলে যে আজ আমার বেড়াতে যাবার ইচ্ছা নেই, আর এক কাপ চা খাবার খুব ইচ্ছা হয়েছে।"

হাসতে হাসতেই অহীন বলে—" আরে ভাই থট-রীডিংফিডিং কিচ্ছু নয়। একটু চোখ কান খুলে রাখলে তুমিও তা অনায়াসে বলে দিতে পার।"

বরুণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বন্ধুর মুখের দিকে। অহীন বলতে থাকে—"তোমার পাশে ঐ পড়ে থাকা ইংরেজী ডিটেকটিভ বইটা আজ সকাল থেকে পড়ছো তুমি, তাই না?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় বরুণ। অহীন বলে—"ঐ বইটা আমিও পড়েছি। সাংঘাতিক সাসপেন্স রয়েছে ঐ বইতে। একবার পড়তে আরম্ভ করলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। তোমাকেও দেখছি আজ তোমার প্রিয় দিবানিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করে সমস্ত দুপুরটা ঐ বই পড়ে তুমি কাটিয়েছ। এখন তাকিয়ে দেখ ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তুমি বেড়াতে বের হও। কিন্তু আমি আড়চোখে লক্ষ্য করছি তুমি একবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছ আবার বইটার দিকে দেখছ। তার অর্থই হলো তোমার ঠিক বইটা ছেড়ে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

অহীনের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতায় চমৎকৃত হয় বরুণ। তারপর আবার বলে—"কিন্তু চা

খাবার ব্যাপারটা?"

"সেও খুবই সহজ। আজ বিকেলে চা খেতে বসে তুমি বলেছিলে যে চাটা কেমন যেন জোলো জোলো লাগছে, তাই না?"

—"হ্যাঁ তা' অবশ্য বলেছিলাম। কিন্তু তা' বলে যে আমার আর এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করবে তা' বুঝলে কী করে?"— জবাব দেয় বরুণ।

অহীন বলে—"রোজই বিকেলে চা খাওয়ার পর তুমি ড্রয়ার খুলে কৌটো বের করে এলাচ লবঙ্গ খাও, তাই না?"

মাথা নাড়ে বরুণ। অহীন বলতে থাকে —"আজও লক্ষ্য করলাম তুমি চা খেয়ে এসে এলাচ লবঙ্গ খাওয়ার জন্যে কৌটো খুললে। তারপর কি মনে করে এলাচ লবঙ্গ না খেয়ে হাতে করে নিয়ে এসে ডেক চেয়ারে বসলে, আর ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাতে লাগলে। তার অর্থই হলো বাহাদুরের জন্যে অপেক্ষা করছো তুমি। সে এলেই তাকে আর এক কাপ চা তৈরি করতে বলবে। তারপর সেই চা খেয়ে ঐ এলাচ মুখে দিয়ে আবার বইটা পড়তে আরম্ভ করবে। কী? ঠিক বলেছি না?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বরুণ জবাব দেয় —"আশ্চর্য, বাড়িতে বসে বসেও তুমি এত সব লক্ষ্য করো?"

হোহো শব্দে হেসে ওঠে অহীন। তারপর জবাব দেয় —"এটাই হচ্ছে স্বভাব। একবার চোখ কান খুলে চলাফেরা করার অভ্যাস হয়ে গেলে ঘরে আর বাইরে কোন প্রভেদ থাকে না।" — বলতে বলতে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় অহীন। যেতে যেতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বরুণকে লক্ষা করে আবার বলে —"একটু দরকারে বাইরে যাচ্ছি। রাত আটটা নাগাদ ফিরে আসবো।"

।। ৮।।

বেলা প্রায় দশটা। মুখের ওপর খবরের কাগজ মেলে ডেক চেয়ারে বসেছিল অহীন সোম। পাশে আর একটা চেয়ারে বসে বরুণ একটা কাগজের উপরে কিছু নোট নিচ্ছিল।

এমন সময় নেপালী কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড অর্থাৎ একাধারে চাকর ও ঠাকুর এবং আরও ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয় অহীনের সংসারের পরিচালক বাহাদুর এসে ডাক দেয় — "চানের জল দেওয়া হয়েছে বাবু।"

—"হ্যাঁ যাই।"—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন। বরুণও কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলতে থাকে।

ঠিক এমন সময় বাইরের কলিং বেলটা কর্কশ শব্দে বেজে ওঠে।

অহীন বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বলে —"দেখ তো কে ডাকছে।"

একটু বাদেই ফিরে আসে বাহাদুর। "একটি মেয়ে দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে।"— বাহাদুর বলে।

—"এখানে নিয়ে আয় তাকে।"

বাহাদুরের পেছনে আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে অমলা চৌধুরী।

অহীনের চেহারার মধ্যে কিন্তু তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। অতি সাধারণ চেহারা। গায়ের রং ময়লা। ছিপছিপে গড়ন। অন্যদিকে বরুণ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। যেমন লম্বা চওড়া

চেহারা তেমন গায়ের রং। তাই অনেকেই দেখা করতে এসে বরুণকেই অহীন বলে ধরে নেয় প্রথমে।

অমলা চৌধুরীও ঠিক সেই ভুল করে। বরুণের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে বলে —"বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, অহীনবাবু। আমাকে সাহায্য করতেই হবে।"

গম্ভীরমুখে বরুণ আঙুল দিয়ে অহীনকে দেখিয়ে দিয়ে বলে —"ঐ হচ্ছে অহীনবাবু।"

লজ্জিতমুখে অমলা অহীনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে—" কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

জবাব দেয় বরুণ —"না না, আমার এই নাদুসনুদুস চেহারা দেখে অনেকেই এই ভুল করে থাকে। ওতে আপনি লজ্জা পাবেন না।"

অহীনের নির্দেশে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অমলা বলে —"বড্ড বিপদ আমার।"

—"কী বিপদ, খুলে বলুন।"— জবাব দেয় অহীন।

অমলা একে একে বলতে থাকে তার স্বামী মহাদেব চৌধুরীর নিরুদ্দেশের কথা । লালবাজারে তার স্বামীর জামা-কাপড় সনাক্তকরণের ব্যাপারটাও সে বাদ দেয় না।

সব শুনে গম্ভীরভাবে জবাব দেয় অহীন —"পুলিস কী বলে?"

—"তারা তো গত তিন দিন ধরে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোন হদিস পায়নি তাঁর।"

মিনিট কয়েক নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায় সকলের। ডেক চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে অহীন। অমলাও চুপ করে বসে থাকে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝরণা কলমের ক্লিপটাকে অকারণে রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে থাতে বরুণ।

একসময় অমলা কিছু বলতে যেতেই বরুণ মুখে একটা শব্দ করে ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে তাকে কথা বলতে বারণ করে। বরুণ অহীনের এই ভাবটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। সে যখন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করে তখন চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকে। এই সময় কথা বলে কেউ তার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটালে সে মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়।

মিনিট দশেক পরে চোখ খুলে অমলার দিকে তাকায় অহীন। তারপর জিজ্ঞেস করে — "আপনার মুখে ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে যে পুলিসের মতে আপনার স্বামী কোন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাই না?"

—"মনে হয় সেইরকমই তাদের সন্দেহ।"—ধরা গলায় জবাব দেয় অমলা।

—"কিন্তু ঐ রক্তমাখা জামাকাপড় তারা কোথায় পেলো, সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানিয়েছে তারা?"

—"হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটা মদের দোকানে পাওয়া গিয়েছিল সেদিন রাতে।"

—"কিন্তু ঐ জামাকাপড় যে আপনার স্বামীর সে সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই?"

—"না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ঐ জামা-কাপড় আমার স্বামীর।"

একটু থেমে অহীন আবার প্রশ্ন করে —"সেদিন আপনার স্বামীর পায়ে কী জুতো ছিল, বলতে পারেন।"

এক মিনিট চিন্তা করে অমলা জবাব দেয় —"কালো রঙের পাম্পসু।"

—"আচ্ছা, মিস্টার চৌধুরীর অফিসটাও তো ঐ পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে অবস্থিত,তাই না?"

—"আজ্ঞো হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছিলাম।"

—"বাড়ির নম্বর কিংবা রাস্তার নাম আপনি বোধহয় বলতে পারবেন?"

—"না, আমার তা জানা নেই। কারণ বাড়ি এসে তিনি অফিস-সংক্রান্ত কোন কথাই কখনও বলতেন না। কেউ সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও বিরক্ত বোধ করতেন।"

মুখে 'হুঁ' জাতীয় একটা শব্দ করে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অহীন। তারপর একসময় আবার জিজ্ঞাসা করে —"আমার মনে হয় বিকেলে অফিসে যাওয়ার সময় মিঃ চৌধুরী কখনও আপনাদের নিজেদের বাড়ির গাড়ি ব্যবহার করতেন না। কেমন?"

বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দেয় অমলা —"হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে?"

অমলার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অহীন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে—"ঠিক আছে, আপনার ব্যাপারটা আমি টেকআপ করলাম। আজ থেকেই আমি কাজ শুরু করবো।"— তারপর একটু থেমে আবার বলে —"বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ আপনাদের বাড়ি আমি যাবো।"

কৃতজ্ঞতায় অমলার চোখে জল এসে পড়ে। সদাব্যস্ত অহীন সোমকে এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে রাজী করানো যাবে কি না সে সম্পর্কে তার নিজের মনে ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

অমলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা চেক বের করে অহীনের হাতে দিতে গিয়ে বলতে থাকে —"আপনাদের পারিশ্রমিক কত তা' আমি জানি না। তবুও এই হাজার টাকার চেকটা নিয়ে এসেছি আপনার জন্যে। বাকী টাকাটা আপনি যেদিন বলবেন সেদিন দিয়ে দেব।"

একটু মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন —"আপাতত চেকটা আপনার নিজের কাছেই রেখে দিন। কাজ শেষ হবার আগে আমি কিছুই নিই না। তা'ছাড়া....." —কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে থেমে যায় অহীন।

—"তা'ছাড়া?"—অহীনের অসম্পূর্ণ কথাটার রেশ টানে অমলা।

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন —"তা'ছাড়া আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে বোধহয় খুব বেশী টাকা আর নেই। কাজেই আপনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই টাকা আপনার নিজেরই কাজে লাগবে।"

অহীনের কথাবার্তায় বিস্মিত না হয়ে পারে না অমলা। তার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কেও এই রহস্যময় লোকটি খবর রাখে!

কিন্তু অমলাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না দিয়েই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অহীন বলে ওঠে— "সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আপনি তা'হলে এখন আসুন।"—বলেই স্মিতহাস্যে ছোট্ট একটি নমস্কার করে সে।

অগত্যা অমলাও প্রতিনমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ঠিক বেলা এগারোটায় খাবার টেবিলে বলে অহীনের দিকে তাকিয়ে বরুণ জিজ্ঞাসা করে —"আচ্ছা তুমি কী করে বুঝলে যে মহাদেব চৌধুরী অফিসে যাওয়ার সময় নিজেদের গাড়ি ব্যবহার করতেন না?"

খেতে খেতে জবাব দেয় অহীন —"অতি সহজ ব্যাপার। যতটা বুঝতে পেরেছি মহাদেব চৌধুরীর অফিসে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। সেই জন্যেই তিনি নিজের অফিসের ঠিকানা কাউকে বলতেন না। এমনকি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত নয়। এই অবস্থায় তুমি কি আশা কর যে নিজেদের গাড়ি ও ড্রাইভার নিয়ে তিনি অফিসে যাবেন, আর ড্রাইভার তাঁর অফিসের ঠিকানা জেনে নেবে?"

—"কিন্তু এমনও তো হতে পারতো যে মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে কোন ড্রাইভার নেই। তিনি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করেন।"—প্রশ্ন করে বরুণ।

—"না তা নয়। তুমি শুনেছ কিনা জানি না, কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি যে আমাদের কলিং বেল বাজাবার আগে একটা গাড়ি এসে থামলো দরজার সামনে। তারপর আমি যখন অমলা দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন ড্রাইভারের পোশাক পরা একটি লোক দরজার সামনে উঁকিঝুঁকি মারছিল—বোধহয় অমলা দেবীর দেরি হচ্ছে দেখেই লোকটি উসখুস করছিল। তাইতেই বুঝতে পারলাম যে অমলা দেবী ট্যাক্সিতে আসেননি, এসেছেন প্রাইভেট কারে। কারণ ট্যাক্সি হলে ট্যাক্সির ড্রাইভার দরজার সামনে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে কেন?" একটু থেমে অহীন আবার বলতে থাকে—"সুতরাং বুঝতে পারা গেল মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে গাড়ি আছে এবং ঐ গাড়ি চালাবার জন্যে একজন ড্রাইভারও আছে। এবং নিজের ড্রাইভার থাকতে নিজে গাড়ি চালায় এমন লোকের সংখ্যা এই কলকাতাতে খুব বেশী নেই। কাজেই ধরে নিতে আমার অসুবিধা হলো না যে মহাদেব চৌধুরী নিজে গাড়ি চালান না।"

খাওয়া থামিয়ে বরুণ অহীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর একসময় বলে —"কথা বলতে বলতে তুমি এতসব বিষয় চিন্তা করতে পারো?"

—"পারি বইকি। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে সকলেই পারে।"— বলে আবার খেতে শুরু করে তারা।

খেতে খেতে হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনিভাবে বরুণ আবার প্রশ্ন করে —"কিন্তু ঐ চেকের ব্যাপারটা? ওটা যে অমলা দেবীর নিজের অ্যাকাউন্টের চেক এবং তাঁর অ্যাকাউন্টে যে খুব বেশী টাকা নেই, একথা তুমি জানলে কী করে?"

হেসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে অহীন জবাব দেয় —"আমি কী করে বুঝতে পারলাম তা' আমি পরে বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি নিজে একটু চিন্তা করে দেখ তো, কিছু বলতে পার কিনা?"—বলেই আবার খাওয়ার দিকে মন দেয় অহীন। আর, এঁটো হাতটা প্লেটের ওপর রেখে আকাশপাতাল চিন্তা করতে থাকে বরুণ। খাওয়ার কথা একদম ভুলে যায় সে।

অহীনের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলো, তখনও বরুণ বসে বসে চিন্তা করছে। অহীন একসময় বলে —"নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না? মহাদেব চৌধুরী সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পারলাম তাতে মনে হলো তিনি নিজেই বাড়ির সব কিছু ব্যাপারে খবরদারি করেন। স্ত্রী অমলা দেবী অত্যন্ত গোবেচারী মানুষ। কাজেই সেই মহাদেব চৌধুরী নিজেই যখন নিরুদ্দেশ, তখন চেকে অমলা দেবী নিজে ছাড়া আর সই করবে কে? আর নিজের নামে অ্যাকাউন্ট না থাকলে কি কেউ চেকে সই করে?"

তারপর বিস্মিত বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে —"স্বামীর অনুপস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে অমলা দেবী নিজের সামান্য পুঁজি থেকেই হাজার টাকা তুলে আমাকে দিতে চেয়েছিলেন।"

।। ৭।।

সেদিনই দুপুরে অহীন সোম বরুণ রায়কে নিয়ে লালবাজারে এসে হাজির হয়। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ভৌমিক তখন অফিসেই ছিলেন। আরদালী মারফত একখানা চিরকুট পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে অহীন। একটু বাদেই তার ডাক আসে।

ঘরে ঢুকতেই মিঃ ভৌমিক হাত বাড়িয়ে তাদের আহ্বান জানান —"আসুন, আসুন মিঃ সোম। একটু আগেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সঙ্গে আপনার কথাই হচ্ছিল।"

চেয়ারে বসতে বসতে কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় অহীন —"তাই নাকি। তবে তো খুব ভয়ের ব্যাপার বলতে হবে। আপনাদের মত পুলিসের কর্তারা যদি আমার মত একটি অভাজন সম্বন্ধে এত আলোচনা করেন, তা'হলে সেটাকে কি খুব আনন্দের ব্যাপার বলতে হবে?"—বলেই হোহো করে হেসে ওঠে সে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ভৌমিকও হেসে ওঠেন।

হাসতে হাসতে মিঃ ভৌমিক বলেন —"তা'যা বলেছেন। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিসে ছুঁলে নাকি বত্রিশ ঘা। কাজেই পুলিসে কেবল আলোচনা করলে অন্ততঃ তার এক-চতুর্থাংশ তো হবেই, কি বলেন?"

আবার একটা হাসির রোল ওঠে ঘরে। খানিকক্ষণ পরে মুখের পাইপে নতুন করে তামাক গুঁজে তাতে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ ভৌমিক বলেন —"তারপর মিঃ সোম, কী মনে করে, বলুন।"

অহীন জবাব দেয় —"....নম্বর লেক অ্যাভিনিউর মিঃ মহাদেব চৌধুরী সম্পর্কে কোন খবর পেলেন?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে এক মিনিট চিন্তা করেন মিঃ ভৌমিক। তারপর পাশের স্তূপাকৃতি ফাইলের মধ্যে থেকে একটা ফাইল টেনে বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন —"আশ্চর্য ব্যাপার, ভদ্রলোকটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। আমাদের তরফ থেকে সবরকম চেষ্টাই আমরা করেছি কিন্তু তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি।"—একটু থেমে আবার বলতে থাকেন তিনি —"বাই দি বাই, আপনি ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে এত ইনটারেস্টেড হলেন কেন?"

—"ওঁর স্ত্রী এই ব্যাপারে আমাকে এনগেজ করেছেন।"

উল্লসিত হয়ে ওঠেন মিঃ ভৌমিক। বলেন —"তাই নাকি। তবে তো অতি চমৎকার কথা। আমরা এখন নিশ্চিন্তমনে এই ফাইল রেখে দিতে পারি। আপনি যখন এর মধ্যে এসে পড়েছেন তখন এর একটা কিনারা হবেই।"

অহীন আবার প্রশ্ন করে —"আপনাদের কী মনে হয়? মহাদেব চৌধুরী নিহত হয়েছেন?"

—"হ্যাঁ, সারকামস্ট্যান্স দেখে তাই মনে হয়।.......নম্বর পার্ক স্ট্রীটের সেই মদের দোকানের সামনে গভীর রাতে পাহারা দেওয়ার সময় দুজন সেপাই পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে যে কাপড়ে ঢাকা একটা মৃতদেহ ঐ দোকানের একটা খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সেপাই দুজন তাদের চ্যালেঞ্জ করতেই একটা প্রাইভেট গাড়িতে দেহটা নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। সেই জানালার ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের চিহ্নও ছিল। সেইখানেই মহাদেব চৌধুরীর জামাকাপড় দুটো পাওয়া গেছে। সুতরাং এ অবস্থায় মহাদেব চৌধুরীকে হত্যা করে তার দেহ পাচার করে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান করাই তো স্বাভাবিক।"

—"কিন্তু মহাদেব চৌধুরী যে প্রতিদিন কিংবা বিশেষ করে ঐ দিন মদের দোকানে গিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?"

—"না, তা' অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে সেই দোকানের ম্যানেজার প্রীতম সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

—"প্রীতম সিং কী বলে?"

বিরক্তকণ্ঠে মিঃ ভৌমিক জবাব দেন —"সেই পাঞ্জাবী ম্যানেজারটা একনম্বরের লায়ার।

সে বলে যে মহাদেব চৌধুরীকে সে চেনে না। ঐরকম কোন লোককে সে জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।"

—"কিন্তু ঐ রক্তমাখা ধুতি পাঞ্জাবি ও সেই মৃতদেহ পাচার করে দেওয়ার ব্যাপারে সে কী বলে?"

—"কিছুই বলে না। বলে —আই ডোন্ট নো—আমি জানি না"

একটু সময় চুপ করে থেকে অহীন আবার জিজ্ঞেস করে —"প্রীতম সিং কি জামিনে ছাড়া পেয়েছে নাকি?"

—"না। মার্ডার চার্জে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিনে ছাড়া পাওয়া কি এতই সহজ ব্যাপার? বাছাধনকে সাত দিনের জন্যে পুলিস কাস্টোডিতে নেওয়া হয়েছে।"

—"তা'হলে তো সে এখন এই লালবাজারের সেন্ট্রাল লক্‌আপেই আছে, তাই না, মিঃ ভৌমিক?"

ঘাড় নেড়ে সায় দেন মিঃ ভৌমিক। অহীন আবার জিজ্ঞেস করে —"তার সাথে একবার দেখা করতে পারি?"

—"নিশ্চয় নিশ্চয়, একবার কেন দরকার হলে আপনি একশবার দেখা করতে পারেন তার সঙ্গে।"—বলেই মিঃ ভৌমিক কলিং বেল টিপে একজন অফিসারকে ডেকে নির্দেশ দেন।

সেন্ট্রাল লক্ আপের ভারী লোহার দরজা খুলতেই দেখা গেল ভেতরে অনেকগুলো লোক বসে জটলা করছে। একপাশে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক শুষ্কমুখে বসে আছে।

অফিসারটি নাম ধরে ডাকতেই সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে মাথার পাগড়িটা একটু ঠিক করে নিয়ে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রীতম সিংকে ইনটারভিউ রুমে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে মুখোমুখি আর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অহীন সোম।

সামান্য দু'চারটা কথাতেই অহীন বুঝতে পারে ভদ্রলোক বেশ শিক্ষিত। পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব দিতে থাকে প্রীতম সিং।

অহীনের কথার জবাবে সে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে—"আমি মহাদেব চৌধুরী নামে কোন লোককে চিনি না।"

অহীন আবার প্রশ্ন করে —"আচ্ছা মিঃ সিং, রাতে আপনার দোকানে যারা মদ খেতে আসে তাদের সবাইকেই কি আপনি চেনেন?"

জবাব দেয় প্রীতম সিং —"দেখুন, কলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার ওখানে ড্রিঙ্ক করতে যেতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রত্যহ যেতেন তাঁদের আমি চিনি। কিন্তু তা'ছাড়া অনেক ক্যাজুয়াল ভিজিটরও যেতেন। আমার পক্ষে তাঁদের চেনা সম্ভব নয়।"

—"তা' তো বটেই।"অহীন বলে —"কিন্তু সেদিন রাতে কোন ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোক কি আপনার ওখানে গিয়েছিল?"

একটু চিন্তা করে প্রীতম সিং জবাব দেয় —"ধুতি পাঞ্জাবি পরা সেদিন অনেক ব্যক্তিই ওখানে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভেতর কে মহাদেব চৌধুরী তা' আমি কী করে বলবো?"

তীক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রীতম সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অহীন আবার প্রশ্ন করে —"সেদিন গভীর রাতে জানালা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া একটা মানুষের মৃতদেহ আর সেই সঙ্গে রক্তমাখা ধুতি পাঞ্জাবি সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে?"

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় প্রীতম সিং —"মাপ করবেন। ঐ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। সেদিন গভীর রাতে পুলিস যখন আমার দোকানে আসে তখন আমি দোকানের হিসেবপত্র ঠিক করছিলাম।"

অহীন বুঝতে পারে অত্যন্ত কঠিন ব্যক্তি এই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। এর মুখ থেকে বেফাঁস কিছু বের করা যাবে না। তাই সে তাকে পুনরায় লক্‌আপে পাঠিয়ে দিয়ে মিঃ ভৌমিকের ঘরে ফিসে আসে।

মিঃ ভৌমিক জিজ্ঞেস করেন —"কি, কিছু বের করতে পারলেন ঐ লোকটার মুখ থেকে?"

—"না"— ছোট্ট জবাব দেয় অহীন সোম। তারপর আবার বলে —"সেই ধুতি পাঞ্জাবিটা একবার দেখতে পারি, মিঃ ভৌমিক?"

—"নিশ্চয়।"

মিঃ ভৌমিকের আদেশে অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন কনস্টেবল কাগজের প্যাকেটে মোড়া ধুতি পাঞ্জাবিটা এনে হাজির করে সেখানে। অহীন মনোযোগ দিয়ে উলটেপালটে জিনিসগুলো দেখতে থাকে। পরীক্ষা করে রক্তের দাগগুলো।

অহীন একসময় বলে —"আচ্ছা, মিঃ ভৌমিক, এবার তা'হলে উঠি।"

—"আর একটু বসবেন না?"—অনুরোধ করেন মিঃ ভৌমিক।

—"না। আর একদিন আবার আসবো। আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। সঙ্গে সঙ্গে বরুণও উঠে দাঁড়ায়।

নমস্কার বিনিময়ের পর বাইরে বেরিয়ে আসে তারা।

সাড়ে তিনটা বাজতে তখনও মিনিট কয়েক বাকী। একটা ট্যাক্সিতে চেপে অহীন সোম বরুণ রায়কে নিয়ে এসে হাজির হয় মহাদেব চৌধুরী বাড়িতে। বিরাট তিনতলা অট্টালিকা। সামনে প্রশস্ত লন। দেশী বিদেশী নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে লন-সংলগ্ন বাগানে। গেট দিয়ে ঢুকতেই বাঁদিকে কোল্যাপসিবল্ গেট লাগানো মোটর গ্যারেজ।

অমলা দেবী বোধহয় এদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অহীন ও বরুণ বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই অমলা দেবী ভেতর থেকে ছুটে এসে গেট খুলে দেয়। তারপর শুষ্কমুখে তাদের অভ্যর্থনা করে—"আসুন, ভেতরে আসুন।"

অমলা দেবীকে অনুসরণ করে অহীন ও বরুণ দোতলায় একটা প্রশস্ত ঘরে এসে হাজির হয়।

চেয়ারে বসতে বসতে পকেট থেকে রুমার বের করে কপালের ঘাম মুছে অহীন জিজ্ঞেস করে—"আপনার স্বামীর আর কোন খবর পেলেন?"

—"না"—মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় অমলা। চোখদুটি তার ছলছল করে ওঠে।

আর কোন কথা না বলে অহীন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ঘুরে ঘুরে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো একে একে দেখতে থাকে, আর চেয়ারে স্থির হয়ে বসে বরুণ ও অমলা এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটির কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকে।

আর দশজন লোকের মত অহীন সোমের কথা অমলাও অনেক শুনেছে. কিন্তু লোকটি যে কতটা ক্ষমতাশালী তার প্রমাণ সেদিন সে তার বাড়িতেই পেয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সেই চেকটা বের করতে না করতেই এই ব্যক্তিটি একেবারে মুখস্থ বলে দিলে যে চেকটা তার নিজের অ্যাকাউন্টেই কাটা হয়েছে এবং তার সেই অ্যাকাউন্টে বেশী টাকাও নেই। তা'ছাড়া

তার স্বামীর বাড়ির গাড়ি ব্যবহারের কথাটাও এই ব্যক্তি এমনভাবে বলে দিলে যেন এ বাড়ির সমস্ত কিছুই তার একেবারে নখদর্পণে। কিন্তু এই ব্যক্তিকে চাক্ষুষ দেখা তার এই প্রথম. এবং যতদূর তার মনে পড়ে এই বিখ্যাত অহীন সোমের সঙ্গে মহাদেব চৌধুরীর কোনকালে আলাপ. ছিল বলেও সে শোনেনি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখা শেষ করে একসময় আবার চেয়ারে এসে বসে অহীন। তারপর দেয়ালের একপাশে একখানা বড় ছবি দেখিয়ে অমলাকে জিজ্ঞেস করে—"এটাই বোধহয় আপনার স্বামীর ছবি?"

—"হ্যাঁ।" জবাব দেয় অমলা।

—"আপনারা কি আগে বম্বে থাকতেন?"

অমলা জবাব দেয় —"হ্যাঁ।"

—"সেখানে আপনার স্বামী কী করতেন, জানেন কি?"

—"কী করতেন তা' ঠিক বলতে পারবো না, তবে সিনেমা লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর।"

—"তিনি কি সিনেমার প্রডিউসার ছিলেন?"

—"ঐ রকমই কিছু ছিলেন বোধহয়।"

খানিকক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করে অহীন, তারপর একসময় হঠাৎ প্রশ্ন করে—"আপনার স্বামী বোধহয় ড্রিঙ্ক করতেন না?"

—"না।"

—"কিন্তু সেদিন রাতে তিনি ঐ মদের দোকানে কেন গিয়েছিলেন বলতে পারেন?"

—"সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে তিনি যদি কখনও মদ খেতেন, তবে স্ত্রী হয়ে একদিন না একদিন আমি ঠিক তা' টের পেতাম।"

—"আচ্ছা, আপনার স্বামী রোজই বিকেল ঠিক চারটার সময় বেরিয়ে যেতেন, তাই না?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর বাড়ি ফিরতেন গভীর রাতে ?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় অমলা।

হঠাৎ একসময় অহীন বরুণের দিকে তাকিয়ে বলে—"একবার বাইরে যাও তো বরুণ। মনে হয় বাইরে গিয়ে তুমি দেখতে পাবে কোন খালি ট্যাক্সির ড্রাইভার ফুটপাথের পাশে রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এই বাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছে। যদি সেরকম কিছু দেখতে পাও তো ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বলে তুমি আমাকে এসে খবর দেবে।"

কিছু বুঝতে না পেরে বরুণ অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । অমলা দেবীও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অহীনের দিকে।

বরুণের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখতে পায় অহীন। তাই সে আবার বলে—"এখন বাইরে যাও। পরে সবই জানতে পারবে।"

বরুণ আর দ্বিধা না করে বাইরে চলে যায়। অহীন অমলার দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে—"আচ্ছা, আপনার স্বামী কী হাতঘড়ি ব্যবহার করতেন?"

—"হ্যাঁ, তাঁর হাতের কবজিতে একটা রোলেক্স ঘড়ি বাঁধা ছিল।"

ঠিক এমনি সময় বরুণ এসে আবার ঘরে ঢোকে। অহীনের দিকে তাকিয়ে সে বলতে

থাকে—"আশ্চর্য ব্যাপার, বাইরে যেতেই দেখি একটা ট্যাক্সি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আর গাড়ির ড্রাইভার হর্ন বাজাতে গিয়েই আমাকে দেখে থেমে গেল। আমি তাকে সেখানে দাঁড়াতে বলে চলে এসেছি। কী ব্যাপার বল তো অহীন?"

একটা মৃদু হাসি অহীনের ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। তারপর সে বললে—"ড্রাইভার বোধহয় তোমাকে দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল?"

—"হ্যাঁ, অহীন। কিন্তু তার আগেই আমি ছুটে চলে এসেছি তোমাকে খবর দিতে। কী জানি যদি সে আবার চলে যায়!"

—"না হে, না। এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও ড্রাইভার আর চলে যাবে না। তুমি যদি ড্রাইভারকে তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিতে তবে সমস্ত ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারতে।" — বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন। তারপর অমলা দেবীকে নমস্কার করে দুজনে বাইরে চলে আসে।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হয় অমলার। বিস্মিত অমলা তাদের প্রতিনমস্কার পর্যন্ত করতে ভুলে যায়।

।। ১০।।

বাড়ি থেকে বাইরে এসে অহীন একবার থমকে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে দেখে নেয়। তারপর কোনো কথা না বলে সোজা ট্যাক্সির সামনে এসে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে। বরুণও নিঃশব্দে অনুসরণ করে তাকে।

বৃদ্ধ ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখে কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিতে দিতে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভার হিন্দীতে জিজ্ঞেস করে—"কোথায় যাব, সাব?"

—"এস্‌প্লানেড"— জবাব দেয় অহীন।

গাড়ি ছুটে চলে এস্‌প্লানেডের দিকে।

যেতে যেতে সামনের দিকে নজর রেখে বৃদ্ধ ট্যাক্সি ড্রাইভার একসময় জিজ্ঞেস করে—"একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সাব?"

—"আলবৎ।"

—"আপনারা যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ঐ বাড়ির বাবু কি কলকাতায় নেই?"

—"না, তিনি এখন বাইরে আছেন।" জবাব দেয় অহীন।

বৃদ্ধ ড্রাইভাব আর কোন কথা না বলে গাড়ি চালাতে থাকে।

খানিকক্ষণ পরে অহীন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে—"ঐ বাবুকে বোধহয় তুমি রোজ নিয়ে যেতে, তাই না?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ড্রাইভার। অহীন আবার প্রশ্ন করে—"তোমার সঙ্গে কি মাসকাবারী বন্দোবস্ত ছিল?"

—"না, সাব। রোজের ট্যাক্সি ভাড়া রোজ দিয়ে দিতেন তিনি। তবে বাবু ঠিক বিকেল চারটার সময় বাইরে যেতেন বলে আমি রোজই ট্যাক্সি নিয়ে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াতাম। মোটা বকশিস দিতেন বাবু।"

—"আচ্ছা, বাবু রোজ কোথায় যেতেন বলতে পারো?"

—"পার্ক স্ট্রীটের সেই বড় বাড়িটার সামনে নেমে যেতেন রোজ।" জবাব দেয় ড্রাইভার।

—"তবে, আমাদেরও আজ সেখানেই নামিতে দিও।"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সে।

পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় দেয় অহীন। তারপর বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে—"আশাকরি এতক্ষণে ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পেরেছো?"

—"আমাকে কি এতই বোকা ভাবো যে এতক্ষণেও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি আমি?"

—"বেশ, তবে এবার এগিয়ে চলো। দেখা যাক মহাদেব চৌধুরী রোজ কোথায় যেতেন তা' জানতে পারি কি না।"

ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে অহীন একসময় বাঁদিকের ছোট্ট পানের দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু সময় চিন্তা করে সে এগিয়ে যায় দোকানের সামনে।

একটি শাঁসালো খদ্দের বিবেচনা করে উড়ে পানওয়ালা জিজ্ঞেস করে—"সিগারেট দিব, বাবু?"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বের করতে করতে অহীন জবাব দেয়—"এক প্যাকেট গোল্ডফ্ল্যাক।"

প্যাকেট খুলে বরুণকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা সিগারেট মুখে দেয় অহীন। তারপর দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে—"রোজ এই সময় যে বাবু এখানে ট্যাক্সি থেকে নেমে এদিকে হেঁটে যেতেন তাঁকে চেন তুমি?"

একমুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তা করে সেই পানওয়ালা। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনিভাবে একটা মুখের ভঙ্গী করে জবাব দেয় —"সেই ধুতিপরা বাবুর কথা বলছেন?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ।"—জবাব দেয় অহীন।

কালো দাঁত বের করে হেসে সেই পানওয়ালা বলতে থাকে—"সে তো আমার অনেকদিনের খদ্দের। তাকে কেন চিনবো না, বাবু?"

আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্যে অহীন আবার জিজ্ঞেস করে—"কাল সেই বাবু এসেছিলেন?"

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় পানওয়ালা—"না, বাবু। দু'তিন দিন সেই বাবু আসেনি এদিকে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অহীন আবার প্রশ্ন করে—"সেই বাবু এদিক দিয়ে কোথায় যেতেন, বলতে পারো?"

পানওয়ালা তার ছোট্ট দোকানের কাঠের পাটাতনের ওপর উবু হয়ে বসে বাইরে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে উলটোদিকের একটা ছোট রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

অহীন বরুণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ছোট রাস্তা ধরে খানিকদূরে এগিয়েই বুঝতে পারে তারা সেই মদের দোকানের সামনে এসে পড়েছে। দোকানের দরজা তখন বন্ধ। বাইরে পুলিস কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। একজন পুলিস অফিসারও উপস্থিত ছিল সেখানে।

অহীনকে দেখে অফিসারটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করে। প্রতিনমস্কার করে অহীন বলে—"আমাকে একবার বাড়ির ভেতরটা দেখতে হবে, মিঃ সেন।"

অফিসারটি অহীনকে ভালমতই চিনতো। সে বুঝতে পারে ডিটেকটিভ অহীন সোম নিশ্চয়ই সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্যে এসেছে। তাই সে দ্বিধা না করে বাইরের দরজার

তালা খুলে দেয়। মিঃ সেনের সঙ্গে অহীন ও বরুণ ঢুকে পড়ে সেই বাড়িতে।

হলঘরের কাউন্টারের সামনে তখনও থরে থরে মদের বোতল সাজানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অহীন চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, তারপর কি মনে হতেই একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালে একটু চাপ দিতেই একটা দরজা খুলে যায়। তিনজনে তখন সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

পাশাপাশি চার-পাঁচখানা ছোট ছোট ঘর। প্রতিটি ঘরের মধ্যে একটা করে চৌকো টেবিল। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার সাজানো।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে নজর রেখে একটার পর একটা ঘর পরীক্ষা করতে থাকে অহীন।

অবশেষে এককোণের সেই ছোট্ট ঘরটার সামনে আসতেই সেই পুলিস অফিসারটি বললে—"এই ঘরের জানালা দিয়েই মৃতদেহটা বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল, স্যার।"

ছোট অপরিসর ঘর। এককোণে একটা আলমারি ছাড়া ঘরে আর অন্য কোন আসবাবপত্র নেই।

অহীন হাত দিয়ে চাপ দিতেই আলমারির ডালা খুলে গেল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আলমারির জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে থাকে অহীন।

গোটাকয়েক প্যান্ট ও শার্ট এবং সাধারণ কিছু টুকিটাকি জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই আলমারিতে।

আলমারির ডালা বন্ধ করে জানালার দিকে এগিয়ে যায় অহীন। ভেতর থেকে বন্ধ ছিল জানালাটা। অহীন ধাক্কা দিয়ে কপাটদুটো খুলে দিতেই একঝলক পড়ন্ত রোদের আলো এসে ঢুকলো ঘরে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জানালাটা পরীক্ষা করতে থাকে অহীন। তখনও ফোঁটা ফোঁটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের কালো দাগ ছিল সেখানে। গভীর মনোযোগ দিয়ে দাগগুলো পরীক্ষা করে সে।

একসময় সেই পুলিস অফিসারটি অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে—"এইখানে সেই রক্তমাখা জামা-কাপড় পড়ে ছিল, স্যার।"—বলেই সে আলমারির পাশের কোণটা দেখিয়ে দেয়।

উবু হয়ে বসে সেই জায়গাটা পরীক্ষা করে অহীন। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"ধন্যবাদ মিঃ সেন। আমার কাজ হয়ে গেছে। এবার আমরা চলি।" বলেই নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা চুকিয়ে অহীন বরুণকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

।। ১১।।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর পাশাপাশি দুটো ডেক চেয়ারে বসে অহীন সোম তার বন্ধু বরুণ রায়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে অহীন বললে—"তোমার কী মনে হয়, বরুণ।"

—"কী সম্বন্ধে?"— বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বরুণ।

—"মহাদেব চৌধুরীর কথা বলছি।"—জবাব দেয় অহীন।

একটু সময় চুপ করে থেকে বরুণ বলে—"ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল বলেই মনে হচ্ছে আমার। আজকের এনকোয়ারীতে এটা বুঝতে পেরেছি যে মহাদেব চৌধুরীর সেই বিকেলে

অফিসে যাওয়ার ব্যাপারটা একদম বাজে কথা। আসলে তিনি রোজ বিকেলে ঐ মদের আড্ডায় যেতেন। এবং ব্যাপারটা গোপন রাখতে গিয়েই তিনি বাড়ির গাড়ি ব্যবহার না করে ট্যাক্সিতে যাতায়াত করতেন।"

বরুণ থামতেই অহীন বলে ওঠে—"বেশ, বলে যাও—বলে যাও।"

বরুণ বলতে থাকে—"আমার মনে হয় অমলা দেবী ব্যাপারটা জানেন। কোন কারণে গোপন করে যাচ্ছেন।"

—"কি করে বুঝলে যে অমলা দেবী জানেন?"—প্রশ্ন করে অহীন।

—"বাঃ, স্বামী রোজ বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে, আর স্ত্রী সে কথা জানতে পারবেনা!"

—"কিন্তু মদের দোকানে যেত বলেই যে মহাদেব চৌধুরী সেখানে বসে মদ খেত আর আড্ডা দিত সেটা কিন্তু এখনও প্রমাণ হয়নি, বরুণ।"

—"তবে কি মহাদেব চৌধুরী মদের দোকানে যেত কীর্তন গাইতে?"—একটু উষ্ণকণ্ঠেই এবার বলে বরুণ।

একটা মৃদু হাসি ভেসে ওঠে অহীনের ঠোঁটের কোণে। বন্ধুর উষ্মা দেখে বোধহয় মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করে। তাই সে আবার বলে—"বেশ, বলে যাও। তোমার অভিমতটাই আগে শুনি।"

বরুণ বলতে থাকে—"মদের দোকান মানেই গুণ্ডাষণ্ডার ব্যাপার। কোন কারণে সেদিন গভীর রাতে ঐ মহাদেব চৌধুরী সেখানেই নিহত হন। তারপর সেই মৃতদেহটা সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বের করে সরিয়ে ফেলতে সাহসী না হয়ে খুনী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ঐ জানালা দিয়ে গলিপথে নামিয়ে নিয়ে গাড়ি করে উধাও হয়ে যায়।" একটু থামে বরুণ। তারপর আবার বলতে থাকে—"আমার মনে হয় মদের দোকানের ম্যানেজার ঐ প্রীতম সিং সব জানে। কিন্তু লোকটা সবকিছু গোপন করে যাচ্ছে।"

ঠিক এমনি সময় ঝনঝন শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন। বরুণ উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরে।

একটু বাদেই টেলিফোনের মাউথপিসটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বরুণ অহীনকে বললে—"ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডি.সি. তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

অহীন উঠে এসে টেলিফোন ধরে।

মিনিট কয়েক কথা বলার পর অহীন যখন টেলিফোন রেখে দিয়ে চেয়ারে এসে বসে তখন তার মুখ গম্ভীর।

বরুণ অহীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কি বললেন ডি.সি.?"

চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দেয় অহীন—"প্রীতম সিংয়ের প্যান্টেও নাকি দু'চার ফোঁটা রক্ত পাওয়া গিয়েছিল। সেই রক্ত পরীক্ষা করে সিরিওলজিস্ট নাকি রিপোর্ট দিয়েছেন যে ঐ রক্ত এবং মহাদেব চৌধুরীর ধুতি পাঞ্জাবিতে যে রক্ত পাওয়া গিয়েছিল, আর জানালায় যে রক্তের ফোঁটা পড়েছিল সেই রক্ত সবই এক গ্রুপের রক্ত।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বরুণ। সে জবাব দেয়—"সিরিওলজিস্ট ঠিকই রিপোর্ট দিয়েছেন। মহাদেব চৌধুরীকে ধরাধরি করে জানালা দিয়ে নামিয়ে দেবার সময় বোধহয় প্রীতম সিং নিজেও তাকে ধরেছিল, তাই তার প্যান্টেও মহাদেব চৌধুরীর রক্ত লেগে গিয়েছিল।"

বরুণের কথা অহীনের কানে গিয়েছিল কিনা কে জানে। বরুণ কিন্তু তাকিয়ে দেখে ডেক চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে অহীন।

।। ১২।।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ভৌমিকের কাছ থেকে জরুরী টেলিফোন পেয়ে বরুণকে সঙ্গে নিয়ে অহীন যখন লালবাজারে এসে উপস্থিত হলো তখন সবে সকাল আটটা।

মিঃ ভৌমিকের ঘরে ঢুকে অহীন দেখে মিঃ ভৌমিক ছাড়া আর একজন অপরিচিত লোক সেখানে বসে আছে। মিঃ ভৌমিকের মুখে চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

অহীনকে দেখেই মিঃ ভৌমিক যেন অকূলে কূল পেলেন। হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন —"এই যে এসে গেছেন। এদিকে যে সাংঘাতিক বিপদ।"

চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে অহীন —"আবার কী বিপদ?"

—"বলেন কি, বিপদ নয়? মহাদেব চৌধুরীর মতো শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হলেন কিন্তু তাঁর মৃতদেহটা পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না আমরা। তাই নিয়ে পেপারওয়ালারা রোজই আমাদের ওপর কটূক্তি বর্ষণ করছে। আবার দেখুন এদিকে এক উটকো ঝামেলা"—বলেই সেই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে আবার বলতে থাকে—"শুনুন এই ভদ্রলোক কী বলছেন।"

অহীন তাকিয়ে দেখে প্রায় মাঝারিগোছের বয়স ভদ্রলোকের। পাণ্ডুর রোগক্লিষ্ট মুখ। চোখে অবসন্ন দৃষ্টি।

অহীন জিজ্ঞেস করে —"কী নাম আপনার?"

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় লোকটি —"শ্রীমুকুন্দ দত্ত।"

—"হ্যাঁ, বলুন আপনার কী বলার আছে।"—প্রশ্ন করে অহীন।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে মুকুন্দ দত্ত সেদিন রাতে মেদিনীপুর থেকে কলকাতা আসার পথে আনন্দ মিশ্রের সঙ্গে আলাপ হওয়া থেকে শুরু করে সেই মদের দোকানের জুয়োর অড্ডায় নিজের কুড়ি হাজার টাকা হেরে দিয়ে সর্বস্বান্ত হবার ঘটনা একে একে বলে যায়।

—"তারপর?"—প্রশ্ন করে অহীন।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে মুকুন্দ দত্ত —"আমি তখন পাগলের মত হয়ে উঠেছি। আমার মনে তখন কেমন একটা ধারণা জন্মে গেল যে এ সমস্তই হচ্ছে আনন্দ মিশ্রের কারসাজি। সব ব্যাপারটাই সাজানো। কুমার বাহাদুরের সাগরেদ দুজন তখন সমস্ত টাকা টেবিলের ওপর গুছিয়ে নিয়ে একখানা কাপড়ের টুকরোয় বাঁধতে ব্যস্ত। হঠাৎ আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। সেই লোকদুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে নোটের বাণ্ডিলগুলো ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম আমি। আর মুখে বলতে লাগলাম —'আপনারা সব চোর, জোচ্চোর, ঠগ। আমি এখনই থানায় গিয়ে পুলিসকে সব কথা জানিয়ে দেব'। হঠাৎ কে যেন কোন একটা কঠিন বস্তু দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করলো আমার মাথায়। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম আমি। তারপর আর কিছু আমার মনে নেই।"

মিঃ ভৌমিকের মুখ গম্ভীর। বরুণের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কেবল অহীনের মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

অহীন জিজ্ঞেস করে —"আপনার জ্ঞান হলো কখন?"

জবাব দেয় মুকুন্দ দত্ত —"কাল সন্ধ্যায় যখন আমার জ্ঞান হলো তখন দেখি আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুয়ে আছি।"

একটু চিন্তা করে অহীন আবার জিজ্ঞেস করে —"ঐ আচমকা আঘাতে আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেও আপনার মাথা কোথাও কেটে ছিঁড়ে যায়নি, কেমন?"

—"আজ্ঞে না।"—জবাব দেয় মুকুন্দ।

—"আচ্ছা, বলুনতো কুমার বাহাদুর দেখতে কেমন?"

—"বেশ মোটাসোটা, ফরসা চেহারা।"—জবাব দেয় মুকুন্দ।

অহীনের ইঙ্গিতে ও মিঃ ভৌমিকের আদেশে একটি কনস্টেবল সেই রক্তমাখা ধুতি পাঞ্জাবি এনে হাজির করে সেখানে।

অহীন মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করে—"দেখুন তো এই জামা কাপড় চিনতে পারেন কিনা।"

খানিকক্ষণ সেই ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুকুন্দ দত্ত জবাব দেয়—"কুমার বাহাদুর সেদিন এইরকমই একটা গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ধুতির পাড়ও এইরকমই কালো ছিল।"

অহীনের মুখটা আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে। মিঃ ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে —"মহাদেব চৌধুরীর একখানা ফটো আনার ব্যবস্থা করুন, মিঃ ভৌমিক।"

জবাব দেন মিঃ ভৌমিক —"তাঁর ফটোগ্রাফ মার্ডার স্কোয়াডের ও.সি.র কাছে রয়েছে। ও.সি. একটু বাইরে গেছে। এখনই হয়ত এসে পড়বে। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, মিঃ সোম।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় অহীন। মুকুন্দ দত্তকে বাইরে বসিয়ে রেখে অহীনের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন মিঃ ভৌমিক।

মিঃ ভৌমিক বলেন —"তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে একটু অন্যরকম—যাকে বলে চোরের ওপর বাটপাড়ি। জুয়োর আসরে মহাদেব চৌধুরী কুমার বাহাদুর সেজে বসেছিলেন এবং মুকুন্দ দত্তর বিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু ভোগে লাগেনি টাকাটা। দোকানের সেই পাঞ্জাবী ম্যানেজার প্রীতম সিং আর তার দলের লোকেরা কুমার বাহাদুররূপী মহাদেব চৌধুরীকে হত্যা করে সেই টাকাটা লুঠ করে নেয়। তারপর জানালা দিয়ে তার মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলে।"

মাথা নেড়ে বরুণও সম্মতি জানায়। বলে—"হ্যাঁ, দেখে শুনে ব্যাপারটা তাই মনে হয়।"

অহীন কিন্তু গম্ভীরমুখে চুপ করে থাকে।

এমনি সময় মুকুন্দর দত্তকে সঙ্গে নিয়ে মার্ডার স্কোয়াডের ও.সি. এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। হাতে তার একখানা ফটোগ্রাফ।

খানিকক্ষণ ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে থেকে মুকুন্দ দত্ত বলে —" আজ্ঞে না, ইনি কুমার বাহাদুর নন।"

স্তব্ধ হয়ে যান মিঃ ভৌমিক। বরুণও চুপ করে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটাই আবার জট পাকিয়ে যায় তাদের কাছে।

একটু রহস্যময় হাসি হেসে উঠে দাঁড়ায় অহীন। তারপর বলে—"আজ তা'হলে উঠি মিঃ ভৌমিক।"

।। ১৩।।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে অহীনের ড্রইং-রুমে বসে ছিল অহীন ও বরুণ। বরুণ একসময় জিজ্ঞেস করে—"তোমার কী মনে হচ্ছে অহীন? মহাদেব চৌধুরীর মৃতদেহটা তারা কোথায় সরিয়ে ফেললো?"

অন্যমনস্কভাবে একটা বই নাড়তে নাড়তে জবাব দেয় অহীন—"খুঁজে পেয়েছি আমি।"

বিস্মিত বরুণ হাঁ করে অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে সে আবার জিজ্ঞেস করে —"বল কি! পেয়েছ? কোথায়? কখন?"

—"আজ সকালে বম্বে থেকে যে চিঠিটা পেয়েছি, ঐ চিঠিতে। মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন।"

*　　*　　*　　*

লালবাজারে মিঃ ভৌমিকের ঘর। দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে অহীন ও বরুণ। টেবিলের উলটো দিকে দাঁতে পাইপ চেপে উদ্বিগ্নমুখে বসে আছেন মিঃ ভৌমিক।

মিঃ ভৌমিক জিজ্ঞেস করেন—"মহাদেব চৌধুরীর দেহটা কেমন করে খুঁজে বের করলেন, মিঃ সোম?"

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে অহীন জবাব দেয়—"এই চিঠির সাহায্যে।"

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে মিঃ ভৌমিক বলেন —"একবার দেখতে পারি চিঠিটা?"

—"একটু পরে, মিঃ ভৌমিক। তার আগে সেই ম্যানেজার প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে চাই।"

সেন্ট্রাল লকআপ থেকে নিয়ে আসা হলো প্রীতম সিংকে। চার-পাঁচ দিন পুলিস হাজতে থেকে বেচারা শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে।

অহীন প্রীতম সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে —"সেদিন আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন। মহাদেব চৌধুরীকে আপনি ভালমতই চেনেন। সে প্রতিদিন বিকেল চারটার সময় আপনার মদের দোকানে যেত।"

পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব দেয় প্রীতম সিং—"না, আমি, মিথ্যা বলিনি। আমি তাকে মোটেই চিনি না।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড করে বসলো অহীন। একলাফে প্রীতম সিংয়ের সামনে গিয়ে তার গালপাট্টা দাড়ি চেপে ধরলো সে।

—"কি করছেন, মিঃ সোম—কি করছেন"—বলতে বলতে চেঁচিয়ে ওঠেন মিঃ ভৌমিক। কিন্তু তার আগেই অহীন একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান দিল সেই দাড়িতে, আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে এলো সেই দাড়ি। মাথার পাগড়িটাও খসে পড়লো তার।

বিস্মিতদৃষ্টিতে বরুণ ও মিঃ ভৌমিক তাকিয়ে দেখে যে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাদেব চৌধুরী।

* * * *

ঘরভর্তি পুলিস অফিসার। বরুণও রয়েছে তার মধ্যে। চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে বলতে থাকে অহীন।

—“মহাদেব চৌধুরীর ব্যবসার কথা একদম বাজে। বম্বেতে সিনেমা লাইনে মেক্‌আপম্যানের কাজ করতো সে আর সেই সঙ্গে এটা-ওটা করে বেশ কিছু পয়সা-কড়ি জমিয়েছিল। কলকাতায় এসে বাড়ি গাড়ি ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠলো। এদিকে জমানো পয়সায় আর ক'দিন চলে! তাই প্রীতম সিং নাম দিয়ে একটা মদের দোকানের লাইসেন্স নিয়ে মদের ব্যবসা শুরু করলো। আর সেই সঙ্গে চলতো জুয়োর আড্ডা। এই পথে প্রচুর আয় হতে লাগলো তার। কিন্তু একটা ভীষণ অসুবিধায় পড়লো সে। শহরের অনেক পরিচিত গণ্যমান্য ব্যক্তি যেত ঐ মদের দোকানে। তাদের সামনে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে যে মহাদেব চৌধুরী মদের ও জুয়োর ব্যবসা করে তা'হলে মুহূর্তে তার সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই সে প্রতিদিন বিকেল চারটার সময় দোকানে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে পাঞ্জাবীর মেক্‌আপ নিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে বসতো। তার মেক্‌আপের হাত এত নিখুঁত ছিল যে কেউ কখনও তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। গভীর রাতে দোকানের কাজ শেষ করে মেক্‌আপ খুলে ফেলে বাড়ি ফিরতো সে।” একটু থেমে আবার বলতে থাকে অহীন —“মহাদেব চৌধুরীর স্ত্রী যদিও সনাক্ত করেছিলেন যে ঐ ধুতি পাঞ্জাবির মালিক হচ্ছে মহাদেববাবু, তবুও আমার ধারণা হয়েছিল যে মহাদেব চৌধুরী নিহত হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি নিহত হলো, তার জামা-কাপড় খুলে রেখে তার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার কোন অর্থই হয়না। আর তা'ছাড়া জামার নিচের দিকে মাত্র কিছু রক্তের দাগ ছিল এবং ধুতিরও একপাশে ছিল সামান্য কিছু রক্তের দাগ। কোন লোকের মাথায় কিংবা বুকে কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে সেখানে রক্তের দাগ না থেকে জামার নিচের দিকে রক্ত লেগে থাকবে কেন? পরে অবশ্য মহাদেববাবুর স্বীকারোক্তি থেকে বুঝতে পারলাম যে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। সেদিন বিকেলে মেক্‌আপ নেবার আগে জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হাতের আঙুল কেটে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের পাঞ্জাবির নিচের অংশটা দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে। দু'চার ফোঁটা রক্ত জানালার ওপরও পড়েছিল।”

একটু থামে অহীন। মিঃ ভৌমিকের প্রশংস দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলিয়ে সে আবার বলে যেতে থাকে —“আরও একটা কথা—হত্যাকারী মৃতদেহ থেকে জামা কাপড় খুলে রেখে দিল কিন্তু জুতো খুলে নিল না—তার অর্থ কী? তা'হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে সেদিন রাতে জানালা দিয়ে যে মৃতদেহটা পাচার করা হয়েছিল তার সঙ্গে এই রক্তমাখা জামা কাপড়ের কোন সম্পর্কই নেই। তবে সেদিন জানালা দিয়ে পাচার করা হলো কার মৃতদেহ? পরে বুঝলাম ওটা মৃতদেহ নয়, মুকুন্দ দত্তর অচৈতন্য দেহ।”

এই সময় বরুণ জিজ্ঞেস করে—“তুমি কি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলে যে প্রীতম সিংই মহাদেব চৌধুরী?”

—“হ্যাঁ, অনুমান করেছিলাম। কারণ প্যান্ট শার্টের সঙ্গে প্রীতম সিংয়ের পায়ে ছিল

কালো পাম্পসু, যা' নাকি মহাদেব চৌধুরীর পায়েও ছিল। তা'ছাড়া অমলা দেবীর কথামত তাঁর স্বামীর রোলেক্স ঘড়ির মত অবিকল একটা হাতঘড়ি ছিল প্রীতম সিংয়ের বাঁ হাতের কবজিতে।"—বরুণকে জবাব দিয়ে অহীন আবার বলতে থাকে—"মাত্র আজ সকালে বম্বে থেকে আমার একজন পুলিস অফিসার বন্ধুর চিঠি পেলাম। তাতে সে জানিয়েছে যে মহাদেব চৌধুরী সেখানে মেক্আপম্যানের কাজ করতো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠলো আমার কাছে।"

—"তা'হলে ঐ মুকুন্দ দত্তর ব্যাপারটা?" প্রশ্ন করে বরুণ।

জবাব দেয় অহীন—"তার সঙ্গে মহাদেবের কোন সম্পর্ক নেই। মহাদেবের জুয়োর আড্ডায় মুকুন্দ একদল প্রতারকের খপ্পরে পড়েছিল। এই ধরনের প্রতারণার নাম নওসেরা ট্রিক্স।"

কথা শেষ করে অহীন। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বরুণকে উদ্দেশ করে বলে—"অনেক রাত হয়ে গেল, এবার বাড়ি চল, বরুণ।"

মিঃ ভৌমিক চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আবেগে জড়িয়ে ধরেন অহীনকে। সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায় অহীন সোম।

গাজী মস্তান

পুরো সাতটি বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে অবশেষে নিজের গ্রামে ফিরে এলো বোমারু। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হতো, কিন্তু ওর বয়স বিবেচনা করে জজসাহেব ওকে সাত বছর কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। সাধারণ মামলা তো নয়— খুনের মামলা। দিন-দুপুরে সকলের চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বোমা ছুঁড়ে সে খুন করেছে।

বাইশ-তেইশ বছরের তরতাজা যুবক সেখ মানিক ধারে-কাছের পাঁচ সাতখানা গ্রামে বোমারু নামেই পরিচিত। বোমা-পটকা বানাতে ওস্তাদ বলেই ওর ঐ নাম। গাঁয়ের সবাই ওকে জানে। এমন কি সে কোথায় বসে ঐ জিনিস তৈরি করে তাও তাদের অজানা নয়। পুলিস দু'তিন বার ওর সেই কুটিরশিল্পের কারখানায় হানাও দিয়েছিল, কিন্তু বোমা-পটকা তো দূরের কথা, সামান্য মশলাপাতির সন্ধানও তারা পায় নি সেখানে।

এ যুগে পশ্চিমবাংলায় বোমা-পটকা তৈরির কুটির-শিল্পেরই এখন জমজমাট অবস্থা। আজকাল এখানে-ওখানে বোমা-পটকা ছোড়া কোন ঘটনাই নয়। ক্রিমিন্যালেরা অনেকে নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই ওসব তৈরি করে নেয়। কেউ কেউ আবার বোমারুর মতো ওস্তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগায়।

সেখ মানিকের বাবা ছিল সেখ আনোয়ার। দিন মজুরী খেটে তার দিন চলতো। বিঘেখানেক জমির ফসলে তার সংসার চলতো না বলেই তাকে এর জমিতে ওর জমিতে মজুরী খাটতে হতো। সেখ আনোয়ারের আর একটি গুণ ছিল—তার গানের গলাখানি ছিল চমৎকার। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় অন্যের ঘরের চাল ছাইতে ছাইতে আনোয়ার যখন ভাটিয়ালি সুরে গলা ছেড়ে গান ধরতো তখন খোদ ঘরের মালিক পর্যন্ত তার কাজের দিকে নজর না দিয়ে তার গানের দিকে কান খাড়া করে রাখতো।

সেই আনোয়ার একদিন নারকেল পাড়তে গিয়ে একটা উঁচু গাছ থেকে পড়ে মারা গেল। আনোয়ারের বিধবা বৌ চোখে অন্ধকার দেখলেও উপযুক্ত ছেলে মানিক কিন্তু নির্বিকার। সে মদ-গাঁজা-ভাঙ খেয়ে এখানে ওখানে আড্ডা দিয়ে এবং অর্থের টানাটানি ঘটলে নিজস্ব কুটিরশিল্পের পণ্য চড়া দামে শহরে সাপ্লাই করে দিব্যি খোশমেজাজে দিন কাটাতে লাগলো। বাড়িতে মা বেশি বকাবকি করলে বিব্রত দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। মার কোন কথা যেমন কানেও তুলতো না, তেমনি ঝগড়াও করতো না তার সঙ্গে। মানিকের এই নিঃশব্দ ভাবভঙ্গিই সেই বিধবা প্রৌঢ়ার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। সেই মুহূর্তে আল্লাহ্‌তালার কাছে নিজের মৃত্যু-কামনা ছাড়া আর কোনো কিছু কামনা করতে মন চাইতো না সেই অসহায় প্রৌঢ়ার।

এমনিভাবেই বোধহয় ওদের দিন কেটে যেত, যদি না ইতিমধ্যে প্রতিবেশী আর্শেদের নজর পড়তো ওদের সেই বিঘেখানেক জমির দিকে। আর্শেদ লোকটা ছিল ভয়ানক চতুর ও লোভী। সে জানতো, বোমারু যতই কেন না বোমা তৈরি করুক, ওর মেজাজটা বাপ আনোয়ারের মতোই শান্ত। সংসারের দিকেও তার মন নেই। নেশা-ভাঙ করা আর সিনেমার সস্তা হিন্দী গান গেয়ে বেড়িয়ে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তার পছন্দ নয়। বাপের ঐ

একটি মাত্র গুণ পেয়েছিল মানিক। গানের গলাখানি তারও ভালো। বোমা তৈরির সঙ্গে সুর তৈরি—অপূর্ব সমন্বয়! তবে অস্বাভাবিক কিছু নয়। নজীরও আছে। ফরাসী সাহিত্যিক ভিয়ঁ নাকি এককালে ছিলেন হার্ড ক্রিমিন্যাল। জেলও খেটেছেন বহুবার। তাঁর অনেক সৃষ্টিই নাকি জেলের মধ্যে বসে লেখা।

জমির ওপর আর্শেদের নজর অনেকটা মরার ওপর শকুনের নজরের মতোই অব্যর্থ। নিস্তার নেই কারুরই। মানিকের বিধবা মার ক্ষমতাই বা কতটুকু। তবুও সদরে গিয়ে মামলা লড়তে সে কসুর করলো না। হয়তো জিততেও পারতো, কিন্তু মামলা দেখাশোনা করার লোকের অভাবেই শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে হলো তাকে। অসহায় বিধবা ও সাবালক অপদার্থ পুত্রের এক বিঘে জমিটুকু গ্রাস করে পরিতৃপ্ত হলো আর্শেদ।

বোমারু বোমা-পটকা তৈরি করতো নেশা-ভাঙের খরচ চালাবার জন্যে, নিজের ব্যবহারের জন্যে নয়। গাঁয়ের কেউ কখনও তাকে নিজের হাতে ঐসব ব্যবহার করতে দেখেনি। কাজেই সেদিক থেকে গাঁয়ের কারুর কোন অভিযোগও ছিল না তার সম্পর্কে। কিন্তু যেদিন সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি মামলায় হেরে গিয়ে একমাত্র জমিটুকু তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় রাগে দুঃখে প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ছেলে মানিককেই যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ পাড়লে, সেদিন মানিকের চোখের তারায় হঠাৎ যে আগুনটুকু জ্বলে উঠেছিল, সেটুকু বোধহয় নজরে পড়ে নি প্রৌঢ়ার। কিংবা পড়লেও তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারে নি সে। বরাবরের মতো এটাকেও বোধহয় একটা দেশলাই কাঠির আগুন বলে ধরে নিয়েছিল, যার স্থিতিকাল মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। অন্য দিন হলে মানিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এখানে-ওখানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অশান্ত মনটাকে খানিকটা শান্ত করতে চেষ্টা করতো। তারপর গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সোজা চলে যেত কোনো তাড়িখানায় কিংবা কোনো গাঁজার আড্ডায়।

সেদিন কিন্তু মানিক অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা চলে গেল আর্শেদের বাড়ি। আর্শেদ তখন মাটির ঘরের দাওয়ায় দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছিল। মানিক উঠোনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি, চাচা।

চম্‌কে উঠে আর্শেদ তাকায় মানিকের দিকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কিসের বোঝাপড়া?

— আমাদের ঐ একফোঁটা জমি তুমি কেড়ে নিলে কেন?

—ও, এই কথা? একটু হেসে আর্শেদ নিজের কাঁচাপাকা দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, বোঝাপড়া আমার সাথে কেন? আদালতের রায়ে ঐ জমি আমার। বোঝাপড়া করতে হয় তো আদালতের সাথে গিয়ে কর।

তেমনি উত্তেজিত সুরেই বলতে থাকে মানিক, না তোমার সাথেই বোঝাপড়া হবে। তুমিই দলিলপত্রে কারসাজি করে আমাদের জমি বেহাত করেছো। তুমি ঠগ—তুমি জোচ্চোর!

আর্শেদ উঠে দাঁড়ায়। দাওয়ার একখানা খুঁটি শক্ত করে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে ওঠে, কি বললি— কি বললি রে হারামজাদা, আমার বাড়িতে এসে আমাকেই বলছিস জোচ্চোর? বেরিয়ে যা—এখনই বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। গিয়ে কোথাও নেশা-ভাঙ করে পড়ে থাক্।

— বেশ করবো। তোমার বাপের পয়সায় তো নেশা করি না।

— কি বললি রে উল্লুক, আনোয়ারের নিকে করা বউয়ের ছেলের মুখে এত বড় কথা?

"নিকে করা বউ"—তার বিয়ে করা মাকে এই শকুনটা কিনা বলছে তার বাবার নিকে করা বউ! সহসা মাথাটা ঘুরে ওঠে মানিকের। চোখের তারায় জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের ঝলক, মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

হঠাৎ জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো রঙের গোলমতো পদার্থ টেনে তোলে মানিক। তারপর সেটা সজোরে ছুঁড়ে মারে আর্শেদকে লক্ষ্য করে।

কান-ফাটানো ভয়ঙ্কর শব্দ একটা। চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। সেই সঙ্গে আর্শেদের ভয়ার্ত চিৎকার।

বোমার টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত আর্শেদের রক্তাক্ত দেহটা মেঝেয় পড়ে যেতেই বাড়ির ভেতর থেকে তার বউ ও নয়-দশ বছরের মেয়ে ময়না চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে সেখানে। ছুটোছুটি লেগে যায় প্রতিবেশীদের মধ্যেও। মানিকের কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, চোখের তারায় বিদ্যুতের পরিবর্তে এবার সহস্র সূর্যের দীপ্তি, কানের কাছে একটানা বেজে চলেছে একটা কথা—নিকে করা বউ—নিকে করা বউ। আগুন লেগেছে বরফে, জলের সাধ্য কি সেই আগুন নেভায়?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আরও একটা তেমনি বস্তু টেনে তোলে মানিক। আর্শেদের ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে লক্ষ্য করে সেটা ছুঁড়তে যায় সে, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কান-ফাটানো একটা শব্দ করে সেটা ফেটে যায় মানিকের নিজেরই হাতে। সামান্য আর্তনাদ করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে মানিক।

বিশ ক্রোশ দূরে শহরের হাতপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জনকেই। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গেল আর্শেদ। বাইশ-তেইশ বছরের যুবক মানিক কিন্তু বেঁচে উঠলো। তবে হাসপাতাল থেকে জেলখানায় যাওয়ার আগে সেখানকার অপারেশন থিয়েটারে নিজের কনুই পর্যন্ত ডান হাতখানা রেখে যেতে হলো তাকে।

।। ২।।

গ্রামটির নাম লক্ষ্মীপুর। থানার নাম ভিন্ন হলেও থানার অবস্থিতি ঐ লক্ষ্মীপুর গাঁয়েরই গা ঘেঁষে। এখানে পোস্টিং নিয়ে এসে সাত আট বছর আগের সেই আর্শেদ-হত্যার মামলার কাহিনী আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সেই মামলার খুনী আসামী মানিক যে ছ'সাত মাস আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে এসেছে, সেকথা জানতাম না। খবরটা প্রথম পেলাম সেই আর্শেদেরই একমাত্র মেয়ে ময়নার কাছে।

অনেকদিন চাকরি হলো। থানায় বসে অনেক ধরনের অভিযোগ শুনতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সেদিন থানায় ময়না নামের সেই ষোল-সতের বছরের কিশোরী মুসলমান মেয়েটির মুখে যে অভিযোগ শুনেছিলাম তা বাস্তবিকই বিচিত্র আর সেই অভিযোগের যে প্রতিকার সেদিন সে আমার কাছে প্রার্থনা করেছিল তা আরও বিচিত্র।

কিশোরী ময়নাকে সাহসীই বলতে হবে। পাশের বাড়ির আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সটান থানার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে।

প্রথমটায় আমি লক্ষ্য করি নি তাদের। দরজার বাইরে বন্দুক হাতে পাহারাদার কনস্টেবল বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছিল। তাই সে এই দুই কিশোরী আগন্তুকের আগমন টের পায় নি।

কাগজপত্রের ওপর থেকে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতেই ময়না কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। অবশ্য, এটুকু তার প্রাথমিক সঙ্কোচ। পরক্ষণেই হলুদ রংয়ের ডুরে শাড়িখানার আঁচল আলগা হাতে কোমরে জড়িয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে সে চলে এলো আমার টেবিলের কাছে।

ময়না সুন্দরী। গায়ের রং ফর্সা, মুখখানা ঢলঢলে। চোখের কোণে সুর্মার টান। নাকে একটা ছোট্ট নাকছাবি, কিন্তু কানে কিংবা গলায় কিছু নেই। হাতে একগোছা কাচের চুড়ি। মাথায় অনেকদিন তেল না দেওয়ায় চুলগুলি রুক্ষ। ধুলোভর্তি দু'খানা পা, ডান হাতের আঙুলে হলুদের ছোপ।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ময়না তার কিশোরী কণ্ঠস্বরকে যথা সম্ভব গম্ভীর করে তুলতে চেষ্টা করে বললে, আমার একটা আর্জি আছে।

ময়নার আর্জির বিষয়ে কান না দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, কে তুমি? কোত্থেকে এসেছো?

— আমার নাম ময়না, জবাব দেয় কিশোরী, লক্ষ্মীপুরে আমার বাড়ি।

— বেশ, কি তোমার আর্জি?

একটা ঢোক গিলে ময়না আবার বলে, যে লোকটা আমার আব্বাজানকে খুন করেছিল, সে গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

খুনের কথায় সতর্ক হয়ে উঠি আমি। কে খুন করলে এই কিশোরীর বাবাকে?

— কে তোমার আব্বাজান ? কবে খুন হলো সে? জিজ্ঞেস করি আমি।

আমার প্রশ্নে মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে ময়নার। ছলছল করে ওঠে তার ডাগর চোখ দু'টি। একটু সময় চুপ করে থেকে সে জবাব দেয়, সে অনেককাল আগের কথা। আমার আব্বাজান আর্শেদকে খুন করেছিল মানিক। সেই লোকটা ছ'সাত মাস আগে ফিরে এসেছে।

এতক্ষণে কিশোরীকে চিনতে পারি আমি। বললাম, সে মামলাতো কবে চুকেবুকে গেছে। হাতকাটা মানিক গাঁয়ে ফিরে এসেছে বুঝি? তা, ফিরে তো আসবেই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে ফিরে না এসে যাবে কোথায়?

আমার জবাবের ধরনটা বোধহয় ঠিক মনোমত হয় নি ময়নার। তাই সে অনুযোগের সুরে এবার বললে, ফিরে এসেই যে আবার হাঙ্গামা শুরু করেছে।

— হাঙ্গামা সুরু করেছে? কি হাঙ্গামা? আবার বোমা-পটকা ফাটাতে শুরু করেছে নাকি?

— না—না, ডান হাতখানা যে কনুই পর্যন্ত কাটা। ও-কাজ আর পারবে কেন?

— তবে? প্রশ্ন করি আমি।

সঙ্গিনীর দিকে একবার তাকায় ময়না। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, একতারা বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করেছে।

—ও—তাই বুঝি? আমি বললাম, তা, এর মধ্যে হাঙ্গামাটা কোথায়?

ময়না আর কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। আমি বুঝতে পারি কি যেন বলতে গিয়েও সে বলতে পারে না। কিসের একটা লজ্জা যেন ঘিরে ধরেছে এই কিশোরীকে।

ময়নার অবস্থা দেখে এবার অন্য কিশোরীটি এগিয়ে আসে তার সাহায্যে। বললে, হাতকাটা মানিক এখন বোষ্টম হয়েছে। হিন্দু পাড়ায় সবাই ওকে মানিকপীর বলে ডাকে। বাঁহাতে একতারা বাজিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে কেবল গান গায়। সবাই বলে ওর গানে নাকি জাদু আছে। ও নাকি গান গেয়ে মানুষকে বশ করার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়।

অন্য মেয়েটি যখন মানিক সম্পর্কে কথাগুলো বলছিল তখন লক্ষ্য করছিলাম, ময়না

মাথা নীচু করে নিজের শাড়ির আঁচল খুঁটছিল। আমার মনে হয়েছিল, তার ফর্সা মুখখানায় যেন একটা রঙীন আভা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মুহূর্তে।

মনুষ্য-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান ছিল না আমার। বিশেষ করে স্ত্রী কিংবা কিশোরী চরিত্র সম্পর্কে আমি তখনও অজ্ঞ। কিন্তু মানিক সম্পর্কে অন্য মেয়েটির কথাগুলো ও সেই সঙ্গে ময়নার বিশেষ ভঙ্গিটি আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে মানিকের গান গেয়ে মানুষকে বশ করার কথাটা গাঁয়ের অন্য লোকেরা যতটা বিশ্বাস করে, তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস করে ঐ ময়না নিজে।

মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর। এককালের বোমারু একখানা হাত হারিয়ে এবার মানিক-পীর হয়ে মানুষ বশ করার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা, একটা কথা—তোমরা সবাই ওর গান না শুনলেই তো পারো।

—তার কি জো আছে? অভিযোগে মুখর হয়ে ওঠে ময়না, কান দুটো তো আর বন্ধ করে রাখতে পারি না।

—হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভয়ানক সমস্যা, বলতে থাকি আমি, তোমরা এবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি ভেবে-চিন্তে দেখি এ ব্যাপারে কি করা যায়।

ময়না এবার সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা ওকে আবার আপনারা জেলে পাঠাতে পারেন না?

—হ্যাঁ, তা পারব না কেন? কিন্তু ওকে আবার জেলে পুরলেই কি তোমরা খুশি হবে? কথাটা বলেই আমি ময়নার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করি।

আমাকে কিন্তু এবার নিরাশ হতে হয়। যা দেখতে চেয়েছিলাম তার কিছুই লক্ষ্য করলাম না ময়নার চোখে। পরিবর্তে সহসা তার চোখ-জোড়া সজল হয়ে ওঠে। ধরা গলায় সে বললে, হ্যাঁ, আমি তাতে খুশিই হবো। আমার আব্বাজানকে যে খুন করেছে তার সারা জীবন জেলে থাকাই উচিত।

কিশোরী দু'টিকে বিদায় দিয়েও কিন্তু ঐ ময়নার কথাই ভাবতে থাকি। হিসেব মেলাতে পারি না কিছুতেই। মানিক সম্পর্কে প্রথমটায় ময়নার মুখে যে অনুরাগের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, তাকে জেলে পাঠাবার কথায় তার চিহ্নমাত্রও কিন্তু দেখতে পেলাম না সেই মুখে। এটা কেমন করে সম্ভব? তবে কি কিশোরী চরিত্র নারী চরিত্রের চাইতেও জটিল?

।।৩।।

সাত বছর পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে জেল থেকে ফিরে এল মানিক। একটা হাত নেই, কিন্তু সেজন্য কোনো দুঃখ নেই বোধহয়। নেশা-ভাঙ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। কথা বলে কম। চোখের দৃষ্টি আগের চাইতে অনেক শান্ত। একমাথা ঝাঁকড়া লম্বা চুল। গালে কুচকুচে কালো দাড়ি। পরনে লুঙ্গি, গায়ে আলখাল্লার মতো ঝুলের লম্বা ছেঁড়া পাঞ্জাবি।

মানিক জেলে থাকতেই তার বিধবা মা কবর নিয়েছিল। তাই, এখন সে সম্পূর্ণ বন্ধনহীন। অবশ্য মা বেঁচে থাকতেও সাংসারিক বন্ধন বলে তেমন কিছু তার ছিল না। জমিজমা কিছু নেই। জেল থেকে ফিরে এসে নিজের হাতে ভাঙা ঘরখানাকে খানিকটা মেরামত করে মাথা

গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। বাপের আমলের ভাঙা একতারাটাকে সারিয়ে নিয়েছে। এটাই তার একমাত্র অবলম্বন। ভিক্ষে সে করে না, কিন্তু কেউ খুশি হয়ে কিছু দিলে ফিরিয়েও দেয় না। গ্রামের মুসলমান পাড়ার চাইতে হিন্দু পাড়াতেই তারা আদর বেশি। কেউ কেউ অবশ্য তার এই বাউল বেশের মধ্যে অন্য কোনো মতলব আছে বলে মনে করে। ঠাট্টা করে বলে—বেড়াল তপস্বী। নিজের কানে সে-কথা শুনেও কিন্তু কোনো জবাব দেয় না মানিক। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বাঁ হাতে একতারায় সুরের ঝঙ্কার তুলে সে গেয়ে ওঠে—

দেখে এলাম ভবের ঘাটে পারাপারের ইস্টিমার
সারেঙ্ যে ঐ মনের মানুষ, রাম-রহিম তার প্যাসেঞ্জার।
দেখে এলাম..........
সারা দিবস বেচা-কেনা
ওপার যেতে মন সরে না
(তাই) ভবের হাটে রইলাম পড়ে আমরা এমন কুলাঙ্গার
দেখে এলাম................

গাঁয়ের কেউ তাকে পছন্দ করে, কেউ করে না। কিন্তু তার গলার সুরের তারিফ করে সকলেই। বলে, ওর বাপ আনোয়ারের চাইতেও ওর গলা মিষ্টি। প্রশংসাই হোক কিংবা গালমন্দই হোক, মানিকের মুখে হাসিটি কিন্তু সর্বদাই লেগে থাকে।

মুশকিল হয়েছে ময়নার। এই কিশোরী মেয়েটি মনেপ্রাণে ঐ পিতৃহন্তা মানিককে ঘৃণা করতে চেষ্টা করে। প্রায় তার চোখের সামনেই ঐ লোকটা একদা তার আব্বাজানকে খুন করেছিল। সেই ছবি এখনও তার চোখের সামনে স্পষ্ট। চোখ বুজলে এখনও সে তার আব্বাজানের যন্ত্রণাকাতর মুখখানা দেখতে পায়। তাই তার পক্ষে মানিককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে মুহূর্তে মানিকের হাতের একতারাটা বেজে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে ময়নার। সাংসারিক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করেও সফল হয় না সে। বাইরের মন বলে, ওর ঐ একতারার বাজনা বন্ধ হয়ে যাক, স্তব্ধ হয়ে যাক ওর কণ্ঠের সুর। কিন্তু ভেতরের মন বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা। সেই মন অপেক্ষা করে থাকে কখন তার কণ্ঠে জেগে উঠবে গানের সুর। তিরিশ বছরের যুবক মানিকের গলার সেই মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে যোল-সতের বছরের কিশোরী ময়নার মনটা যেন পাখা মেলে কোথায় ভেসে যায়। আনন্দের বদলে হাহাকার করে ওঠে তার কিশোরী মন। সেই মুহূর্তে সেই হাহাকারটুকুই সব চাইতে ভালো লাগে তার। ওটুকু যেন তার বড়ই পরিচিত, বড়ই আপনার। মানিকের কণ্ঠে গান থেমে গেলেও সেই গানের রেশ কিন্তু ময়নার কানে বেজে চলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ইচ্ছে হয়, ঐ লোকটার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে বলে—গান বন্ধ করলে কেন? আবার গাও। গেয়ে গেয়ে চোখের জলে আমার উদাস হয়ে ওঠা মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। ইস্টিমারের সারেঙকে আমি চিনি না, কিন্তু রাম-রহিমের মতো আমিও যে একজন যাত্রী হতে চাই।

ময়না সেদিন থানায় এসে আমাকে ঠিকই বলেছিল। বলেছিল যে মানিকের সুরে নাকি জাদু আছে। বাস্তবিকই জাদু। সেই জাদুর টানেই একদিন নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে ময়না এসে হাজির হয়েছিল মানিকের উঠোনে। সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। ও পাড়ায় হিন্দু বাড়িতে জেগে উঠেছে শঙ্খধ্বনি, আর এ পাড়ায় মুসলমান বাড়িতে সন্ধ্যাকে বন্দনা করা হচ্ছিল চেরাগ জ্বালিয়ে। নিজের ঘরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে উদাসী কণ্ঠে গান গাইছিল

মানিক। পাশের আর একখানা খুঁটিতে দেহভার এলিয়ে দিয়ে শুনছিল ময়না তন্ময় হয়ে। গানের উদাস করা সুরে তার বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরে গুমরে মরছিল।

এক সময় মানিকের গান থামতেই ময়না বলে ওঠে, থামলে কেন, গাজী?

ময়নাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি মানিক। তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমকে উঠে সে তাকায় তার মুখের দিকে। এ অঞ্চলের হিন্দুরা তাকে মানিক-পীর বলে ডাকলেও গাজী সম্বোধন এই প্রথম। মানিক কোনো জবাব না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেই কিশোরীটির দিকে। একটু স্মিত হাসি দেখা দেয় তার ঠোঁটের কোণে।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় ময়না। কী করছে সে? ভরসন্ধ্যাবেলা সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কেউ দেখে ফেললে যে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। বিশেষ করে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা মস্ত একটা গুনাহ্।

আর সেখানে দাঁড়ায় না ময়না। গায়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে ছুটে পালায়। চোখে তার ভয়চকিত হরিণীর দৃষ্টি।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ময়নার বরাতও ঠিক তেমনি। মানিকের বাড়ি থেকে বেরোতেই তার সামনে পড়ে প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক। শাড়ির আঁচলে মুখের অংশ ঢেকে মাটির কলসী কাঁখে খাবার জল নিয়ে ফিরছিল তারা।

মুখোমুখি দেখা হতেই প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে যায় ময়না। একটা কিছু কৈফিয়ত দেবার জন্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ায়, পরক্ষণে কিছু না বলেই ছুটে চলে যায় নিজের বাড়ির দিকে।

পরের দিন সকালের মধ্যে গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারুর জানতে বাকি থাকে না যে সোমত্ত মেয়ে ময়নাকে মানিকের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছিল ভরসন্ধ্যাবেলা।

।। ৪ ।।

ময়নার বিধবা মা কপালে করাঘাত করে কাঁদে। ময়নার ভাগ্যকে যারা মনে মনে হিংসে করছিল, তারা এমন একটা মুখরোচক খবরে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাস্তবিকই ময়নার সৌভাগ্য বলতে হবে। নইলে চালচুলোহীন এই মেয়েটা কেবল খুবসুরতের জোরেই পাশের গ্রাম আশুদির মস্ত বড় জোতদার সুকুর মিঞার ছেলে ফকিরের বৌ হতে পারে?

পছন্দ সুকুর মিঞার নয়। পছন্দ ফকিরের নিজের। একটা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী সে। গোটা এলাকায় কিছুটা প্রতিপত্তিও আছে তার। সেই ফকিরের নজরেই পড়ে গেল ময়না। খবরটা কানে উঠলো সুকুরের। একে একমাত্র ছেলে, তায় আবার একজন ছোটখাটো নেতা। কাজেই বিয়ের প্রস্তাবটা ময়নার মার কাছে পৌঁছতে দেরি হলো না।

ময়নার মা তো হাতে স্বর্গ পেল। সুকুর মিঞার মতো ধনীর ঘরে বৌ হয়ে যাওয়া তো ভাগ্যের কথা। ময়না নিজেও এতে কম খুশী নয়। এ তল্লাটে ফকিরের কত সুনাম, কত প্রতিপত্তি।

ময়নার মা চাপা কণ্ঠে মেয়েকে ধমকায়, পাজি হতচ্ছাড়ী, ঐ হাতকাটা খুনী ছেলেটার বাড়ি গিয়েছিলি কেন? চারিদিকে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। কী দরকার ছিল তোর সেখানে, বেসরম কোথাকার!

অপরাধীর ভঙ্গিতে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় ময়না, গিয়েছিলাম ওর গান শুনতে।

—গান শুনতে! মেয়েকে ভেংচে ওঠে মা, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে যে ওখানে গেলি, একবার ভাবলি না যে লোকে দেখলে কি বলবে? এ খবর কি আর সুকুর মিঞা কিংবা তার ছেলের কানে উঠবে না! এমনিভাবে নিজের মুখ কেন পোড়ালি হতভাগী? এখন যদি ওরা মত পাল্টে সাদী ভেঙে দেয়?

কথাটা ময়না নিজেও যে ভাবে নি তা নয়। সত্যিই লোকটার সুরে জাদু আছে। সেই টানেই সে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু আর নয়। মনে মনে কঠিন শপথ করে ময়না। আর কোনোদিন সে ঐ লোকটার ধারেকাছেও যাবে না, ওর গানও শুনবে না। ওকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করবে। লোকটা যে একদিন নিষ্ঠুরভাবে তার বাপজানকে খুন করেছিল, সে কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

মনের শপথ কিন্তু মনেই থেকে যায় ময়নার। মানিককে সে যতই অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করে তার ঐ গান ততই আকৃষ্ট করতে থাকে তাকে। এক এক সময় তার মনে হয় ঐ হাতকাটা লোকটার যেন কোনো আলাদা সত্তা নেই। মানিক ও তার গান যেন একসঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। আর সেই যুগ্ম সত্তা যেন প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করে চলেছে তাকে।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে ময়না। এক অজানা আশঙ্কায় তার কিশোরী মনটা থরথর কাঁপতে থাকে। অতি সংগোপনে ঈশ্বরের কাছে আর্জি জানায় ময়না। বলে, হে খোদা, এ তুমি আমার কী করলে? হাতকাটা পঙ্গু ঐ লোকটাকে ঘৃণা করতে চাইলেও তা পারি না কেন? কেন ওর কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে রাতদিন আমার মন উন্মুখ হয়ে থাকে?

গাঁয়ের লোকেরা ইদানীং আরও কয়েকবার ময়নাকে দেখেছে মানিকের কাছাকাছি। কথাবার্তা বলতে অবশ্য কেউ দেখে নি। দেখেছে কেবল মানিককে একতারা বাজিয়ে আপন মনে গান গাইতে, আর ময়নাকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে সেই গান শুনতে।

পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, বাড়িতে বিধবা মা গালাগাল দেয়, কিন্তু ময়না কেমন যেন নির্বিকার। খবরটা সুকুর মিঞা মারফত ফকিরের কানে ওঠে। রাগে চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে ফকিরের। ইচ্ছে হয়, ঐ ভণ্ড খুনীটাকে উচিত শিক্ষা দেয়। সে ক্ষমতাও ফকিরের আছে। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে ফকির। নিজের বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে এমন কিছু সে করতে চায় না, যা নাকি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনার খোরাক যোগাবে। এসব ব্যাপারে ফকির বাস্তবিকই হুঁশিয়ার।

তেমন কিছু শিক্ষিত না হলেও ফকির বুদ্ধিমান। সে জানে যে সবুরে মেওয়া ফলে। ময়নাকে সাদী করে ঘরে তুলতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে তাকে। যে কোনো কারণেই হোক পিতৃহন্তা মানিকের দিকে মনটা তার ঝুঁকেছে। হয়তো এটা একান্তই সাময়িক। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এমন ধরণের অস্বাভাবিক ঝোঁক হয়তো অনেকের মধ্যেই জেগে ওঠে। আবার দু'দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যায়।

লক্ষ্মীপুর গাঁয়ের একটা নদী। নদী না বলে খাল বলাই উচিত। গ্রীষ্মকালে জল প্রায়

থাকেই না। তিরতির করে জলের যে ধারাটুকু বয়ে চলে তার মধ্যে নেমে গ্রামের ছেলে-বুড়োর দল কাদা ঘেঁটে মাছ ধরে। আবার গাঁয়ের মানুষের পানীয় জল বলতে ওই সামান্য জলের ধারা।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। নদীর পাড়ের মেঠো পথ ধরে গাঁয়ে ফিরছিল ফকির। হঠাৎ একটা গানের সুর কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ে নদীর পাড়ে একটা আম গাছের নিচে বসে একহাতে একতারা বাজিয়ে আপন মনে গান গাইছে মানিক, আর একটু দূরে নদীর উঁচু চড়ায় পা ছড়িয়ে বসে গান শুনছে ময়না। তার কোলের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে কানাভাঙা একটা মাটির কলসী। নদী থেকে জল তোলার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে সে। মানিক তখন গাইছিল—

মায়া-মোহের শিক্‌লি পায়ে
কেন আছিস ভবের নায়ে,
নায়ের তলায় মস্ত ফুটো
বোঝাই কেবল খড় ও কুটো,
অথৈ জলে ভাসাও তরী
জলের ছোঁয়া লাগাও গায়ে।

এমন একটা দৃশ্য ফকিরের দেহের সমস্ত রক্তকে মাথায় তুলতে যথেষ্ট। সেই মুহূর্তে একটা ভয়ানক কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু কী ইচ্ছে হচ্ছিল তা সে ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছিল না। অবশেষে কিছুই না করে একটা চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে সন্তর্পণে সরে পড়ে সেখান থেকে। কেমন যেন একটা রোখ চেপে যায়—এই মেয়েটার মন ফেরাতেই হবে। ওকেই সাদি করতে হবে।

।।৫।।

একটা ডাকাতি মামলার তদন্ত শেষ করে ক্লান্ত দেহে সবে থানায় এসে বসেছি, হঠাৎ মাঝবয়সী একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, সর্বনাশ স্যার, সর্বনাশ হয়েছে!

—কী হয়েছে—কোত্থেকে এসেছো? জিজ্ঞেস করি আমি।

জবাব দেয় লোকটা, এসেছি স্যার লক্ষ্মীপুর থেকে। ঐ গাঁয়ের আর্শেদের বিধবাটা খুন হয়েছে।

—সর্বনাশ, খুন হয়েছে! চমকে উঠি আমি। পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে, এসব অঞ্চলের মানুষের মুখে খুন শব্দের অর্থ সর্বদাই হত্যা নয়। কেউ আহত হলেও এরা বলে খুন হয়েছে।

—কে খুন করলো?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় লোকটি, আমাদের গাঁয়েরই হাতকাটা সেখ মানিক। আর্শেদকে খুন করে সাত বছর জেলে ঘানি ঘুরিয়েও ছেলেটার স্বভাব শোধরায় নি। এবার তার বিধবাটার পালা।

—মানিক অর্থাৎ তোমাদের গাঁয়ের সেই বোমারু? আমি জিজ্ঞেস করি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, মাথা নেড়ে সায় দেয় লোকটা, আজকাল আবার বাউলের ভেক ধরেছে। হিন্দুরা তো ওকে মানিক-পীর বলেই ডাকে।

খবরটার সত্যাসত্য যাচাই করতে গিয়ে লোকটাকে জেরা করে জানতে পারি যে রোজকার মতো সেদিনও ময়নাকে গালাগালি করেছিল ময়নার মা। বলছিল, এমন পাজি নচ্ছার হয়ে উঠবি জানলে ছেলেবেলায় নিমের রস খাইয়ে তোকে মেরে ফেলতাম, হারামজাদী। সাদী যদি ভেঙে যায় তো গলা টিপে তোকে মারবো আমি, এই বলে রাখলাম।

সাধারণতঃ মার কথায় মেয়ে কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সেদিন আর সহ্য করতে না পেয়ে মৃদুকণ্ঠে কি যেন একটা জবাব দিয়েছিল ময়না। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়লো। ময়নার মার হাতে ছিল একখানা চেলাকাঠ। সেই কাঠখানাই সে ছুঁড়ে মারলে মেয়েকে লক্ষ্য করে। আর সেখানা এসে লাগলো ময়নার কপালে। দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তেই ময়না 'মাগো' বলে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মানিক। ময়নার আর্তনাদ শুনে ছুটে এসে হাজির হলো সে ময়নাদের উঠোনে। কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে ময়নার রক্তাক্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে সে তার মাকে বলে ওঠে, এ কী করেছ চাচী? নিজের মেয়ে বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো নাকি? তুমি কি মা, না রাক্ষসী?

— কি বললি রে হতভাগা? ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ময়নার মা, বাড়ির ভেতর ঢুকে আমার মেয়েকে দরদ দেখাতে এসেছিস? আবাগীর বেটা, বেরো—বেরো আমার বাড়ি থেকে। বাপকে খেয়ে বুঝি আশ মেটেনি, এবার মেয়েটাকে খাওয়ার মতলব করেছিস, তাই না?

মানিক আর কিছু না বলে বেরিয়ে এসেছিল। তবে তার আগে নাকি সে শাসিয়েছিল ময়নার মাকে। বলেছিল, ভুলে যেও না চাচী, আমি এখনও মরিনি। একটা হাত গেলেও আমার আর একটা হাত এখনও আছে।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই নাকি আর্শেদের বাড়িতে পর পর দুটো বোমার শব্দ হয়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখে চারিদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তার মধ্যে উঠোনে কাত হয়ে পড়ে আছে ময়নার মা। আর ময়না হতভম্বের মতো বসে আছে মায়ের কাছে। ওদের গোয়াল ঘরের একাংশ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আমি যখন লক্ষ্মীপুরে আর্শেদের বাড়ি এসে পৌঁছালাম তখন গোয়াল ঘরের আগুন নিবে গেছে। প্রতিবেশীরাই নিবিয়েছে। আমার অনুমানই ঠিক, ময়নার মা খুন হয়নি। এমন কি তেমন কোনো জখমের চিহ্নও ছিল না তার দেহে। বোমার প্রচন্ড শব্দে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। প্রতিবেশীরা তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিল। আর, কপালে জখম নিয়ে মার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মেয়ে ময়না ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

আমাকে দেখেই ময়না ডুকরে কেঁদে উঠে বলতে থাকে, আমি জানতাম যে এমনি একটা কাণ্ড একদিন ঘটবে। বাপজানের মতো আমার মাকেও সে খতম করবে। তাই তো সেদিন থানায় গিয়ে আপনাকে বলেছিলাম ঐ দুশমনকে জেলে পুরতে।

ময়নার কথায় প্রতিবেশীরা বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়। ঐ দুশমন ব্যাটাকে জেলে পুরতে মেয়েটার যদি এতই আগ্রহ, তাহলে সে বারে বারে কেন ছুটে যেত তার কাছে?

ময়নার কথার জবাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম, ভয় কি, তোমার মা ভালো হয়ে উঠবে। তবে এবার ঐ হাতকাটা ছেলেটাকে আমি জেলে পুরবো।

মানিককে কিন্তু তার বাড়িতেই পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলাম, একতারা বাজিয়ে যতই কেন না বাউল গান গাও, স্বভাব কিছুতেই ছাড়তে পারো নি, কেমন? বোমারু কি আর রাতারাতি সত্যিকারের মানিক-পীর হয়ে উঠতে পারে? বাপকে খুন করেছ। এবার মেয়েটাকে হাতের মুঠোয় পুরতেই বুঝি মাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলে?

আমার প্রশ্নের কিছুক্ষণ কোনো জবাব দেয় না মানিক। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, না স্যার আমি এ কাজ করি নি।

ধমকে উঠি আমি, মিথ্যে বলছো তুমি।

— মিথ্যে বলছি? কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মানিক। তারপর আবার বললে, হবেও বা। সত্যি-মিথ্যা তো দুই যমজ ভাই। বাছাই করা ভারি শক্ত।

মানিকের এই দার্শনিকসুলভ কথাগুলো ভালো লাগছিল না আমার। গ্রেপ্তার করে ওকে নিয়ে এলাম থানায়। একবার মনে হলো, ওকে কোর্টে চালান দেব, পরক্ষণেই কিন্তু তা না করে ওকে জামিনে ছেড়ে দিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল ছেলেটা জামিন থেকে পালাবে না।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে তারপর, কিন্তু মামলার তদন্ত তেমন এগোচ্ছে না। এগোবেই বা কেমন করে? পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় মানিক দোষী বলে সাব্যস্ত হলেও এর বিরুদ্ধে চাক্ষুষ কোনো প্রমাণ নেই। কেউ দেখে নি তাকে বোমা ছুঁড়তে। অস্বীকার করেছে মানিক নিজেও। অবশ্য মানিকের অস্বীকারের তেমন একটা দাম নেই। দোষীর পক্ষে দোষ অস্বীকার করাই স্বাভাবিক।

গাঁয়ের লোকের কিন্তু ধারণা, মানিক বাঁ-হাত দিয়ে বোমা ছুঁড়ছিল বলেই ময়নার মার গায়ে লাগে নি। নইলে সেদিন তাকেও আর্শেদের পথেই যেতে হতো। আল্লা মেহেরবান, তাই বিধবা বেঁচে গেছে।

মানিকের নিজের আচার-আচরণে কিন্তু কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। আগের মতোই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে একতারা বাজিয়ে সে গান গেয়ে বেড়ায়। বোমা ছোঁড়ার ঘটনার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে স্বীকার কিংবা অস্বীকার কিছুই সে করে না। কেবল একটু ম্লান হাসে। হিন্দু পাড়ার কেউ কেউ হয়তো ঠাট্টার সুরে বলে, কিগো মানিক-পীর, শেষে কিনা একটা ছুঁড়ীর জন্যে বোমাবাজিতে আবার হাত লাগালে?

মুখে হাসি টেনে একটু সময় চুপ করে থাকে মানিক। টুং-টাং শব্দে বেজে ওঠে তার

হাতের একতারা। তারপর সেই বোমাবাজিকেই যেন সমর্থন করে সে গেয়ে ওঠে —

এ সংসারে বোম্‌বাজিতে দোষের কিবা আছে?
চেয়ে দেখ স্বরগ পানে ভাই
ভোলার মুখে ব-বম্‌ সদাই
মহাব্যোমে এই ব্রহ্মাণ্ড তা-ধিন্‌ তা-ধিন্‌ নাচে
এ সংসারে বোম্‌বাজিতে দোষের কিবা আছে?

মানিকের মুখে এ ধরনের গান শুনে কেউ কেউ বলে ওঠে, কি সাংঘাতিক লোকটা! এমন একটা কাজ করেও এতটুকু অনুশোচনা নেই। উলটে বোমাবাজির গুণকীর্তন!

কথাটা ময়নার কানেও ওঠে, কিন্তু কিছু বলে না সে। ঐ ঘটনার পর থেকে কেমন যেন অতিরিক্ত শান্ত হয়ে উঠেছে ময়না। ছল্‌-ছল্‌ কল্‌-কল্‌ শব্দে বয়ে চলা নদীর স্বাভাবিক গতিপথে কে যেন বাঁধ দিয়েছে। কিশোরী ময়না যেন হারিয়ে ফেলেছে প্রাণোচ্ছলতা। কথা বলে কম। বাইরে বেরোয় আরও কম। কিন্তু মানিকের কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছলে চঞ্চলতার বদলে উন্মনা হয়ে ওঠে। বাঁধ দেওয়া নদীর জল উপচে পড়ে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের সীমানায় পা দিয়ে নিজের ছোট্ট বুকখানার মধ্যে যে উথালি পাথালি-করা স্রোতের তাণ্ডব সে অনুভব করতে থাকে, তাকে সংযত করতে গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। আকর্ষণ বিকর্ষণের মিশ্র অনুভূতিতে বাইরের আপাতঃ শান্ত কিশোরী মনের তলায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন সর্বদাই মাথা কুটতে থাকে।

।। ৬।।

মামলার তদন্ত চালু থাকাটাই তদন্তের প্রাণ, থেমে যাওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। ব্যাপারটা অনেকটা সেই বিষ-খাওয়া রোগীর মতো। যতক্ষণ জেগে আছে ততক্ষণই বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা, একবার ঘুমিয়ে পড়লেই অনিবার্য মৃত্যু।

এই মামলার তদন্তও আমার হাতে প্রায় থেমে রয়েছে। কিছুতেই এগোতে পারছি না। বোমার আঘাতে ময়নার মা জখম না হলেও তার গোয়াল ঘরের খানিকটা পুড়ে গেছে। মানিকের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে গৃহদাহের মামলা। কিন্তু কোথায় তেমন জোরালো প্রমাণ, যা দিয়ে তাকে আদালতে অভিযুক্ত করতে পারি?

তদন্তের সাফল্য অনেকটাই ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। মাথা কুটলেও যেমন প্রমাণ মেলে না, তেমনি সময় সময় এমন সব প্রমাণ আকস্মিকভাবে হাতের কাছে এসে হাজির হয় যা নাকি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কতকগুলো পোড়া দড়ি ও ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে থানায় বসে একদিন নাড়াচাড়া করছি। বোমার অংশ এগুলো। সংগ্রহ করেছিলাম ময়নাদের উঠোন থেকে। নিয়ম-অনুযায়ী এগুলো পাঠাতে হবে বিস্ফোরক দ্রব্য বিশেষজ্ঞের কাছে পরীক্ষার জন্যে।

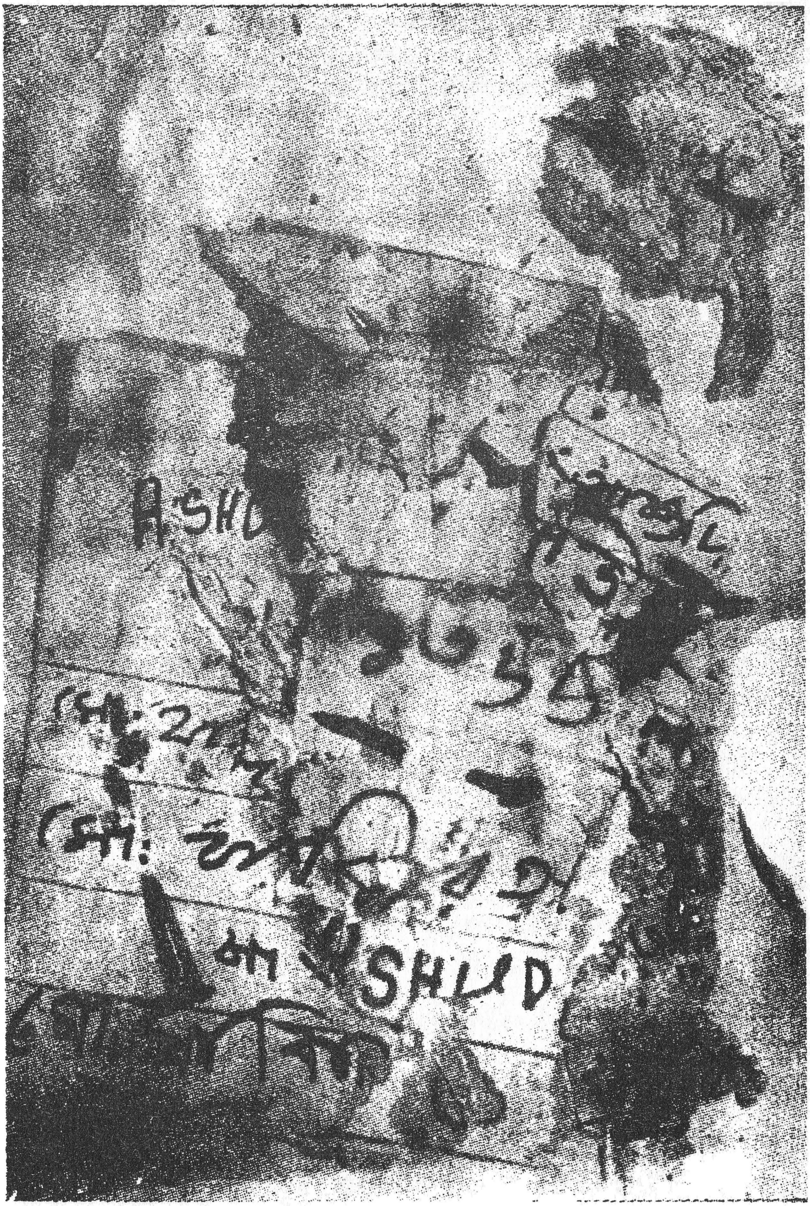

বোমা বাঁধার পোড়া ও ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় লেখা।

হঠাৎ সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোর রোশনাই চোখে পড়ে আমার। আর্কিমিডিসের মতো ইউরেকা—ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ি লক্ষ্মীপুর গাঁয়ের কাছে সেই আশুদি গ্রামের দিকে।

সুকুর মিঞাকে তার বাড়িতেই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল তার ছেলে ফকিরকেও। সুকুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, লক্ষ্মীপুরের আর্শেদের মেয়ে ময়নার সঙ্গে আপনার ছেলের সাদীর ব্যবস্থা তো পাকা হয়ে আছে, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সুকুর মিঞা। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, ওদের বাড়িতে সেদিন কে বোমা ছুঁড়ে ময়নার মাকে জখম করতে চেষ্টা করেছিল, আপনি জানেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় সুকুর, শুনেছি এ-কাজ নাকি ওদের গ্রামের হাতকাটা মানিকের।

— কে বলেছে আপনাকে?

— গাঁয়ের লোকেরাই বলাবলি করছে।

— কিন্তু আমি যদি বলি মানিক এ কাজ করেনি? যদি বলি ময়নার মার সঙ্গে কথা কাটাকাটির সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ মানিকের ঘাড়ে এমনিভাবে দোষ চাপাতে চেষ্টা করেছিল?

সুকুর মিঞা আর কিছু না বলে চুপ করে থাকলেও পাশ থেকে ফকির বলে ওঠে, মানিকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অন্যের কি লাভ?

একটু হেসে আমি বললাম, বোধহয় মানিকের ওপর ময়নার মনটাকে বিষিয়ে দেওয়া।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফকির আবার বললে, এসবের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?

জবাব দিলাম আমি, তোমার বাবার সম্পর্ক না থাকলেও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। ময়নার মনটাকে বিষিয়ে দিতে পারলে তোমারই লাভ।

— আমার? চঞ্চল হয়ে ওঠে ফকিরের চোখ দুটো।

সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললাম, হ্যাঁ, একমাত্র তোমার। তাই বলছি, এ কাজ করেছিলে তুমি।

— আমি? প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে ফকির।

তেমনি সুরে আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমিই সেই বোমা তৈরি করেছিলে। বলতে বলতে বোমার পোড়া কাগজের টুকরোগুলো মেলে ধরলাম ওর চোখের সামনে।

ফকির বিহ্বল চোখে এই কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। আমি বললাম, তাকিয়ে দেখ, এর মধ্যে ইংরেজি ও বাংলায় তোমার নাম, গাঁয়ের নাম, সাল প্রভৃতি লেখা রয়েছে। তাড়াতাড়িতে নিজের কোনো খাতা থেকেই বোধহয় কাগজ ছিঁড়ে বোমার মশলা বাঁধার কাজ সেরেছিলে। তখন বোধহয় ধারণাই করতে পারো নি যে এই কাগজের টুকরোগুলোই একদিন ধরিয়ে দেবে তোমাকে?

ভীতবিহ্বল ফকির কিন্তু মচকালেও ভাঙে না। রাজনৈতিক দলের কর্মী। তেমন বিদ্যে না থাকলেও বুদ্ধির অভাব ছিল না। তাই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কাগজের টুকরোয় আমার নাম-ধাম লেখা রয়েছে বলেই যে এ লেখা আমার তার প্রমাণ কোথায়? অন্য কেউও তো আমার নাম-ধাম লিখতে পারে?

সঙ্গত প্রশ্ন। জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, পারে বৈকি। তবে এক্ষেত্রে এগুলো যে তোমারই লেখা তাও যথাসময়ে প্রমাণিত হবে। এবার চলো আমার সঙ্গে।

যাবার কথা শুনেই সুকুর মিঞা কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে স্যার?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি, থানায়। একে গ্রেপ্তার করলাম।

তদন্তের শেষের অংশটুকু কিন্তু তেমন দীর্ঘ নয়। নিয়মমত সাদা কাগজের ওপর ফকিরকে দিয়ে লেখালাম। নাম-ধাম, ঠিকানা, সাল—যেমনটি নাকি বোমার টুকরো কাগজের ওপর ছিল।

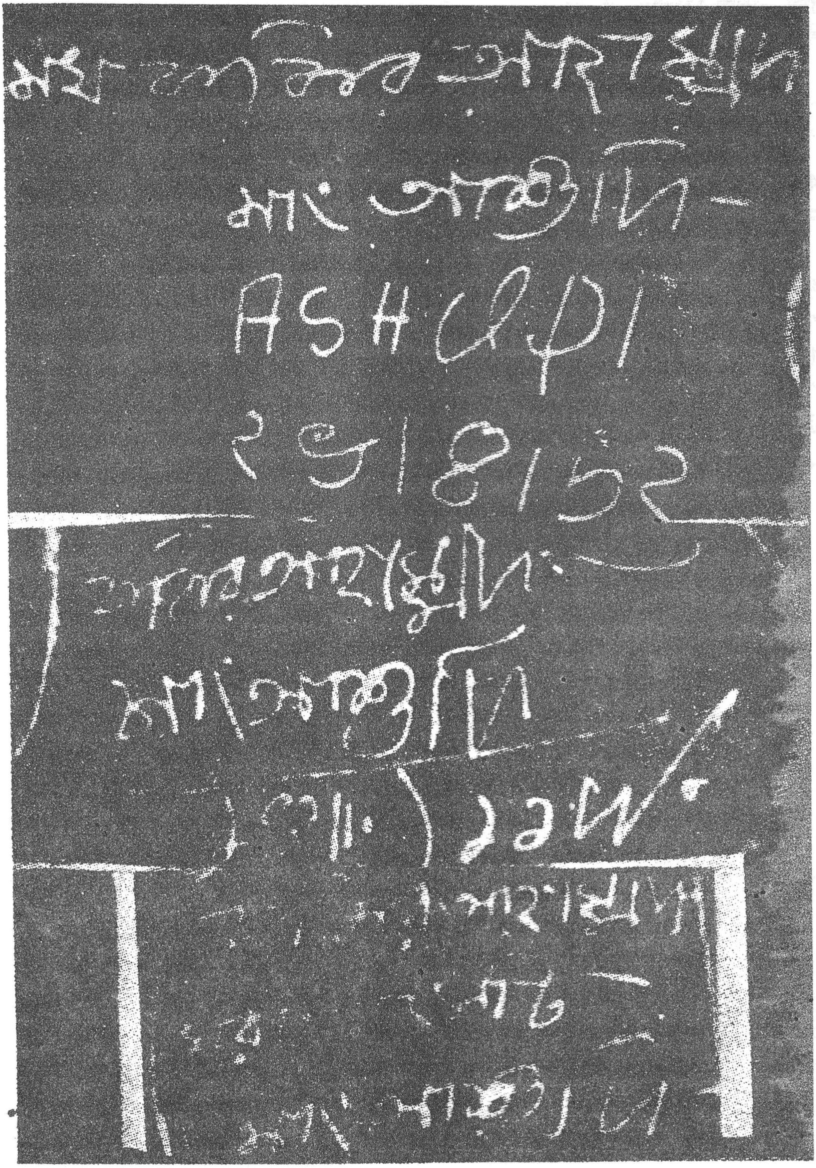

ফকিরের নিজের হাতের লেখা

অবশেষে সব কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলাম হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের কাছে। অল্প দিনেই পেয়ে গেলাম বিশেষজ্ঞের অভিমত—একই লেখা। নমুনা লেখার লেখকই বোমার টুকরো কাগজের লেখাগুলো লিখেছে।

ফকিরের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এসে গেল আমার হাতে। কয়েক টুকরো ছেঁড়া ও পোড়া কাগজ ধরিয়ে দিল অপরাধীকে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এমন কাণ্ড এই অঞ্চলে এর আগে কখনও ঘটেনি। একটা মেয়ের মন ফেরাতে গিয়ে কী সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিল ফকির! কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, শেষ রক্ষা হলো না।

গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন এই আলোচনায় মশগুল, ময়নার মার আশাহত মুখখানা যখন ম্লান হয়ে উঠেছে, আর ময়নার নিজের কিশোরী মনের ওপরের সেই জগদ্দল পাথরখানা যখন কোন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখন সারা গাঁয়ে কেবলমাত্র একটি লোকের চোখেই ফুটে উঠলো না কোনো কৌতূহলের চিহ্ন কিংবা তার মুখে দেখা গেল না কোনো ভাবান্তর। সেই লোকটি মানিক—হাতকাটা মানিক-পীর—কিশোরী ময়নার আদরের গাজী। সে তখন কোন্ গাছের ছায়ায় বসে একতারা বাজিয়ে আপন মনে পারাপারের ইষ্টিমারের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে— দেখে এলাম ভবের ঘাটে পারাপারের ইস্টিমার, সারেঙ্ যে ঐ মনের মানুষ, রাম-রহিম তার প্যাসেঞ্জার।

পত্রবিষ

জবাব দেবার মত কিছু থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জবাব দিত ঝুমুর। নেই বলেই অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না তার।

প্রশ্নের জবাব না পেলে দেবার মত জবাব নেই ধরে নিয়ে যাঁরা অন্যপথে ব্যাপারটার ফয়সলা করতে এগিয়ে যান তেমন ধরনের মহিলা নন ইভাদি। ইভাদি অর্থাৎ এই উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের হেডমিসট্রেস ইভা দস্তিদার। বয়স পঞ্চশের কোঠা ছুঁই ছুঁই। এর মধ্যেই মাথার সামনের দিকের পাতলা চুল রং পালটাতে শুরু করেছে। কপালে একটা মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। চোখে হাইপাওয়ার লেন্সের চশমা। ফর্সা মুখখানা সর্বদাই গম্ভীর। সাধারণ দোহারা চেহারায় একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ। সেই ব্যক্তিত্বকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে ঐ মোটা লেন্সের চশমা ও সিঁদুরের টিপটি। কথা বলেন কম। কিন্তু যখন বলেন তখন উপস্থিত প্রত্যেকটি লোককে সেই কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনে উপায় থাকে না, তা সে স্কুলের টিচারই হোক কিম্বা ছাত্রীই হোক। ছাত্রীরা যমের মত ভয় করে এই হেডমিসট্রেসকে। পারতপক্ষে তাঁর ঘরের ছায়া মাড়ায় না তারা। স্কুলের শিক্ষিকাদেরও প্রায় তেমনি অবস্থা। নেহাত প্রয়োজন না হলে হেডমিসট্রেসের কাছে ঘেঁসেন না।

এই ইভা দস্তিদারের হাতেই সেদিন ধরা পড়লো এগারো ক্লাশের ছাত্রী ঝুমুর। ব্যাপারটা নেহাতই অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কি? স্কুলে যত চিঠিপত্র আসে সেগুলো সর্বপ্রথম এসে হাজির করা হয় অ্যাসিস্টেন্ট হেডমিসট্রেস পুষ্পদি অর্থাৎ পুষ্প দাশগুপ্তার কাছে। তিনিই দেখেশুনে প্রয়োজনীয় চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেন ইভার কাছে। এটাই স্কুলের রীতি। কিন্তু পুষ্প দাশগুপ্তা একমাসের ছুটি নেওয়াতেই যত বিপত্তি। অন্য কারুর ওপর এই দায়িত্ব না চাপিয়ে ইভা নিজেই সরাসরি চিঠিগুলো দেখতে শুরু করলেন, আর তাতেই সেদিন ভয়ানক বেকায়দায় পড়ে গেল ঝুমুর।

ছাত্রী হিসেবে ঝুমুর ভালই। মাধ্যমিকে এই স্কুল থেকেই গোটা দু'য়েক লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল। কিন্তু সেই ঝুমুরেরই যে এমন অধঃপতন তা যেন কল্পনাই করতে পারেন নি ইভা। ঝুমুর যদি ভালো ছাত্রী না হয়ে খারাপ ছাত্রী হতো, যদি সে শান্ত বিনয়ী না হয়ে একটু দুর্বিনীতা প্রকৃতির হতো তা হলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হতেন না ইভা দস্তিদার। দেশের যা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি তাতে একটু উঁচু ক্লাশের মেয়েদের সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন থাকাই ভালো। একালের বাপ-মায়েরা তো ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠনের জন্যে স্কুলে পাঠান না, পাঠান পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে। কিন্তু ঝুমুরের মতো একটি মেয়ের এমন অধঃপতন যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না ইভা। এ যেন তাঁর নিজেরই অসতর্কতার ফল, এ যেন তার নিজের পরাজয়। একটি সম্ভাবনাময় ছাত্রী যেন তাঁর চোখের সামনেই একটু একটু করে অধঃপতনের পথে পা বাড়িয়েছে।

অধঃপতন ছাড়া আর কি বলা যায় একে? একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের

নামে যদি স্কুলের ঠিকানায় কোনো চিঠি আসে তা'হলে তার একটি মাত্র অর্থই হয়। আর সেই অর্থ হচ্ছে মেয়েটি অধঃপতনের পথে পা বাড়িয়েছে। আত্মীয় স্বজনের চিঠি হলে তা' আসতো বাড়ির ঠিকানায়। স্কুলে চিঠি আসার অর্থই হচ্ছে বাড়িতে চিঠি পাঠানো নিরাপদ নয় মনে করেই এখানে পাঠানো। কিন্তু সেই চিঠির প্রেরক তো জানে না যে বাড়িতে যদি বাঘ থাকে তাহলে স্কুলে আছে সিংহ। এখানে বিপদ আরও বেশি।

ঝুমুরের নামে এখানাই প্রথম চিঠি নয়। দিন সাতেক আগে আরও একখানা এমনি চিঠি এসেছিল। সেখানাও পড়েছিল ইভার হাতে। চিঠির ওপর নাম ঠিকানা দেখে ইভার ভ্রু-জোড়া একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠলেও খারাপ ভাবনাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্কুলের বেয়ারা মারফৎ সেটা ক্লাশে ঝুমুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন যে কোনো বিশেষ পারিবারিক কারণেই হয়তো ওর কোনো আত্মীয়-স্বজন এটা এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটা হাতে পড়তেই মনের সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল। চিঠিটা ক্লাসে ঝুমুরের কাছে না পাঠিয়ে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। কুণ্ঠিত পায়ে ঝুমুর তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেই ইভা তার মুখের দিকে একটু সময় স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলতেই ঝুমুরের সারা দেহে যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

ইভা দস্তিদার ঝুমুরের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠির খামটা তুলে ধরে একটু অতিরিক্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার চিঠি।

সেই মুহূর্তে ঝুমুরের মনে হয়েছিল একটা বরফ ঠাণ্ডা তরল পদার্থের স্রোত তার মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে বইতে শুরু করেছে। সেই স্রোতের স্পর্শে তার হৃদপিণ্ডের রক্তও যেন বরফ-ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইভার দিকে তাকিয়ে রইল ঝুমুর। অবশেষে নিঃশব্দে কম্পিত হাতে চিঠিটা নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই ইভা দস্তিদারের কণ্ঠস্বর আবার কানে এলো তার— কে চিঠি লিখেছে?

চিঠি হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারল না ঝুমুর। প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই হলো তাকে। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

ঝুমুরের ভাব-ভঙ্গি ততক্ষণে ইভার মনের সন্দেহের ছোট্ট বীজটাকে বড় করে তুলতে শুরু করেছে। কণ্ঠস্বর সামান্য চড়িয়ে আবার বলে ওঠেন তিনি, ওকি, চুপ করে রইলে কেন? চিঠিটা কে লিখেছে?

তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে জবাব দিতে গিয়েও ঝুমুর টের পায় তার সমস্ত শক্তি কোন্ মন্ত্রবলে যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। তবুও নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, চিঠিটা না পড়ে ঠিক বুঝতে পারছি না কে—

কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা চড়িয়ে ইভা আবার বললেন, তুমি না পারলেও আমি পারি। এর আগের যে চিঠিখানা এসেছিল সেটা তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। সেই চিঠির নাম ঠিকানা যার লেখা, এটাও তার। এবার বলো কে সে?

ঝুমুর আর জবাব দিতে পারে না। কি বা জবাব দেবে। সে যে এবার হাতে নাতে ধরা পড়েছে। তাই, কেবল মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় তার থাকে না।

চড়া কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করেন ইভা, কি চুপ করে রইলে কেন? জবাব দিতে হবে। বল, কে লিখেছে এই চিঠি।

ঝুমুর কিন্তু মাথা না তুলে তেমনি ভাবেই স্থির হয়ে থাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে.ব্যাপারটা যখন ইভাদি টের পেয়েছেন তখন জল অনেকদূর গড়াবে। তবে ভরসার মধ্যে একমাত্র এই যে ব্যাপারটা বাড়িতে তার মা-বাবার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। তাঁরা টের পেয়েছেন — ঝুমুরই বলেছে তাঁদের। এ নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়েও উঠেছেন। ইদানীং বাড়ির ঝি কিম্বা তার মা নিজে ঝুমুরকে গলিটা পার করে দেন। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার সময় এই বিপদজনক পথটুকু একাই পার হতে হয় তাকে।

সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে অনুশোচনার বাষ্প জমে ওঠে ঝুমুরের। সত্যি বলতে কি চিঠির লেখকের পরিচয় সে আজও সঠিক জানে না। তবে, প্রথম চিঠিখানার কথা যদি সে তার মাকে জানাত তাহলে আজ সে অনায়াসেই ইভাদিকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি, মা-বাবার কাছেও গোপন করেছিল। এই গোপনতার কারণ লজ্জা নয়, এ যেন নতুন এক অভিজ্ঞতার শঙ্কামিশ্রিত মাদকতা যা নাকি গোপন রাখতে পারলেই নেশাটা জমে ওঠে।

প্রথম চিঠিটা ছিল সংক্ষিপ্ত! তার মধ্যে ছিল কেবল ঝুমুরের রূপের বর্ণনা। ভাষাটা যদিও ছিল দুর্বল, কিন্তু সেই দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে আসল বিষয় বস্তুকে ছেঁকে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল ঝুমুর। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে যে ঐ প্রথম চিঠির ব্যাপারটা মা-বাবাকে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

আবার জেগে ওঠে ইভার কণ্ঠস্বর। বলতে থাকেন তিনি, শোন ঝুমুর, যদি মনে করে থাকো চুপ করে থেকে তুমি পার পাবে তাহলে ভুল করছো। বলতে তোমাকে হবেই।

এতক্ষণে মাথা তুলল ঝুমুর। ছলছল চোখে একবার তাকাল ইভাদির দিকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, সত্যি ইভাদি, আমি বলতে পারছি না এই চিঠি কে লিখেছে।

ঝুমুর থামতেই একজন শিক্ষিকা সহানুভূতির সুরে ইভাকে বললেন, ও বোধহয় খামের লেখাটা ঠিক চিনতে পারছে না।

— চিনতে পারছে না? গম্ভীব সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করেন ইভা। তারপর ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে আবার বলে ওঠেন, অন্যের চিঠিপড়া নীতিবিরুদ্ধ, নইলে আমি নিজেই এটা খুলে পড়তাম। বেশ তো, আমার সামনেই চিঠিটা খুলে পড়ো। তারপর বলো কে লিখেছে এই চিঠি।

ইভার কথায় ঝুমুর যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন একটা চিঠি এই শিক্ষিকাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে পড়তে হবে। তারপর এঁদের জানাতে হবে লেখকের পরিচয়। তারপরে হয়তো চিঠির বিষয়বস্তুও এঁদের কাছে ব্যক্ত করতে হবে।

লজ্জায় মনটা কুঁকড়ে ওঠে ঝুমুরের। গোপনে যেটা আনন্দ, প্রকাশ্যে সেটা বিষ। সাধারণ বিষ নয়, তীব্র হলাহল। জেনে শুনে সেই তীব্র হলাহল সে পান করবে কেমন করে?

ইভা দস্তিদার ও আর দু'জন শিক্ষিকার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে খামটা খুলে ফেলল ঝুমুর। একবার উপস্থিত শিক্ষিকাদের দিকে আড় চোখে তাকাল। তাঁদের চোখেমুখে কৌতুহলের চিহ্ন। অবশেষে মাথা হেঁট করে চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

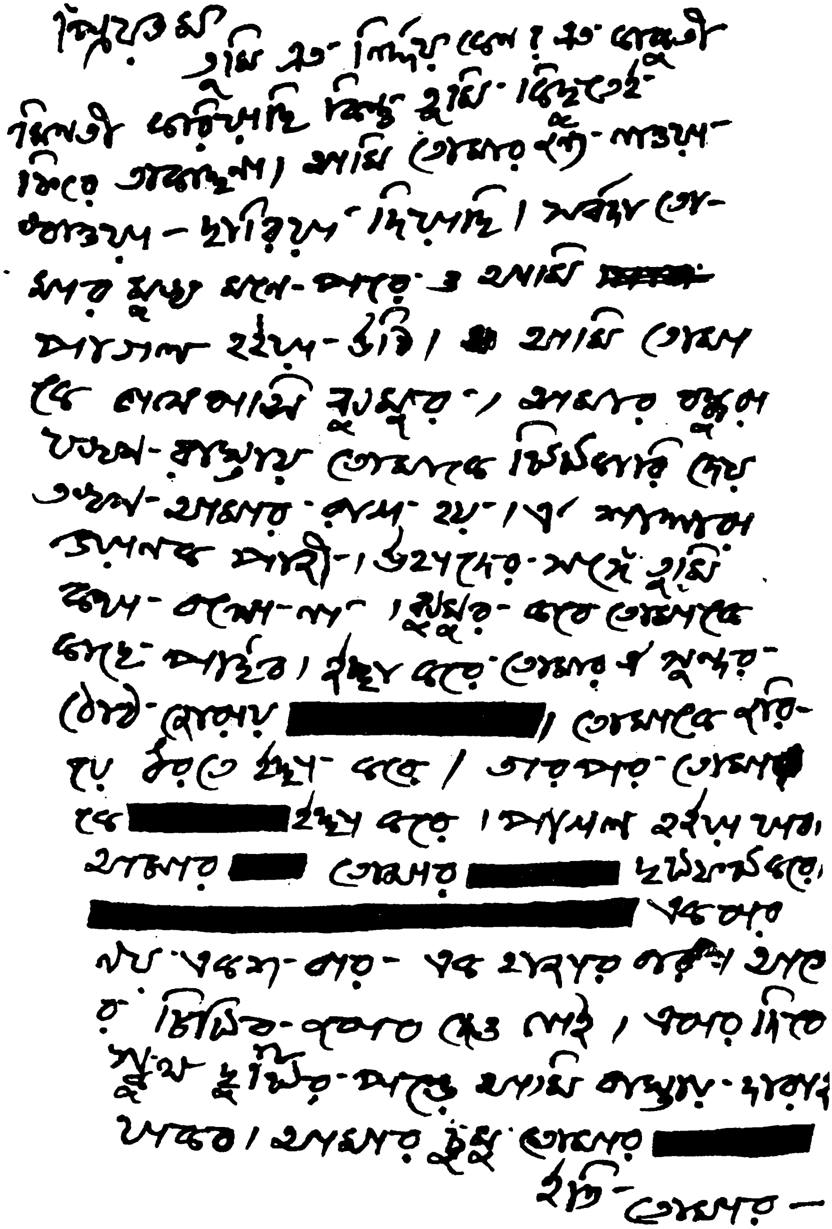

প্রেমপত্র

কিন্তু এ কী পড়ছে ঝুমুর! এ কী ভাসছে তার চোখের সামনে! চিঠিখানার মাঝামাঝি পর্যন্ত লেখাগুলো না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু তার পরের লাইনগুলো? ওগুলো যেন কতগুলো কালো রংয়ের ঘৃণ্য কুৎসিত জীব চিঠির কাগজের ওপর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। উদ্বেল মনটা যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তেই সেই বিস্ফোরণের আগুনে সেই পত্রলেখক যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু না, তেমন কোন বিস্ফোরণই ঘটল না। তার বদলে ঘটল এমন এক আশ্চর্য ঘটনা যার জন্যে উপস্থিত শিক্ষয়িত্রীরা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্ফোরণের রুদ্ধ শক্তি সহসা ঝুমুরের মস্তিষ্ককে যেন অধিকার করে বসল। তার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে এলো। শিক্ষয়িত্রীরা কিছু বুঝতে পারার আগেই ঝুমুরের অবশ হাত থেকে খসে পড়ল চিঠিখানা। আর পরমুহূর্তেই দু'চোখে একরাশ অন্ধকার নিয়ে জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

হৈ-হৈ ব্যাপার। চিৎকার চেঁচামেচিতে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন আরও কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী। ছুটে এলো ছাত্রীরা। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। ঝুমুরকে শুইয়ে দেওয়া হলো একটা ইজিচেয়ারে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে তার মাথার কাছে এসে বসলেন ইভা দস্তিদার। হয়তো ততক্ষণে তাঁর মনেও জমতে শুরু করেছে একরাশ অনুশোচনার বাষ্প। ব্যাপারটা অন্য কোনো খারাপ দিকে টার্ন নিলেই তো বিপদ। তখন আর তাঁর নিজের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার মতো কিছু থাকবে না। কিন্তু সেই চিঠিটা? সেটা গেল কোথায়? এই ভিড়ের মধ্যে কে সেটা গায়েব করে ফেলল? আশ্চর্য তো! ঝুমুরের পরিচর্যায় তারা যখন ব্যস্ত, তখন ভিড়ের মধ্যে কে সেই চিঠিটা সরিয়ে ফেলল?

চোখে-মুখে জল ও পাখার হাওয়ায় একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলো ঝুমুরের। চোখ মেলে তাকিয়েই মৃদু কণ্ঠে সে বলে ওঠে, সেই চিঠিটা কোথায়?

বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দেন ইভা দস্তিদার, এখানেই পড়ে ছিল. ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে—। কথাটা শেষ না করেই তিনি থেমে যান।

ইভার কথায় ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করে ঝুমুর। চোখে-মুখে তার আতঙ্কের ছায়া। শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ইভার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে থাকে, ঐ চিঠি যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে তাহলে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না, দিদিমণি। আমার যে সর্বনাশ হবে তা'হলে।

— কেন, কে লিখেছে ঐ চিঠি? কী ছিল ওতে যে পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে গেলে? ইভার কণ্ঠে কৌতূহল।

ঝুমুর এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে জলভরা চোখে কেবল তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। সেই মুহূর্তে সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে এরপর অন্যের কাছে মুখ দেখাবার আর কোনো পথই খোলা রইল না তার।

চিঠিটা সেদিন আর পাওয়া গেল না। ঝুমুরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। পরের দিন স্কুলে এসেই ইভা দস্তিদার দেখলেন যে ঝুমুরের সেই চিঠিখানা চাপা দেওয়া রয়েছে তাঁর টেবিলে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও তিনি জানতে পারলেন না এটা এখানে কে রেখে গেল।

যে চিঠি নিয়ে আগের দিন এত ঝঞ্ঝাট সেই চিঠি পড়ার লোভ কিন্তু সংবরণ করতে পারলেন না ইভা দস্তিদার। কিন্তু পড়তে গিয়েই খেলেন দারুণ হোঁচট। একী লেখা রয়েছে চিঠিতে? কতগুলো বিশেষ শব্দ ঢেকে সেই চিঠিখানা ছাপা হলো পরের পাতায় (ব্লক)

চিঠিখানা পড়তে পড়তে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল ইভা দস্তিদারের। ইতরতারও একটা সীমা থাকে, কিন্তু এ যে সীমাহীন ইতরতা!

ঝুমুর সেদিন স্কুলে আসে নি। চিঠিটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারেই বসে রইলেন ইভা। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিলেন ঝুমুরের বাবার কাছে। সঙ্গে একখানা শ্লিপে লিখে দিলেন যে ঝুমুরের মতো মেয়েকে এই স্কুলে রাখতে চান না তিনি।

বাবা-মা'র জেরায় ঝুমুরকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হলো প্রথম চিঠিটার কথা। বাবা চড়া সুরে বলে ওঠেন, এই চিঠির কথা যদি তুই আগে বলতিস তা'হলে হয়ত এই দ্বিতীয় কুৎসিত চিঠিটা আর আসতই না।

ঝুমুরের বাবা থামতেই তার মা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, এ কাজ নিশ্চয়ই পাড়ার ঐ বখাটে ছেলেগুলোর। আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম। এখন কি হবে? স্কুলের সবাই তো ধরে নিয়েছে এই নোংরামির মধ্যে মেয়েটা নিজেও আছে। ছি, ছি, ছি, লজ্জায় যে আমার এখন মরতে ইচ্ছে করছে!

চিন্তিত কণ্ঠে বলতে থাকেন ঝুমুরের বাবা, এখন দেখছি ভুলই করেছি। ছেলেগুলো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন ওকে বিরক্ত করত তখনই আমার কড়া স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। প্রথম চিঠির কথা জানতে পারলেও হয়ত একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম।

— যা হবার হয়েছে, অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন ঝুমুরের মা, নির্দোষ মেয়েটা যে এমনি ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। ব্যাপারটা যতই নোংরা হোক আর চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা করো এবার।

— হ্যাঁ, তাই করতে হবে। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন ঝুমুরের বাবা।

এসব ব্যাপারে কিছু করা মানেই থানা-পুলিস। ঝুমুরের বাবা শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। থানার অফিসার ঝুমুরের বাবার হাত থেকে সেই বিশ্রী চিঠিখানা নিয়ে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, সেই রকবাজ ছেলেগুলোর মধ্যে কাকে আপনাদের সন্দেহ হয়?

জবাব দেন ঝুমুরের বাবা, যতদুর জানি ঐ ছেলেগুলোর প্রত্যেকেই তো এক একটি রত্ন। বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে। লিখেছে কে তা তো বলা শক্ত।

— কিন্তু তা বললে তো হবে না। জিজ্ঞেস করুন তো আপনার মেয়েকে।

মাথা নেড়ে জবাব দেন ঝুমুরের বাবা, না, তার পক্ষেও সম্ভব নয়। ও যখন স্কুলে যেত তখন গোটা দলটাই ওকে বিরক্ত করত। কাজেই — । কথাটা শেষ না করেই তিনি থেমে যান।

গম্ভীর মুখে পুলিস অফিসার বললেন, ঠিক আছে দেখা যাক কতদূর কি করা যায়।

মিথ্যে স্তোক বাক্য দেন নি সেই পুলিস অফিসার। সত্যিই তিনি কিছু করেছিলেন। ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণের মতো হঠাৎ একদিন তিনি হানা দিয়েছিলেন সেই রাস্তার মোড়ে। তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই ছোঁ মেরে সেই রকবাজদের মধ্যে চারজনকে কালো ভ্যানে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। দলের বাকি দু'জন কোনো রকমে ছিটকে

সরে পড়েছিল।

থানায় নিয়ে এসে শুরু হলো জেরা। কিন্তু প্রত্যেকেরই সেই এক কথা। ঝুমুর নামে একটা মেয়ে যে ঐ পাড়ায় বাস করে এই খবরটাই নাকি তারা জানে না, তাকে উত্ত্যক্ত করা কিম্বা তার নামে চিঠি পাঠানো তো দূরের কথা।

গম্ভীর মুখে পুলিস অফিসার বললেন, ভেবেছিলাম তোমরা সত্যি কথা বলবে। মেয়েটির নামে স্কুলে যে চিঠি পাঠিয়েছিলে তার নাম প্রকাশ করবে। কিন্তু তা যখন করছো না তখন আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে। তোমাদের প্রত্যেকের নমুনা হাতের লেখা নিয়ে সেগুলো বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাব। তখনই জানা যাবে কে তোমাদের মধ্যে দোষী।

দলের মধ্যে সমীর ছেলেটিই একটু বেশি চটপটে। কথাও বলে সেই বেশি। পুলিস অফিসারের কথায় সে বলে ওঠে, বেশ তো স্যার, তাই করুন। দেখুন আমাদের মধ্যে কে দোষী।

শেষ পর্যন্ত পুলিস অফিসার তাই করলেন। একে একে ঐ যুবক চারটির কাছ থেকে ওদের নমুনা হাতের লেখা নিলেন কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ওরা নিজেদের স্বাভাবিক লেখা না লিখে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করে লেখা লিখলে। ওরা বোধহয় মনে করেছিল হাতের লেখা বিকৃত হলে বিশেষজ্ঞের পক্ষে মতামত দেওয়া সম্ভব হবে না। যদিও ওদের মধ্যে হয়ত মাত্র একজনই দায়ী, কিন্তু বিশেষজ্ঞকে বিপাকে ফেলতে গিয়ে প্রত্যেকেই বিকৃত করলে নিজের লেখা। ওদের লেখার ঢং দেখে ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন সেই পুলিস অফিসার। বললেন তিনি, ওকি, এভাবে লিখছ কেন? স্বাভাবিক ভাবে লেখ।

সঙ্গে সঙ্গে লেখক যুবকটি জবাব দেয়, আমি তো স্যার এরকম লিখতেই অভ্যস্ত। আমার হাতের লেখা বরাবরই খারাপ।

বাস্তবিকই এ ক্ষেত্রে পুলিস অফিসার নিরুপায়। কাউকে চোখ রাঙিয়ে কিম্বা ধমকে আর যা-ই করানো যাক না কেন, স্বাভাবিক ঢংয়ে লেখানো চলে না। লেখার ঢং লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।

অবশেষে নিরুপায় পুলিস অফিসার সেই বিশ্রী চিঠিখানা ও সেই সঙ্গে যুবকদের নমুনা হাতের লেখা পাঠিয়ে দিলেন সরকারী হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের কাছে। আর যুবকদের ছেড়ে দিলেন জামিনে।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে পুলিস বিভাগে একদল হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের কাজই হলো লেখা পরীক্ষা করে জাল-জালিয়াতি যারা করে বেড়ায় তাদের চিহ্নিত করা। তদন্তকারী পুলিস এই বিশেষজ্ঞের মতামতের ওপর নির্ভর করেই পরিচালনা করে তাদের তদন্ত। এই বিশেষজ্ঞ দলের যিনি অধিনায়ক তাঁর নাম বাণীকণ্ঠ ধর হলেও ডিপার্টমেন্টে তিনি 'কণ্ঠধর' নামেই পরিচিত! কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে, এই কণ্ঠধর যে কখন কার কণ্ঠ ধরবেন তার স্থিরতা নেই। বাস্তবিকই তাই। আধুনিক বিজ্ঞানের এই শাখাটির ওপর অদ্ভুত দখল কণ্ঠধরের। কোনো একটি বিশেষ লেখার লেখককে খুঁজে বের করতে পুলিস হয়ত সন্দেহভাজন দশজনের নমুনা লেখা পাঠিয়ে দিলে কণ্ঠধরের কাছে। হয়তো ওদের মধ্যে বিশেষ একজনের ওপর পুলিশের বেশি সন্দেহ। কিন্তু কণ্ঠধরের মতামত পেয়ে পুলিস তো তাজ্জব। সেই বিশেষ লোকটির বদলে কণ্ঠধর হয়ত অন্য একজনকে

চিহ্নিত করে দিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পুলিস তদন্ত করতে গিয়েই কিন্তু বুঝতে পারল যে কণ্ঠধরের সেই চিহ্নিতকরণই সঠিক। নিরীহ গোবেচারা গোছের সেই লোকটি সেই বিশেষ লেখাটির জন্য দায়ী।

বিশেষজ্ঞ কণ্ঠধরের চেহারাটা কিন্তু মোটেই চোখে পড়ার মতো নয়। বেঁটে খাটো দোহারা গড়ন, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা, গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার কামানো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। কণ্ঠধর কথা বলেন কম, যখন বলেন তখন এতই আস্তে বলেন যে কান খাড়া না রাখলে ঠিকমত শোনা যায় না। অত্যন্ত ধীর স্থির প্রকৃতির। প্রায় কিংবদন্তীর মতই তাঁর সততা, আর এই জন্যেই রাজ্যের আইন আদালতে কেবল তাঁর সুনামই নেই, অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটি লোকই এই নির্বিরোধী মানুষটিকে ভালোবাসে।

সেই চিঠিটা ও চারজন যুবকের নমুনা হাতের লেখা কণ্ঠধরের নির্দেশে তাঁর সহকারী কাম-শিক্ষানবীশ রজত মিত্র দিন কয়েক ধরে পরীক্ষা করল। অবশেষে একদিন কণ্ঠধরের সামনে সেগুলো মেলে ধরে বললে, স্যার, পরীক্ষা করেছি, কিন্তু —

— কিন্তু কি? জিজ্ঞেস করেন কণ্ঠধর।

আমতা আমতা করে জবাব দেয় রজত, আমার তো মনে হয়, এই ধরনের নমুনা লেখা দিয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।

কেন? কণ্ঠধরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

জবাব দেয় রজত, নমুনা লেখাগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে লেখা হয়েছে। এদের স্বাভাবিক লেখা না পেলে মতামত দেওয়া যাবে না।

— স্বাভাবিক লেখা যদি আর না পাওয়া যায়?

— তা'হলে মতামত দেওয়া যাবে না।

— ভালো করে পরীক্ষা করেছো?

— হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি।

— বেশ।

কাগজপত্রগুলো কণ্ঠধরের কাছে রেখে দিয়ে রজত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাস্তবিক, ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে। সেই চিঠিখানা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই লেখা হয়েছে, অথচ নমুনা লেখাগুলোর প্রত্যেকটাই লেখা হয়েছে বিকৃত করে। অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে কষ্টকর ও দুরূহ এই পরীক্ষা।

দিন কয়েক কেটে গেছে তারপর। কণ্ঠধর নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে রজতকে এটা-ওটা করতে নির্দেশ দেন, কিন্তু ঐ ব্যাপারটা সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন না।

অবশেষে কণ্ঠধর একদিন রজতকে ডেকে বললেন, বুঝলে হে, সেই বিশ্রী চিঠিটার লেখককে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি।

— তাই নাকি স্যার? বলে ওঠে রজত, পুলিস কি ওদের স্বাভাবিক লেখা পাঠিয়েছে?

— না হে, ঐ বিকৃত লেখা থেকেই আইডেন্টিফাই করা গেছে।

কথাটা শেষ করেই একটা ফাইল টেনে নিয়ে রজতের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কণ্ঠধর আবার বললেন, ফাইলটা খুলে দেখ। সেই সমীর ছেলেটাই ঐ চিঠির জন্যে দায়ী। ওর নমুনা লেখার সঙ্গেই সেই চিঠির লেখা মিলে গেছে। মিলগুলো আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি।

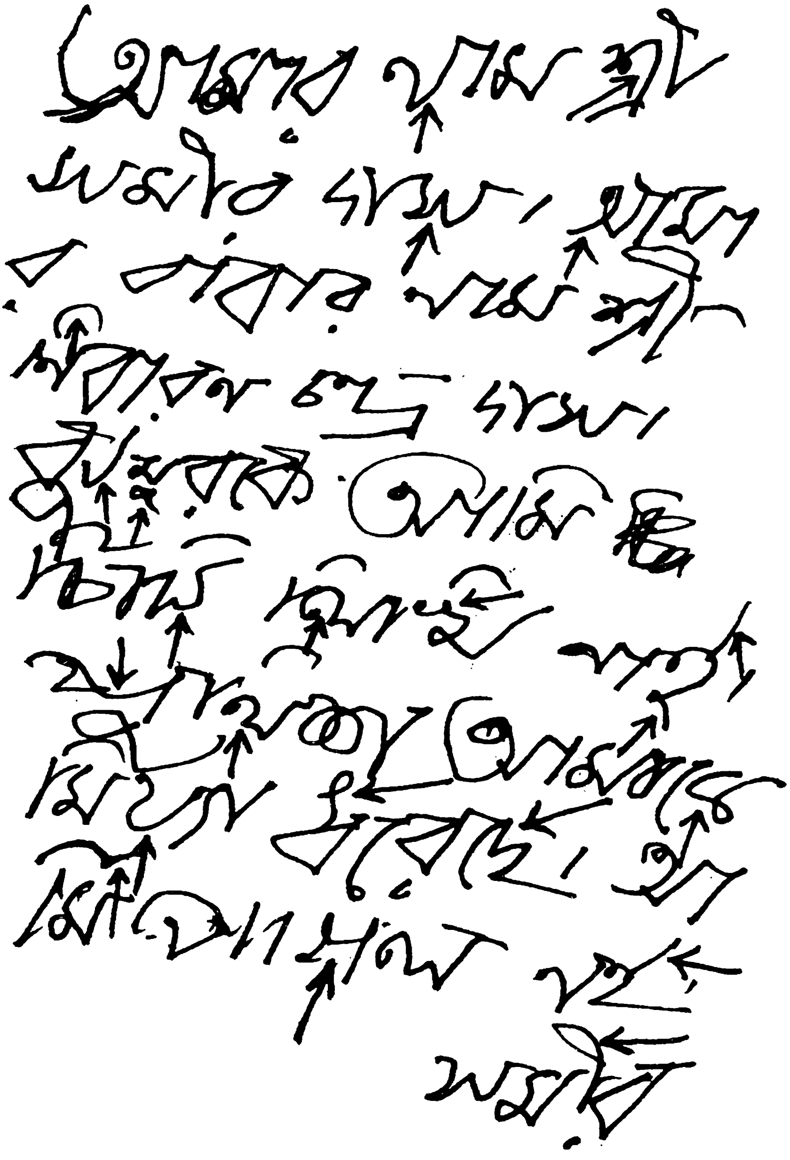

সমীরের নমুনা লেখা

ফাইল খুলে সমীরের লেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রজত।

একসময় কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে রজত কণ্ঠধরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই কণ্ঠধর তার মনের কথা টের পেয়ে বলতে থাকেন, শোন রজত, দুটো লেখাই যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে যে ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তা' যখন নয়, তখন এই অসুবিধা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। অপরাধী যে সর্বদাই আমাদের সুবিধার জন্যে তাদের স্বাভাবিক নমুনা লেখা দেবে তা' তো আর আশা করা যায় না।

এই সময় রজত প্রশ্ন করে, আচ্ছা স্যার, লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথায় না হয় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে বলুন সেই চিঠি ও সমীরের নমুনা লেখার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কি কি মিল আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

মৃদু হেসে জবাব দেন কণ্ঠধর, বলতে পারো প্রায় কিছুই পাই নি। একটা স্বাভাবিক আর অন্যটা অস্বাভাবিক, এমন দু'টো লেখার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়ার আশা করা চলে না। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। একমাত্র এলাইনমেন্ট অর্থাৎ লাইনগুলো যেমনভাবে যেদিকে শেষ হয়েছে, সেই ব্যাপারে যথেষ্ট মিল রয়েছে এদের মধ্যে। লক্ষ্য করে দেখ, চিঠিখানার লাইনগুলো সোজা নয়। প্রতিটি লাইনই শুরু হয়ে সোজা শেষ না হয়ে নিচের দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটাই লেখকের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও এই মিল একেবারে ফেলনা নয়। অর্থাৎ এই লোকটির লেখার এলাইনমেন্ট নিচের দিকে।

জবাব দেয় রজত, বুঝলাম স্যার। এলাইনমেন্টের মিলই বোধহয় এই লোকটির প্রতি আপনার সন্দেহের কারণ।

— ঠিক তাই, বলতে থাকেন কণ্ঠধর, তারপরেই এলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মিল। লেখক তার নমুনা লেখা বিকৃত করলে কি হবে, তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সেই বিকৃত লেখার মধ্যেও অটুট আছে। প্রথমেই ধরো "ন"। লেখক কোন কোন "ন"-এর শ্যাফট অর্থাৎ দণ্ডটিকে একটু বাঁকাভাবে ওপরে তুলে দেয়। এই বৈশিষ্ট্য দু'টো লেখার মধ্যেই রয়েছে। যেমন চিঠির শেষের দিকে "নয়" শব্দটি আর নমুনা লেখায় "নাম" শব্দটা।

প্রশ্ন করে রজত, "শ"-এর মধ্যে বৈশিষ্ট্যটুকু কি?

জবাব দেন কণ্ঠধর, "শ"-এর ঘাড়ের কাছে ঢেউ খেলানো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক লেখকই এটা করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য দু'টো লেখার মধ্যেই থাকলেও আমি সেটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। কিন্তু ঘাড়ের কাছে ঢেউ না খেলিয়ে সোজা নিচে টেনে নামানো একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। চিঠির শেষের দিকে "একশ" শব্দটিতে আর নমুনা লেখায় "শ্রী"-তে রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য। এরপরে "স"। চিঠির "রাস্তা" শব্দটির "স" ও নমুনা লেখার "দাস"-এর "স", চিঠির "ত"-এর লেজ, ও নমুনা লেখার "অ"র লেজ, চিঠির "প্রিয়তম"-এর ই-কার ও নমুনা লেখার "নিবারণ"-এর ই-কার, "ঝুমুর" শব্দটির "ঝ" ও "উ-কার", "ট"-এর চেহারা, "ল"-এর অর্ধবৃত্তের চেহারা, "খ"-এর ঘাড়, "ই"-এর চুলের টিকি, "প"-এর গ্রীবার চেহারা, "ধ"-এর মাথা, "ছ" ও "ক"-এর সরলীকরণ, "থ"-এর চেহারা, "গ"-এর চেহারা ও "ঈ-কার"-এর মাথার "লুপ"-এগুলোর প্রত্যেকটিই বহন করে চলেছে লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

এতক্ষণে রজতের মুখের ওপর ফুটে ওঠে বিশ্বাস ও তৃপ্তির চিহ্ন। প্রশংস চোখে কণ্ঠধরের দিকে তাকিয়ে সে বললে, হ্যাঁ স্যার, এবার আমি পুরোপুরি স্যাটিসফায়েড। যদিও একটা লেখা স্বাভাবিক ও অন্যটা অস্বাভাবিক কিন্তু এত মিলের পরে আর কিছুতেই কোনো

সন্দেহ থাকে না। ঐ সমীর ছেলেটিই এই বিশ্রী চিঠিটার জন্যে দায়ী।

এর পরের কাহিনীটুকু সংক্ষিপ্ত, যদিও পুলিশের কাজ মোটেই সংক্ষিপ্ত ছিল না। তদন্ত শেষে পুলিস আদালতে চালান দিয়েছিল সমীরকে। বিচারে ছেলেটির কয়েক মাসের জেলও হয়েছিল। কিন্তু ঝুমুর আর কোনোদিন সেই স্কুলে যেতে পারে নি লজ্জায়। সেই থেকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাকে।

বেইমান

বইখানা বন্ধ করে বিরক্ত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় চিরঞ্জীব। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বারোটা বাজতে দু'তিন মিনিট বাকি। ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার। একটা সিগারেট ধরায় চিরঞ্জীব। তারপর বাইরে এসে বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ তার মনে হল দূরে যেন একটা মোটরের শব্দ হচ্ছে। একটা অতিক্ষুদ্র চঞ্চল আলোও দৃষ্টিগোচর হয় তার।

রেলিংয়ের ওপর আরও একটু ঝুঁকে পড়ে চিরঞ্জীব।

কিন্তু নাঃ, আলোটা নিচের সর্পিল পাহাড়ী পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠে না এসে একসময় অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। শব্দটাও শোনা যায় না আর। হাতের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দেয় চিরঞ্জীব। তারপর অস্থির পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করে টেবিলের ওপর থেকে বইখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে থাকে।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে মিনিট পনেরো কেটে যায়। কিন্তু কিছুতেই বইতে মনঃসংযোগ করতে পারে না চিরঞ্জীব। রাত সাড়ে বারোটা বাজতে চললো, এখনও দেখা নেই উর্মিলার। এখনও ক্লাবে বসে কী যে করছে সে! এটা কিন্তু সত্যিই উর্মিলার বাড়াবাড়ি। এত রাত করে বাড়ি ফেরা নিশ্চয়ই তার অন্যায়। নির্জন ঐ পাহাড়ী পথে কতরকম বিপদ থাকতে পারে। অবশ্য সে জানে উর্মিলা একা নিশ্চয়ই ফিরবে না। সেন তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে। সেন মানে ধূর্জটি প্রসাদ সেন। তিনটে চা-বাগানের দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী ম্যানেজার সেন সাহেব। প্রায় প্রত্যহ রাতে সে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় উর্মিলাকে। উর্মিলার এই জেদের কোন অর্থ খুঁজে পায় না চিরঞ্জীব। জেদ না নেশা? হয়তো নেশা। ক্লাবের মজলিসের নেশা। তার নিজেরও এই মজলিসের নেশা ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় উর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে সে যেত ক্লাবে। কিন্তু গত মাসখানেক ধরে সে আর যায় না সেখানে। তার মতে, শত শত চা-বাগানের কুলীরা যখন ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছে, তখন এই প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে ক্লাবের সান্ধ্য মজলিসে গিয়ে আড্ডা জমানো অপরাধ। ঘোরতর পাপ। কিন্তু উর্মিলা শোনে নি তার কথা। তার মতে ইচ্ছে করে ক্ষিধের জ্বালায় কষ্ট পেলে দোষটা কার? মালিকের? কেন তারা গত এক মাস যাবৎ স্ট্রাইক করেছে? কেন তারা মীমাংসার পথ বেছে না নিয়ে মালিকের ক্ষতি করছে আর সেই সঙ্গে নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে আনছে?

বেশীক্ষণ বইটাতে মনোযোগ দিতে পারে না চিরঞ্জীব।

আবার সে উঠে দাঁড়ায়। আবার সে বাইরে এসে রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘন অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। নিচের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ঢেউখেলানো ছোট ছোট টিলা। তাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে কার্পেটের আচ্ছাদনের মতো ছোট ছোট চা-গাছ।

এই বাড়ি থেকে যে সরু পাহাড়ী রাস্তাটা এঁকে বেঁকে নিচের দিকে নেমে গেছে তারই

একপাশে আর একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়িটার মালিক চিরঞ্জীবেরই ছোট ভাই সঞ্জীব রায়।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতর চিরঞ্জীব তাকিয়ে থাকে সঞ্জীবের বাড়ির দিকে। সাদা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটা আবছা দেখা যাচ্ছে। আলোর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। বোধহয় এতক্ষণে বাড়ির চাকরবাকরেরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সঞ্জীব বোধহয় এখনও ফেরে নি। সঞ্জীব সম্বন্ধে কানাঘুষায় নানারকম কথা কানে আসে তার। গভীর রাতে নাকি বাড়ি ফেরে সে। আরও কত কী। সব কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না তার। এখনও বিয়ে করেনি সঞ্জীব। ঊর্মিলাকে দিয়ে একবার চিরঞ্জীব তার কাছে বিয়ের কথা পাড়িয়েছিল, কিন্তু সে নাকি তেমন গা করে নি।

এই তিন তিনটে বিরাট চা বাগান, বাড়ি, ঘর সবই তাদের স্বর্গীয় পিতা বীরেশ্বর রায়ের কীর্তি। বলতে গেলে, চা-বাগান তিনটের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই। সেই সঙ্গে দুই ছেলের জন্যে দু'খানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। মৃত্যুর আগে উইল করে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। উত্তরবঙ্গের মহকুমার শহর থেকে এই চাবাগানগুলো বেশী দূরে নয়। বলতে গেলে শহরের ঠিক পাশেই। শহরতলিতে।

ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে রাত একটা বাজে।

চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় চিরঞ্জীব।

হঠাৎ তার মনে পড়ে বিকেলের ডাকে আসা চিঠিটার কথা। এই নিয়ে পরপর চারখানা চিঠি এলো তার কাছে। সবগুলিই একই ঢঙে লেখা নামধান-বিহীন চিঠি। সবগুলোর বক্তব্যই প্রায় এক।

মনটা কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে চিরঞ্জীবের। কে লিখছে এই চিঠিগুলো? কেনই বা লিখছে? সে কি তার প্রকৃত অবস্থা জানে না? তার মনের খবরও বোধহয় জানা নেই তার। কিন্তু এমনিভাবে চুপ করে থাকাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হবে। নইলে কখন কি ঘটে যায় তো বলা যায় না।

আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চিরঞ্জীব। টেবিলের সামনে বলে রাইটিং প্যাডটা টেনে নেয় সে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে চিরঞ্জীব। তারপর লিখতে থাকে —

প্রিয় অহীনবাবু,

আপনার বোধহয় মনে আছে, গত বছর পুজোর সময় কলকাতায় আপনার সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপ হয়েছিল। আজকে বিপদের দিনে আপনাকে স্মরণ করছি আমি। এখানে আমাদের চা-বাগানে গত এক মাস ধরে কুলীদের ধর্মঘট চলছে। ঐ ব্যাপারে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে পরপর চারখানা উড়ো চিঠি পেয়েছি আমি। প্রত্যেকটা চিঠিতেই আমাকে হত্যার ভয় দেখানো হয়েছে। আপনি বোধহয় জানেন না যে আমি ও আমার ছোটভাই চা-বাগানগুলোর মালিক হলেও বাগান পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা আমাদের নেই আমার বাবার উইল অনুসারে।..... থেমে যায় চিরঞ্জীবের কলম। চিঠিখানা প্রথম থেকে আর একবার পড়ে। কিন্তু মনঃপুত হয় না লেখাটা। এসব কথা চিঠিতে লিখে লাভ কি? তার চেয়ে তাঁকে একবার আসতে বলাই ভালো।

প্যাডের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিরঞ্জীব। তারপর আবার নতুন করে লিখতে থাকে —

প্রিয় অহীনবাবু,

এখানে চা-বাগানের ধর্মঘটের ব্যাপারে কতকগুলো উড়ো চিঠি পেয়েছি। প্রত্যেকটা চিঠিতেই আমাকে হত্যার ভয় দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাইছি। চিঠি পাওয়ামাত্র আপনি একবার দয়া করে এখানে চলে আসবেন। সাক্ষাতে সব জানতে পারবেন। আপনার পারিশ্রমিকের মধ্যে বর্তমানে দশ হাজার টাকার একটা চেক পাঠাচ্ছি। দয়া করে গ্রহণ করবেন।

ইতি — আপনার সাহায্যপ্রার্থী
চিরঞ্জীব রায়।

চিঠি লেখা শেষ করে ড্রয়ারের মধ্য থেকে একখানা চেকবই বের করে চিরঞ্জীব। তারপর চেকে টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিচে সই করে চিঠির সঙ্গে চেকটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে ফেলে। খামের উপরে গোয়েন্দা অহীন সোমের নাম-ঠিকানা লেখা প্রায় শেষ করেছে, এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ কানে ভেসে আসে চিরঞ্জীবের।

দ্রুতহাতে লেখাটা শেষ করে খামখানা পকেটে রেখে দেয় চিরঞ্জীব। বাইরে শব্দটা প্রায় বাংলোর কাছে এসে পড়েছে ততক্ষণে।

টেবিলের ওপরের বইটা কাছে টেনে নেয় চিরঞ্জীব। তারপর ঝুঁকে পড়ে বইটার ওপরে।

একটু পরেই ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে ঊর্মিলা। বছর কুড়ি বয়স। ছিপছিপে চেহারা। ধবধবে ফরসা গায়ের রং। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। ঘনপল্লবে বেষ্টিত টানা চোখদুটো সুর্মার ছোঁয়ায় অপরূপ। সমস্ত দেহে কেমন যেন একটা ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

শ্লথভঙ্গিতে চিরঞ্জীবের সামনে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ঊর্মিলা। তারপর, স্বামীর হাতের উপরে একটা হাত রেখে বুজে আসা চোখদুটোকে অতিকষ্টে মেলে রেখে মৃদু হেসে কনভেন্টে পড়া ঊর্মিলা টেনে টেনে বলে —"তুমি এখনও বসে পড়ছো, মাই ডিয়ার?"

বই থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ঊর্মিলার দিকে তাকায় চিরঞ্জীব। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে তার। ঊর্মিলা মদ খেয়েছে? পরিষ্কার মদের গন্ধ আসছে তার মুখ থেকে।

নিজের অজ্ঞাতসারে বলে ফেলে চিরঞ্জীব—"তুমি মদ খেয়েছো, ঊর্মিলা?"

চেয়ারের উপর একটু সোজা হয়ে বসে ঊর্মিলা। তারপর মৃদু হেসে জবাব দেয়—"এই একটু।"

স্বামীকে চুপ করে থাকতে দেখে ঊর্মিলা আবার বলে —"তুমি রাগ করেছ, মাই ডিয়ার? এতে রাগ করবার কি আছে? তোমার সঙ্গে যখন ক্লাবে যেতাম, তখন তো তোমার সঙ্গেই মাঝে মাঝে একটু আধটু খেতাম?"

চিরঞ্জীব কোন জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে। ওর ঐ ক্লান্ত মুখের ভঙ্গিটি মোটেই অপরিচিত নয় তার কাছে। তাদের এই দু'বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামী হিসাবে স্ত্রীর ঐ বিশেষত্বপূর্ণ ক্লান্ত ভঙ্গিটির সঙ্গে সে পরিচিত। দেহমনের একটা বিশেষ অবস্থায় তার ক্লান্ত মুখে এই ভঙ্গিটি ভেসে উঠতে দেখেছে সে অনেকবার।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে চিরঞ্জীব। ঊর্মিলা এতটা নিচে নেমে গেছে! কে সেই ব্যক্তি? সেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ধূর্জটি সেন।

ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করে চিরঞ্জীব — "তোমাকে কে পৌঁছে দিয়ে গেল? নিশ্চয়ই ধূর্জটিপ্রসাদ?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় ঊর্মিলা। তারপর পালটা প্রশ্ন করে — "আর ইউ জেলাস মাই ডিয়ার?"

একটু বিকৃত হাসি ভেসে ওঠে চিরঞ্জীবের মুখে। মনটাকে শক্ত করতে চেষ্টা করে সে। এর বোঝাপড়া পরে হবে। তার আগে অনেক কাজ বাকি আছে তার। ধর্মঘটের ব্যাপারে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করার সময় রাত দুটোয়। এখনই না বেরিয়ে পড়লে ঠিক সময়ে সে তার বাড়ি পৌঁছতে পারবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় চিরঞ্জীব। শান্তকণ্ঠে ঊর্মিলাকে বলে — "তুমি এবার গিয়ে শুয়ে পড়। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।"

চমকে ওঠে ঊর্মিলা। জবাব দেয় —"এত রাতে? কোথায়?"

—"সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে।"— বলেই আর না দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিচে নেমে এসে গ্যারেজের মধ্যে প্রবেশ করে চিরঞ্জীব।

।। ২।।

সকালবেলা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো খবরটা শহরের চারিদিকে। বেলা আটটা নাগাদ শহরের প্রতিটি লোক সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের খবর জানতে পারলো।

একটা মজুর শ্রেণীর লোকের চোখে দৃশ্যটা ধরা পড়ে প্রথমে।

শহরের পিচের রাস্তার ওপাশে একটা ছোট্টমতো ঝোপ। তার আড়ালে পড়ে ছিল চিরঞ্জীবের মৃতদেহটা। জমাটবাঁধা রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। উপুড় হয়ে পড়ে ছিল দেহটা। মাথার ঠিক পেছনের দিকে একটা ছোট ক্ষত। একপাশে পড়ে ছিল একটা চকচকে পিস্তল।

খবর পেয়ে মহকুমা শহরের থানার অফিসার-ইন-চার্জ অরবিন্দ ভট্টাচার্য স্বয়ং ছুটে আসে সেখানে।

প্রাথমিক তদন্তের পর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিয়ে পিস্তলটা নিজের হেপাজতে নেয় সে। তারপর দলবল নিয়ে সোজা চলে যায় চিরঞ্জীবের বাংলোয়।

সেখানে তখন অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। চিরঞ্জীবের বন্ধুবান্ধবেরা এসেছে ঊর্মিলাকে সান্ত্বনা দিতে। কেঁদে কেঁদে চোখদুটো ফুলিয়ে ফেলেছে ঊর্মিলা।

চা-বাগানের ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেন ও চিরঞ্জীবের ছোটভাই সঞ্জীবও উপস্থিত ছিল সেখানে।

পুলিস অফিসার অরবিন্দ একে একে সকলের জবানবন্দি নিলে। সকলেই প্রায় একমত যে এই জঘন্য কাজ করেছে চা-বাগানের ধর্মঘটী কুলীদের নেতা বলে পরিচিত সুদর্শন দত্ত। চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঊর্মিলাও ঠিক সেই কথাই বললো। চিরঞ্জীব রাতে বাইরে যাওয়ার সময় নাকি তাকে বলে গিয়েছিল যে একটা বিশেষ কাজে সে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

অন্যান্য কথার মধ্যে চা-বাগানের ম্যানেজার ধূর্জটি সেন এ কথাও বলতে ভুললো না যে সুদর্শন দত্ত লোকটা সাংঘাতিক উগ্রপ্রকৃতির। এই একটি মাত্র লোক এখানে এসে চা-বাগানের কুলীদের ক্ষেপিয়ে তাদের এই ধর্মঘটের পথে নামিয়েছে। তার দাবিমতো চিরঞ্জীব এই ধর্মঘট মেটাতে চায়নি বলে তাকে নিজের পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে সে।

পিস্তলটার কাগজে সযত্নে মুড়ে অরবিন্দ সদলবলে গিয়ে হাজির হয় সুদর্শনের আস্তানায়।

এই শহরের লোক নয় সুদর্শন দত্ত। ধর্মঘট উপলক্ষে বড়রাস্তার পাশে একখানা দোতলা বাড়ির একতলার একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো সে। এখানে বসেই এই ধর্মঘট পরিচালনা করছিল সে। চা-বাগানের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর বিরাট আধিপত্য তার।

বাড়িতেই ছিল সুদর্শন। রোগা পাতলা চেহারা। ময়লা রং। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। একমাথা কোঁকড়া চুল। অতি সাধারণ আড়ম্বরহীন চেহারার মধ্যে একমাত্র চোখদুটোই যা দেখবার মতো। বড় বড় চোখদুটো উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত। চেহারা দেখে বিশ্বাস করাই শক্ত যে এই একটিমাত্র লোক চা-বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট পরিচালনা করে আসছে।

পুলিস অফিসার অরবিন্দ ও তার দলবল দেখে মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না তার। ধীর পদক্ষেপে বাইরে এসে এতটু স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা করলো তাদের, যেন পুলিসদের প্রতীক্ষায় বসে ছিল সে।

অরবিন্দ কিছু বলার আগেই সুদর্শন বললো—"বুঝতে পেরেছিলাম, আপনারা আমার কাছেই আগে আসবেন।"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে জবাব দেয় অরবিন্দ—"কেন? কি করে বুঝলেন?"

—"স্বাভাবিকভাবেই বুঝলাম। চা-বাগানের মালিক নিহত হয়েছে। কাজেই সন্দেহটা আমার ওপরই পড়বে কারণ ধর্মঘট পরিচালনা করছি আমি।"

—"কিন্তু সত্যিই কি এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না?"

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় সুদর্শন—"না, একেবারেই না।"

—"গতকাল গভীর রাতে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?"

—"না।"

—রাত ক'টায় আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন?"

—"কাল রাতে আমি বাড়ি ফিরি নি। শ্রমিকদের ইউনিয়ন অফিসে সারারাত কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। আজ সকালে বাড়ি ফিরেছি।"

—"সেখানে সারারাত আপনি একা ছিলেন?"

—"না, আরও কিছু লোক ছিল।"

—"তাদের নামধাম বলবেন কি?"

একমুহূর্ত চুপ করে থাকে সুদর্শন। তারপর জবাব দেয়—"তারা হচ্ছে ছাতিম মুর্মু, আনন্দ ঝা ও গগন বর্মন, সকলেই ধর্মঘটী শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী।"

অরবিন্দের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। মুখে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলে—"এলিবাই। ভালো এলিবাই নিয়েছেন।"

জবাব দেয় সুদর্শন—"এলিবাই নেবার প্রশ্ন ওঠে না। সত্যি কথা বললাম আপনাকে। দরকার হলে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

—"হ্যাঁ, তা পারি এবং করবও।"—বলে একটু থামে অরবিন্দ। তারপর কাগজে মোড়া পিস্তলটা সুদর্শনের সামনে টেবিলের ওপর রেখে আবার বলে—"দেখুন তো, এই বস্তুটা চিনতে পারেন কিনা।"

পাকা পুলিস অফিসার অরবিন্দ লক্ষ্য করে পিস্তলটা দেখেই কেমন যেন একটু চমকে ওঠে সুদর্শন। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছোটমতো কাঠের আলমারি খুলেই মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে।

অরবিন্দ বলে—"কি হলো?"

একটু কম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয় সুদর্শন—"এই আলমারির মধ্যেই থাকতো আমার পিস্তলটা। আত্মরক্ষার জন্যেই পিস্তলের লাইসেন্স পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু কখন যে এখান থেকে সেটা চুরি হয়ে গেল কিছুই টের পাই নি আমি।"

গম্ভীরকণ্ঠে অরবিন্দ আবার বলে—"তাহলে স্বীকার করছেন এটাই আপনার হারিয়ে যাওয়া পিস্তল?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় সুদর্শন।

অরবিন্দ বলে—"চিরঞ্জীববাবুর মৃতদেহের পাশে পাওয়া গিয়েছে এটা।"

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে সুদর্শন।

পিস্তলটাকে কাগজে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় অরবিন্দ। তারপর সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে আবার বলে—"এবার উঠুন সুদর্শনবাবু। থানায় যেতে হবে আপনাকে। চিরঞ্জীব রায়ের হত্যার ব্যাপারে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো।"

।।৩।।

উঁচুনীচু টিলাগুলো যেখানে মাটির সঙ্গে এক সমতলে এসে মিশেছে সেখানেই চা-বাগানের কারখানা। অ্যাসবেসটসের ছাতের মাঝামাঝি একটা মাঝারি ধরনের উঁচু কালো চিমনি। কারখানা চালু থাকা অবস্থায় ঐ চিমনি দিয়ে গাঢ় কালো ধোঁয়া বেরোয় সবসময়। কর্মব্যস্ত কুলীমজুরেরা ছোটাছুটি করে এদিক ওদিক।

আজ কিন্তু জায়গাটা একেবারেই নির্জন। শুধু আজ কেন, গত এক মাস ধরে এমনি নির্জন পড়ে আছে কারখানাটা। চা-বাগানে স্ট্রাইক চলছে। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট। লম্বা বাঁশের ঝুড়ি পিঠে বেঁধে বেঁটেখাটো শক্তসবল স্ত্রী-পুরুষগুলো দু'হাতের চারটে আঙুলের বিদ্যুৎগতিতে চা-গাছের নরম ডগাগুলো খুঁজে ফেরে না। বয়লার ঘরের চোখধাঁধানো লেলিহান আগুনের শিখার রসদ যোগাতে একঝুড়ি কয়লাও ফেলে দেয় না কেউ।

তবে, ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেন কিন্তু রোজই একবার আসে। কাচের দরজা-জানালা লাগানো অফিসকক্ষে ডানলপিলো লাগানো নরম চেয়ারে প্রতিদিনই একবার এসে বসে সে।

টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে ছিল ধূর্জটিপ্রসাদ ও সঞ্জীব।

একসময় সঞ্জীব বলে —"পুলিস অফিসার অরবিন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলে মনে হলো সুদর্শন দত্তর ব্যাপারে তিনিও একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। একে তো পিস্তলের ওপর কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি, তাছাড়া......"

—"তাছাড়া, কি?"—প্রশ্ন করে ধূর্জটিপ্রসাদ।

জবাব দেয় সঞ্জীব—"তাছাড়া, সুদর্শনের এলিবাই। সেদিন সমস্ত রাত নাকি সে ইউয়িনন অফিসে ছিল।"

—"তার কোন প্রমাণ আছে?"

—"হ্যাঁ আছে। অরবিন্দবাবু নাকি ছাতিম মুর্মু, আনন্দ ঝা ও গগন বর্মনের জবানবন্দি নিয়েছেন। তারা সকলেই নাকি বলেছে ঐ দিন রাতে সুদর্শন দত্ত তাদের সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে ছিল।"

—"সুদর্শনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা উঠলে তারা কি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে?"

জবাব দেয় সঞ্জীব—"অরবিন্দবাবু তো সেই কথাই বললেন। বললেন—এই তিন ব্যক্তি যদি আদালতে ঠিকমতো সাক্ষ্য দিতে পারে, তবে সুদর্শনের বিরুদ্ধে মামলা একেবারেই হালকা হয়ে যাবে। হয়তো খালাস পেয়ে যাবে সে।"

কোন জবাব না দিয়ে ডানহাতের তালুর ওপর থুতনি রেখে তর্জনী দিয়ে মুখের ওপর আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাকে ধূর্জটিপ্রসাদ।

এমনিভাবেই নিঃশব্দে কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে ধূর্জটিপ্রসাদ বলে—"তাই যদি হয় তবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা কেউ সুদর্শনের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে না পারে।"

—"কী করে তা সম্ভব, মিঃ সেন?"— প্রশ্ন করে সঞ্জীব।

একটা রহস্যময় হাসি ভেসে ওঠে ধূর্জটি সেনের ওষ্ঠপ্রান্তে। মুখে কোন জবাব না দিয়ে ডানহাতের তর্জনীর গায়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এমনভাবে নাড়াতে থাকে, যার একমাত্র অর্থ হচ্ছে—'টাকা'।

ঠিক এমনি সময় ঘরে প্রবেশ করে একজন অবাঙালী ব্যক্তি। ধূর্জটি ও সঞ্জীব দুজনেই যুগপৎ তাকায় তার দিকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধূর্জটি সেন আহ্বান জানায় তাকে— "এই যে, আসুন আসুন আগরওয়ালজী।"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে মাথার কাপড়ের দড়ি পাকানো পাগড়ির ওপর একবার হাত বুলিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার দখল করে বসে রাজাগোপাল আগরওয়াল। তারপর সঞ্জীবের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে —"এই যে সঞ্জীববাবুও রয়েছেন দেখছি। তা আপনাদের এখানকার স্ট্রাইকের খবর কী? কিছু মিটমাট হলো?"

সঞ্জীব জবাব দেবার আগেই ধূর্জটি সেন বলে ওঠে—"কিছুই খবর নেই, আগরওয়ালজী। ধর্মঘট এখনও চলছে।"

চিন্তিতমুখে রাজাগোপাল আগরওয়াল বলে—"তাই তো। এখনও মিটলো না। কিন্তু এই স্ট্রাইক ভেঙে দিতে না পারলে যে সাংঘাতিক সর্বনাশ হবে। স্ট্রাইক যদি সাক্সেস্ফুল হয়, আর এখানকার কুলীমজুরেরা যদি একবার তাদের দাবি আদায় করতে পারে, তবে এই তল্লাটের সমস্ত চা-বাগিচার কুলীরা দেখাদেখি নির্ঘাত স্ট্রাইক করবে। আর সেরকম একটা ব্যাপার চা-ইণ্ডাস্ট্রীর পক্ষে হবে ভীষণ ক্ষতিকর।"

কেউ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

রাজাগোপাল আগরওয়াল কিন্তু বলে যেতে থাকে—"কোত্থেকে যে ঐ দুশমনটা এসে জুটলো! কুলীদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তুললো। কিন্তু এবার বাছাধন টের পাবে। যে সে চার্জ নয়, মার্ডার চার্জ। তাও আবার চিরঞ্জীববাবুর মতো ব্যক্তিকে খুন। ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন জেল তো বটেই। কুলী ক্ষেপানোর ব্যবসা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে ঐ সুদর্শন দত্তর।"

এবার জবাব দেয় সঞ্জীব—"কিন্তু এদিকে যে সুদর্শন দত্তর বিরুদ্ধে মামলা ফেঁসে যায়, আগরওয়ালজী।"

—"কি রকম?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর রাজাগোপালের।

সঞ্জীব সবিস্তারে সুদর্শন দত্তর আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারটা বলে।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকে রাজাগোপাল। তারপর বলে—"তাহলে উপায়? ঐ দুশমন ছাড়া পেলে তো ভীষণ বিপদ।"

জবাব দেয় সঞ্জীব —"কিন্তু মিঃ সেন একটা ব্যবস্থা বাতলেছেন।"

—"তাই নাকি? কি সেটা? — বলেই সোৎসাহে রাজাগোপাল আগরওয়াল ধূর্জটিপ্রসাদের দিকে একটু ঝুঁকে বসে।"

।। ৪ ।।

উত্তরবঙ্গের সামান্য একটা মহকুমা শহর। ভালো হোটেলের ব্যবস্থা নেই এখানে। তবুও ওর মধ্যেই একটু ভদ্রগোছের হোটেল 'নর্দান ভিলা'তে মালপত্র নিয়ে যখন অহীন ও তার সহকারী বন্ধু বরুণ এসে উঠলো তখন দূরে থানার পেটা ঘড়িতে বেলা দশটা বাজে।

প্রায় আধঘন্টা পরিশ্রমের পর নিজেদের ডাব্‌ল্‌-সীটেড রুমটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে দু' বন্ধুতে সবে দুটো সিগারেট ধরিয়ে বসেছে, এমনি সময় হোটেলের প্রৌঢ় ম্যানেজার এসে হাজির হলো সেখানে, হাতে তার একখানা বাঁধানো খাতা । ম্যানেজারের খাতার দিকে তাকিয়ে কোনরকম ভূমিকা না করেই অহীন নিজের ও বরুণের নাম ও ঠিকানা গড়গড় করে বলে যায়।

ম্যানেজার ভদ্রলোক খানিকক্ষণ অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু কুণ্ঠার হাসি হেসে জবাব দেয়—"ঠিকই ধরেছেন স্যার। হোটেলের নিয়ম মতো..........."

ম্যানেজারকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে জবাব দেয় অহীন—"নিশ্চয়ই, একশোবার। নিয়ম মতো কাজ করবেন বৈকি।"

ম্যানেজার খাতায় নামধাম লিখতে লিখতে নিজের মনেই বলে চলে—"বুঝতেই তো পারছেন, স্যার। হোটেলের ব্যবসা করি। কতরকম চোর ডাকাত খুনীরা এসে এইসব হোটেলে গা ঢাকা দেয়।"

কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে জবাব দেয় অহীন—"বলেন কি, ম্যানেজারবাবু? আমাদেরও আপনি সেই দলে ফেলবেন নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে খাতার ওপর থেকে চোখ তুলে জিভে কামড় দিয়ে ম্যানেজার জবাব দেয়—"না, না স্যার। কী যে বলেন! আমি আপনাদের সম্পর্কে ওকথা বলিনি।"

কোন কথা না বলে অহীন ও বরুণ মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

ম্যানেজার ভদ্রলোক আবার লেখায় মন দেয়। একসময় সে আবার প্রশ্ন করে — "আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী লিখবো।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় অহীন —"লিখুন, দেশভ্রমণ।"

বিস্মিত ম্যানেজার অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে —"বলেন কি, স্যার! দেশভ্রমণের জন্যে এখানে কেউ কখনও এসেছে বলে তো শুনি নি। এই জঙ্গলের দেশে দেখবার আছেই বা কী? তাছাড়া মারধোর খুন-খারাপি তো লেগেই আছে এখানে।"

এবার জবাব দেয় বরুণ—"তাই নাকি? এখানে বুঝি খুব খুনটুন হয়?"

হাতের খাতাখানা বন্ধ করে একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে ম্যানেজার বলে—"হ্যাঁ, তা হয় বৈকি। এই তো সেদিন অতবড় বিরাট ধনী লোকটাকে খুন করলে।"

একটু থেমে অনেকটা সেই খুনীকে উদ্দেশ করেই আবার সে বলতে থাকে—"আরে আহাম্মক, খুন-খারাপি করে কী ধর্মঘটী কুলীদের দাবিদাওয়া আদায় করতে পারবি!"

চেয়ারে এবার একটু সোজা হয়ে বসে অহীন। তারপর প্রশ্ন করে—"কে খুন হলো?"

—"আর বলেন কেন! তিন তিনটে চা-বাগানের মালিক চিরঞ্জীব রায়কে সেদিন পিস্তল দিয়ে খুন করেছে সেই লোকটা।"

গম্ভীর হয়ে ওঠে অহীনের মুখ। হায় ভগবান, যার জন্যে এতদূর ছুটে আসা সেইই নেই! প্রশ্ন করে বরুণ—"কে খুন করলে তাকে?"

জবাব দেয় ম্যানেজার—"কে আবার? সেই কুলীদের পাণ্ডা। সুদর্শন না কি যেন নাম। ঐ লোকটাই তো চা-বাগানের কুলীদের ক্ষেপিয়ে তুলে এই ধর্মঘটটা বাধিয়েছে।"

দুপুরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে অহীন দেখে বরুণ ইতিমধ্যে দিবানিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অহীন বলে—"কী, এখন ঘুমুবে নাকি?"

—"তাই তো ভাবছি। তুমি ঘুমুবে না? কাল সারারাত ট্রেনে মোটেই ঘুমুতে পারিনি।"

জবাব দেয় অহীন—"বেশ, তুমি ঘুমোও। আমি একবার চিরঞ্জীব রায়ের বাড়িটা ঘুরে আসি।"—বলেই পোশাক পালটাতে থাকে সে।

পাহাড়ের টিলার উপরে সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের আধুনিক বাড়িটার বাইরের দরজাটা বন্ধ ছিল। অহীন দরজার ওপর মৃদু করাঘাত করে।

একটু পরেই সাহেবী পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। অহীনের আপাদমস্তক একবার ভালোমতো দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে —"কাকে চাই আপনার?"

—"আমি একবার মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ধূর্জটিপ্রসাদের। আবার সে প্রশ্ন করে—"তাঁর সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন? কোত্থেকে আসছেন আপনি?"

—"আসছি কলকাতা থেকে। প্রয়োজনটা ব্যক্তিগত।"

—"ব্যক্তিগত?"—একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধূর্জটি সেন। তারপর আবার বলে—"তাঁর সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না আপনার।"

—"কেন?"—প্রশ্ন করে অহীন।

—"না, হবে না। তিনি অসুস্থ। তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে তিনি খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন।"

জবাব দেয় অহীন—"তা হোক। তবুও তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে আমাকে।"

ক্রুদ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে ধূর্জটিপ্রসাদ বলে—"সেকি! আপনি জোর করে দেখা করতে চান নাকি? আমি এঁদের চা-বাগানের ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেন। আমি বলছি, এখন তাঁর সাথে দেখা হবে না আপনার।"

একটু মৃদু হাসি ভেসে ওঠে অহীনের ওষ্ঠপ্রান্তে। জবাব দেয় সে—"সে আপনি যেই হোন। দেখা তাঁর সাথে করতেই হবে আমাকে। প্রয়োজন হলে জোর করেই। তবে আশা করি আমাকে সে পথ অবলম্বন করতে হবে না।"

—"কী বললেন?"—প্রায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ধূর্জটিপ্রসাদ। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা সেই অহীন কিন্তু ততক্ষণে দৃঢ়পদক্ষেপে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে।

প্রশস্ত ড্রয়িং-রুমের একটি সোফায় বিরসমুখে বসে ছিল ঊর্মিলা। পাশে আর একখানা চেয়ার অধিকার করে বসে ছিল সঞ্জীব।

অহীন সোজা সেখানে এসে দাঁড়াতেই উপবিষ্ট দুজনেই একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে।

ততক্ষণে অহীনের পেছনে ক্রুদ্ধপদক্ষেপে ধূর্জটি সেনও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। অনুমতির অপেক্ষা না করেই একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে অহীন। একবার আড়চোখে ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে ঊর্মিলাকে বলে—"মাপ করবেন, আপনিই বোধহয় মিসেস রায়। আপনার অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়ার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

অহীনের কথার জবাব দেয় না কেউ। বলতে থাকে অহীন—"আমি আপনার স্বামীর চিঠি পেয়ে আজই কলকাতা থেকে এসেছি। আমার নাম অহীন সোম।"

সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করে সে—"অহীন সোম? কোন্ অহীন সোম? বিখ্যাত গোয়েন্দা অহীন সোম আপনি?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত যাই হই না কেন, আমিই গোয়েন্দা অহীন সোম।"

মৃদুকণ্ঠে এবার প্রশ্ন করে ঊর্মিলা—"আপনাকে আমার স্বামী চিঠি লিখেছিলেন?"

—"হ্যাঁ। লিখেছিলেন, এখানে নাকি তাঁর নানারকম বিপদ। তাঁকে বেনামী চিঠিতে ভয় দেখানো হয়েছে যে তাঁকে হত্যা করা হবে। এই জন্যেই তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন।"

সঞ্জীব বলে—"একটু দেরি করে ফেলেছেন আপনি। সত্যিই তিনি এক জঘন্য আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।"

—"আততায়ী কি ধরা পড়েছে?"—প্রশ্ন করে অহীন।

ধূর্জটি একটু রাগতস্বরে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, নাম তার সুদর্শন দত্ত। ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতা সে। পুলিস ঐ ব্যাপারে তদন্ত করছে। কাজেই আপনাকে আর কোন প্রয়োজনই নেই। আপনি এবার আসতে পারেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অহীন। তারপর ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে জবাব দেয়—"কিন্তু একটু মুশকিল হয়েছে কি জানেন, চিরঞ্জীববাবু আমাকে পারিশ্রমিক বাবদ দশ হাজার টাকার একখানা চেকও পাঠিয়েছিলেন। ঐ টাকা আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁকে কোন সাহায্য করতে না পারলেও তাঁর মৃত্যুর জন্যে প্রকৃত দায়ী ব্যাক্তিকে খুঁজে বের করতে পারলেও বুঝতে পারবো টাকাটা নেওয়া আমার সার্থক হয়েছে।"

ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে চেঁচিয়ে ওঠে ধূর্জটিপ্রসাদ—"প্রকৃত খুনীকে তো পুলিস গ্রেফতার করেছে, মশাই। আপনি আর বেশী কি করবেন?"

শুধু বাংলার কেন, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা অহীন সোমের সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের এমনি-ধারা আচরণে সঞ্জীব যেন মনে মনে একটু লজ্জিত হয়। তাই সে ধূর্জটিপ্রসাদের রূঢ় আচরণের ওপর একটু প্রলেপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে—"না না, তা নয়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সুদর্শনই যে প্রকৃত খুনী সেকথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না, মিঃ সোম?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"এবিষয়ে আলোচনা করার আগে আপনার পরিচয়টা আমার জানা দরকার।"

সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—"আমার নাম সঞ্জীব রায়। মৃত চিরঞ্জীব রায়ের ছোটভাই আমি।"

একটু সময় চুপ করে থাকে অহীন। তারপর বলে—"দেখুন সঞ্জীববাবু, আমি এখনও এখানকার ঘটনাবলীর সাথে পরিচিত হতে পারি নি। তবুও আমার ধারণা, কোন্ লাভের আশায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতা সুদর্শনবাবু চা-বাগানের মালিককে হত্যা করতে যাবে? তাতে কি শ্রমিকদের দাবি পূরণ হবে? আর, তাছাড়া শত শত অনুগত শ্রমিক থাকতে সে নিজহাতে এমন একটা জঘন্য কাজ করতে যাবে কেন?"

জবাব দেয় সঞ্জীব—"কেন, এমনও তো হতে পারে যে মালিক পক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করে দাবি আদায়ের জন্যে সে এই কাজ করেছে।"

—"দেখুন, সঞ্জীববাবু, এমন একটা যুক্তি অবশ্য দাঁড় করানো যায়, কিন্তু এরকম একটা যুক্তির পেছনে মনের তেমন সায় পাচ্ছি না।"

অধৈর্য কণ্ঠে আবার বলে ওঠে ধূর্জটি সেন—"আপনার মনের সায় দিয়ে কী হবে? পুলিসও বিশ্বাস করে এটা সুদর্শন দত্তর কাজ। তাই তারা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তাছাড়া আপনি জানেন কি যে সুদর্শন দত্তর নিজের পিস্তলটা পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে?"

—"তাই নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় সঞ্জীব। দ্রুত চিন্তা করতে থাকে অহীন। তার পর বলে—"যতদূর বুঝতে পারছি, এই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই। কাজেই এটা বিবেচনাযোগ্য বিষয় যে চিরঞ্জীব রায়কে হত্যা করার পর কার ভয়ে আততায়ী সুদর্শন দত্ত নিজের পিস্তলটাকে সেখানে ফেলে রেখে গেছে। এমন একটা বোকার মতো কাজ করতে যাবে কেন সে? কাজেই তদন্তের এই স্টেজে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সাজানো ঘটনা বলে অনুমান করলে খুব একটা ভুল হবে না মনে হয়।"

অহীনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে রাজাগোপাল আগরওয়াল। একটা প্রশস্ত চেয়ারে নিজের দেহভার এলিয়ে দিতে রাজাগোপাল বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করে সাধারণভাবে প্রশ্ন করে—কী খবর আপনাদের?

তারপর অহীনের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে —"এঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

সঞ্জীব অহীনের পরিচয় দেয়—"ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা অহীন সোম। দাদার চিঠি পেয়ে কলকাতা থেকে এসেছেন। আর ইনি হচ্ছেন রাজাগোপাল আগরওয়াল—এখানকার টি.জি. এর চেয়ারম্যান।"

প্রশ্ন করে অহীন—"টি.জি.এ—মানে?"

রাজাগোপাল নিজেই জবাব দেয়—"টি গ্রোয়ার্স্ অ্যাসোসিয়েশন। এখানকার ধর্মঘটের ব্যাপারে আমার অ্যাসোসিয়েশন ভাইটালি ইনটারেস্টেড্। কাজেই আমিও চাইছি যাতে সেই খুনী সুদর্শন দত্তর উপযুক্ত শাস্তি হয়।"

হেসে প্রশ্ন করে অহীন—"তার মানে, ঐ সুদর্শন দত্তর ফাঁসি হয়ে গেলে লোকটা ভবিষ্যতে আর শ্রমিক ক্ষেপিয়ে আপনার অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষতি করতে পারবে না, তাই না মিঃ আগরওয়াল?"

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দেয় রাজাগোপাল—"সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে ঐ কথা একেবারেই ভাবছি না, তা নয়। কিন্তু চিরঞ্জীব রায়কে যে এই সুদর্শন দত্তই হত্যা করেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই, কি বলেন মিঃ সোম?"

মাথা নেড়ে জবাব দেয় অহীন—“তবে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে বলে মনে করি না আমি।

এতক্ষণ ঊর্মিলা একটি কথাও বলেনি। অহীন থামতেই সে বলে —“তবে কি আপনার ধারণা, সুদর্শন দত্ত খুনী নয়?”

—“দেখুন, মিসেস রায়, আমাদের দেশের আইনে বলেছে—যতক্ষণ না যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা যাচ্ছে যে সন্দেহ জনক ব্যক্তিই প্রকৃত দোষী, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ হিসাবেই ধরে নিতে হবে। তেমনি আমার মনে হয় তদন্তের ব্যাপারেও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নিয়েই তদন্ত আরম্ভ করা উচিত।”

ঊর্মিলা কিছু বলার আগেই ধূর্জটি সেন বলে—“তাহলে আপনিও এই ব্যাপারে আবার তদন্ত করতে চান নাকি?”

—“নিশ্চয়ই। চিরঞ্জীব রায়ের প্রেরিত টাকা যখন গ্রহণ করেছি তখন এই ব্যাপারে তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে হবে বৈকি।”—কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় অহীন। তারপর আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে ধূর্জটিপ্রসাদ সেন। আর সেই সঙ্গে ঘরের অন্যান্য ব্যক্তিরাও দেখতে থাকে গোয়েন্দা অহীন সোমের অপসৃয়মান দেহটা।

।। ৫ ।।

অহীন যখন হোটেলে তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করে, তখন বরুণ সবে দিবানিদ্রা শেষ করে বিছানার ওপর বসে একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙছিল। অহীনকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধুর মনোভাব আন্দাজ করে নিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু অহীনের ভাবলেশহীন মুখ দেখে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে প্রশ্নই করে বসে—“কি, খবর কি? কি করে এলে সেখানে?”

বরুণের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অহীন বলে—“এখনই একবার থানায় যেতে হবে। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?”

মাথা নেড়ে সায় দেয় বরুণ। অহীন আবার বলে—“বেশ, তবে চল। যেতে যেতে সব শুনতে পাবে।”

থানার কর্তা অর্থাৎ অফিসার-ইন-চার্জ অরবিন্দ ভট্টাচার্য অহীনের পরিচয় পেয়ে একটু খাতিরযত্ন করেই নিজের ঘরে তাদের বসায়। কিন্তু অহীনের বুঝতে অসুবিধা হয় না ঐ খাতিরযত্নের মধ্যে কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার অভাব লুকিয়ে আছে। নিজের মনে একটু হাসে অহীন। প্রৌঢ় পুলিস অফিসার তার মতো একজন ব্যক্তির উপস্থিতি বোধহয় পছন্দ করে নি।

অহীনের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে অরবিন্দ তাকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করে—“আপনার কি ধারণা সুদর্শন চিরঞ্জীব রায়কে খুন করেনি?”

সুকৌশলে জবাব এড়িয়ে গিয়ে অহীন পালটা প্রশ্ন করে—“আপনিই কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারেন যে সেইই প্রকৃত অপরাধী?”

—“না, তা অবশ্য এখনও পারি নি। তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আই উইটনেস না থাকলেও

তার বিরুদ্ধে স্ট্রং সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স রয়েছে। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারে তার ওপর সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে আমার।''

—''কি সেই ব্যাপারটা, জানতে পারি কি?''—প্রশ্ন করে অহীন।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় অরবিন্দ—''ছাতিম মুর্মু, আনন্দ ঝা ও গগন বর্মন নামে তিনজন লেবার ইউনিয়নের মাতব্বরকে ডিফেন্স উইটনেস হিসেবে দাঁড় করিয়ে সুদর্শন দত্ত একটা এলিবাই নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা ধোপে টিকলো না—'' বলেই হেসে ওঠে অরবিন্দ। তারপর আবার বলে—''তাদেরও জবানবন্দি নিয়েছিলাম আমি। তারাও সুদর্শনের এলিবাইকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু সিচুয়েশানটাকে এমনভাবে ট্যাক্‌ল্‌ করলাম যে বেচারীরা পালাতে পথ পেল না।''

—''কেন, তারা কি এখানে নেই?''—এবার প্রশ্ন করে বরুণ।

জবাব দেয় অরবিন্দ—''না নেই। গতকাল থেকে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় আদালতে দাঁড়িয়ে সুদর্শনের পক্ষে মিথ্যে কথা বলতে হবে সেই ভয়ে পালিয়েছে তারা।''

বরুণ প্রশ্ন করে—''তাদের বোধহয় ভয় দেখিয়েছিলেন আপনি?''

জবাব দেয় অরবিন্দ—''না, তেমন কোন ভয় দেখাই নি। ওদের জবানবন্দি নেবার সময় আমার মনে হয়েছিল নিজেদের নেতাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছিল তারা। তাই আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম মাত্র।''

—''তাতেই ভয় পেয়ে তারা পালিয়ে গেল''—প্রশ্ন করে বরুণ।

—''তাই তো দেখতে পাচ্ছি।''—জবাব দেয় অরবিন্দ।

অহীন এবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ ভঙ্গীতে বলে—''আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম।''

—''কি রকম?''—প্রশ্ন করে অরবিন্দ।

—''হত্যার অপরাধে সুদর্শন দত্তর শাস্তি হোক—এটা যারা চায় তারাই হয়তো তাদের সরিয়ে দিয়েছে এখান থেকে।''

—''কীভাবে সরিয়ে দিল? জোর করে?''

—''জোর করতে হবে কেন? অন্য কোন উপায়ে।''

—''অন্য কী উপায়ে?''

—''তা অবশ্য এখনই সঠিক বলতে পারছি না। তবে টাকার লোভ দেখিয়ে সরিয়ে দিতে পারে।''

আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে অরবিন্দ।

অহীন আবার বলে—''আচ্ছা, অরবিন্দবাবু, সুদর্শন দত্তর সঙ্গে জেল হাজতে একবার দেখা করা যায় না?''

জবাব দেয় অরবিন্দ—''কাজটা খুবই শক্ত। স্বয়ং এস.ডি.ও. আদেশ দিয়েছেন যে একমাত্র তার উকিল ছাড়া আর কেউ তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবে না। সুতরাং..........''—কথাটা শেষ না করেই চুপ করে থাকে অরবিন্দ।

গম্ভীর মুখে অহীন জবাব দেয়—''তাহলে তো দেখা করার কোন সম্ভবনাই নেই।''

—''হ্যাঁ।''—জবাব দেয় অরবিন্দ।

একটু সময় চুপ করে থাকে অহীন, তারপর আবার বলে—"দেখুন, গোয়েন্দা হলেও আমি একজন বাইরের লোক। আমাকে এই মামলার কেস ডাইরী পড়তে দেওয়া হয়তো আপনার অভিপ্রেত নাও হতে পারে। তাই বলছি এই মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলো যদি আমাকে একবার পড়তে দেন তাহলে খুবই ভালো হয়।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে অরবিন্দ। বিখ্যাত গোয়েন্দা অহীন সোমের অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে ভরসা পায় না সে। তাই সে জবাব দেয়—"বেশ তো, পড়ুন না।"—বলেই একগোছা কাগজ এগিয়ে দেয় অহীনের সামনে।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে থাকে অহীন।

।। ৬।।

কেস ডাইরীর পাতা থেকে অহীন সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলো পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে কাগজ থেকে চোখ না তুলেই দরকারী পয়েন্টগুলো সে মুখে মুখে বলে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো টুকে নিতে থাকে বরুণ। সঞ্জীবের জবানবন্দি খুবই সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য দিনের মতো সেদিন রাতেও সে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের বাড়ির শোবার ঘরে ঘুমুতে যায়। রাতে তার ভালোই ঘুম হয়েছিল। পরের দিন সকালে চিরঞ্জীবের বাড়ির একটা চাকর এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে চলে যায় তার দাদার বাড়ি। বৌদি ঊর্মিলা তখন নিজের ঘরে বসে কাঁদছিল। সেই অবস্থায় তার পক্ষে সমস্ত কিছু খুলে বলা সম্ভব ছিল না। তাই আসল ঘটনাটা না জানতে পেরে মনে মনে দারুণ উদ্বিগ্ন হচ্ছিল সে। ইতিমধ্যে ম্যানেজার ধূর্জটি সেন এসে হাজির হয় সেখানে। তার কাছ থেকেই তার দাদার হত্যার মোটামুটি কাহিনীটা জানতে পারে। পুলিস অফিসার অরবিন্দর প্রশ্নের জবাবে সে আরও বলেছিল যে তার দাদার মৃত্যুর আগের দিন সকালের দিকে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সঞ্জীবের। সেই তাদের শেষ দেখা।

ঊর্মিলা তার জবানবন্দিতে বলেছিল যে সেদিন একটু বেশী রাতেই ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরেছিল সে। ধূর্জটিপ্রসাদ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে সামান্য কিছু সাধারণ ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল। তারপরেই চিরঞ্জীব নিজের পোশাক পরিবর্তনের পর বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার প্রশ্নের জবাবে সে তাকে জানায় যে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে তার একটু জরুরী দরকার। ঐ গভীর রাতেই নাকি তার সঙ্গে দেখা করার খুবই প্রয়োজন। ঊর্মিলা তার স্বামীকে যেতে নিষেধ করেছিল কিন্তু স্ত্রীর কথায় কান দেয়নি সে। নিচে নেমে গিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে চিরঞ্জীব চলে গিয়েছিল। ঐ রাতে অমনি ভাবে চিরঞ্জীব চলে যাওয়ায় সংঘাতিক চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সে। মাসখানেক ধরে চা-বাগানে স্ট্রাইক চলছে। ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছিল ঊর্মিলা। দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নি তার। শেষ রাতে আর বিছানায় শুয়ে থাকতে না পেরে টেলিফোনে খবরটা সে জানায় ধূর্জটি সেনকে। ধূর্জটি সেন তাকে জানায় যে, সে তখনই বেরিয়ে পড়বে তার স্বামীর খোঁজে। খুব ভোরবেলা ধূর্জটি সেন স্বয়ং এসে তাকে জানায় যে সুদর্শন দত্তর বাড়িতে সুদর্শন কিংবা চিরঞ্জীব কারুর দেখাই সে পায়নি। ধূর্জটি সেন তাকে আরও আশ্বাস দিয়েছিল, বিশেষ কোন কারণে নিভৃতে আলাপের

জন্যে হয়তো তারা অন্য কোথাও গিয়েছে। সকালেই ফিরে আসবে। ঐ আশ্বাসে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে সে। ধূর্জটিপ্রসাদ চলে যায়। কিন্তু একটু বেলা হতেই টেলিফোন মারফত পুলিসের কাছ থেকে চিরঞ্জীবের মৃত্যুর খবর পায় সে।

ঊর্মিলার জবানবন্দি পড়া শেষ করে অহীন মাথা তুলে তাকায় পুলিস অফিসার অরবিন্দের দিকে। তারপর প্রশ্ন করে—"চিরঞ্জীব রায়ের গাড়িটা কি পাওয়া গিয়েছিল?"

জবাব দেয় অরবিন্দ—"হ্যাঁ, চিরঞ্জীব রায়ের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে বড় রাস্তার একপাশে তার বড় ফিয়াট্ গাড়িটা পার্ক করা ছিল। দেখে মনে হয়েছিল যেন চিরঞ্জীব রায় ইচ্ছে করেই গাড়িটা পার্ক করেছিল ওখানে।"

আর কোন প্রশ্ন না করে আবার কাগজে মন দেয় অহীন।

এবারের জবানবন্দি ধূর্জটিপ্রসাদের। সে বলে যে সেদিন শেষ রাতে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। টেলিফোন হাতে নিয়েই সে শুনতে পায় ঊর্মিলার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। ঊর্মিলার কাছ থেকে চিরঞ্জীর রায়ের গভীর রাতে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার খবর পেয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে সে। তাই সে তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় সুদর্শনের আস্তানায়। কিন্তু সেই আস্তানায় তখন বাইরের দরজায় একটা তালা ঝুলছিল। সুদর্শন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে এমন একটা লোকের সন্ধানও সে পেল না সেখানে। হঠাৎ সে দেখতে পায় রাস্তার ঠিক উলটোদিকের বাড়িটায় তখনও আলো জ্বলছে। ঐ বাড়িটার মালিক হচ্ছে দেবদাসী নামে একটি রূপসী স্ত্রীলোক। হয়তো সে কিছু জানতে পারে এই আশায় দেবদাসীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে ধূর্জটিপ্রসাদ। বেরিয়ে আসে দেবদাসী। কিন্তু সুদর্শন দত্ত সম্পর্কে সেও কিছু বলতে পারে না। অগত্যা, সে সোজা চলে যায় চিরঞ্জীবের বাড়ি। সেখানে গিয়ে সে ঊর্মিলাকে আশ্বাস দেয়। তারপর নিজের বাড়ি ফিরে আসে। সকালের দিকে পুলিসের কাছ থেকে চিরঞ্জীবের মৃত্যুর খবর জানতে পারে সে।

পড়া শেষ করে কাগজগুলো তেমনিভাবে হাতের মধ্যে ধরে রেখে চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকে অহীন।

পুলিস অফিসার অরবিন্দ বোধহয় অহীনকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই নিজের ঠোঁটে তর্জনী লাগিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করে বরুণ। সাবধান হয়ে যায় অরবিন্দ।

প্রায় মিনিট দশেক কেটে যায় এমনিভাবে।

তারপর একসময় চোখ খুলে অহীনই প্রথমে কথা বলে—"আচ্ছা, অরবিন্দবাবু, চিরঞ্জীব রায়ের স্ত্রী ঊর্মিলা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অরবিন্দ—"দেখুন, বড়লোকের ব্যাপার। সঠিক কোন কিছুই বলা চলে না। তবে শুনেছি এই ভদ্রমহিলা নাকি একটু আমুদে প্রকৃতির। রাতদিন খেলাধুলো ক্লাব নিয়েই নাকি মেতে থাকতেন তিনি।"

—"চিরঞ্জীব রায়ের সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল কেমন, জানেন কি?"

—"দেখুন, স্বামীর সঙ্গে ঊর্মিলা রায়ের বনিবনা ছিল না, এমন খবর পাইনি কখনও। তবে ইদানীং চা-বাগানে ধর্মঘট আরম্ভ হবার পর থেকে চিরঞ্জীবাবু তেমন আর ক্লাবে যাতায়াত করতেন না। তবে ঊর্মিলা রায় নাকি রেগুলার যেতেন সেখানে।"

—"কিসের ক্লাব এটা?"

—"সাধারণ ক্লাব নয়। এই এলাকার রথী-মহারথী ও তাঁদের আত্মীয়ারা এই ক্লাবে যাতায়াত করেন। চা-বাগানের সাহেবসুবোদেরও আড্ডা এই ক্লাবে। এই, বড় বড় ব্যাপার

আর কি?"—বলেই মৃদু হাসে অরবিন্দ।

—"আচ্ছা, চিরঞ্জীবের চরিত্র কেমন ছিল?"

—"খুবই ভালো। যতদূর শুনেছি চরিত্রবান পুরুষ তিনি। তবে একটু একরোখা প্রকৃতির।"

—"আর তাঁর ছোটভাই, সঞ্জীব?"

—"অরবিন্দ আবার একটু হাসে। তারপর জবাব দেয়—"বড়লোকের ছেলে অল্পবয়সে অসৎ সংসর্গে পড়লে যা হয় ঠিক তাই। শুনতে পাই রূপসী দেবদাসীর বাড়ি নাকি তার প্রত্যহ যাতায়াত।"

একটু সময় চুপ করে থেকে অহীন আবার প্রশ্ন করে—"চিরঞ্জীব ও সঞ্জীব দু'ভাইই চা-বাগানের মালিক, তাই না?"

—"হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি। তবে তাঁদের বাবা নাকি একটা বিচিত্র উইল তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন।"

—"কি রকম?"

—"তাঁর উইলে নাকি আছে যে চিরঞ্জীব রায়ের বয়স যখন ঠিক তিরিশ বছর হবে তখনই সে চা-বাগানগুলোর কর্তৃত্ব পাবে। তার আগে নয়। তার তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কর্তৃত্ব থাকবে ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেনের হাতে। আবার কর্তৃত্ব লাভ করার আগেই যদি চিরঞ্জীবের মৃত্যু হয়, তবে তার স্থলে কর্তৃত্ব আসবে তার ছোটভাই সঞ্জীবের হাতে। তবে তাও তার তিরিশ বছর বয়স হওয়ার আগে নয়। সেই পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতাই থাকবে ম্যানেজার ধূর্জটি সেনের হাতে।"

অরবিন্দ থামতেই অহীন একটু সময় চিন্তা করে। তারপর আবার বলে—"বলতে পারেন, চিরঞ্জীবের তিরিশ বছর বয়স পূর্ণ হতে আর কতদিন বাকি ছিল?"

জবাব দেয় অরবিন্দ—"তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে লোকমুখে শুনতে পেতাম যে আর নাকি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চা-বাগান পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলো রিফর্ম-এর ব্যবস্থা করবে বলে ঠিক করেছিল চিরঞ্জীব রায়। সুতরাং এতেই বুঝতে পারা যায় তিরিশ বছর পূর্ণ হতে আর বেশী দিন বাকি ছিল না তার।"

—"তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে চিরঞ্জীব রায়ের মৃত্যুতে লাভবান হয়েছে দুটি মাত্র লোক। এই ধূর্জটিপ্রসাদ সেন। চা-বাগানের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হলো না তার। অন্ততঃ সঞ্জীবের বয়স তিরিশ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব রয়ে গেল। আর দুই নম্বর হচ্ছে সঞ্জীব। দাদা বেঁচে থাকলে চিরদিন তার তাঁবেই থাকতে হতো তাকে। এবারে তিরিশ বছর বয়স পূর্ণ হলে অন্ততঃ কর্তৃত্বলাভের একটা সম্ভাবনা আছে তার।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অরবিন্দ বলে—"হ্যাঁ, ব্যাপার তো সেরকমই দাঁড়াচ্ছে।"

—"আচ্ছা, চিরঞ্জীবের সঙ্গে সঞ্জীবের সম্বন্ধটা কীরকম ছিল, বলতে পারেন?"

—"ভালই বলে শুনেছি। সঞ্জীব নাকি তার দাদাকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতো।"

আবার খানিকক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করে অহীন।

অহীন চোখ খুলতেই এবার বরুণ বলে—"আমার মনে হয় অরবিন্দবাবুর কাছ থেকে ঐ দেবদাসী মেয়েটা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতে পারলে বোধহয় ভাল হতো।"

প্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় অহীন—"একজাক্ট্লি তাই। আমিও এই মুহূর্তে ঐ কথাই ভাবছিলাম।"

তারপর অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে অহীন আবার বলে—"এই দেবদাসী স্ত্রীলোকটি কে? কী পরিচয় তার?"

জবাব দেয় অরবিন্দ, স্ত্রীলোকটি সুন্দরী, খুবই সুন্দরী। বয়স প্রায় তিরিশ, কিন্তু দেখতে অনেক কম মনে হয়। পরিচয় তার গণিকা। তবে ঠিক সাধারণ গণিকা নয়। একটু উঁচু শ্রেণীর। লোকে বলে রূপের জলুস ছাড়াও ওর নাকি একটা সম্মোহন শক্তি আছে। আর সেই শক্তি দিয়েই এ তল্লাটের চায়ের কাঁচা পয়সার মালিক অনেকের সর্বনাশ করেছে ঐ দেবদাসী।"

—"মেয়েটা কি বাঙালী।"

—"দেখতে সম্ভ্রান্ত ঘরের বাঙালী বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে নাকি আদিবাসীশ্রেণীর। তবে, বাঙালীর রক্তও কিছুটা রয়েছে বোধহয় ওর দেহে।"

—"মেয়েটা কি একাই থাকে সেই বাড়িতে?"

—"না, মহীন্দর নামে আর একটা ছেলে থাকে ওর সঙ্গে। এই মহীন্দর ছেলেটার বয়স বছর কুড়ি হবে। সাংঘাতিক কেতাদুরস্ত আর হিংস্রপ্রকৃতির। ছেলেটা কোন্ দেশীয় বলা কঠিন। তবে দেবদাসী যা আয় করে তার একটা মস্তবড় অংশ যে ঐ ছেলেটা দু'হাতে উড়োয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

—"ঐ মহীন্দর সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারেননি?"

—"না, একবার রাস্তায় একটা লোককে ছোরা দিয়ে আঘাত করার জন্যে ছেলেটাকে চালান দিয়েছিলাম। পাগলের মত হয়ে উঠেছিল দেবদাসী। অজস্র পয়সা ব্যয় করে কলকাতা থেকে তিন চারজন ব্যারিস্টার আনিয়ে সেবার কোন মতে রক্ষা করেছিল তাকে।"

—"এই দেবদাসীর কাছেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করতো সঞ্জীব, না?"

—"হ্যাঁ, তবে দেবদাসী রাত দুটোর পর কোন অতিথিকেই নিজের ঘরে ঠাঁই দিতে রাজী নয়। সে যত বড় সম্পদশালী ব্যক্তিই হোন না কেন।"

—"কেন, কারণ কি?"

—"তা অবশ্য সঠিক বলতে পারবো না। তবে অনেকে বলে রাত দুটোর পর অতিথিরা চলে গেল ঐ মহীন্দর ছেলেটার সাথে কোন অস্বাভাবিক কাজে লিপ্ত হয় সে। আর ঐ ব্যাপারটা দেবদাসীর এমন নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে যে একটা রাত মহীন্দরকে ছাড়া চলে না তার। তাই সেবার মহীন্দর অ্যারেস্ট হবার পর তিন দিন পর্যন্ত জামিনে ছাড়া না পাওয়ায় প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল সে।"

অরবিন্দের কথা শেষ হলে অহীন মন্তব্য করে—"অসম্ভব নয়। এরকম অদ্ভুত স্পৃহার কাহিনী পাশ্চাত্যদেশে মাঝে মাঝেই শুনতে পাওয়া যায়।"

।। ৭।।

হোটেলে নিজেদের কক্ষে বসে আলোচনা করছিল অহীন ও বরুণ। বরুণ বলে—"আচ্ছা, তোমার কি ধারণা, চিরঞ্জীব রায়কে সেই সুদর্শন দত্ত হত্যা করেনি?"

একটু সময় চুপ করে থেকে জবাব দেয় অহীন—"এখন তোমাকে আমি সঠিক উত্তর দেব না, বরুণ। তবে একথা ঠিক যে এই হত্যার ব্যাপারে আরও কিছু ঘটনা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেগুলোকে ঠিকমত আবিষ্কার করতে না পারলে এই রহস্যের প্রকৃত সমাধান

কিছুতেই সম্ভব নয়। পুলিসী তদন্তে সেগুলো আবিষ্কৃত হয়নি। পুলিস অফিসার অরবিন্দবাবু ঐ সম্পর্কে এখনও কিছুই জানে না।"

—"তুমি কি সেগুলোর সন্ধান পেয়েছ?"

মাথা নেড়ে জবাব দেয় অহীন—"ঠিক সন্ধান পাই নি, তবে কতকটা আঁচ করতে পেরেছি মাত্র। জেলে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ব্যাপারটা অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে যেত বলে মনে হয়।"

—"কিন্তু সে তো অসম্ভব ব্যাপার। খোদ এস ডি ও-র হুকুম যে জেলে সুদর্শনের সাথে কেউ দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবে না।"

—"একমাত্র তার নিযুক্ত উকিল ছাড়া।"—কথাটা যোগ করে দেয় অহীন।

একটু হেসে বরুণ বলে—"ঐ রাস্তায় কার্যোদ্ধার করতে চাও নাকি? উকিল সেজে দেখা করতে চাও তার সঙ্গে?"

এবার হো হো শব্দে হেসে ওঠে অহীন। তারপর হাসি থামিয়ে জবাব দেয়—"না হে, না। এক্ষেত্রে ঐ পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ধরা পড়লে, এখানে বসে এই মামলার তদন্ত করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

—"তবে কী করতে চাও তুমি?"

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অহীন। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে তার। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে সে।

বরুণ বসে বসে চিন্তা করতে থাকে কীভাবে অহীন দেখা করতে পারে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে। কোন্ পথ অবলম্বন করলে নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হতে পারে।

একসময় চোখ মেলে তাকায় অহীন। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে—"কি, কোন রাস্তা খুঁজে পেলে?"

—"কি করে তুমি বুঝলে যে আমি এতক্ষণ রাস্তার খোঁজ করছিলাম?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"তোমার মুখ দেখে। চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ তোমার সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে, বরুণ।"

জবাব দেয় বরুণ—"বেশ ধরে নিলাম আমার মুখে চিন্তার ছাপ রয়েছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারতো আমি ঐ বিষয় চিন্তা না করে অন্য জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। সেক্ষেত্রে তো তোমার অনুমান মিথ্যা হয়ে যেত।"

—"না হতো না। ঐ বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় তুমি চিন্তা করতেই পারতে না।"

—"কি বলছ? এ কথা জোর করে বলতে পার তুমি?" বরুণ বলে।

জবাব দেয় অহীন—"নিশ্চয়। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। কীভাবে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলাম আমি। তারপর চোখ খুলেই যখন দেখতে পেলাম তোমার মুখে চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ, তখন কি আমি অনুমান করবো যে ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে এতক্ষণ তুমি পরমাণু তত্ত্বের মত একটা জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলে?"—কথা শেষ করেই হোহো শব্দে হেসে ওঠে অহীন।

লজ্জিতকণ্ঠে জবাব দেয় বরুণ—"তা অবশ্য ঠিক।"

অহীন আবার বলে —"যাক, কোন উপায় মাথায় এলো?"

—"না, তেমন কোন উপায় তো দেখছি না।"

—"আমি কিন্তু একটা উপায় বের করেছি।"

সাগ্রহে জবাব দেয় বরুণ—"কী সেটা?"

—"অতি সহজ রাস্তা। এই ধর, আজ বিকেলে যদি আমি প্রকাশ্য রাস্তায় একটা কুলি কিংবা একটা রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে মারামারি করি, তবে তার ফল কী হবে?"

তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয় বরুণ—"কী আর হবে? পুলিস অ্যারেস্ট করে চালান দেবে তোমাকে।"

—"বেশ, বিচারে আমার কী হতে পারে?"

একটু ভেবে জবাব দেয় বরুণ—"এসব সামান্য অপরাধে আর কী হবে? দু'দশ টাকা জরিমানার অনাদায়ে দু'চার দিন জেল হবে।"

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে অহীন বলে—"তবে, তাই হোক। একজন নিরপরাধ লোক যে আজ বিকেলে আমার হাতে মার খাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় বরুণ—"কিন্তু তোমাকে যখন থানায় ধরে নিয়ে যাবে তখন অরবিন্দবাবু তোমাকে চিনতে পেরেও আদালতে চালান দেবে, তাই কি তুমি আশা কর?"

—"না, তা অবশ্য করি না। কিন্তু সে যাতে আমাকে চিনতে না পারে তার ব্যবস্থা করেই যাব।"

বরুণ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

সেইদিনই বিকেলে সকলের অলক্ষ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে যে লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে যে সত্যিই শহর দেখতে আসা একজন গ্রাম্য চাষী লোক নয়, সেকথা কারুর পক্ষেই বোঝবার উপায় ছিল না।

গ্রাম্য চাষীর ছদ্মবেশে অহীন শহর দেখবার জন্যে একটা রিক্‌শা ভাড়া করে। তারপর রিক্‌শার ওপর জাঁকিয়ে বসে সস্তাদামের একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দু'পাশে বোকার দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে বেড়ায় সে। থানার কাছাকাছি আসতেই রিক্‌শা থামিয়ে নেমে পড়ে পথে। তারপর, পরিকল্পনামত ভাড়া নিয়ে রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দেয়।

দু' চারজন পথচারী জমে যায় সেখানে। চেঁচামেচির শব্দে থানার দু'একজন সেপাই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে ব্যাপারটা।

এই সুযোগ। আর কালক্ষেপ করে না অহীন। মুখে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়ে রিক্‌শাওয়ালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে প্রবলভাবে কিল ঘুষি লাগাতে থাকে তাকে।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। একটা রাত থানা-হাজতে থাকতে হয় অহীনকে। পরের দিন যথারীতি আদালতে চালান দেওয়া হয় তাকে। পাবলিক রাস্তায় মারামারি করার অপরাধে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু'দিন জেল হয় তার।

হাসিমুখে জেল ফটকে প্রবেশ করে অহীন।

পরের দিন সকালবেলা কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রাখা এক প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে একজন সেপাই-এর কাছ থেকে সুদর্শন দত্তর সাথে দেখা করার অনুমতি লাভ করে অহীন।

জেল সেপাইটি কিন্তু প্রথমটায় রাজী হয়নি। ভ্রূ কুঁচকে অহীনের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করেছিল—"ঐ খুনী আদ্‌মীর সঙ্গে তুম্‌হার কীসের পরিচয়?"

হাত কচলে নম্রকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল অহীন—"আজ্ঞে সেপাইজী, ঐ সুদর্শন দত্তই

একদিন আমার মনিব ছিল। তাই......" বলে—কথাটা শেষ না করে একটু হেসেছিল অহীন।

একটা ভাঙা চেয়ারে বসে বই পড়ছিল সুদর্শন দত্ত।

একটি চাষীশ্রেণীর লোক তার সামনে এসে দাঁড়াতেই বই থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে সুদর্শন—"কে তুই? কী চাস এখানে?"

জবাব দেয় অহীন—"আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই ইচ্ছা করে জেলে এসেছি আমি।"

—"সে কি?"—বলেই হাতের বইটা বন্ধ করে সুদর্শন।

চারিদিকে একবার সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুদর্শনের আরও একটু কাছে সরে এসে নিচুকণ্ঠে জবাব দেয় অহীন—"আমার নাম অহীন সোম। আমি একজন ডিটেকটিভ। চিরঞ্জীব রায়ের আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্যে আমি এসেছি কলকাতা থেকে।"

অহীন আশা করেছিল, এই কথা শোনার পর সুদর্শন দত্ত হয়তো তার সম্বন্ধে একটু উৎসাহিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সুদর্শনের নির্বিকার কণ্ঠের জবাবে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না সে।

সুদর্শন জবাব দেয়—"তা', এখানে এমনিভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন?"

—"অন্য কোন উপায়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল না বলে।"

—"কী চাই আপনার?"

—"আপনার কাছে থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুদর্শন দত্ত বলে—"ঐ বিষয়ে আমি কারও সাথে কথা বলতে রাজী নই।"

—"কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, আপনাকে খুনী প্রতিপন্ন করবার জন্যে পুলিস ও আরও অনেকে উঠে পড়ে লেগেছে।"

সুদর্শনের ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলে—"মিথ্যে মামলা থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তা আমার জানা আছে। আপনার কোন সাহায্যই চাই না আমি।"

একটু সময় চিন্তা করে অহীন। সুদর্শন বোধহয় ভাবছে সে যে 'এলিবাই' নিয়েছিল সেই ছাতিম মুর্মু, আনন্দ ঝা ও গগন বর্মন যখন তার সহায় রয়েছে, তখন আর তার ভাবনা কী? তাই সে আবার বলে—"কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না ছাতিম, আনন্দ ও গগন নিরুদ্দেশ। তারা কখনও আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসবে না।"

তেমনি নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দেয় সুদর্শন—"না আসে, না আসুক। তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

।। ৮।।

রাত তখন দশটা।

হোটেলে খাওয়ার পাট চুকে গেছে। মেম্বারদের মধ্যে অনেকেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে নিজ নিজ ঘরে।

খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে টেবেল লাইট জ্বালিয়ে একখানা ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে ডুবে রয়েছে বরুণ। একটু দূরে একখানা চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে আছে অহীন, যেন ঘুমুচ্ছে। কিন্তু আসলে সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

এমন সময় বাইরে দরজার ওপর মৃদু করাঘাত। অহীনের কানে পৌঁছায় না সেই শব্দ। কিন্তু বরুণের মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যায় সেই শব্দে। কান খাড়া রেখে চুপ করে থাকে সে।

আবার শব্দ হয় দরজার ওপর। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে খাট থেকে নেমে আসে বরুণ। তারপর নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে কপাট খুলে দেয়।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের একটা চাকর।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে চাকরটার দিকে তাকাতেই চাকরটা জবাব দেয়—"একজন স্ত্রীলোক দেখা করতে চায় আপনাদের সঙ্গে।"

একটু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে বরুণ—"স্ত্রীলোক? এত রাতে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।"

—"কী বললে সে?"

—"বললে, অহীনবাবুর সঙ্গে নাকি তার বিশেষ দরকার। তাই দেখা করতে চায়।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বরুণ। একবার পেছন ফিরে অহীনের দিকে তাকায়। অহীন তখনও তেমনিভাবে স্থির হয়ে আছে।

বরুণ চাকরটাকে বলে—"আচ্ছা তুমি তাকে নিয়ে এসো এখানে।"

একটু পরেই চাকরের পেছনে একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ায় দরজার গোড়ায়।

চাকরটা চলে যেতেই বরুণ স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—"আপনি কোত্থেকে এসেছেন? অহীনবাবুর সঙ্গে কি প্রয়োজন আপনার?"

—"আমার প্রয়োজনের কথা তাঁকেই বলতে চাই আমি। তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা হবে?"

ঠিক এমনি সময় পেছনে অহীনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"আসুন ঊর্মিলা দেবী। ভেতরে আসুন।"

বরুণ ও ঊর্মিলা দুজনেই ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে।

চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে মৃদু হেসে অহীন বলে—"আমি এরকমই একটা কিছু আশা করেছিলাম।"

অহীনের সামনে একটা চেয়ারে বসতে বসতে ঊর্মিলা জবাব দেয়—"আপনি কি জানতেন যে আজ আমি আপানার সঙ্গে দেখা করতে আসবো?"

জবাব দেয় অহীন—"জানতাম বললে ভুল বলা হবে। তবে, আমি অনুমান করেছিলাম আসতে হবে আমার কাছে।"—একটু থেমে অহীন আবার বলে—"যাক সে কথা। এবার আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।"

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জবাব দেয় উর্মিলা—"সেদিন আমার বাড়িতে আমাদের, বিশেষ করে ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেনের ব্যবহারে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

অহীন বুঝতে পারে এটা ভূমিকা মাত্র। তাই সে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। বলতে থাকে উর্মিলা—"আমার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমি একটা মিথ্যে কথা বলেছি পুলিসের কাছে। এই ক'দিন সেই কথাটা নিয়ে মনে মনে অনেক জল্পনাকল্পনা করেছি। ধূর্জটি

সেনকেও প্রশ্ন করেছি, কিন্তু সে সবসময়ই জবাব এড়িয়ে গেছে। তাই আপনার কাছে এসেছি প্রকৃত ঘটনাটা জানাবার জন্যে।"

—"বলুন কী বলতে চান আপনি।"—অহীন গম্ভীরকণ্ঠে বলে।

ঊর্মিলা বলে—"পুলিসের কাছে বলেছিলাম সেদিন রাতে আমার স্বামী সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবার পর দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমুতে পারিনি। শেষ রাতে টেলিফোনে ধূর্জটিপ্রসাদকে ডেকে আমার স্বামীর খোঁজ করতে বলি। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। আমার স্বামী চলে যাবার পর একটুও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইনি আমি। কারণ ধর্মঘটের ব্যাপারে শ্রমিকদের প্রতি খুবই সহানুভুতি ছিল আমার স্বামীর। তিনিই উপযাচক হয়ে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবেন বলে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বয়স তিরিশ বছর পূর্ণ হবার পর চা-বাগানের সমস্ত কর্তৃত্ব যখন তাঁর হাতে আসবে তখন তিনি শ্রমিকদের দাবিমত তাদের মজুরি বাড়িয়ে দেবেন বলে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে গোপনে একটা চুক্তিপত্রও তৈরি করেছিলেন। কাজেই, বুঝতে পারছেন সেদিন গভীর রাতে তিনি সুদর্শন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াতে আমি মোটেই চিন্তিত হইনি।"

ঊর্মিলা একটু থামতেই অহীন প্রশ্ন করে—"সেই চুক্তিপত্রটা আপনি দেখেছিলেন? সেটা কোথায় বলতে পারেন?"

—"হ্যাঁ, দেখেছিলাম। কিন্তু সেটা কোথায় জানি না। আমার বাড়িতেও খোঁজ করেছি আমি, কিন্তু পাইনি।"

—"আচ্ছা ঊর্মিলাদেবী, আপনাদের ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ, টি.জি.এ.র চেয়ারম্যান আগরওয়ালা এবং আপনার দেবর সঞ্জীব এরা সকলেই চাইছেন যাতে ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া যায়, তাই না?"

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় ঊর্মিলা—"হ্যাঁ, প্রথম দুজন তা চাইছেন বটে, তবে সঞ্জীবের কথা ঠিক বলতে পারবো না।"

—"সুদর্শন দত্তর সঙ্গে আপনার স্বামীর গোপন চুক্তিপত্রের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাঁরা জানেন না, তাই না?"

জবাব দেয় ঊর্মিলা—"না তারা কেউই জানে না।"

একটু সময় চিন্তা করে অহীন। তারপর আবার বলে—"তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সেদিন শেষ রাতে আপনি আপনার স্বামীর বিষয়ে টেলিফোনে ধূর্জটিপ্রসাদকে খোঁজ নিতে বলেননি!"

—"না। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই আমার বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে খুঁজবার কথা বলে গিয়েছিল। এবং তারই অনুরোধে এই কথা পুলিসের কাছে চেপে গিয়েছিলাম আমি।"

—"আর একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করবো ঊর্মিলা দেবী —ধূর্জটি সেন কিংবা আগরওয়ালা যদি চিরঞ্জীববাবুর সেই গোপন চুক্তির কথা জানতেন পারতেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠতেন, তাই না?"

—"তাই তো মনে হয়।"

সেদিন রাতে ঊর্মিলা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে বসে চিন্তা করে অহীন। ঊর্মিলা আজ রাতে তাকে অনেক সাহায্য করেছে। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে একসাথে জুড়ে দেবার সূত্র সে দিয়ে গেছে তাকে। গভীর রাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে নিজের শয্যায় শয়ন করে অহীন।

।। ৯ ।।

সুন্দর ঝকঝকে তকতকে একতলা বাড়িটা। সামনে ছোট্ট একটা দেশী ফুলের বাগান। দু'সারি সাজানো ইঁটের মাঝবরাবর একটা অপরিসর পথ সোজা বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে।

অহীন ও বরুণকে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি বাইরে।

দরজার কড়া নাড়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই একটি বছর কুড়ি বয়সের ছোকরা দরজার কপাট খুলে দিয়ে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কাকে চাই?"

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে জবাব দেয় অহীন—"দেবদাসী নামে একটি মহিলা কি এই বাড়িতে থাকে?"

—"হ্যাঁ থাকে। তার সঙ্গে কি দরকার আপনাদের?"

—"একটু দরকার আছে। একবার তাকে খবর দাও তো।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে মহীন্দর, তারপর আবার প্রশ্ন করে—"আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?"

জবাব দেয় অহীন—"কলকাতা থেকে।"

একটু সময় কি যেন ভাবে মহীন্দর, তারপর তাদের নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসায়।

মিনিট পাঁচেক পরে যে মেয়েটি তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে দাঁড়ায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেবলই তাদের মনে হতে থাকে— মানুষের দেহে এত রূপ কি সম্ভব?

অহীন ও বরুণের মুগ্ধদৃষ্টি কিন্তু চোখ এড়ায় না দেবদাসীর। ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলে সে জিজ্ঞেস করে—"আমার সঙ্গে আপনাদের কী প্রয়োজন?"

একটু নড়েচড়ে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে অহীন জবাব দেয়—"চিরঞ্জীব রায়ের হত্যার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এসেছি আপনার কাছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে দেবদাসী—"সেকি! ঐ সম্পর্কে পুলিসকে তো আমি সবকিছু বলেছি। আবার কেন আপনারা এসেছেন সেই একই কথা জিজ্ঞেস করতে? আপনারা কি এখানকার থানার লোক?

জবাব দেয় অহীন—"না, থানার লোক নই আমরা। আমি হচ্ছি কলকাতার একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। চিরঞ্জীব রায়ের হত্যার ব্যাপারে আমিও কিছু কিছু খোঁজখবর করছি। ঐ সম্পর্কেই গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে—"

একটা সুস্পষ্ট বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে দেবদাসীর মুখে। তারপর সে বলে—"ঐ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবুও আপনারা বার বার বিরক্ত করছেন আমাকে। বেশ তো, আমি যদি আর আপনাদের প্রশ্নের জবাব না দিই, তবে কী করতে পারেন আপনারা?"

অহীন তাকিয়ে দেখে সেই মহীন্দর ছোকরাটা দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন একটা হিংস্র দৃষ্টি তার মুখে। যেন দেবদাসীর একটা আদেশের প্রতীক্ষায় সে স্তব্ধ হয়ে আছে। আদেশ পেলেই ঐ আগন্তুক দুটোকে জোর করে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু অসুবিধে হবে না তার। দেবদাসীর প্রশ্নে মনে মনে একটু হাসে অহীন। তাকিয়ে দেখে বরুণ একদৃষ্টে মহীন্দরকে দেখছে।

মনের ভাব গোপন করে জবাব দেয় অহীন—"আমাদের প্রশ্নের জবাব না দিলে আমরা আর কী করতে পারি! তবে সেক্ষেত্রে আমাদের মনে ধারণা জন্মাবে যে এই ব্যাপারে আপনি ও আপনার ঐ মহীন্দর জড়িত আছেন।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে দেবদাসী বলে—"বেশ, কী প্রশ্ন করতে চান, করুন।"

অহীন কিছু বলার আগেই বরুণ জিজ্ঞেস করে দেবদাসীকে—"আচ্ছা, ঐ ছোকরা আপনার কে হয়?"

মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে দেবদাসীর। জবাব দেয় সে—"আপনার এই প্রশ্নের সঙ্গে চিরঞ্জীব রায়ের হত্যার ব্যাপারের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না আমি।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অহীন—"বেশ, বেশ। ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু সেদিন রাতের ঘটনাটা আবার একটু খুলে বলুন।"

একটু থেমে জবাব দেয়, দেবদাসী—"সেদিনের ঘটনা আমি জানি না। কেবল, সেদিন শেষ রাতে সেন সাহেব আমার বাড়িতে এসে সুদর্শনবাবু সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেন। আমি তাঁকে জবাব দিই যে, আমি কিছু জানি না। তারপর তিনি চলে যান। ব্যস, এই পর্যন্ত। এছাড়া আর কিছু জানা নেই আমার।"

—"আপনাদের সেন সাহেব, মানে ধূর্জটিপ্রসাদ সেন যখন আপনার বাড়ি এসেছিলেন, তখন আপনার বাড়িতে কি কোন বাইরের লোক ছিল?"

—"না, অত রাতে কোন বাইরের লোককে ঘরে রাখি না আমি।"

—"কেবল ঘরের লোক ছিল, তাই না?"প্রশ্ন করে বরুণ।

— রাগত কণ্ঠে জবাব দেয় দেবদাসী—"মানে? আপনি কী বলতে চান?"

অহীনই এবার রক্ষা করে বরুণকে। বলে—"না, না, আমার বন্ধু কোন কিছু ভেবে একথা বলেনি। বলেছে যে তখন ঐ ছোকরা মহীন্দর আপনার ঘরে ছিল।"

একটু শান্ত হয় দেবদাসী। বলে—"না, মহীন্দর তার নিজের ঘরেই ছিল। আমার ঘরে কেউ ছিল না তখন।"

তির্যক দৃষ্টিতে দেবদাসীর দিকে তাকিয়ে অহীন বলে—"এবার কিন্তু আপনি সত্যি কথা বললেন না। ধূর্জটি সেনই আমাকে বলেছেন যে তখন ঐ মহীন্দর আপনার ঘরেই ছিল।"

কেমন যেন একটু হকচকিয়ে যায় দেবদাসী। আমতা আমতা করে বলে—"না.....হ্যাঁ..... ছিল। একবার এসেছিল..... মহীন্দর।"

—"সেদিন রাতে আর কেউ আপনার কাছে আসেনি?"

—"না, আসেনি।"

—"সত্যি বলছেন?"

—"হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে অহীন। মনে মনে ভাবে, আন্দাজে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবে নাকি? তাতে ফল লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা!

শেষে বলেই ফেলে অহীন—"চিরঞ্জীব কিংবা সঞ্জীব কেউই সেদিন আপনার কাছে আসেনি, এই কথাই বলতে চান আপনি?"

একটু চমকে ওঠে দেবদাসী। তার এই চমকে ওঠার ব্যাপারটা নজর এড়ায় না অহীনের। মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করে—আন্দাজে ছুঁড়ে দিলেও ঢিলটা গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে।

দেবদাসীকে চুপ করে থাকতে দেখে অহীন আবার বলে—"চুপ করে রইলেন কেন? জবাব দিন।"

রেগে গিয়ে জবাব দেয় দেবদাসী—"আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেব না আমি।"

অহীনও গম্ভীরকণ্ঠে বলে—"তা আপনার ইচ্ছা। তবে এতক্ষণে এটা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে যে চিরঞ্জীবের আসল হত্যাকারী কে।"

—"কেন, সুদর্শন দত্ত।"

গর্জে ওঠে অহীন এবার—"না, মোটেই না, আসল হত্যাকারী হচ্ছে মহীন্দর। আপনার ঐ মহীন্দর।"

—"মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, মহীন্দর খুনী নয়।"— প্রায় চিৎকার করে ওঠে দেবদাসী।

অহীনও চেঁচিয়ে জবাব দেয়—

—"মহীন্দরই হত্যাকারী।"

উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে দেবদাসী। বলে—"আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে মহীন্দরই হত্যাকারী?"

—"নিশ্চয়।"

—"না, আপনি পারবেন না।"

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় অহীন —"বেশ, দেখা যাক্, পারি কিনা। গ্রেফতারের পর মাসখানেক পুলিস হাজতে থাকলে নিজমুখেই সবকিছু স্বীকার করবে মহীন্দর।"

—"বলেন কি! এক মাস আপনি ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন?"

—"শুধু এক মাস কেন, বিচারে ওর ফাঁসি হয়ে যাবে নিশ্চয়।"

রাগে, দুঃখে থরথর করে কাঁপতে থাকে দেবদাসী। কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারে না সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটে যায় ঘরের মধ্যে। অহীন ও দেবদাসী কিছু বুঝতে পারার আগেই বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহীন্দরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বরুণ। মহীন্দরকে মেঝেয় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ডানহাতের কবজিটা সজোরে চেপে ধরে সে। মহীন্দরের হাতে একখানা চকচকে তীক্ষ্ণধার ছোরা।

ততক্ষণে অহীন ও দেবদাসী দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। বরুণের সবল বাহুর নিষ্পেষণে মহীন্দরের হাত থেকে খসে পড়ে ছোরাটা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মহীন্দরের হাতদুটো পেছনের দিকে শক্ত করে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

জবা ফুলের মত লাল চোখ দিয়ে বরুণের দিকে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে হাঁপাতে থাকে মহীন্দর।

এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে দেবদাসী। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে সে—"ওকে ছেড়ে দিন—ওকে ছেড়ে দিন। ওকে জেলে পুরলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না। আপনি বিশ্বাস করুন, মহীন্দর খুনী নয়। চিরঞ্জীব রায়কে ও হত্যা করেনি।"

মনে মনে একটু হাসে অহীন। তারপরে বলে—"মহীন্দরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি আমি। কিন্তু তার আগে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হবে আপনাকে।"

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে দেবদাসী। তারপর বলতে আরম্ভ করে—"সেদিন রাতে আমার ঘরে ছিল সঞ্জীব। দুপুররাতে বাইরে একটা লোক ডাকাডাকি করতে থাকে। আমি তখন শুয়ে ছিলাম। সঞ্জীব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। তারপরই শুনতে পাই সঞ্জীব

সেই লোকটির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। বাইরে এসে বুঝতে পারি ঐ লোকটিই হচ্ছে সঞ্জীবের দাদা, চিরঞ্জীব রায়। সুদর্শন দত্তকে খুঁজতে এসে তার বাড়ি বন্ধ দেখে এসেছিল আমার কাছে তার খোঁজ করতে।"

দেবদাসী থামতেই অহীন প্রশ্ন করে—"কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল দুই ভাইতে?"

জবাব দেয় দেবদাসী—"সঞ্জীবের চরিত্র সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনলেও তার দাদা নাকি তখন বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সেদিন রাতে সঞ্জীবকে আমার ঘরে দেখতে পেয়ে রেগে দিয়ে গালাগাল দিচ্ছিলো তার দাদা। চিরঞ্জীব এমন কথাও বলেছিল যে সঞ্জীব যদি তার স্বভাব না বদলায়, তবে চা-বাগানের কর্তৃত্ব হাতে আসার পর চিরঞ্জীব এই ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করবে।"

—"সঞ্জীব কিছু বলেননি?"— প্রশ্ন করে অহীন।

—"হ্যাঁ, সঞ্জীবও বলেছিল, তার যা খুশি সে তাই করবে। তাকে যেন উপদেশ দিতে কেউ না আসে। চা-বাগানের কর্তৃত্ব হাতে আসার পর চিরঞ্জীব যদি তার স্বার্থবিরুদ্ধ কিছু করে, তবে তার পরিণাম মোটেই ভাল হবে না।"

—"তারপর?"

—"তারপর চিরঞ্জীব এখান থেকে চলে যায়। একটু পরেই সঞ্জীবও অনুসরণ করে তার দাদাকে।"

—"তারপর, আর কিছু শুনতে পেয়েছিলেন আপনি? এই ঘটনার সময় মহীন্দর কি এখানেই ছিল?"

—"মহীন্দর তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল তখন। একটু পরে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দূরে একটা গুলির আওয়াজ শুনেছিলাম আমি।"

একটু থেমে দেবদাসী আবার বলে—"বিশ্বাস করুন আপনি, এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না। মহীন্দর সত্যিই খুনী নয়।"

।। ১০।।

উঁচুনিচু টিলার নিচের দিকের সাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটার মালিক হচ্ছে সঞ্জীব রায়।

অহীন ও বরুণকে সাদর অভ্যর্থনা করে সঞ্জীব।

সঞ্জীবের দেওয়া একটা দামী সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অহীন বলে—"পুলিসের কাছে আপনি মিথ্যে বলেছিলেন, সঞ্জীববাবু।"

—"মিথ্যে? বলেন কি?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর সঞ্জীবের।

—"হ্যাঁ, মিথ্যে বলেছিলেন আপনি। ভেবেছিলেন সেদিন রাতে দেবদাসীর বাড়িতে আপনার সঙ্গে আপনার দাদার কথা কাটাকাটির ব্যাপারটা আর কেউ জানতে পারবে না।"

—"এ সব কথা কে বললে আপনাকে?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কে একথা বলতে পারে আমাকে।"

—"দেবদাসী নিজের মুখে একথা বললে আপনাকে?"

—"হ্যাঁ বলেছে। তবে নিজের মুখে বললেও নিজের ইচ্ছেয় বলেনি। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে তাকে।"

জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে সঞ্জীব। তারপর একসময় একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—"তাহলে আমাকেই আমার দাদার হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছেন, মিঃ সোম?"

অহীন জবাব দেয়—"ধরে আমি কিছুই নিইনি, সঞ্জীববাবু। আমি কেবল জানতে এসেছি সেদিন রাতে আপনার দাদার পিছু পিছু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

একটু সময় চুপ করে থেকে সঞ্জীব জবাব দেয়—"আমার কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন, মিঃ সোম?"

—"নিশ্চয়! বলুন আপনি সেদিন কোথায় গিয়েছিলেন।"

—"বেশ বলছি।"—বলে সঞ্জীব একটু থামে। তারপর আবার বলতে থাকে—"দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। দেবদাসীর ঘর আর ভালো লাগলো না আমার। তাই আমিও বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।"

—"আপনার দাদাকে আর দেখতে পাননি আপনি?"

—"না। দাদা চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পর বেরিয়েছিলাম আমি। তাই আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি আমার।"

—"আপনি কি আপনার দাদাকে অনুসরণ করেননি?"

—"না। আমার গাড়িটা রিপেয়ার করতে দিয়েছিলাম বলে হেঁটেই চলছিলাম আমি। উদ্দেশ্য ছিল, বড়রাস্তায় কোন রিক্সাটিক্সা হয়তো পেয়ে যেতে পারি।"

—"তারপর?"—প্রশ্ন করে অহীন।

একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অহীনের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় সঞ্জীব—"বড়রাস্তায় সবে পা দিয়েছি, হঠাৎ একটু দূরে ঝোপের আড়ালে একটা গুলির শব্দ শুনলাম। কি মনে হলো, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের দিকে দৌড়ে গেলাম আমি। সেখানে পৌঁছে দেখি, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মাটির ওপর পড়ে আছে আমার দাদার নিশ্চল দেহ। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখদুটো খোলা। দেখেই বুঝতে পারলাম গুলির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে তার।"—সঞ্জীবের কথাগুলো শেষের দিকে ভারী হয়ে আসে।

কেউ কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সঞ্জীব আবার বলতে থাকে—"এই অবস্থায় কী করবো বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম, আমি অসচ্চরিত্র ব্যক্তি। তাছাড়া একটু আগেই একজন গণিকার ঘরে দাদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। তাই, আমাকে যদি কেউ এখানে দেখে ফেলে, তাহলে হয়তো খুনী বলে আমাকেই সন্দেহ করবে। আর দেরি না করে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ি পৌঁছলাম আমি। তারপরেই টেলিফোনে খবর দিই ধূর্জটি সেনকে।"

—"ধূর্জটি তখন বাড়িতেই ছিল?"

—"হ্যাঁ, ছিল। দাদার সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারটা গোপন রাখতে সেই উপদেশ দিয়েছিল আমাকে।"

সঞ্জীবের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে থাকে দুই বন্ধু। চলতে চলতে অহীন বরুণকে বলে—"কথাবার্তাগুলো ঠিকমতো নোট করে নিচ্ছ তো?"

জবাব দেয় বরুণ—"নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি। সবই ঠিকমতো টুকে নিয়েছি। কিন্তু এখন চললে কোথায়?"

—"চা-বাগানের ম্যানেজার ধূর্জটিপ্রসাদ সেনের বাড়ি।"

—"ধূর্জটি সেনের বাড়ি গিয়ে কি কোন কাজ হবে? যে ঘুঘুলোক এই ধূর্জটিপ্রসাদ, তাতে' তো মনে হয়না কোন কিছু তার কাছ থেকে বের করতে পারবে।"

বরুণের কথায় কোনরকম মন্তব্য না করে পথ চলতে থাকে অহীন।

একসময় অহীন বলে—"এই হত্যারহস্য সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, বরুণ?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বরুণ—"সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন পর্যন্ত কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। যতই দিন যাচ্ছে ব্যাপারটা ততই জটিল হয়ে উঠছে আমার কাছে। তোমার কী মনে হয়, অহীন?"

মৃদু হেসে অহীন জবাব দেয়—"এতদিনে রহস্যটা যেন একটু একটু করে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে।"

—"বলছো কী অহীন? ব্যাপারটা যখন জটিল হয়ে উঠছে আমার কাছে, তখনই সেটা সরল হতে আরম্ভ করেছে তোমার কাছে!"

—"ঠিক তাই। একটু ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করো, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কী কী কথা বলছে এবং কেনই বা বলেছে সেগুলো একটু ভাবতে চেষ্টা করো, দেখবে তোমার কাছেও রহস্যটা সরল হয়ে উঠতে থাকবে।"

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে হাজির হয় ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ি 'সেন ভিলা'র সামনে।

গেটের সামনে একটি দারোয়ান শ্রেণীর লোক বসে ছিল।

অহীন পকেট থেকে তার নামাঙ্কিত একখানা সুদৃশ্য কার্ড বের করে লোকটির হাতে দিতেই সে দ্রুতপদে কার্ডটা নিয়ে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই সে ফিরে এসে পথ দেখিয়ে দুজনকে নিয়ে যায় বাড়ির ভেতর।

ড্রইং-রুমে একখানা চেয়ারে বসে ছিল ধূর্জটিপ্রসাদ।

অহীন ও বরুণ দুখানা চেয়ার অধিকার করে বসতেই একটু হেসে ধূর্জটিপ্রসাদ বলে—'একটা সুখবর দিচ্ছি আপনাদের, মিঃ সোম। চা-বাগানের কুলীদের স্ট্রাইক ভেঙে গেছে। আজ সকালেই অধিকাংশ শ্রমিক কাজে যোগদান করেছে। আগামীকাল থেকে পুরোদমে ফ্যাক্টরী চালু হবে।"

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অহীন ও বরুণ।

তাদের নীরবতা কথা বলতে উৎসাহিত করে ধূর্জটিপ্রসাদকে। সে আবার বলে—"তা আসল খুনীকে কি ধরতে পেরেছেন, মিঃ সোম?"

অহীন বুঝতে পারে ধূর্জটি সেনের প্রশ্নে সামান্য একটু ব্যঙ্গের খোঁচা রয়েছে, তাই সেও পরিহাস-তরল কণ্ঠে জবাব দেয় —"আপনারা সকলেই যখন সত্য কথা গোপন রেখে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছেন, তখন আসল খুনী ধরা পড়বে কী করে?"

—"বলছেন কী আপনি, মিঃ সোম! আমি আবার কখন সত্য গোপন করলাম?"

একটু রহস্যময় হাসি ভেসে ওঠে অহীনের ওষ্ঠপ্রান্তে। জবাব দেয় সে—"ভেবে দেখুন, মিঃ সেন, সেদিন রাতে ঊর্মিলা দেবীর টেলিফোন করার ব্যাপারে আপনি মিথ্যে বলেছেন কিনা। যাক্ সে কথা পরে হবে। তার আগে আর গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।"

—"বেশ করুন।"

—"আপনি কি জানেন যে মৃত্যুর আগে সুদর্শন দত্তর সঙ্গে ধর্মঘটের ব্যাপারে চিরঞ্জীব রায় একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলেন?"

—"না না। হতেই পারে না। যদি ওরকম কোন এগ্রিমেন্টের অস্তিত্ব থাকে, তো বুঝতে হবে সেটা জাল।"

—"তবে শুনে রাখুন মিঃ সেন, চিরঞ্জীব রায় সত্যিই একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলেন। ঐ এগ্রিমেণ্টে তিনি শ্রমিকদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল চিরঞ্জীবের বয়স তিরিশ পূর্ণ হলে সে যখন চা-বাগানের কর্তৃত্ব হাতে পাবে তখনই ঐ এগ্রিমেণ্টটা চালু হবে। ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্যে আপনি ও আপনাদের টি. জি. এ.র চেয়ারম্যান মিঃ আগরওয়ালা চেষ্টা করেছিলেন বলেই হয়তো চিরঞ্জীববাবু ঐ বিষয়ে আপনাদের কিছু বলেননি।"

—"কোথায় সেই এগ্রিমেন্ট?" প্রশ্ন করে ধূর্জটি সেন—"ঐ এগ্রিমেন্টের কথা কি চিরঞ্জীববাবু আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন?"

—"না।"— জবাব দেয় অহীন।

একটু সময় চিন্তা করে ধূর্জটি সেন আবার প্রশ্ন করে—"চিরঞ্জীববাবুকে হত্যার ভয় দেখিয়ে যে বেনামী চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল সেগুলো কি তিনি আপনাকে পাঠিয়েছিলেন, মিঃ সোম?"

দ্রুত চিন্তা করতে থাকে অহীন। বুঝতে পারে এবার শেয়ানে শেয়ানে আরম্ভ হয়েছে কথার লড়াই।

জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ। আপনি দেখেননি সেই চিঠিগুলো?"

—"না। সেগুলো একবার দেখাবেন আমাকে?"

—"এখন তা সম্ভব নয়। অহীন বলে।"

ধূর্জটিপ্রসাদ আর প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে। এবার অহীন বলে—"আপনার সঙ্গে ঊর্মিলা দেবীর সম্পর্কটা কী রকম, বলবেন কী?"

এমনধারা প্রশ্নের জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না ধূর্জটি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে জবাব দেয়—"হোয়াট ডু ইউ মীন?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"আপনাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কোন একটা সম্পর্ক ছিল কি না, তাই জানতে চাইছি।"

—"বিশেষ সম্পর্ক আবার কী রকম? আমি তার সঙ্গে মিশতাম, বন্ধুর মতোই মিশতাম।"

—"বেশ, ভালো কথা।"

অহীন থামতেই ধূর্জটিপ্রসাদ প্রশ্ন করে —"এসব কথা কি চিরঞ্জীব রায় আপনাকে জানিয়েছিলেন?"

একমুহূর্ত দ্বিধা না করে জবাব দেয় অহীন—"না, বেনামী চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল এসব কথা।"—বলেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধূর্জটিপ্রসাদের মুখভাব লক্ষ্য করতে থাকে অহীন।

একটা অবিশ্বাসের ভাব জেগে ওঠে ধূর্জটি সেনের মুখে। প্রায় গর্জে ওঠে সে—" মিথ্যে কথা! আপনি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন। এসব কথা সেই বেনামী চিঠিগুলোয় থাকতেই পারে না।"

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অহীনের মুখ। মৃদু হেসে বলে সে—"সেই বেনামী চিঠিতে যে ঐ কথা নেই তা আপনি জানলেন কি করে?"

কথার প্যাঁচে আটকা পড়ে যায় ধূর্জটি সেন। একটা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে কিছু বলতে যেতেই অহীন তাকে থামিতে দিয়ে আবার বলে—"জবাব দিতে যখন আপনার অসুবিধা হচ্ছে তখন আপনার হয়ে আমিই জবাব দিই—আপনি চিঠিগুলো দেখেছেন, কারণ ঐগুলো আপনারই লেখা। তাই না, মিঃ সেন?"

ধূর্জটিপ্রসাদকে চুপ করে থাকতে দেখে অহীন আবার প্রশ্ন করে—"ঐ বেনামী চিঠি লিখে চিরঞ্জীব রায়কে হত্যার ভয় দেখানোর কারণটা দয়া করে বলবেন কি, মিঃ সেন?"

গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয় ধূর্জটিপ্রসাদ—"ঐ ব্যাপারে আমি আপনার আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী নই।"

—"বেশ, ভালো কথা। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণটা আমার অজানা থাকবে না।"—একমুহূর্ত চিন্তা না করে অহীন আবার বলে—"চিরঞ্জীব রায়ের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছেন আপনি। কারণ চা-বাগানের ওপর কর্তৃত্বের মেয়াদ আরও কিছুকাল বেড়ে গেল আপনার। তাই না, মিঃ সেন?"

মুখে কোন জবাব না দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ধূর্জটিপ্রসাদ তাকিয়ে থাকে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির দিকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন ও বরুণ।

।। ১১ ।।

হোটেলের সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল ভদ্রলোকটির সঙ্গে।

বেঁটে ফরসা চেহারা। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স। অহীনের মুখের দিতে তাকিয়ে পাকা ভ্রূজোড়া কুঁচকে ভদ্রলোকটি বললেন —"আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

জবাব দেয় অহীন—"আমিও ঠিক মনে করতে পারছি না। বোধহয় কলকাতায় দেখে থাকবেন।"

—"ঠিক ঠিক, কলকাতায় দেখেছি আপনাকে।"

—"আপনি বুঝি কলকাতায় থাকেন?"— প্রশ্ন করে অহীন।

—"হ্যাঁ, কর্মক্ষেত্র কলকাতা, তাই সেখানেই থাকতে হয়। আসলে আমার দেশ এই উত্তরবঙ্গে।"

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকটি অহীনকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন।

অহীন জিজ্ঞেস করে—"আপনি কোন্ কোর্টে প্র্যাকটিস করেন?"

বিস্মিত ভদ্রলোক অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর জবাব দেন—"আমার নাম টি. কে. নন্দী। আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি। কিন্তু আপনি আমার পেশার বিষয় জানলেন কী করে?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"আপনার গায়ের ঐ কলারছাড়া ফুলশার্ট দেখে। আপনার জামার গলার ঠিক পেছনদিকে একটা বোতামঘর রয়েছে. তার অর্থই হলো, আপনি জামার ফলস্ কলার ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে উকিল ব্যারিস্টার ছাড়া সাধারণতঃ কেউ ফলস্ কলার ব্যবহার করে না।"

মুগ্ধবিস্ময়ে মিঃ নন্দী বলে ওঠেন—"আপনার পাওয়ার অব অবজারভেশানের তারিফ না করে পারা যায় না, সত্যিই চমৎকার।"

অহীন প্রশ্ন করে—"আপনি এখানে ক'দিন থাকবেন?

—"ক'দিন থাকতে হবে তা এখনও সঠিক বলতে পারি না। আমার একজন মক্কেলের চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছি এখানে। অনেকদিনের মক্কেল। মার্ডার চার্জে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে তাকে। মামলা আদালতে উঠলে তাকে ডিফেণ্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।"

—"কী নাম আপনার মক্কেলের?"

—"সুদর্শন দত্ত। লেবার লীডার। এই অঞ্চলে অনেকেই চেনে তাকে।"

অহীন কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে না।

তারপর দু'চারটা সাধারণ কথাবার্তার পর অহীন উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"আমি তাহলে এবার চলি। একটা বিশেষ কাজ আছে আমার।"

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভঙ্গিতে মিঃ নন্দী বলে ওঠেন —"ঠিক, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আমাকেও একবার এক্ষুণি বেরোতে হবে। আজকের মধ্যে জেলে আমার মক্কেলের সঙ্গে ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।"

নমস্কার বিনিময়ের পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে অহীন।

প্রায় আধঘন্টা কেটে যায় তারপর।

ব্যারিস্টার নন্দীর বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় অহীন ও বরুণ।

চারিদিকে একবার সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অহীন বরুণকে আড়াল করে দাঁড়াতেই পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে বরুণ দ্রুতহাতে দরজায় লাগানো তালার ওপর চাপ দেয়।

খুট্ করে একটা শব্দ হয়, খুলে যায় দরজার তালা।

অহীন ও বরুণ ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। ভেজিয়ে দেয় দরজাটা।

অহীন বরুণের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে—"তুমি দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি চটপট কাজ সেরে নিচ্ছি।"

দ্রুতহাতে অহীন পরীক্ষা করতে থাকে মিঃ নন্দীর জিনিসপত্র।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। কিন্তু যে বস্তুর সন্ধানে এত পরিশ্রম সেই জিনিসটা পাওয়া গেল না।

অবশেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অহীনের মুখ। চামড়ার ফোলিও ব্যাগের এক কোণে পাওয়া যায় কাগজটা। সেই সঙ্গে একখানা চিঠি।

কাগজ ও চিঠির ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেয় অহীন। তারপর, যে বস্তুটি যেখানে যেমনভাবে ছিল তেমনিভাবে ঠিক করে রেখে দরজার বাইরে এসে তালা বন্ধ করে নিজেদের ঘরে চলে আসে দুজনে।

লম্বা তিন শীট টাইপকরা কাগজ। নিচে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে চিরঞ্জীব রায়ের সই। পড়া শেষ হয়ে গেলে অহীন কাগজটা তুলে দেয় বরুণের হাতে। কাগজটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বরুণ প্রশ্ন করে —"এইটাই বুঝি সেই এগ্রিমেন্ট?"

জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ। এবং সুদর্শনের রক্ষাকবচও বটে।"

তারপর অহীন চিঠিখানা পড়তে থাকে। মিঃ নন্দীকে লেখা সুদর্শনের চিঠি। চিঠিতে সুদর্শন লিখেছে তার ভীষণ বিপদ। চিঠি পাওয়ামাত্র ঐ এগ্রিমেন্টটা নিয়ে তিনি যেন চলে আসেন।

চিঠি পড়া শেষ করে মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করে অহীন—"যাক, এতদিনে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা।"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বরুণও পড়ে ফেলে। তারপর একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে অহীনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—"এটা সাধারণ চিঠি। সুদর্শন বিপদে পড়ে মিঃ নন্দীকে সাহায্যের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। এই সাধারণ চিঠির মধ্যে এমন কী অসাধারণ জিনিস তুমি আবিষ্কার

করলে যাতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তোমার কাছে?"

মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে অহীন বলে—"চোখ কান খুলে সজাগ থাকতে হয় বরুণ, চিঠির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাওনি তুমি?"

চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালমতো দেখতে দেখতে জবাব দেয় বরুণ—"কই না তো। তেমন কিছুই তো চোখে পড়ছে না।"

—"দেখ দেখ, ভাল করে চিঠির তারিখটা পড়ে দেখ, বরুণ,।"

নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ অফিস।

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক এটা। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত ছোট-বড় শহরে এই ব্যাঙ্কের শাখা ছড়িয়ে আছে।

বিকেল পাঁচটা বাজতে আর মিনিট কয়েক বাকী। ব্যাঙ্কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অহীন এসে দাঁড়ায় ব্যাঙ্কের কাউন্টারের সামনে। কাউন্টারের ওপাশে একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে —"এজেন্টের ঘরটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

অহীনকে একবার ভালমতো দেখে নিয়ে জবাব দেয় কর্মচারীটি —"এখনই বন্ধ হয়ে যাবে ব্যাঙ্ক। এই সময় তো কোন ট্রানজ্যাকশান হবে না। আপনি বরঞ্চ কাল দশটায় আসবেন।"

জবাব দেয় অহীন—"আমি কোন ট্রানজ্যাকশানের জন্যে আসিনি। এজেন্টের সঙ্গে শুধু একবার দেখা করতে চাই।"

কর্মচারীটি আর কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এজেন্টের ঘরটা।

ঘরে ঢুকতেই প্রৌঢ় এজেন্ট ভদ্রলোক খাতা থেকে মুখ তুলে অহীনের দিকে তাকান। সেই দৃষ্টিতে বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ। যেন তিনি বলতে চাইছেন—এই অসময়ে আবার কেন মশাই?

অহীন কোন কথা না বলে সামনের চেয়ারে বসে পড়ে।

ভদ্রলোক এবার বিরক্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করেন—"কী চাই আপনার? ব্যাঙ্ক তো বন্ধ হয়ে গেছে।"

—"জানি।"—বলেই পকেট থেকে নিজের নামাঙ্কিত কার্ডটা বের করে ভদ্রলোকের সামনে এগিয়ে ধরে।

কার্ডটার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই কিন্তু বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ান ভদ্রলোক। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন —"কী আশ্চর্য, আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা অহীন সোম! আপনার অদ্ভুত অদ্ভুত কার্যকলাপের বিষয় খবরের কাগজে কত পড়েছি। আপনার মত ব্যক্তি............।"

এজেন্ট ভদ্রলোককে তাঁর কথার মাঝখানে না থামিয়ে দিলে তার উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়তে হয়তো অনেকটা দেরি হতো।

কণ্ঠস্বর নিচু করে অহীন বলে—"একটা খবরের জন্যে এসেছি আপনার কাছে।"

—"কী খবর, বলুন? আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো আমি।"

—"আচ্ছা দেখুন, সুদর্শন দত্ত নামে একটি লোকের অ্যাকাউন্ট আছে আপনাদের এখানে?"

—"সুদর্শন দত্ত? কোন্ সুদর্শন দত্ত? লেবার লীডার সুদর্শন দত্তর কথা বলছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় অহীন।

জবাব দেন এজেন্ট ভদ্রলোক—"হ্যাঁ, আছে। কেন বলুন তো?"

—"অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি আপনাদের এখানে কোন টাকা জমা দিয়েছেন কিনা, সেই খবরটা চাই আমার।"

এজেন্ট ভদ্রলোক নিজেই ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে চলে যান। তারপর একখানা মোটা খাতা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পাতা ওলটাতে থাকেন।

খানিকক্ষণ পর জবাব দেন তিনি—"হ্যাঁ, বিশ হাজার টাকার একখানা চেক দিয়েছেন তিনি।"

—"চেকের তারিখটা বলতে পারবেন?"

—"নিশ্চয়, এ মাসের সাত তারিখে ইসু হয়েছে চেকটা।"

—"কে ইসু করেছে চেকটা, বলবেন কি?"

এজেন্ট ভদ্রলোক নামটা বলতেই মনটা নেচে ওঠে অহীনের। কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশ পায় না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অহীন ধন্যবাদ দেয় সেই ভদ্রলোককে। নিজেই যেন কৃতার্থ হয়েছেন এমনি ভঙ্গিতে জবাব দেন সেই এজেন্ট ভদ্রলোক—"এর জন্যে আর ধন্যবাদ কেন? আপনার মতো ব্যক্তির এই সামান্য একটু কাজে লাগতে পেরেছি, এটাই কি কম ভাগ্যের কথা?"

ব্যাঙ্ক ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে অহীন।

।। ১২।।

ঊর্মিলার বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনের খোলা বারান্দায় বসেছিল চায়ের আসর। আসরের উদ্যোক্তা ঊর্মিলা হলেও পরামর্শদাতা ছিল গোয়েন্দা অহীন। সকলেই উপস্থিত আসরে। লম্বা টেবিলের একদিকে ঊর্মিলা ছাড়া আর ছিল সঞ্জীব, ধূর্জটি সেন, রাজাগোপাল আগরওয়ালা। টেবিলের অন্যপাশে অহীন ও বরুণ ছাড়া আর ছিল বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত সুন্দরী দেবদাসী ও মহীন্দর। অহীনের ঠিক পাশেই বসে ছিল থানার অফিসার ইনচার্জ অরবিন্দ ভট্টাচার্য তার ধড়াচূড়া সমেত।

গল্পগুজবের মধ্যে চা-পান পর্ব শেষ হলে অরবিন্দই প্রথমে বলে—"আজ এই সময় আমাদের একত্রিত করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে ঊর্মিলা দেবীর।"

মৃদু হেসে জবাব দেয় ঊর্মিলা—"হ্যাঁ, তা আছে। তবে উদ্দেশ্যটি ঠিক আমার নয়। অহীনবাবুর অনুরোধেই আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে।"

উপস্থিত সকলেই অহীনের দিকে তাকায়।

গোয়েন্দা অহীন সোম তার স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে বলতে থাকে—"চিরঞ্জীব রায়ের হত্যারহস্য এতদিনে উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছি আমি। তাই আপনাদের সকলের সামনে ঘটনাটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্যেই আপনাদের একত্রিত করেছি।"

একটু থেমে অহীন পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে একবার করে তাকায়। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে—"এই হত্যারহস্যকে জটিল করে তোলবার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে আপনারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর দায়ী। আপনাদের মিথ্যে ভাষণ, বিশেষ করে, অরবিন্দবাবুর কাছে আপনাদের অর্ধসত্য জবানবন্দিই হচ্ছে এই জটিলতার

মূল। বিভিন্ন কারণে আপনারা প্রায় সকলেই কিছু-না কিছু মিথ্যে কথা বলেছেন অরবিন্দবাবুর কাছে।"

অহীন তাকিয়ে দেখে সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার কথা। সে আবার বলতে থাকে—"এই ধরুন, ঊর্মিলা দেবীর কথা — তিনি বলেছেন যে সেদিন রাতে চিরঞ্জীবাবু চলে যাওয়ার পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে শেষরাতে তিনি টেলিফোন করেন ধূর্জটিবাবুকে। কিন্তু পরে ঐ ঊর্মিলা দেবীই স্বীকার করেছেন যে আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। ধূর্জটিবাবুর পরামর্শ মত মিথ্যে কথা বলেছিলেন তিনি । চিরঞ্জীববাবু চলে যাওয়ার পর তিনি মোটেই চিন্তিত হননি। কারণ তিনি জানতেন চিরঞ্জীববাবু সুদর্শন দত্তর সঙ্গে শ্রমিকদের দাবিমতো একটা এগ্রিমেন্টে পৌঁছেছিলেন এবং একটা লিখিত এগ্রিমেন্টও তৈরি করেছিলেন তিনি। কাজেই চিরঞ্জীববাবু সম্বন্ধে ঊর্মিলা দেবীর কোন দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। তিনি শেষ রাতে ধূর্জটিবাবুকেও টেলিফোন করেননি।"

"তারপর ধরুন সঞ্জীববাবুর কথা—তিনি জবানবন্দিতে বলেছেন যে তিনি নাকি কিছুই জানেন না। কিন্তু তিনি পরে অনেক কথাই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে সেইদিন রাতে তিনি দেবদাসীর বাড়িতে ছিলেন। মধ্যরাত নাগাদ তাঁর দাদা অর্থাৎ চিরঞ্জীববাবু সুদর্শন দত্তকে খুঁজতে এসে তাঁকে দেখে ফেলেন দেবদাসীর বাড়িতে। দুই ভাইতে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে চিরঞ্জীববাবু চলে যান।

একটু পরে সঞ্জীববাবুও অনুসরণ করেন তাঁকে। কিন্তু সঞ্জীববাবুর সঙ্গে তাঁর দাদার আর দেখা হয়নি। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে ঝোপের আড়ালে গিয়ে তিনি তাঁর দাদার মৃতদেহ দেখতে পান। পাছে তাঁর ওপর সন্দেহ হয় এই ভয়ে তিনি সোজা নিজের বাড়িতে চলে গিয়ে টেলিফোন করেন ধূর্জটিবাবুকে।"

একটু থেমে দম নেয় অহীন। তারপর আবার বলতে শুরু করে —"তারপর আসে দেবদাসীর স্টেটমেন্ট। তিনিও মিথ্যে বলেছেন। পুলিসের কাছে সঞ্জীব ও চিরঞ্জীবের ব্যাপারটা একেবারে চেপে গিয়েছেন তিনি। সম্ভবতঃ সঞ্জীবের ওপর দুর্বলতাবশতঃ তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ মিথ্যা বলেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তিনি আমার কাছে সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

এই সময় দেবদাসী বলে ওঠে—"তাহলে মহীন্দর যে প্রকৃত খুনী নয়, একথা বিশ্বাস করেন আপনি?"

—"নিশ্চয়।"— জবাব দেয় অহীন—"আপনার কাছ থেকে সত্য কথা আদায় করবার জন্যেই সেদিন মহীন্দরকে সন্দেহ করবার কথা বলে আপনাকে একটু ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম।"

দেবদাসী চুপ করে। বলতে থাকে অহীন—"সবশেষে ধূর্জটিবাবুর জবানবন্দি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি। যা কিছু তিনি করেছেন, ভেবেচিন্তেই করেছেন। সুদর্শন দত্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর ও আগরওয়ালা সাহেবের। সুদর্শন দত্ত 'এলিবাই' নিয়েছিল যে ঐদিন রাতে সে তাদের ইউনিয়ন অফিসে ছাতিম মুর্মু, আনন্দ ঝা ও গগন বর্মনের সঙ্গে কাজ করেছিল। পাছে তারা সুদর্শনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে মামলা হালকা করে দেয়, সেই ভয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে ধূর্জটিবাবু তাদের এই শহর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।"

একটু থামে অহীন। তাকিয়ে দেখে ধূর্জটিপ্রসাদ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আবার বলতে আরম্ভ করে অহীন—"ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে চিরঞ্জীববাবুর সহানুভূতির কথা অজানা ছিল না ধূর্জটিবাবুর। তিনি আরও জানতেন অত্যন্ত জেদী লোক চিরঞ্জীব রায়। যুক্তি দিয়ে তাঁকে নিজের মতে আনতে সমর্থ না হয়ে একটা উপায় বের করলেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর জীবননাশের হুমকি দিয়ে একটার পর একটা বেনামী চিঠি লিখতে লাগলেন চিরঞ্জীববাবুকে। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন চিঠিগুলো পেয়ে চিরঞ্জীব রায় ধারণা করবেন যে ধর্মঘটী শ্রমিকেরাই তাঁকে হত্যার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে। তাতে হয়তো শ্রমিকেরা তাঁর সহানুভূতি হারাবে। এই আশাতেই বেনামী চিঠিগুলো লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না তাঁর। সকলের অজ্ঞাতে চিরঞ্জীব রায় একটা এগ্রিমেন্ট করে ফেললেন সুদর্শন দত্তর সঙ্গে।"

একটু থেমে অহীন ধূর্জটিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে—"কি ধূর্জটিবাবু, আশা করি আপনার সেই বেনামী চিঠিগুলো লেখার কারণ খুঁজে বের করতে পেরেছি, তাই না?"

ধূর্জটিপ্রসাদ অহীনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে—"সেই চিঠিগুলো কি সত্যিই আপনার কাছে আছে?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অহীন—"মোটেই না। চিরঞ্জীববাবু চিঠিগুলো আমার কাছে পাঠাননি। চিঠিগুলো যে আপনারই লেখা সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম সেদিন।"

ধূর্জটিপ্রসাদ আর কোন প্রশ্ন করে না। অহীন আবার বলতে শুরু করে—"চিরঞ্জীব রায় নিহত হওয়ায় সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন ধূর্জটিবাবু। চা-বাগানের ওপর কর্তৃত্ব করবার মেয়াদ বেড়ে গিয়েছে তাঁর। আর এই বিষয়ে নিজেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই সঞ্জীববাবুর কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে তিনি সোজা সেই ঝোপের আড়ালে গিয়ে চিরঞ্জীববাবুর মৃতদেহ দেখতে পান। তারপর তিনি চলে যান দেবদাসীর বাড়ি। বোধহয় তিনি ধারণা করছিলেন সঞ্জীবকে ঐ বাড়িতে পাওয়া যাবে। কারণ সঞ্জীববাবু যে প্রায়ই গভীর রাত পর্যন্ত দেবদাসীর বাড়ি থাকতেন সে খবর অজানা ছিল না তাঁর। শেষ রাতে ঊর্মিলা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে এলেন তিনি। কারণ তিনি যে চিরঞ্জীববাবুর মৃত্যুর খবর জেনেছেন এবং তাঁর মৃতদেহ দেখেও এসেছেন সে কথা প্রকাশ করতে রাজী ছিলেন না তিনি। মনে ভয়, পাছে কেউ তাঁকে সন্দেহ করে। ধূর্জটিবাবু অনুমান করেছিলেন, যে তিনি সেদিন শেষ রাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, এ কথা হয়তো তিনি পুলিসকে বলে দিতে পারেন। তাতে তাঁর ওপর সন্দেহ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আবার সঞ্জীববাবুর টেলিফোন পেয়েই যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সেকথা প্রকাশ করায়ও সঞ্জীববাবুর ঘোরতর আপত্তি। এই দুটো ঘটনার সামঞ্জস্যবিধান করতে গিয়েই তিনি ঊর্মিলা দেবীকে মিথ্যে বলতে প্ররোচিত করেছিলেন। ভেবেছিলেন তাতে সব দিক রক্ষা করা যাবে।"

অহীন থামতে পুলিস অফিসার অরবিন্দ বলে ওঠে—"একে একে সবাইকেই তো আপনি এলিমিনেট করে দিচ্ছেন। এখন কেবল বাকী আছে আগরওয়ালাসাহেব। আপনি কি বলতে চাইছেন, আগরওয়ালাসাহেবই আসল খুনী?"

অহীন তাকিয়ে দেখে চোখদুটো বিস্ফারিত করে আগরওয়ালা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"না, আগরওয়ালাসাহেব খুনী নন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নেই।"

—"তবে খুনী কে?"—একসঙ্গে প্রশ্ন করে পুলিস অফিসার অরবিন্দ ও ঊর্মিলা।

গম্ভীরমুখে জবাব দেয় অহীন—"সুদর্শন দত্ত।"

হঠাৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে পুলিস অফিসার অরবিন্দ। হাসির বেগ কমিয়ে সে বলে—"এ যে দেখছি পর্বতের মূষিক প্রসব! এত কাণ্ডকারখানার পর স্থির করলেন সুদর্শন দত্তই আসল খুনী? কিন্তু এই সন্দেহ তো আমরা প্রথম দিন থেকেই করে আসছি। আর সেই জন্যই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলাম আমরা।"

অহীন জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু সুদর্শন দত্তকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা ছিল না আপনাদের!"

—"কেন? সুদর্শন দত্তর শেষ ভরসা ছাতিম, আনন্দ ও গগন যখন তার 'এলিবাই' প্রমাণ করবার জন্যে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারতো না, তখন আর অসুবিধা কি ছিল?"

জবাব দেয় অহীন—"না, তা নয়। ঐ তিন ব্যক্তি সুদর্শন দত্তের শেষ ভরসা নয়। আর, এই জন্যই তাদের পালিয়ে যাবার খবরে এতটুকু বিচলিত হয়নি সে। তার শেষ ভরসা হচ্ছে এই।"—বলেই পকেট থেকে সেই এগ্রিমেণ্টের কাগজটা টেনে বের করে অহীন।

উৎসুক চোখে সকলেই তাকায় ঐ কাগজটার দিকে। অহীন আবার বলে—"চিরঞ্জীব রায় ও সুদর্শন দত্তর মধ্যে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, এই সেই এগ্রিমেন্ট। নিচে রায়ের সই রয়েছে। মামলার সময় এই এগ্রিমেণ্টটা আদালতে পেশ করে সে প্রমাণ করতো যে চিরঞ্জীব রায়কে হত্যা করার কোনো 'মোটিভ' ছিল না তার। ধর্মঘটের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে। শ্রমিকদের দাবি তিনি পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে হত্যা করায় কী লাভ তার? তাছাড়া হত্যাই যদি সে করবে তবে মৃতদেহের পাশে নিজের পিস্তলটা ফেলে আসবে কেন?"

অরবিন্দ আবার প্রশ্ন করে—"বেশ, তাই যদি হবে, তবে সুদর্শন দত্ত তাঁকে হত্যা করলো কেন? আর, সত্যিই তো, হত্যাকারী তার নিজের পিস্তলটা মৃতদেহের কাছে ফেলে আসবে কেন?"

স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"পিস্তলটা সেখানে ফেলে আসা সুদর্শন দত্তর একটা চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়। সে ইচ্ছে করেই ওটা সেখান ফেলে রেখেছিল যাতে সে ভবিষ্যতে বলতে পারে যে সমস্ত ব্যাপারটাই তার বিরুদ্ধে সাজানো। হত্যাকারী নিজের হাতিয়ার নিয়ে পালিয়ে না এসে সেটা মৃতদেহের পাশে ফেলে রেখে আসে না। হত্যার কারণের কথা বলছেন? সেই কারণটা আর কিছুই নয়—টাকা, স্রেফ টাকা।"

—"টাকা?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর অরবিন্দর।

—"হ্যাঁ টাকা। বিশ হাজার টাকা।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অহীন রাজাগোপাল আগরওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলে—"কি, আগরওয়ালাসাহেব? বলুন। টাকার কথা তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন।"

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে রাজাগোপাল আগরওয়ালা।

অহীন বলতে থাকে—"আমাদের দেশে এমন শ্রমিকদরদী লেবার লীডারের অভাব নেই যারা শ্রমিকের স্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজেদের স্বার্থের কাছে। পয়সার লোভে শ্রমিকদের পথে বসাতে একটুও ইতস্ততঃ করে না তারা। এই সুদর্শন দত্তও তেমনি একজন শ্রমিক নেতা। ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্যে টি. জি.এ-র চেয়ারম্যান আগরওয়ালাসাহেব বিশ হাজার টাকা ঘুস দেন তাকে। টাকাটা গ্রহণ করে মনে মনে এমন একটা ফন্দি আঁটে সুদর্শন দত্ত, যাতে

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। সে ভালোমতোই জানতো চিরঞ্জীবকে হত্যা করলে পুলিস তাকেই প্রথমে অ্যারেস্ট করবে। আর তাকে অ্যারেস্ট করার অর্থই হলো নেতার অবর্তমানে ধর্মঘট ভেঙে যাওয়া। এদিকে হত্যার চার্জ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় হিসেবে এই এগ্রিমেণ্টটা তো হাতেই রয়েছে। কাজেই শ্রমিকদরদী এই নেতার ওপর শ্রমিকদের সন্দেহ করার মতো কিছুই থাকবে না।"

উপস্থিত কারও মুখে আর কোন কথা নেই। সকলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি অহীনের দিকে।

এতক্ষণ পরে অহীনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বরুণ—"আচ্ছা অহীন, তুমি কি প্রথম থেকেই অনুমান করেছিলে যে সুদর্শন দত্তই প্রকৃত খুনী?"

জবাব দেয় অহীন—"না, তা অবশ্য নয়। জেলে সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করে বুঝতে পেরেছিলাম যে নিজেকে আইনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কোন প্রমাণ তার হাতে নিশ্চয়ই আছে। পরে, এই এগ্রিমেন্টের কথা শুনে অনুমান করেছিলাম যে ওটাই হয়তো তার সেই প্রমাণ। কিন্তু এগ্রিমেণ্টটা আছে কোথায়? ব্যারিস্টার মিঃ নন্দীকে দেখে আমার সন্দেহ হয় যে সম্ভবতঃ ওটা তাঁর কাছেই আছে। এগ্রিমেণ্টের খোঁজ করতে গিয়েই মিঃ নন্দীকে লেখা সুদর্শনের চিঠিটা হাতে পড়ে।"—বলেই পকেট থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা বের করে সে।

বরুণ বলে—"কিন্তু ঐ চিঠিতে তো সুদর্শন সাহায্য করবার জন্যে আসতে লিখেছিল মিঃ নন্দীকে। তাছাড়া অন্য কিছু তো নেই ওটায়।"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"আছে, মস্ত বড় একটা প্রমাণ লুকিয়ে আছে এই চিঠিতে। আর সেইজন্যেই তোমাকে সেদিন বার বার চিঠিটা ভালমতো দেখতে বলেছিলাম।"

অহীন একটু থামে, তারপর আবার বলতে থাকে—"চিরঞ্জীব রায় নিহত হয়েছেন এই মাসের দশ তারিখে। আর এই চিঠিটা সুদর্শন মিঃ নন্দীকে লিখেছে আট তারিখে। সেই সঙ্গে এগ্রিমেণ্টটাও পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে। এর অর্থই হলো সে একটা প্ল্যান করে কাজটা করেছে। তা না হলে, চিরঞ্জীব রায় নিহত হবেন, আর তাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে এবং এই এগ্রিমেণ্টের বলেই মিঃ নন্দী তাকে রক্ষা করবেন—এসব ব্যাপার পূর্বাহ্নেই অনুমান করে সে কী করে তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল? তাছাড়া আর একটা কথা— মিঃ আগরওয়ালা যে চেকটা সুদর্শনকে দিয়েছিলেন সেটা ইসু করা হয়েছিল এই মাসের সাত তারিখে। এখন দেখতে পাচ্ছ, ব্যাপারটা তাহলে কী হয়েছিল? সাত তারিখে চেকটা নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আট তারিখেই সে মিঃ নন্দীকে চিঠি লেখে, এবং দশ তারিখে হত্যা করে চিরঞ্জীবকে।"

কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন। তারপর বরুণের দিকে তাকিয়ে বলে—"আর দেরি নয়, এবার চলো হোটেলে ফেরা যাক। ওদিকে এতক্ষণে হয়তো মিঃ নন্দী একটা কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন সেখানে।"

———

জালিয়াতি

হরিহর চক্রবর্তীকে টাউট অর্থাৎ দালাল বললে তাঁকে অপমান করা হবে। দালাল তো নয়ই, এমনকি কোর্ট-কাছারির মুহুরীও নন তিনি। আবার উকিল-ব্যারিস্টার নিদেনপক্ষে মোক্তারও নন। তবে আইনের জ্ঞান, বিশেষকরে আইনের প্যাঁচে তিনি অনেক উকিল-ব্যারিস্টারকে অনায়াসেই ঘোল খাওয়াতে পারেন। আর এই জন্যেই আইন-আদালতে হালে পানি না পেয়ে অনেক মক্কেল এসে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে হরিহরের বাইরের ঘরে। তাদের সকলের আর্জি মাত্র একটিই—একটা কিছু উপায় করুন চক্রবর্তী মশাই। নইলে যে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাবো।

হরিহর তাঁর চকচকে টাকের ওপর একবার আলতো হাত বুলিয়ে নিয়ে হাতের সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে জবাব দেন, সেই এলেন আমার কাছে। তা, দু'দিন আগে এলে না হয় একটা উপায় বের করা যেত। এখন এই অবস্থায় আমি আর কী করতে পারি?

— না-না চক্রবর্তী মশাই, বলতে থাকে মক্কেল, ইচ্ছে করলে আপনি এখনও অনেক কিছু করতে পারেন। আমরা তো শুনেছি আপনার অসাধ্য কিছু নেই।

মক্কেলের কথায় হরিহরের মুখে ফুটে ওঠে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি। মক্কেলটি মিথ্যে বলেনি। বুদ্ধির জোরে অনেক অসাধ্যও সাধন করেছেন তিনি। আর সেসব কথা কোর্ট-কাছারি মহলে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

বাংলাভাষায় বুদ্ধিজীবী বলতে যা বোঝায়, হরিহর তা নন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি বাস্তবিকই বুদ্ধিজীবী। এই বুদ্ধির দৌলতেই অতি সাধারণ অবস্থা থেকে আজ তিনি পাড়ায় একজন কেউকেটা ব্যক্তি।

লোকে তাঁকে যতটা সমীহ করে তার চাইতে ভয় করে বেশি। বলে, হরিহর চক্রবর্তীর কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই ভাল। এই মানুষটিকে মোটেই বিশ্বাস নেই। কখন যে কাকে কোন প্যাঁচে ফেলে দেবে তা সেই প্যাঁচে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত লোকটি টের পাবেনা। যখন পাবে তখন বুঝতে পারবে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই প্যাঁচ থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বয়ং হরিহরেরই শরণাপন্ন হতে হবে তাকে।

হরিহরের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। গোফ-দাড়ি নিখুঁত কামানো। পরনে সর্বদাই পাটভাঙা ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী। পায়ে পাম্পসু। পয়সা-কড়ি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও হরিহর কেন যে এখনও একটা নিজস্ব বাড়ি করেন নি তা বাস্তবিকই গবেষণার বিষয়। কেউ জিজ্ঞেস করলে অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে জবাব দেন, কি দরকার নিজের বাড়ি ঘরের। এই তো বেশ আছি!

হ্যাঁ, হরিহর বেশ-ই আছেন বটে। দক্ষিণ খোলা মোড়ের বাড়িটার গোটা একতলাটাই এখন তাঁর দখলে। এক কালে এই এক তলায় আরও তিন ঘর ভাড়াটে থাকত। বাড়িওয়ালার সঙ্গে যুক্তি করে কৌশলে তাদের সবাইকেই তাড়িয়েছেন হরিহর। অবশেষে খোদ বাড়িওয়ালাকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গোটা একতলাটাই তিনি অধিকার করেছেন। বাড়িওয়ালা এ নিয়ে প্রথম প্রথম দু'চার দিন একটু ঝামেলা পাকাতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সামান্য কিছু বাড়তি ভাড়ার আশ্বাস পেয়ে চুপ করে গেলেন। এ-ছাড়া তাঁর আর কোনো পথও ছিল না। মামলা করতে পারতেন তিনি হরিহরের নামে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হতো না। মাঝখান থেকে কোর্ট-কাছারী করে কতগুলো পয়সা জলে যেত তাঁর।

বাড়িওয়ালা অম্বিকা রায় একটু ভালো মানুষ গোছের ব্যক্তি। ঝুট-ঝামেলায় সহসা যেতে চান না তিনি। হরিহর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, শুনুন রায় মশাই, আমাকে নিয়ে নিচের চারঘর ভাড়াটের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা হিসেবে একশো ষাট টাকা আপনি পেতেন। আমি আপনাকে মোট দুশো টাকা দেব। কাজেই এ নিয়ে আর চেঁচামেচি করবেন না।

অম্বিকা রায় মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, দেখুন চক্রবর্তীমশাই, এই একতলাটার ভাড়া কম করে ধরলেও এ-বাজারে আটশো টাকা। সেই আটশোর বদলে আপনি আমাকে দুশো টাকা নিতে বলছেন?

— হ্যাঁ বলছি, জবাব দেন হরিহর, বলছি এই জন্যে যে ঐ তিনঘর ভাড়াটে অনেককাল থেকে ঐ ভাড়ায় এখানে ছিল। তাদের উৎখাত করার সাধ্য আপনার ছিল না। ঐ চল্লিশ টাকাতেই আপনাকে মুখ বুজে থাকতে হতো। অনেক কৌশল খাটিয়ে আমি তাদের সরিয়েছি। কাজেই এখন দু'শোতেই আপনার খুশি থাকা উচিত।

অনন্যোপায় অম্বিকা রায় এর পরে আর কিছু বলেন নি। তিনি জানতেন হরিহরের সঙ্গে তর্ক করা একান্তই অর্থহীন। দু'শোর একটা পয়সাও বেশি তিনি আদায় করতে পারবেন না হরিহরের কাছ থেকে।

ব্যাপারটা হয়তো এখানেই মিটে যেতে। অম্বিকা রায় হয়তো দু'শোতেই বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু পরের মাসে ভাড়া দিতে এসে হরিহর যা বললেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অম্বিকা রায়। গৌরচন্দ্রিকার শেষে হরিহর বললেন; শুনুন অম্বিকাবাবু, এই নিন আপনার দুশো। আমি মশাই এক কথার মানুষ।

গম্ভীর মুখে অম্বিকা রায় ভাড়ার রসিদ লিখতে গিয়ে দুশো টাকা লিখতে যেতেই হা হা করে ওঠেন হরিহর, ওকি করছেন? দুশো টাকা লিখছেন কেন? আমি যদিও মাসে মাসে আপনাকে দুশোই দেব, কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে সেই পুরানো ভাড়া—চল্লিশ টাকা।

— তার মানে? অম্বিকা রায়ের মুখে বিরক্তি।

— মানে অতি সরল, মৃদু হেসে থাকতে থাকেন হরিহর, কাগজপত্রে এই দুশোর কথা থাকবে না। এটা হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার প্রাইভেট বন্দোবস্ত।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকেন অম্বিকা রায়। তারপর বললেন, তার মানে কাগজ পত্রে একথাই লেখা থাকবে যে গোটা একতলাটা আমি আপনাকে চল্লিশ টাকা ভাড়ায় দিয়েছি, কেমন?

জবাব দেন হরিহর, হ্যাঁ, অর্থ করলে অবিশ্যি ওটাই দাঁড়ায়। তবে, আপনি তো আর সত্যি সত্যি চল্লিশ পাচ্ছেন না। আপনি পাচ্ছেন তার পাঁচগুণ।

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে অম্বিকা রায়ের। চিৎকার করে ওঠেন তিনি। বলতে থাকেন, আপনি আমাকে কী পেয়েছেন, মশাই? আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন, তাই বলে আমি কি উজবুক? শুনুন হরিহরবাবু, দুশো টাকার রসিদ নিয়ে যদি আপনি টাকা দিতে রাজি থাকেন তো দিন, নইলে আমি আপনার কাছে থেকে ভাড়াই নেব না।

—বেশ তো, না নেবেন, না নেবেন। ভাড়া না দেয়ার অপরাধে আমাকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতে চান বুঝি? সে গুড়ে মশাই বালি। আমি সোজা রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া জমা দেব।

— হ্যাঁ, তাই দেবেন। অম্বিকা রায় হরিহর চক্রবর্তীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন।

এই শুরু। তবে শুরু হলেও শেষ যে কোথায় তা বোধহয় সেদিন অম্বিকা রায় বুঝতে পারেননি। যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। তবে দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে এই নিয়ম বোধহয় খাটে না।

একটি থেকে দু'টি, দু'টি থেকে তিনটি—এমনিভাবে বাড়তে বাড়তে ফৌজদারী-দেওয়ানী

মিলিয়ে সর্বমোট ছ'টি মামলা চলছে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ শঙ্কিত বোধ করে অম্বিকা রায়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। বলে, হরিহরের সঙ্গে লাগতে না গেলেই ভদ্রলোক ভালো করতেন। এবার হয়তো হরিহর ভদ্রলোককে নাকাবি-চোবানি খাইয়ে ছাড়বেন।

সাক্ষী-সাবুদ, দলিল-দস্তাবেজ, উকিল-মোক্তার—জলের মতো পয়সা খরচ হচ্ছে অম্বিকা রায়ের। ইদানীং যেন জেদ চেপে গেছে তাঁর। জব্দ করতেই হবে ঐ হরিহরকে। ওঁকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আইন-কানুনের প্যাঁচ কেবল ওঁরই একচেটে নয়। এদিকে হরিহর প্রকাশ্যেই বলেন, ওঁর এই ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে আমি ছাড়ব। বাড়িওয়ালাগিরি ঘোচাব ওঁর।

প্রথম যে মামলার রায় বেরোল সেটা ফৌজদারী। অভিযোগ, বাড়িওয়ালা অম্বিকা রায় নাকি তাঁর দলবল নিয়ে ভাড়াটে হরিহর চক্রবর্তীর ঘরে ঢুকে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের দু'তিনজনকে মারধোর করেছে। দু'পক্ষের সাক্ষী-সাবুদ বিবেচনা করার পর হাকিম রায় দিলেন যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানানো। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। হেরে গেলেন হরিহর চক্রবর্তী।

পাড়ায় উত্তেজনা। হরিহরের মতো মানুষ যে শেষ পর্যন্ত অম্বিকা রায়ের মতো একজন নিরীহ ব্যক্তির কাছে হেরে গেলেন এটাই সেদিন একটা মস্ত ঘটনা। পাড়ার মোড়ে মোড়ে জটলা। সবার নজরই ঐ বাড়িটার দিকে। সবাই চায় একটিবার হরিহরের শুকনো মুখখানা দেখতে। দেখে মনে মনে তৃপ্ত হতে। যে লোক স্রেফ বুদ্ধির জোরে এতকাল অন্যকে মামলা-সমুদ্র পার হতে সাহায্য করে এসেছে তিনি নিজে আজ এমনি মার খেয়ে কতটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন সেটাই আজ জানতে চায় সবাই। কিন্তু জানার কোনো উপায় নেই। দোতলায় বাড়িওয়ালা অম্বিকা রায়ের দরজা-জানালা যদিও সব খোলা, কিন্তু একতলায় মানুষের কোনো সাড়া-শব্দই নেই। দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। আদালত থেকে ফিরে হরিহর সেই যে বাড়িতে ঢুকেছেন, একটি বারও বেরোন নি।

পরাজয়ে কাতর হবার মতো ব্যক্তি হরিহর নন। দু'দিন যেতে না যেতেই তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মামলার তদ্বির-তদারক শুরু করলেন। দ্বিতীয়টাও ফৌজদারী। এটা দায়ের করেছিলেন অম্বিকা রায়। অভিযোগ, হরিহর ও তাঁর লোকজনেরা সিঁড়ির দরজা বন্ধ রেখে অম্বিকা রায়ের পরিবারের লোকজনকে দোতলায় উঠতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিয়েছিলেন।

মাস তিনেক পরে বেরোল এই দ্বিতীয়টির রায়। এবারেও হরিহর কাত।

অভিযোগ প্রমাণ হলো। বিচারক হরিহরের দুই ছেলে ও চাকরকে অভিযুক্ত করে জরিমানার নির্দেশ দিলেন।

জরিমানার টাকার অঙ্কটা যদিও তেমন বেশি নয়, কিন্তু পর পর দু'বার হেরে গিয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে উঠলেন হরিহর। তার এককালের জারিজুরি এবার বোধহয় নষ্ট হতে বসেছে। ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে তার প্রতিপত্তি। এখন তবে উপায়? বাকি মামলাগুলোতেও যদি তিনি এভাবে হেরে যান তাহলে যে এপাড়া থেকে বাস উঠিয়ে দিতে হবে। তার চাইতেও বড় কথা, এতকাল যে সুনামের জোরে তিনি ধান্দাবাজ মক্কেলদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতড়ানোর ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন সেই ব্যবসার যে ভরাডুবি। এরকম একটা অবস্থার কথা ভাবতেও হৃদকম্প হয় হরিহরের। কিন্তু উপায় কি? ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় তাঁকে সেই পথেই টেনে নিয়ে চলেছেন।

পর পর দু'টো মামলায় কঠিন আঘাত পেয়ে কিছুদিন বিভ্রান্তির মধ্যে দিন কাটালেন হরিহর চক্রবর্তী। বাড়ি থেকে বেরোন না। দিন-রাত কেবল ঐ একটা চিন্তাই তার মনটাকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে। এভাবে অম্বিকা রায়ের হাতে পড়ে পড়ে মার-খাওয়া আর চলে না। এবার পাল্টা মার দিতেই হবে তাঁকে। কিন্তু কেমন

করে, সেটাই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন মাথায় নিয়েই একের পর এক বিনিদ্র রজনী কাটান হরহর। ভাবনা-চিন্তায় তাঁর চোখের কোণে কালি পড়ে। অবশেষে—

অবশেষে একটা কথা মাথায় আসে তাঁর। ঝগড়া তো অনেক হলো। এবার না হয় সন্ধি হোক। চোখের বদলে চোখ কিংবা দাঁতের বদলে দাঁত — এই নীতিতে আর যা হোক মানসিক শান্তি যখন পাওয়া যায় না তখন কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল বাড়িয়ে দেবার নীতিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি?

বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়েছিলেন অম্বিকা রায়। সহসা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলেই তিনি অবাক। এ কাকে দেখছেন তিনি? দুটো বছর ধরে যাঁর সঙ্গে মুখে দেখাদেখি বন্ধ সেই হরিহর চক্রবর্তীই যে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দরজায়।

বিহ্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অম্বিকা। বলে ওঠেন, আসুন— আসুন হরিহরবাবু।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে হরিহর ঘরে ঢোকেন! তারপর চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, অনেক তো হলো, আর কেন? আপনি বাড়িওয়ালা, আমি ভাড়াটে। বয়স আপনারও হয়েছে, আমারও হয়েছে। এই মামলা মোকর্দ্দমা করে আপনিও শান্তি পাচ্ছেন না, আমিও পাচ্ছি না। দুটোয় আপনি জিতেছেন। দু'একটায় আমিও জিততে পারি! কিন্তু এই করে উকিল-মোক্তারের পকেট ভরে আমাদের কি লাভ হবে, বলুন?

একরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে মনটা প্রায় আইঢাই করছিল শান্তিপ্রিয় অম্বিকা রায়ের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দেন, আপনি ঠিকই বলেছেন চক্রবর্তী মশাই। আমি বরাবরই এসবের বিরোধী। কিন্তু শেষপর্যন্ত অন্য কোনো পথ খোলা না পেয়েই—

একটু থেমে আবার বলতে থাকেন অম্বিকা রায়, যাক গে ওসব কথা। এবার আপনিই বলুন কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে জবাব দেন হরিহর, শুনুন রায়মশায়। আপনার কথাই ঠিক। আপনার একতলার ভাড়া সাত-আটশো না হলেও চার পাঁচশো তো হবেই। আমি আপনাকে মাসে মাসে ঐ চারশো করেই দেব। সেই হিসেবে দু'বছরে আপনার পাওনা হয় ন'হাজার ছ'শো। এই বাকি টাকাও আমি শোধ করব এক বছরের মধ্যে। মনে হয় এতে আপনি রাজি হবেন।

দু'শোর জায়গায় চারশো। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন অম্বিকা রায়। বললেন, বেশ, তাই হবে চক্রবর্তীমশাই। তবে এই মর্মে একটা কিছু লেখাপড়া থাকা দরকার।

— নিশ্চয়—নিশ্চয়, বলতে থাকেন হরিহর, আমি জানতাম এতে আপনি রাজি হবেন। তাই কাগজ-কলম সঙ্গেই এনেছি। এই মুহূর্তেই আপনার সামনে বসে লেখাপড়া করে দিচ্ছি আমি।

তাই হলো। চুক্তিপত্র লিখে দিলেন হরিহর। নিচে সই করলেন নিজের নাম। কাগজটা অম্বিকার হাতে দিয়ে হরিহর বললেন, ভালো করে পড়ে দেখুন রায়মশাই। কিছু বাদ গেলে বলবেন।

অম্বিকা রায় বার দুয়েক কাগজটা পড়ে নিয়ে একটু হেসে বললেন, না— না, কিছু বাদ যায় নি। সবই ঠিক আছে।

হরিহর বললেন, তাহলে আজ থেকে আমরা হলাম সৎ প্রতিবেশী। কোর্ট থেকে মামলা-মোকর্দ্দমা আমরা তুলে নেব। বলতে বলতে অম্বিকার সঙ্গে হাত মেলান হরিহর।

অবশেষে চা-জলখাবার খেয়ে হরিহর উঠলেন। যত্ন করে চুক্তিপত্রটা আলমারিতে তুলে রাখলেন অম্বিকা রায়। চুক্তিপত্রটা হচ্ছে এই—

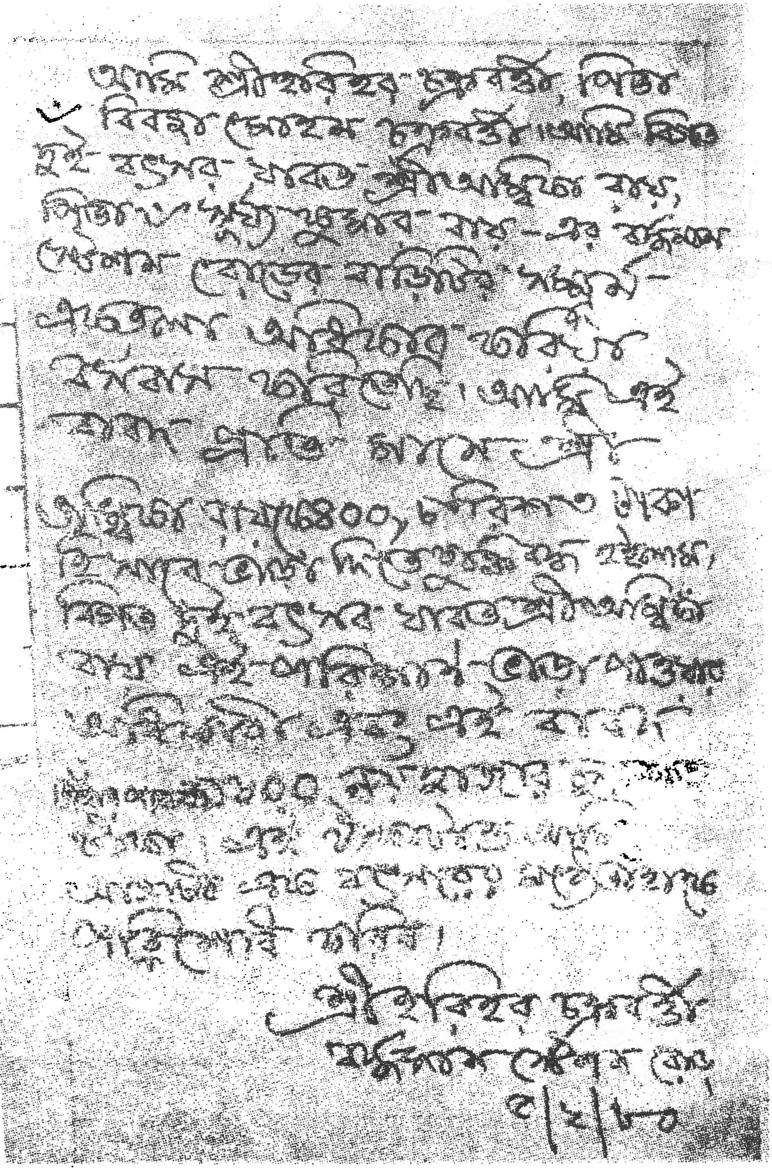
আমি শ্রীহরিহর চক্রবর্তী, পিতা
৺ [illegible] [illegible] চক্রবর্তী আমি বিগত
দুই বৎসর যাবত শ্রীঅম্বিকা রায়,
পিতা ৺ [illegible] [illegible] রায়-এর বর্তমান
[illegible] [illegible] বাড়ীতে [illegible] -
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। আমি এই
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ৪০০/ [illegible] টাকা
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলাম,
বিগত দুই বৎসর যাবত শ্রীঅম্বিকা
রায় এই [illegible] ভাড়া পাওয়ার
[illegible] এবং এই [illegible]
[illegible] ২০০ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
শ্রীহরিহর চক্রবর্তী
[illegible] [illegible] রোড
[illegible]

চুক্তিপত্র

যুদ্ধের পরে শান্তি। অম্বিকা রায় খুশি। পুরোনো ভাড়াটে। একতলাটার জন্যে না হয় কিছু কমই দিলেন। তাছাড়া সেই বাকি প্রায় দশ হাজার টাকাটাও তো নির্ঝঞ্ঝাটে পাওয়া যাবে।

দুটো মাস কেটে গেল কিন্তু হরিহরের ভাড়ার টাকা দেবার নাম নেই। আশায় আশায় থাকেন অম্বিকা রায়। অবশেষে তৃতীয় মাসে একদিন মুখ ফুটেই টাকার কথা বললেন হরিহরকে।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন হরিহর। তারপর যেন বুঝতে পারেন নি এমনি ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, টাকা? কিসের টাকা? ও—আপনি ভাড়ার টাকার কথা বলছেন? তা দেখুন রায়মশাই, ইদানীং একটু টানাটানি যাচ্ছে। পুরানো বাকি টাকাটা বরঞ্চ এখন থাক। আপনি এই তিনমাসের ভাড়া একশো কুড়ি টাকা নিন।

— তিন মাসের ভাড়া একশো কুড়ি টাকা! বিস্মিত কণ্ঠস্বর অম্বিকার, আপনি কি ভুলে গেছেন চক্রবর্তীমশাই? তিন মাসের ভাড়া তো বারোশো টাকা।

হো—হো করে হেসে ওঠেন হরিহর। হাসতে হাসতে বলেন, আপনি কী পাগলের মতো বলছেন? এই একতলার জন্যে আপনাকে ফি মাসে চারশো করে দেব?

— তাই তো ঠিক হয়েছে। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দেন অম্বিকা, আপনি নিজেই তো উপযাচক হয়ে এই চুক্তি করেছেন।

— চুক্তি! ও— সেই কাগজটার কথা বলছেন? তা দেখুন রায়মশাই, আমি একটু বেশি আবেগপ্রবণ লোক। সেই মুহূর্তে আবেগের তাড়নায় যা বলেছি করেছি তাকে ধ্রুব বলে ধরবেন না। মাসিক চল্লিশ টাকা ও সেই সঙ্গে পুরানো পাওনা দু'বছরের নশো ষাট টাকা— এর বেশি একটি পয়সাও আপনাকে দিতে পারব না।

অম্বিকা রায় স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হরিহরের মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, পারবেন কি পারবেন না সেটা ঠিক হবে আদালতে। ভুলে যাবেন না আপনার নিজের হাতে লেখা সেই চুক্তিপত্রটা আমার কাছেই আছে।

আবার মামলা—চুক্তি ভঙ্গের মামলা। অম্বিকা রায়ের উকিল আদালতে পেশ করলেন হরিহরের লেখা সেই চুক্তিপত্র।

বিচারকের প্রশ্নের জবাবে হরিহরের উকিল বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ ধর্মাবতার, আমার মক্কেল নিজের হাতে একখানা চুক্তিপত্রে লিখে দিয়েছিলেন অম্বিকা রায়কে। তবে তাতে লেখা ছিল একতলার ভাড়া মাসিক চল্লিশ টাকা আর আগের দু'বছরের পাওনা চল্লিশ টাকা হিসেবে নশো ষাট টাকা।

হরিহরের উকিলের কথায় অম্বিকার উকিলের মুখে একটু বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। বিচারক সেই চুক্তিপত্রটা হরিহরের উকিলের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন এই চুক্তিপত্রটা জাল? অম্বিকা রায় এই জাল চুক্তিপত্র আদালতে পেশ করেছেন? হরিহরের উকিল চুক্তিপত্রটা হাতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করেন।

পাশে দাঁড়ানো হরিহরের সঙ্গে নীচু কণ্ঠে কি যেন আলোচনা করেন। তারপর বিচারকের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন, না ধর্মাবতার এর সবটাই জাল নয়। এটা সেই চুক্তিপত্র যেটা আমার মক্কেল নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। এমনকি নিচের এই সইটাও আমার মক্কেলের। তবে টাকার কথা যেখানে লেখা আছে সেখানে কিছু গোলমাল করা হয়েছে। চারিশত টাকা-এর জায়গায় লেখা ছিল চল্লিশ টাকা, আর ন হাজার ছয়শত-এর জায়গায় লেখা ছিল ন শো ষাট।

বিচারক জিজ্ঞেস করেন, চুক্তিপত্রে এই পরিবর্তন ঘটালো কে?

হরিহরের উকিল জবাব দেন, কে ঘটিয়েছে বলতে পারছি না, ধর্মাবতার। তবে অম্বিকা রায় যখন এটা আদালতে দাখিল করেছেন তখন ধরে নিতে পারি এই কাজ তিনিই করেছেন।

— না—না, ধর্মাবতার, বলে ওঠেন অম্বিকা রায়ের উকিল, এ কাজ আমার মক্কেল করেন নি। চারিশত টাকা ও ন হাজার ছয়শত—এই লেখাগুলো আমার মক্কেলের নয়। ওগুলো অবশ্যই হরিহর চক্রবর্তীর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠেন হরিহরের উকিল, না ধর্মাবতার এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ লেখা আমার মক্কেলের নয়। অম্বিকা রায়ের নিজের না হলে ঐ লেখা তিনিই অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। মোটকথা এভাবে চুক্তিপত্রে পরিবর্তন ঘটানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অম্বিকা রায়ের। এ জন্যে আমার মক্কেল তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা করবে।

অম্বিকা রায়ের উকিল এই সময় বলে ওঠেন, হুজুর ধর্মাবতার, আদালতের সামনে আমার মক্কেলকে জালিয়াতি মামলার ভয় দেখানো অনুচিত। এখন পর্যন্ত প্রমাণই হল না যে চুক্তিপত্রে সত্যিই কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। আমি বলছি, অপরপক্ষের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চুক্তিপত্রটাকে নাকচ করার জন্যেই হরিহর চক্রবর্তী এইসব পরিবর্তন করার আজগুবী গল্প তৈরি করেছেন। ওখানে কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। লেখাগুলো তাঁর।

এই সময় হরিহরের উকিল কিছু বলার জন্যে মুখ তুলতেই বিচারক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। এই চুক্তিপত্র আমি হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাচ্ছি তাঁর মতামতের জন্যে। তাঁর রিপোর্টে যদি দেখা যায় ওখানে বাস্তবিকই কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাহলে তার দায়িত্ব বাস্তবিক পক্ষেই অম্বিকা রায়ের ওপর বর্তাবে।

আদালতের বাইরে এসে অম্বিকা রায়ের উকিল অম্বিকাকে জিজ্ঞেস করেন, কি মশাই, চুক্তিপত্রে কোন গোলমাল করেছেন নাকি?

জবাবে অম্বিকা রায় বললেন, না স্যার, সেসব কিছুই নয়। এটা কেবল চুক্তিপত্রটাকে নাকচ করার কৌশল।

অম্বিকা রায় যা-ই বলুন না কেন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পড়ে তাঁর উকিলের মুখ চুণ। বিশেষজ্ঞ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে চুক্তিপত্রে চল্লিশ কে চারিশত এবং ন'শো ষাট'কে ন হাজার ছয়শত করা হয়েছে। তাঁর এই মতামতের স্বপক্ষে তিনি আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিতে তোলা চুক্তিপত্রের পাতার ফটোখানাও আদালতে পাঠিয়েছেন। ওতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আগের লেখা।

কেবল তাই নয়, বিশেষজ্ঞ আরও বলেছেন যে 'চারিশত টাকা' ও'ন'হাজার ছয়শত' লেখাগুলোর সঙ্গে চুক্তিপত্রের বাকি লেখাগুলোর সম্পূর্ণ গরমিল, অর্থাৎ ওগুলো হরিহরের হাতের লেখা নয়।

আদালতে বিচারকের মুখ গম্ভীর, অম্বিকা রায়ের উকিলের মুখ পাংশু, আর হরিহরের উকিলের মুখে হাসি। বাস্তবিক, হরিহরের আনন্দ হবারই কথা। বিশেষজ্ঞের মতামত সম্পূর্ণভাবে তাঁরই পক্ষে। বিশেষজ্ঞ বলে দিয়েছেন যে গোটা চুক্তিপত্রটাই লিখেছেন হরিহর। পরে, টাকার কথাগুলো মুছে দিয়ে সেখানে অন্য কেউ নতুন করে বেশি টাকার কথা লিখেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কে এই কাজ করেছে? নিশ্চয়ই অম্বিকা রায় কিংবা তাঁর হয়ে অন্য কেউ, কারণ লেখার পর থেকে কাগজটা তাঁর কাছেই ছিল। বিচারক গম্ভীর মুখে অম্বিকা রায়ের উকিলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই উকিল ভদ্রলোক সামান্য কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, ধর্মাবতার, ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। দশচক্রে যেমন ভগবান পর্যন্ত

ভূত হয়ে ওঠেন, তেমনি কোন একটা ষড়যন্ত্রের ফলে আমার মক্কেল জালিয়াত প্রতিপন্ন হতে চলেছেন। সরকারী হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের অভিমত চিরকালই উঁচু পর্যায়ের। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলেও আমি বলতে চাই যে চুক্তিপত্রটা আবার সেই বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হোক, ঐ টাকার কথাগুলো আমার মক্কেলের নিজের লেখা কিনা এবং এই চুক্তিপত্রের লেখাগুলো কোন বিশেষ অবস্থায় লেখা হয়েছে কিনা।

অম্বিকা রায়ের উকিল থামতেই হরিহরের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বলতে থাকেন, এর পরেও এসবের কোন প্রয়োজন আছে কি, ধর্মাবতার? এসব হচ্ছে সময় নষ্ট করার কৌশল। আমার মক্কেলের সঙ্গে অম্বিকা রায়ের চুক্তি হয়েছিল যে মাসিক চল্লিশ টাকায় তিনি একতলায় বাস করবেন এবং বাকি নশো ষাট টাকা তিনি এক বছরের মধ্যে ফেরত পাবেন। চুক্তিপত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে এখন তিনি বেশি দাবী করছেন। আমার মক্কেল বিশেষজ্ঞের রিপোর্টের ভিত্তিতে অম্বিকা রায়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই জালিয়াতির মামলা আনবেন। এই অবস্থায় চুক্তিপত্র আবার বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো সম্পূর্ণ অর্থহীন।

হরিহরের উকিলের যুক্তি কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না বিচারক। তিনি চুক্তিপত্র আবার বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন।

চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন অম্বিকা রায়। হরিহরকে বিশ্বাস করে তিনি ঠকেছেন। ভয়ঙ্কর ধুরন্ধর এই লোকটির অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু কেমন করে যে ব্যাপারটা ঘটল তা তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না। হরিহর তো তার সামনে বসেই চুক্তিপত্রটা লিখেছিলেন। তারপর থেকে তো ওটা তাঁর কাছেই ছিল। তাহলে ওটায় সেই পরিবর্তন ঘটলো কি করে? রহস্য—বাস্তবিকই এক রহস্যময় ব্যাপার। কে এর সমাধান করবে? বিশেষজ্ঞ কি পারবেন এই রহস্যের জট খুলতে?

হ্যাঁ পারবেন। কেবল পারবেন-ই নয়, পেরেছেন। সরকারী হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ তাঁর পরীক্ষার পরে দ্বিতীয়বার যে রিপোর্ট দিলেন তাতেই পাওয়া গেল সেই জট খোলার ইঙ্গিত। তিনি লিখলেন— টাকার অঙ্কগুলোর লেখা যেমন হরিহরের নয়, তেমনি অম্বিকা রায়েরও নয়। এর অর্থ, পরিবর্তনগুলো হরিহর কিম্বা অম্বিকা রায়ের মধ্যে কেউই করেন নি। অবশ্যি এটা অম্বিকা রায়ের পক্ষে তেমন কোন সুখবর নয়। অম্বিকা রায় নিজে না করে ঐ কাজ অন্য কাউকে দিয়েও করাতে পারেন।

বিশেষজ্ঞের রিপোর্টের দ্বিতীয় পংক্তিটিই গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে রহস্যের জট খোলার এটাই চাবিকাঠি। এতে তিনি লিখেছেন—চুক্তিপত্রের পুরো লেখাটা পরীক্ষা করলে কতগুলো অসংগতি ধরা পড়ে। কোন লেখক যখন কোন কিছু লেখে তখন সাধারণতঃ অক্ষরের সাইজগুলো সমান হয়। সামান্য ইতর বিশেষ হলেও মোটামুটি সাইজ সমান থাকে। তাছাড়া লিখতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তির লেখা শব্দগুলোর মধ্যে যে ব্যবধান এবং লাইনের মধ্যে যে ব্যবধান তাও মোটামুটি সমান থাকে। কিন্তু এই চুক্তিপত্রের লেখা অসংগতিতে পূর্ণ। অক্ষরগুলো কোথাও কোথাও অসমান। লাইনগুলোর ব্যবধানও সমান নয়। বিশেষ করে অক্ষরগুলোর পারস্পরিক ব্যবধান খুবই ত্রুটিপূর্ণ— কোথাও বেশ দূরে দূরে, আবার কোথাও বা গায়ে গায়ে ঘেঁষে তাদের অবস্থান। চুক্তিপত্রের লেখার ধরন দেখে বোঝা যায় যে এর লেখক হরিহর চক্রবর্তী বেশ দক্ষ লেখক। এমন দক্ষ লেখকের লেখার মধ্যে এমন ত্রুটিপূর্ণ অক্ষরে অক্ষরে ব্যবধান, অক্ষরের সাইজে গরমিল আশা করা যায় না। বিশেষ করে 'চারিশত' ও 'ন'হাজার ছয়শত' কথাগুলোর ঠিক আগের শব্দগুলোর চেহারা ও তাদের

অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে ঐ 'চারিশত' ও 'ন'হাজার ছয়শত লেখাগুলো সম্ভবতঃ আগে থেকেই ঐ কাগজের ওপরে ছিল। হরিহর চক্রবর্তী এই অবস্থায় বাকি লেখাগুলো কাগজের ওপরে লেখেন এবং লিখতে গিয়ে বাক্যগুলো কোথায় শেষ হবে বুঝতে না পারার জন্যেই অক্ষরগুলোর অমন গা ঘেঁষাঘেঁষি কিম্বা কাছে, দূরে অবস্থান, কোথাও সাইজ বড়, কোথাও ছোট, লাইনের ব্যবধান কোথাও বেশি, কোথাও কম।

উল্টে গেল পাশার দান। হরিহরের উকিলের হাসিমুখের ওপর কালির প্রলেপ। অম্বিকা রায়ের উকিলের কালো মুখে আনন্দের ঝিলিক। অম্বিকা রায়ের উকিল বলেন, বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট চমৎকার। কি অপূর্ব বিশ্লেষণ! একেই বলে সরকারী হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট! হরিহরের উকিল বলেন, একেবারে বাজে। বিশেষজ্ঞকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে আমার অনুমান।

অম্বিকা রায়ের উকিল বলেন, ধর্মাবতার, শেষ পর্যন্ত আমার সেই আশংকাই সত্য হলো। আমার মক্কেল অম্বিকা রায়কে বিপাকে ফেলার জন্যেই ধুরন্ধর হরিহর চক্রবর্তীর এই কারসাজি। তিনি নিজের হাতে প্রথমে 'চল্লিশ' ও 'ন'শো ষাট' ঐ কাগজের ওপর লেখেন। পরে কোন বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে ঐগুলো মুছে ফেলে অন্য কাউকে দিয়ে ঠিক ঐ জায়গায় 'চারিশত' ও 'ন'হাজার ছয়শত কথাগুলো লিখিয়ে নেন। অবশেষে আমার মক্কেলের ঘরে এসে ভালমানুষের মতো সেই কাগজটার ওপরেই বাকি কথাগুলো লিখে আমার মক্কেলের হাতে সেটা তুলে দেন। মানুষকে ফাঁদে ফেলে জালিয়াত প্রতিপন্ন করার কি বিশ্রী কৌশল। এখন ইচ্ছে করলে আমার মক্কেলই হরিহর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা দায়ের করতে পারেন।

হরিহরের উকিলের মুখে আর কথা সরে না। মৃদু কণ্ঠে দুর্বল যুক্তির সাহায্যে তিনি তার মক্কেলকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে অবশেষে হতাশ হয়ে বসে পড়েন।

বিচারকের রায় বেরোলে দেখা গেল তিনি বিশেষজ্ঞকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে তাঁর রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন এবং গোটা ব্যাপারটাকে হরিহর চক্রবর্তীর একটা সাজানো কৌশল বলে আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেছেন।

ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে জর্জরিত হরিহর চক্রবর্তী এর মাস খানেক পরেই অম্বিকা রায়ের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঐ পাড়া থেকে বাস উঠিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র।

———————

রক্তলেখা

চমকে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। প্রবীর যে কোনদিন এমনিভাবে তাঁর মুখের ওপর কৈফিয়ত চেয়ে বসবে তা তিনি একেবারে ধারণাই করতে পারেন নি। কিন্তু ঘটছে ঠিক তাই। ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন চন্দ্রকান্ত, আর কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে আঙুল তুলে চড়াগলায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে প্রবীর যার জবাব দিতে সেই মুহূর্তে মোটেই ইচ্ছে করছিল না চন্দ্রকান্তর। বোধহয় দেবার মতো তেমন কিছু ছিলও না! কি জবাব দেবেন, তিনি? ছেলে যদি বাপের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার চরিত্র সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবী করে তা'হলে বাপের পক্ষে তার জবাব দেওয়া বাস্তবিকই শক্ত যদি না অভিযোগগুলো মিথ্যে হয়। কিন্তু চন্দ্রকান্তর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের একবর্ণও যে মিথ্যে নয় সে কথা চন্দ্রকান্তর নিজের চাইতে আর কে বেশি জানে?

কিন্তু চন্দ্রকান্ত বরাবরই এমনি ছিলেন না। বিরাট লোহার ব্যবসা তাঁর। প্রচুর পয়সার মালিক। একটু সৌখীন প্রকৃতির মানুষ চন্দ্রকান্তর চেহারায় যতটা না ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া, তার চাইতে বেশি ছিল কর্ম্মদক্ষতার ছাপ। কর্মবীর না হলেও করিৎকর্ম্মা ব্যক্তি তিনি। বাপের সামান্য লোহার ব্যবসাটিকে একমাত্র নিজের কর্ম-নিপুণতা ও বুদ্ধির জোরে বিরাট বড় করে তুলেছিলেন তিনি। একমাত্র ছেলে প্রবীরকে নিজের ব্যবসায়ে টেনে না এনে আলাদা কাঠের ব্যবসায়ে লাগিয়েছিলেন। প্রবীরের কাঠের ব্যবসার অবস্থা এখন রমরমা।

ছেলের অভিযোগগুলি কিছুক্ষণ ধরে স্থিরভাবে শুনে গেলেন চন্দ্রকান্ত। তারপর শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, শোন খোকা, আমি এখনও অথর্ব হয়ে পড়ি নি কিম্বা বুদ্ধিভ্রংশও হয় নি আমার। এখনও এত বড় ব্যবসা আমি চালাচ্ছি, কাজেই আমি কেমনভাবে চলবো তার উপদেশ তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না আমাকে। আমার চালচলনের স্বাধীনতা আমি তোমার কাছে এখনও গচ্ছিত রাখি নি। কাজেই আমাকে অহেতুক উপদেশ দিতে না এলেই আমি খুশি হবো। চন্দ্রকান্ত থামতেই বলে ওঠে প্রবীর, তোমাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই, বাবা। তবে, ইদানীং তুমি যা শুরু করেছ তাতে আমার পক্ষে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

— বেশ তো, তাই যদি মনে করো তা হলে মুখ দেখিয়ো না।

— এ তুমি কি বলছো বাবা? চন্দ্রকান্তর কথার ধরনে আরও রেগে ওঠে প্রবীর, নিত্য নতুন বাইরের মেয়েছেলে এই বাড়িতে আসবে, আর আমি চুপ করে তা' সহ্য করবো? এই পরিবেশে তোমার বৌমাকে নিয়ে আমার পক্ষে এই বাড়িতে থাকাই যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীরা আমাকে ছি ছি করে, আত্মীয়স্বজনেরা কটাক্ষ করে, এমনিভাবে আমরা কী করে এই বাড়িতে বাস করতে পারি বলো তো?

একটু সময় চুপ করে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তারপর জবাব দেন, বেশ তো, থেকো না এখানে। বাগবাজারের বাড়িতে বৌমাকে নিয়ে চলে যাও তুমি। আমি একাই এখানে থাকবো।

— আচ্ছা বাবা, মা আজ বেঁচে থাকলে কি তুমি এখানে বসে এমনি বেলেল্লাপনা করতে পারতে?

বাপের মুখের ওপর এমন বিশ্রী শব্দটি ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল না প্রবীরের। হঠাৎই এটা বেরিয়ে পড়েছিল তার মুখ দিয়ে। কথাটা মিথ্যে নয়। চন্দ্রকান্তর চারিত্রিক শিথিলতা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। শৌখিন চরিত্রের চন্দ্রকান্ত এই ব্যাপারে বরাবরই একটু দুর্বল। মদ তিনি বরাবরই খেতেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রবীরের মা'র জন্যে এতকাল সেই মদের আনুষঙ্গিক কোন কিছুতে তেমন কিছু আসক্তি তার জন্মে নি। কিন্তু জলস্রোত বন্ধ হতেই শ্যাওলা জন্মাতে শুরু করলে। বুদ্ধিমতী সেই মহিলার মৃত্যুর পরে কিছুদিন স্তব্ধ হয়ে রইলেন চন্দ্রকান্ত। তারপরেই তাঁর জীবনধারা চলতে শুরু করলো বাঁকা পথে। আর, এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠলো তাঁরই ব্যবসার ম্যানেজার শক্তি সরকার।

প্রবীরের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া সেই শব্দটি যেন আগুন ধরিয়ে দিলে চন্দ্রকান্তের মাথায়। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, সাট্ আপ ননসেন্স। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকেই এত বড় কথা?' বেরিয়ে যাও—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। তোমার মতো ছেলের মুখ দেখতে চাই না আমি।

প্রবীরের মাথায়ও তখন আগুন। একটা হেস্তনেস্ত করতেই সে আজ এসেছিল বাপের কাছে। চন্দ্রকান্তর কথার জবাবে সেও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, বেশ, আমি এখনই চলে যাচ্ছি এই বাড়ি ছেড়ে। তোমার মতো বাবার মুখও আর দেখতে চাই না।

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল পিতা-পুত্রে। সেই দিনই স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল প্রবীর। একমাত্র পুত্রকে এমনিভাবে তাড়িয়ে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন চন্দ্রকান্ত। তারপর সেই অসময়েই নিজের খাস চাকরকে মদের সরঞ্জাম আনতে হুকুম দিয়ে ম্যানেজার শক্তি সরকারকে জরুরী তলব দিলেন।

বেঁটে খাটো ছিপছিপে চেহারার শক্তি সরকার যখন এসে হাজির হলো তখন চন্দ্রকান্ত আর প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। নেশায় তখন তিনি চুর। লাল ছল্‌ছলে চোখ দু'টো তার ছোট হয়ে উঠেছে। ফর্সা মুখখানাও লাল।

দ্বিধাগ্রস্ত শক্তি সরকার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে। এই সময় তার ভেতরে প্রবেশ করা উচিত হবে কিনা তাই নিয়েই বোধ হয় কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনা করলে আপন মনে। অবশেষে এক সময় প্রবেশ করলে ঘরের মধ্যে।

শক্তি সরকারকে দেখেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। চিৎকার করে বললেন, কে, কে তোমাকে এই সময় এখানে আসতে হুকুম দিয়েছে? গেট আউট — আই সে, গেট আউট।

মালিকের এমন ধারা আচরণের সঙ্গে শক্তি সরকার মোটেই অপরিচিত নয়। এর আগেও এমনি অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাই, নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, বেশ আমি চলে যাচ্ছি। আপনি ডেকেছিলেন বলেই এসেছিলাম। বলতে বলতে শক্তি সরকার ঘরের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

মদের গ্লাসটা এক চুমুকে নিঃশব্দে নিঃশেষ করে চিৎকার করে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, হোয়াট, আমার অনুমতি না নিয়েই চলে যাচ্ছো? এত স্পর্ধা তোমার?

একটু মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়ায় শক্তি সরকার। তারপর বললে, তা'হলে যেতে বারণ করছেন?

— সারটেন্‌লি, জবাব দেন চন্দ্রকান্ত, আমার হুকুম ছাড়া এক পা নড়বে না তুমি।

শক্তি সরকার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে চন্দ্রকান্তর কাছে। তারপর বললে, কেন ডেকেছিলেন বলবেন কি?

এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছেন চন্দ্রকান্ত। অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরে বললেন,

বৌবাজারের সেই মেয়েটার খোঁজে এখনই লোক পাঠাও। ওকে আজ আমার চাই।

— একটু আস্তে বলুন, ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে শক্তি সরকার, এসব কথা কি এত জোরে বলতে হয়?

— হোয়াই—আস্তে বলবো কেন? আমার বাড়িতে বসে আমি কাকে ভয় করি ?

— না — না, ভয়ের কথা হচ্ছে না। চাকর-বেয়ারাদের জানিয়ে এসব করলে লাভ কি? বিশেষ করে প্রবীরবাবু শুনতে পেলে—

শক্তি সরকার আর কথাটা শেষ করতে পারে না। তার আগেই বলে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, হ্যাং ইওর প্রবীরবাবু। হি ইজ আউট্। তাকে আমি তাড়িয়েছি এখান থেকে। সেই সঙ্গে বৌমাকেও। এখন আমি এ্যালোন— এখানকার একচ্ছত্র সম্রাট।

কথাটা শেষ করেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন চন্দ্রকান্ত। হাসতে হাসতে তাঁর দম আটকে যাবার মতো অবস্থা। সেই দিকে তাকিয়ে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে শক্তি সরকার। মানুষটা এবার সত্যি সত্যি মরে যাবে নাকি?

দম কিন্তু আটকায় না চন্দ্রকান্তর। হাসি থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, জানো শক্তি, ছেলেটা বাড়ি থেকে চলে গেছে যাক, কিন্তু বৌমাটার জন্যে সত্যিই ভারি কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটা সত্যিই ভালো ছিল হে। বলতে বলতে চন্দ্রকান্তর চোখ দু'টো ছল ছল করে ওঠে।

জিগ্যেস করে শক্তি সরকার, এই জন্যেই কি আমাকে ডেকেছিলেন?

— কি জন্যে বলো তো? কথার খেই হারিয়ে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞেস করেন।

চাপা কণ্ঠে জবাব দেয় শক্তি, বৌবাজারের সেই মেয়েটার জন্যে।

— কোন মেয়েটা বলো তো?

শক্তি কিছু জবাব দিতে যায়। কিন্তু হঠাৎ তার আগেই চন্দ্রকান্ত বলে ওঠেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বৌবাজারের সেই নীপা না দীপা কি যেন নাম সেই মেয়েটার? আরে ছ্যা—ছ্যা, ওরকম একটা থার্ডক্লাশ মেয়ে আমার এখানে আসবে কিহে? রিমেমবার শক্তি, আমার নজর এত ছোট নয়। সাত ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে আমার কাছে এসে বলে কুমারী। আমি যেন কচি খোকা। মাথার চুল না পাকলেও বয়সে হাফ সেঞ্চুরী পেরিয়ে গেছি আমি। আমার চোখে ধূলো দেওয়া অত সহজ নয়। না—না শক্তি, ঐ ধরনের মেয়ে আমি চাই না। আমি চাই—আমি চাই—

কথাটা শেষ না করেই চন্দ্রকান্ত মদের খালি বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অহেতুক দেখতে থাকেন।

শক্তি খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারে যে চন্দ্রকান্তর তাকে বলার মতো তেমন কিছু নেই এবং এই মুহূর্তে তাঁর একমাত্র মনোযোগ ঐ বোতলের দিকে, তখন সে একসময় নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

।। ২।।

চিরকালের খামখেয়ালী স্বভাবের মানুষ চন্দ্রকান্ত। দিন কয়েকের জন্য যেন তিনি আবার একেবারে অন্য মানুষ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় মদের বোতল নিয়ে

বসলেও আনুষঙ্গিক অন্য কিছু নিয়ে শক্তি সরকারকে কিছুই আর বলেন না। মনে মনে চিন্তিত হয়ে ওঠে শক্তি সরকার, ভদ্রলোক হঠাৎ সন্ন্যেসী-টন্ন্যেসী হয়ে উঠলেন নাকি? নিয়মিত অফিসে আসেন, ব্যবসা দেখাশোনা করেন, কাজে গাফিলতি দেখলে কর্মচারীদের ধমকান, এমনকি ম্যানেজার শক্তি সরকারকেও কড়া কথা শোনাতে ছাড়েন না। হিসেব-নিকেশে চন্দ্রকান্তর মাথা বরাবরই সাফ। হিসেবের গরমিল কিম্বা গোঁজামিল চট করে ধরে ফেলেন, তারপর ঝড় তোলেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ওপর।

কর্তার কম-নজর হলে কর্মীদের পো-বারো। বিশেষ করে শক্তি সরকার বরাবরই চন্দ্রকান্তর এই ধরনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে নিজের আখেরের দিকে মন দিতে ভীষণভাবে অভ্যস্ত। তাই চন্দ্রকান্ত যখন ব্যবসার ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে ওঠেন তখন স্বাভাবিক কারণেই একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারে না শক্তি সরকার। একবার তাঁর ইচ্ছে হয় বৌবাজার অঞ্চল থেকে মদনদের ডেকে এনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করান। কিন্তু চন্দ্রকান্তর চাল-চলন দেখে ঠিক ভরসা পান না। উপযাচক হয়ে এসব ব্যাপারে এগিয়ে যাবার ফল যে সাধারণতঃ খারাপই হয়ে থাকে এ কথা সে জানে। এবং জানে বলেই উপযাচক হতে সাহস হয় না।

অবশেষে আর একদিন সন্ধ্যায় শক্তি সরকারের ডাক পড়লো চন্দ্রকান্তর কাছে। মনে আশা এবার হয়তো চন্দ্রকান্তর নির্দেশে তাকে ছুটতে হবে বৌবাজার অঞ্চলে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শক্তি সরকার লক্ষ্য করে যে চন্দ্রকান্ত সেদিনও একা বসে বসে মদ খাচ্ছেন। তবে, মদ খেলেও তিনি সেদিন সংযত, ধীর স্থির।

হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে চন্দ্রকান্ত তাকান শক্তির দিকে। তারপর বললেন, শোন শক্তি, তুমি সেদিন যেন কোন্ মেয়েটির কথা বলেছিলে?

— আজ্ঞে সেই বৌবাজারের দীপার কথা। তাড়াতাড়ি জবাব দেয় শক্তি।

— উফ্, নো—নো সেই থার্ডক্লাশ মেয়েটার কথা বলছি না, বলতে থাকেন চন্দ্রকান্ত; তুমি না সেদিন একটি সুন্দরী অথচ গরীব মেয়ের কথা বলছিলে যার নাকি পয়সা-কড়ির অভাবে বিয়ে হচ্ছে না?

আনন্দে বুকের হৃদপিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে শক্তি সরকারের। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। জবাব দেয় শক্তি, আপনি কি সাবিত্রীর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলতে থাকেন চন্দ্রকান্ত, সাবিত্রীই বটে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে?

চন্দ্রকান্তর কথাটাকে এক রকম লুফে নিয়ে বলতে থাকে শক্তি সরকার, না—না, এখনও হয় নি। তা'ছাড়া, হবেই বা কেমন করে? পয়সা-কড়ি কোথায়?

এরপরে চন্দ্রকান্ত যা বললেন তাতে সেই মুহূর্তে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করে শক্তি সরকারের। এতদিনে বুঝি তার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, তুমি ঐ সাবিত্রী সম্পর্কে খবরাখবর নাও। আমার বয়সটা যদিও একটু বেশি কিন্তু তাতে আর এমন কি যাবে আসবে? মেয়েটি ও তার মা-বাবা যদি রাজি থাকে তা'হলে তাকে আমি বিয়ে করবো। না—না, খারাপ কিছু মনে করো না, তাকে আমি শাস্ত্রমতেই বিয়ে করবো। এমনি একা একা আর ভালো লাগছে না।

— কি যে বলেন আপনি! জবাব দেয় শক্তি সরকার, তারা তো পা বাড়িয়েই আছে। অবশ্যি মেয়েটির বাপ নেই, মা আছে। আপনি সাবিত্রীকে বিয়ে করতে রাজি হলে তো ওরা

বর্তে যাবে।

গ্লাসে নতুন করে মদ ঢালতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করেন চন্দ্রকান্ত। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওসব মোসাহেবি কথা ছাড়ো। যা বলছি তা করো। তাদের অভিমত নাও। কনে দেখার আর দরকার নেই। তার ফটো তো দেখিয়েছো আমাকে। ওতেই আমার হবে। তারা রাজি থাকলে সামনের কোন একটা ভালো তারিখেই আমি বিয়ে করতে রাজি।

সেদিন হেঁটে বাড়ি ফিরবার পথে শক্তি সরকারের মনে হচ্ছিল সে যেন হেঁটে নয়, উড়ে চলেছে। এতই হাল্‌কা মনে হচ্ছিল নিজেকে।

কথাটা শুনে পারুলবালা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সহসা কথাটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। অবশেষে পানের ছোপ লাগানো দাঁত বের করে খল্ খল্ করে হেসে উঠে শক্তি সরকারের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে—ঠাট্টা করছো নাকি?

— না মাসি ঠাট্টা নয়। সত্যিই বলছি। তবে সবই নির্ভর করছে তোমার মেয়ের ওপর। আমার শর্তমতো কাজ করতে রাজি হলে তবেই আমি এ ব্যাপারে এগোতে পারি। বাব্বাঃ বুড়োটাকে রাজি করাতে কি কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

— তোমার আবার কি শর্ত? জিজ্ঞেস করে পারুলবালা।

— বারে, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে? আমার শর্ত—

কথাটা শেষ করতে পারে না শক্তি সরকার। ঘরে ঢোকে বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী—সাবিত্রী।

সাবিত্রীকে দেখেই বলে ওঠে পারুলবালা, এই তো তুমি এসে গেছ। এবার তোমরা দুজনে বোঝাপড়া করে নাও। আমাকে আর মিছি মিছি এর মধ্যে টেনো না। কথাটা শেষ করেই পারুলবালা আড়চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়েই গম্ভীর হতে চেষ্টা করে।

সাবিত্রী বাস্তবিকই সুন্দরী। তবে তার সেই সৌন্দর্যের ওপর সবে দু'এক পোছ কালি পড়তে শুরু করেছে। সত্যি বলতে কি এ জন্যে তার মা পারুলবালাই দায়ি। তার ইচ্ছে মেয়ে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সাবিত্রীর ইচ্ছে কিন্তু তা নয়। মার এই ঘৃণ্য জীবনকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। এই নিয়েই মা-মেয়েতে মন কষাকষি। অবশেষে জয় হলো পারুলবালার। চোখের জলের মধ্যেই সাবিত্রীকে নামতে হলো তার মায়ের পথে। তবে সে এখনও একেবারে হাল ছাড়ে নি। এখনও তার চোখের সামনে ভাসে একটি সুন্দর ছোট সংসার, একজন প্রেমময় স্বামী। এখনও সে স্বপ্ন দেখে কোন এক রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে এসে এই রাক্ষুসে পুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তাকে। এখনও হয়তো সময় আছে, বেশি দেরি হয় নি।

সাবিত্রীর তখন যা মনের অবস্থা তাতে বোধহয় একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া আর সবকিছুই সে করতে পারে। চন্দ্রকান্তর মতো একজন প্রৌঢ়কে পতিত্বে বরণ করা তো কিছুই নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঐ শক্তি সরকারের শর্ত নিয়ে। আপাত নিরীহ এই শর্তটির পেছনে যে একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেটা যে মোটেই সৎ নয় সেটুকু অনায়াসেই বুঝতে পারে সাবিত্রী। তা'ছাড়া নিজের পরিচয়টাও গোপন রাখতে হবে চন্দ্রকান্তর কাছে। ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। যার সঙ্গে সে ঘর করবে তার কাছে বরাবর এসব কথা গোপন রাখা বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু উপায় বা কি? এছাড়া, এই নরককুণ্ড থেকে মুক্তির আর তো কোন পথ নেই। সে নিঃসন্দেহে সুন্দরী, কিন্তু সবকিছু জেনে শুনে তাকে বিয়ে করার মতো উদার মনের মানুষ সংসারে একান্তই দুর্লভ। কাজেই সোজা পথে না গিয়ে বাঁকা পথে চলা ছাড়া

আর তো কোন পথ খোলা নেই তার।

অবশেষে শক্তি সরকারের শর্তেই রাজি হতে হলো সাবিত্রীকে। পারুলবালা কেবল মুখ বেঁকিয়ে বলে, হুঃ, পিঁপড়ের পাখা গজালে তাকে আগুনে পুড়েই মরতে হয়। মেয়েটার হয়েছে ঠিক তাই। মা দিদিমার পথ ছেড়ে উনি গেরস্থ হবেন! তা' যাচ্ছো, যাও। তবে, যেদিন শ্যাল-কুকুরের মতো লাথি মেরে তাড়াবে সেদিন বাছাধন টের পাবে কত ধানে কত চাল! আমার আর কি? ভেবেছিলাম এ লাইনে পাকাপাকি বসিয়ে দিয়ে যাবো, তা'আর হলো না। যাক্‌গে, আমি আর ওর ব্যাপারে নেই।

বাস্তবিকই পারুলবালার কিছু নয়। সব কিছু যেন ঐ শক্তি সরকারের। বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি। ব্যবস্থা যা কিছু সবই করতে হলো তাকে। অবশেষে একদিন কোনরকম আড়ম্বর ছাড়াই চন্দ্রকান্তর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সাবিত্রীর

বিয়ের মাস কয়েক পরে হঠাৎ একদিন চন্দ্রকান্তর বাড়িতে আবির্ভাব ঘটলো তাঁর পুত্র প্রবীরের।

চন্দ্রকান্তর মনটা এখন শান্ত। স্ত্রী সাবিত্রী তার মেয়ের বয়সী হলেও তার আচার-ব্যবহারে বিশেষ করে প্রৌঢ় স্বামীর প্রতি আচরণে চন্দ্রকান্তর অভিযোগ করার মতো বাস্তবিকই কিছু নেই। বেশ সহজ সরল, স্বাভাবিক। কেবল একটা ব্যাপারেই মাঝে মধ্যে তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করে, এমন সুন্দর মুখের অধিকারিণী তাঁর স্ত্রীর মুখে হাসি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। এ নিয়ে চন্দ্রকান্ত একদিন প্রশ্নও করেছিলেন সাবিত্রীকে। একটু ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল সাবিত্রী, চিরকাল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেছি বলেই হয়তো মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে।

বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে রাগে থর থর করে কাঁপছিল প্রবীর। তীক্ষ্ণ চাপাকণ্ঠে সে বলতে থাকে, ঐ মেয়েছেলেটাকে কোত্থেকে জোগাড় করলে জানি না। তবে, তোমার প্রবৃত্তিকে বলিহারি দিই, বাবা। এই বয়সে এমন একটা কাজ তুমি করলে কেমন করে? নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়েছেলেকে —

কথাটা শেষ করতে পারে না প্রবীর। তার আগেই বজ্রনির্ঘোষে বলে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, একজন মহিলা সম্পর্কে যে সম্ভ্রম নিয়ে কথা বলতে হয় সেই জ্ঞানটুকুও কি তোমার লোপ পেয়েছে? ভুলে যেও না মেয়েছেলেটাকে বলে যাকে এমনি অবজ্ঞা করছো সে-ই এখন তোমার মা।

— আমার মা? চিৎকার করে ওঠে প্রবীর, ওকে আমি মা বলে মানি না।

— তুমি না মানলেও কিছু যায় আসে না। আইনমতো সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী— তোমার মা।

— বিবাহিতা স্ত্রী! বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলতে থাকে প্রবীর, তোমার পয়সা কড়ির লোভে যারাই তোমার কাছে আসবে তাদের প্রত্যেককেই যদি মা বলে মানতে হয় তা'হলে তো খুব বিপদ, বাবা।

—মানা না মানা তোমার ইচ্ছে, বলে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, তবে আইনমত সে তোমার মা। আর, সে আমার পয়সা-কড়ির লোভে আমার কাছে এসেছে কিনা সেটা তোমার বিবেচ্য বিষয় নয়।

—কে বললে নয়? সেটা আলবৎ আমার বিবেচ্য। আজ যদি তুমি তোমার সবকিছু তার নামে লিখে পড়ে দিয়ে যাও তা'হলে কি মনে করেছো আমি চুপ করে থাকবো?

একটু সময় চুপ করে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তারপর বলতে থাকেন, শোন খোকা, আমার

বিষয় সম্পত্তি আমি কাকে দেব সেটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। মনে করো না, তুমি আমার ছেলে বলে সবকিছু তুমি পাবে!

— হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি জানি, বাবা। আর এও জানি আজ হোক কাল হোক ঐ ডাইনী মেয়েছেলে তোমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নেবে। একমাত্র এই জন্যেই ওর আগমন।

— বেশ তো, আমার যদি তেমন ইচ্ছেই হয় তা'হলে তুমি আমাকে বাধা দেবে কেমন করে?

— আইনের সাহায্যে।

— আইন আমার কী করবে? আমার নিজের সবকিছু আমি যাকে খুশি তাকেই দিয়ে যেতে পারি। তাতে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না।

— নিশ্চয়ই পারে। তোমার নিজের রোজগারের সবকিছু তুমি যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে দিতে পারো। কিন্তু তোমার বাবা অর্থাৎ আমার দাদুর কাছ থেকে তুমি যা পেয়েছ তার ওপর আমারও অধিকার। সেসব তুমি তোমার খুশি মতো বিলি করে দিতে পারো না। দেশের আইন সে কথাই বলে।

— দেখ খোকা, এসব আইনের ব্যাপার নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তবে, এটা তুমি জেনে রেখ, এর এক কণাও অন্ততঃ তুমি পাবে না। এই আমার শেষ কথা।

কথাটা শেষ করেই চন্দ্রকান্ত ছেলের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবীর। রাগে উত্তেজনায় চোখ দুটো যেন জ্বলতে থাকে তার। তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকায় চন্দ্রকান্তর দিকে। তারপর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকে, নিজের পাওনা-গণ্ডা কি করে আদায় করতে হয় তা' আমি জানি।

পিতা-পুত্রে ঝগড়া। বাড়ির চাকর-বাকরেরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে, আর পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল সাবিত্রী।

প্রবীর বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী ঘরে ঢোকে। অপলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকান্তর দিকে। তারপর একটু কাছে সরে এসে বললে, এমনি চেঁচামেচি করে শরীর খারাপ করে লাভ কি, বলো?

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে সাবিত্রীর দিকে একবার তাকান। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, আমিও দেখবো ও কতখানি শক্তি ধরে।

।।৩।।

সুখ জিনিসটা যখন একটা মানসিক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়, তখন সেই বিচারে সাবিত্রীকে সুখী বলাই চলে। কিন্তু সত্যিই কী সুখী সাবিত্রী? নিরবিচ্ছিন্ন সুখ যাকে বলে তা কি পাচ্ছে সে? বোধহয় না। জীবনে যা সে চেয়েছিল তার চাইতে ঢের বেশি পেয়েছে সে। এত পাওয়া তার কল্পনারও বাইরে ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পাওয়ার সেই বিস্ময়ের ঘোরটুকু কেটে যেতেই

একটা হারাবার ভয় পেয়ে বসে তাকে। অতিরিক্ত পাওয়ার বিপদই এখানে। পাওয়ার পরিমাণ যতই বাড়ে হারাবার ভয়ও বাড়তে থাকে ঠিক সেই অনুপাতে। তার ওপর গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই যে একটা ছলনা, একধরনের লুকোচুরি ছিল সেটাই প্রতিনিয়ত সেই হারাবার ভয়টাকে একটা ভয়ানক আশঙ্কার স্তরে ঠেলে তুলতে থাকে। হ্যাঁ, ছলনা ছাড়া কি? নিজের আসল পরিচয় গোপন করে হঠাৎ রাতারাতি সে এই সংসারের কর্ত্রী হয়ে এসে বসেছে। একথা যদি কোনরকমে জানাজানি হয় তাহলে যে তার কি অবস্থা হবে তা' ভাবতেও শিউরে উঠে সাবিত্রী। তার ওপর রয়েছে শক্তি সরকারের চাহিদা। চাহিদাই বটে। উত্তরোত্তর সেই চাহিদা বেড়েই চলেছে। কিন্তু কোন উপায় নেই সাবিত্রীর। বিয়ের আগে শক্তি সরকার যে শর্ত আরোপ করেছিল তা' থেকে মুক্তির কোন পথই খুঁজে পায় না সে। শর্তটা এমন কিছু নয়—শক্তি সরকারের কথামতো চলতে হবে তাকে। অতি নিরীহ সাধারণ শর্ত। কিন্তু বিয়ের পরেই সে টের পেল যে সেই সাধারণই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। প্রথম প্রথম শক্তি সরকার তাকে উপদেশ দিতো কেমন করে এই সংসারে এসে চলতে ফিরতে হবে, কথাবার্তা বলতে হবে ইত্যাদি। সাবিত্রীও এটাকে গুরুজনের উপদেশ মনে করেই খুশি মনে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে টের পেল যে সে নিজে শক্তি সরকারের হাতের ছিপের চার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম প্রথম দু' একশ' টাকা। তারপরেই এলো হাজার হাজারের প্রশ্ন। সাবিত্রী কোনরকম ওজর আপত্তি দেখাতে চেষ্টা করলেই শক্তি সরকার বলে উঠতো, দেখ সাবিত্রী, তুমি তো এখানে নতুন এসেছো, আমি তোমার স্বামীর ব্যবসার ম্যানেজার। এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি। তোমাদের শোবার ঘরের স্টিলের আলমারির মধ্যে যে টাকা রয়েছে তার সবটাই কালো। ঐ টাকাকে সাদা করা সম্ভব নয় বলেই কর্তা ওগুলো ব্যাঙ্কে রাখেননি। তা'ছাড়া ঐ টাকার তেমন একটা হিসেবও নেই। কাজেই তোমাকে মাঝে মাঝেই আমার প্রয়োজন মতো ওখান থেকে টাকা এনে দিতে হবে।

— আমাকে আপনি চুরি করতে বলছেন? বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করেছিল সাবিত্রী।

মুখে একটু কুটিল হাসি ফুটিয়ে তুলে জবাব দিয়েছিল শক্তি সরকার, এতো তোমার নিজের টাকা। নিজের টাকা সরানোকে চুরি বলে না। কর্তার পয়সা কড়ির ওপর যাতে তোমার অধিকার জন্মে তেমন ব্যবস্থাই তো আমি করে দিয়েছি তোমাকে এখানে এনে।

সাবিত্রী আর কোন জবাব দেয় নি! দিতে পারে নি। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে এখন শক্তি সরকারের হাতের পুতুল। তার ইচ্ছে মতোই তাকে চলতে হবে। আর যদি সে না চলে? তার পরিণতির কথাও সাবিত্রীর অজানা নয়। তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সত্যের শক্ত জমির ওপর।

লোহার ব্যবসা। কালো টাকার ছড়াছড়ি। সেই টাকা এসে আশ্রয় লাভ করে চন্দ্রকান্তর শোবার ঘরের আলমারিতে অতি সংগোপনে। আর তা' থেকে নিয়মিত একটা মোটা অংশ ধীরে ধীরে এসে পৌঁছতে থাকে শক্তি সরকারের পকেটে। এমনিভাবেই সাবিত্রীর মাধ্যমে হাতবদল হতে থাকে চন্দ্রকান্তর কালো টাকা।

মাঝে মাঝে নিজের ওপরেই মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সাবিত্রীর। এমনিভাবে সে কী করে চলেছে? একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে কেবল সে ঠকায়ই নি, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। নিজের ওপরেই ঘৃণা জন্মে তার। ইচ্ছে হয় নিজের মুখেই

সবকিছু প্রকাশ করে দিয়ে শক্তি সরকারের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাহসে কুলায় না। নিজের ভবিষ্যতের ওপর এত তাড়াতাড়ি যবনিকা টেনে দিতে ইচ্ছে হয় না।

পাথর যতই শক্ত হোক, বেশি ঘষাঘষির ফলে তারও ক্ষয় হয়। একদিন সত্যিই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো সাবিত্রীর। সে শক্তি সরকারের মুখের ওপর স্পষ্ট বললে, আমি আর পারব না আপনার কথামতো চলতে। পারবনা আর পাপের বোঝা বাড়াতে।

— পাপ! বিস্মিত কণ্ঠস্বর শক্তি সরকারের, তোমার মুখে পাপের কথা?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে সাবিত্রী, কেন, আমি কি মানুষ নই?

— নিশ্চয়—নিশ্চয় তুমি মানুষ। তবে পাপের মধ্যেই যার জন্ম তার আবার পাপের ভয় কি? সাপ কি কখনও নিজের বিষকে ভয় করে?

শক্তি সরকারের কথায় সেই মুহূর্তে চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে সাবিত্রীর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে তাকে এত সহজে রেহাই দেবার মতো মানুষ শক্তি সরকার নয়।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠে সাবিত্রী, আপনি যাই বলুন না কেন, আমি আর আপনার কথা মতো চলতে পারবো না।

— জানো তার ফল কি হতে পারে? গম্ভীর কণ্ঠে সাবিত্রীকে শাসায় শক্তি সরকার।

জবাব দেয় সাবিত্রী, জানি। আপনি আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেবেন, এই তো? বেশ তাই দিন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দিন। আমি আর পারছি না এই যন্ত্রণা সহ্য করতে—বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যায় সাবিত্রী।

ইদানীং সাবিত্রী আর বেরোয় না শক্তি সরকারের ,সামনে। খবর দিলেও না। চাকরকে দিয়ে বলে পাঠায় যে তার শরীর খারাপ। শক্তি সরকার সাবিত্রীর কাছে এমন সময় আসে যখন চন্দ্রকান্ত বাড়ি থাকেন না।

সাবিত্রীর জবাবে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে শক্তি সরকার অবশেষে একসময় চলে যায় সেখান থেকে।

সাবিত্রী কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মুখোমুখি হবার আশঙ্কা করে থাকে যখন নাকি চন্দ্রকান্ত বাড়ি এসে সোজাসুজি তার কৈফিয়ৎ তলব করে বসবে। কিন্তু তার সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় না। তবে কি শক্তি সরকার তার পরিচয় প্রকাশ করে দেয় নি? কিন্তু কেন? এমনিভাবে যে আর থাকা যায় না। অমঙ্গল যদি আসেই তবে তাড়াতাড়ি আসাই ভালো।

লোভের হাতছানি বড়ই প্রবল। বিশেষ করে সেই লোভ যদি অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা'হলে তার হাতছানি থেকে রেহাই পাওয়া সত্যিই কষ্টসাধ্য। শক্তি সরকারের লোভ এখন পর্বতপ্রমাণ। সে ইতিমধ্যেই মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সাবিত্রীর কাছ থেকে। সে ভালই জানে সাবিত্রীর পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে সাবিত্রীকে বেকায়দায় ফেলতে পারলেও তাতে তার নিজের কোনো লাভ হবে না। মাঝখান থেকে স্রোতের মুখে পাথর চাপা দিয়ে চিরকালের মতো নালার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার চাইতে ওপথে না গিয়ে সাবিত্রীকে নরমে গরমে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে অন্ততঃ ভবিষ্যতে নালা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়ালেও গড়াতে পারে।

সাবিত্রীর মাধ্যমে আমদানী আপাততঃ বন্ধ। কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকা চলে কেমন

করে? কাজেই এবার অন্য পথ ধরতে মনস্থ করলে শক্তি সরকার। চন্দ্রকান্তর ব্যবসার ম্যানেজার সে। কাজেই তার কিছু ক্ষমতা থাকা স্বাভাবিক। সেই ক্ষমতার বলেই বেচা-কেনার ক্যাশ থেকে কিছু কিছু করে সরাতে আরম্ভ করলে শক্তি সরকার।

ব্যবসা ভালই চলছে চন্দ্রকান্তর। তার ওপর বিয়ের পর থেকে তাঁর মনে এই ধারণাটাই একটু একটু করে শেকড় গাড়তে শুরু করলে যে ম্যানেজার শক্তি সরকারই তাঁর একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তার প্রচেষ্টাতেই সাবিত্রী এসেছে তাঁর ঘরে। তাই শক্তিকে একটু বেশি পরিমাণেই বিশ্বাস করতে শুরু করলেন তিনি। তা'ছাড়া একটা অবলম্বন হাতছাড়া হয়ে গেলে আর একটা অবলম্বনের জন্যে মানুষের প্রাণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এটাই সংসারের নিয়ম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চন্দ্রকান্তর একমাত্র অবলম্বন ছিল তার ছেলে প্রবীর। কিন্তু সে অকস্মাৎ সরে যাওয়াতে চন্দ্রকান্ত আরও বেশি করে নির্ভর করতে শুরু করলেন শক্তি সরকারের ওপর। আর শক্তিও সে সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে।

পাপকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায় না। একদিন না একদিন তার প্রকাশ ঘটবেই। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় চন্দ্রকান্ত খুবই কর্মঠ। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া বাস্তবিকই শক্ত। কাজেই একটু একটু করে শক্তি সরকারের আসল রূপ প্রকাশ হতে আরম্ভ করল চন্দ্রকান্তর সামনে! প্রথম প্রথম এটাকে ঠিক গ্রাহ্য করতেন না চন্দ্রকান্ত, কিন্তু অচিরেই তিনি টের পেলেন যে গ্রাহ্য না করে উপায় নেই। তাই একদিন তিনি স্পষ্টই তাকে বললেন, শোন শক্তি, আমার মনে হচ্ছে হিসেবে গরমিল করার ছিদ্রপথে টাকা-পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে।

— না — না, ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে বলতে থাকে শক্তি সরকার, ওসব কিছু নয়, আপনার মনের ভুল মাত্র।

তক্কে তক্কে রইলেন চন্দ্রকান্ত। একবার যখন সন্দেহের বীজ তার মনে ঢুকেছে তখন তাকে তাড়ানো সহজ নয়। অবশেষে একদিন সবিস্ময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে হিসেবে কারচুপি করে একটা মোটা অঙ্কের টাকা বেরিয়ে গেছে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে, আর এ জন্যে একমাত্র দায়ী তাঁরই ম্যানেজার শক্তি সরকার।

ব্যাপারটার টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কঠিন হয়ে ওঠে চন্দ্রকান্তর। বিশ্বাসের এমন প্রতিদান! মানুষ এতটা নেমকহারাম হতে পারে!

শক্তিকে ডেকে কৈফিয়ত চাইলেন চন্দ্রকান্ত, বল এবার কি তোমার কৈফিয়ত?

শক্তি এবারেও ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করে দিতে চেষ্টা করে জবাব দেয়, না না, বোধহয় হিসেবপত্রে কোনরকম ভুল—!

কথাটা শেষ করতে পারে না শক্তি। তার আগেই গর্জে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, শোন শক্তি, মাতাল হই কিম্বা যাই হই না কেন, এত বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন চালাচ্ছি তখন মনে করো না যে আমার মগজে বুদ্ধির অভাব ঘটেছে কিম্বা রঙিন চোখে আমি ভুল দেখছি। আসলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাই-ই সঠিক। কোন অবস্থাতেই তুমি এবার আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। এবার তাকে সামলানো দায়। তাই শক্তি সরকার এবার অন্যপথ ধরে বলে ওঠে, না—না, একি বলছেন আপনি? আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কি এতই সহজ? হয়তো ঠিকই ধরেছেন আপনি। টাকাপয়সা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। এর জন্যে হয়তো এখানকার স্টাফদের মধ্যেই কেউ দায়ী।

ঠাট্টার সুরে টেনে টেনে বলতে থাকেন চন্দ্রকান্ত, ঠিক বলেছ তুমি। এখানকার স্টাফ ছাড়া আর কে দায়ী হতে যাবে? তবে সেই স্টাফ হচ্ছ স্বয়ং তুমি।

— আমি? একবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো সুরে বলে ওঠে শক্তি সরকার, আমাকে দায়ী করছেন?

— হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি নিজের হাতে এসব করেছ। প্রমাণ আমার হাতেই রয়েছে।

এবার শেষ চেষ্টা করে শক্তি বললে, বেশ তো প্রমাণ থাকলে তা দেখান।

বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠেন চন্দ্রকান্ত, তোমাকে প্রমাণ দেখাতে যাব কেন? প্রমাণ দেখাব পুলিশের কাছে।

সেইদিনই চন্দ্রকান্ত পুলিশের কাছে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনেন শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে। এবং পুলিসও গ্রেপ্তার করে তাকে। চন্দ্রকান্তও চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন শক্তিকে।

শক্তি সরকারকে তাড়িয়েও কিন্তু মনে শান্তি পান না চন্দ্রকান্ত। শক্তি কেবল তাঁর পুরানো কর্মচারীদেরই অন্যতম ছিল না, সে ছিল তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি স্তম্ভ। সেই লোককে তাড়িয়ে চন্দ্রকান্তর পক্ষে মনে মনে খুশি না হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তার ওপর এমনিভাবে একটি একটি করে তাঁর অবলম্বন নিজের কাছ থেকে সরে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণাও তাঁর কম নয়। কিন্তু উপায় নেই। জেনে শুনে ঘরে কালসাপ পুষতে পারেন না তিনি। তাতে ধনে প্রাণে মারা পড়ার সম্ভাবনা।

কাছের মানুষগুলো একে একে সরে যাচ্ছে চন্দ্রকান্তর কাছ থেকে। প্রথমে গেল তাঁর প্রথমা স্ত্রী। তারপরে পুত্র প্রবীর। অবশেষে শক্তি সরকার। কাজেই চন্দ্রকান্ত এবার সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী সাবিত্রীর ওপর। সেই এখন তাঁর প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া, সেই রঙীন তরল পদার্থ তো আছেই যার তপ্ত চুম্বন প্রৌঢ় চন্দ্রকান্তকে ভুলিয়ে দেয় সবকিছু। একদিকে সাবিত্রী, আর অন্যদিতে মদ—এই দু'য়ের মাঝে চন্দ্রকান্ত তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

নির্ভর করতে চাওয়া আর নির্ভরশীল হওয়া এক কথা নয়। সাবিত্রী বুঝতে পারে চন্দ্রকান্ত তার ওপর নির্ভর করতে চাইছেন। মানসিক স্থৈর্যের জন্যে একটা অবলম্বন খুঁজছেন। কিন্তু তেমন নির্ভরশীল হবার মতো মানসিক জোর সাবিত্রীর কোথায়? একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় যে লোক রাতদিন শঙ্কিত হয়ে থাকে তার পক্ষে অন্যের অবলম্বন হওয়া কতখানি সম্ভব? তাই, চন্দ্রকান্তর সাগ্রহে বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানি ইচ্ছে থাকলেও যেন ঠিক ধরে রাখতে পারে না সাবিত্রী। চন্দ্রকান্ত কিন্তু এর অন্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে তাঁদের স্বামী-স্ত্রী বয়সের ব্যবধানই এর কারণ। যুবতী নারী সম্ভবতত তার প্রৌঢ় স্বামীকে নিজের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মনে মনে দুঃখিত হন চন্দ্রকান্ত। তবে কি তিনি ভুল করেছেন সাবিত্রীকে বিয়ে করে? বোধহয় তাই। এমনিভাবে একটি যুবতী নারীকে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিয়ে করা উচিত হয় নি তাঁর।

চন্দ্রকান্ত একদিন বললেন সাবিত্রীকে, আমি ঠিক করেছি আমার যা কিছু আছে সব আমি তোমায় লিখে দেব।

স্বামীর জন্যে চা তৈরি করতে করতে চোখ না তুলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী, কেন,

হঠাৎ এসব করতে যাচ্ছো কেন?

সামান্য হেসে চন্দ্রকান্ত বললেন, না, হঠাৎ নয়। অনেক দিন থেকেই কথাটা ভাবছিলাম।

চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী আবার বললে, না এসব করতে যেও না। তাতে অশান্তি বাড়বে।

— কিসের অশান্তি? বিরক্তি মিশ্রিত বিস্মিত দৃষ্টি চন্দ্রকান্তর চোখে।

তেমনি শান্ত সুরে জবাব দেয় সাবিত্রী, তোমার উপযুক্ত ছেলে রয়েছে। তাকে বঞ্চিত করে—

কথাটা শেষ করতে পারে না সাবিত্রী। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন চন্দ্রকান্ত, ঐ অপদার্থটার নাম আমার সামনে উচ্চারণ করো না। ওকে আমি একটি পয়সাও দেব না।

।। ৪ ।।

পুলিস তদন্ত চলছে। জামিনে ছাড়া পেয়েছে শক্তি সরকার। এত কাণ্ডের পরেও সে মাঝে-মধ্যে আসে চন্দ্রকান্তর কাছে। অনুনয় বিনয় করে তাঁকে। বলে, আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। জীবনে আর এ ধরনের কাজ আমি করব না। আপনার যে টাকাটা নিয়েছি তা' আমি ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

প্রথম প্রথম চন্দ্রকান্ত কঠিন হয়ে উঠতেন শক্তির ওপরে। দৃঢ় কণ্ঠে বলতেন, না — না, চোরের ক্ষমা নেই আমার কাছে। আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছ তুমি।

শক্তি চুপ করে থাকতো। নিঃশব্দে হজম করতো চন্দ্রকান্তর গালাগাল। মাঝে মাঝে মৃদু কণ্ঠে কেবল বলতো, পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তও করব। সেই সুযোগটুকু দয়া করে আমাকে দিন।

একদিন চন্দ্রকান্ত অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন, এখন আমি আর কি করতে পারি? থানায় তোমার নামে অভিযোগ করেছি। পুলিস তদন্ত করছে। মামলা প্রমাণ হলে তারা তোমাকে বিচারের জন্যে কোর্টে পাঠাবে। এক্ষেত্রে আমার নিজের আর কি করণীয় আছে?

চন্দ্রকান্ত যতই এধরনের কথা বলেন শক্তি সরকার ততই তাঁকে অনুনয় বিনয় করে। বলে, আপনি যখন অভিযোগ করেছেন তখন আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সেই অভিযোগ থেকে মুক্তিও দিতে পারেন। দয়া করুন—আমাকে জেল থেকে বাঁচান।

চন্দ্রকান্তর পরিকল্পনার কথা প্রবীরের কানে উঠতে দেরী হয় না। সে জানতে পারে চন্দ্রকান্ত তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি সাবিত্রীর নামে লেখাপড়া করে দেবার জন্য তোড়জোড় করছেন। খাপ্পা হয়ে ওঠে প্রবীর। একটা কিছু উপায় স্থির করতে সে বিনিদ্র রজনী কাটায় কিন্তু কোন উপায়ই তার মাথায় আসে না। সে বুঝতে পারে, মামলা-মোকদ্দমা করে কোন লাভ নেই। এ ধরনের দেওয়ানী মামলা চলবে বছরের পর বছর। এর মধ্যে চন্দ্রকান্ত যদি তাঁর সব সম্পত্তি ঐ মেয়েছেলেটাকে লিখে-পড়ে দেয় তাহলে প্রবীরের আর কিছুই করার থাকবে না। রাগে দুঃখে, ভাবনা চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে প্রবীর। যে করেই হোক বাধা দিতেই হবে চন্দ্রকান্তকে। কিন্তু কেমন করে বাধা দেবে সেটাই একটা মস্ত প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

ছুটির দিন। বাড়িতে একা চন্দ্রকান্ত। একতলায় বাইরের ঘরে বসে লেখাপড়া করছিলেন তিনি। চাকর-বাকরেরা সব ভেতর মহলে। সাবিত্রী বাড়ি নেই, কালীঘাটের নাম করে বেরিয়েছে সে। সঙ্গে গাড়িও নেয়নি। চন্দ্রকান্ত গাড়ির কথা বলতেই জবাব দিয়েছিল সাবিত্রী, ঠাকুর দর্শনে আরাম করে যেতে নেই। আমি ট্রামে-বাসেই যাব। এমনকি, সঙ্গে একজন ঝি-চাকরকে নিতেও আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, রাস্তা-ঘাট আমার অচেনা নয়।

আসলে কালীঘাট যাওয়া একটা উপলক্ষ। বিয়ের পর থেকে সাবিত্রী একটি দিনের জন্যেও তার মা পারুলবালার কাছে যায় নি। পারুলবালা খবর পাঠায় কিন্তু সাবিত্রী যায় না। ঐ বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে যখন একবার সে মুক্তি পেয়েছে তখন জীবনের ঐ অধ্যায়কে ভুলতে গিয়েই মার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চাইছিল সে। কিন্তু, চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? বিশেষ করে নিজের মার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এতই সহজ? যত খারাপই হোক্ না কেন পারুলবালা তার মা। তাই মা'কে মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করতো সাবিত্রীর। সেদিন তাই গিয়েছিল মাকে দেখতে। ইচ্ছা ছিল কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফেরার পথে পারুলবালাকে দেখে আসবে। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই উদ্দেশ্যেই সে সঙ্গে গাড়ি বা কোন সঙ্গী নেয় নি।

বেলা বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে সাবিত্রী চন্দ্রকান্তর কথা জিজ্ঞেস করতেই চাকর-বাকরেরা জানালে যে তিনি নাকি নিচের ঘরে বসে লেখাপড়া করছেন।

ব্যাপারটা একটু অভিনব। ছুটির দিনে দুপুর পর্যন্ত নিচের ঘরে বসে লেখাপড়া করার অভ্যাস চন্দ্রকান্তের নেই। তবে তিনি ওখানে বসে কি করছেন। তবে কি শোবার ঘরের বদলে মদের বোতল নিয়ে সেখানে আসর জমিয়েছেন? অসম্ভব নয়। সাবিত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে হয়তো তিনি তাই করছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সাবিত্রী ভাবতে থাকে, নিচে গিয়ে হয়তো সে দেখতে পাবে মদের ঘোরে চন্দ্রকান্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। অপরিমিত মদ্যপানে আজকাল তাঁর এরকম প্রায়ই ঘটে। চেষ্টা করেও সাবিত্রী তাকে এই পথ থেকে ফেরাতে পারে নি।

ঘরের আধভেজানো দরজা খুলে ভেতরে পা বাড়াতেই চন্দ্রকান্তকে দেখতে পায় সাবিত্রী। যা ভেবেছে ঠিক তাই, মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে বোতল আর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন চন্দ্রকান্ত। তবে তিনি বেহুঁশ নন—মৃত। বুকের রক্তে টেবিলের ধবধবে সাদা চাদরটা লাল হয়ে উঠেছে। সামনে একটা রাইটিং প্যাড্।

স্বামীর রক্তাক্ত নিথর দেহটার দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার করে উঠে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সাবিত্রী।

পুলিস যখন এলো তার অনেক আগেই সাবিত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে। চন্দ্রকান্তকে সামনে থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই মুহূর্তে সম্ভবতঃ তিনি নিজের রাইটিং প্যাডে কিছু লিখছিলেন। হয়তো মদ খেতে খেতেই লিখছিলেন। বুকের রক্তে কাগজের একটা দিক লাল হয়ে উঠেছে। টেবিলের এককোণে পড়ে রয়েছে খোলা কলম।

কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশে ছুঁলে যে কত ঘা তা' বোধহয় খোদ পুলিসও বলতে পারে না।

ছুটির দিন হলেও খবর পেয়ে চন্দ্রকান্তর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই এসে হাজির

হয়েছে। সকলের মুখই বিমর্ষ। তবে সেই বিমর্ষ মুখের ওপরেই ফুটে রয়েছে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন—কে সেই হত্যাকারী? কেন সে হত্যা করল চন্দ্রকান্তকে?

বাড়ির ভেতর তখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে সাবিত্রী। কিন্তু সুস্থ হলেও যেন বোবা হয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছে না। কথা বলছে না প্রবীরও। বাপের নৃশংস হত্যার খবর পেয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল সে। বাপের মৃতদেহের পাশে মাথা নিচু করে চুপ করে বসেছিল প্রবীর। চন্দ্রকান্তর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মীর মুখে খবর শুনে শক্তি সরকারও এসে উপস্থিত হয়েছিল। স্থির হয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে পুলিসের কাজকর্ম দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছিল সে। একজন কর্মী কিছু জিজ্ঞেস করতেই শক্তি সরকার উদাস কণ্ঠে বললে, আমার নামে পুলিশে অভিযোগ করলেও উনি যে আমার কতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তা' আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন লোকের এই পরিণতি!

পুলিসী জেরায় কিন্তু হত্যাকারীর হদিশ পাওয়া গেল না। চন্দ্রকান্তকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সাইলেন্সার জাতীয় কোন যন্ত্র লাগানো ছিল আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে, তাই, বাড়ির চাকর-বাকরেরা কেউ কোন শব্দ শুনতে পায়নি। জেরার জবাবে সাবিত্রী সেদিন কালীঘাট যাবার কথা স্বীকার করলেও তার মা পারুলবালার সঙ্গে দেখা করার কথা চেপে গিয়েছিল। বোধহয় নিজের পরিচয় গোপন করতে চেয়েছিল সে। প্রবীর পারিবারিক কারণে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে তার মন কষাকষির কথা অস্বীকার করে নি। এমন কি তার নতুন মা সাবিত্রীকে সবকিছু লিখে পড়ে দেবার জন্যে তার বাবা যে তোড়জোড় করেছিলেন সেকথাও সে পুলিসকে স্পষ্ট বললে। পুলিশের জেরার জবাব দিতে দিতে শক্তি সরকারের চোখের কোণে জল জমা হয়।

পুলিস ছাড়া বাইরের কোন লোকই জানতে পারে নি মৃত্যুর ঠিক আগে চন্দ্রকান্ত কাকে চিঠি লিখছিলেন এবং সেই চিঠির বিষয়বস্তুই বা কি। এ সম্পর্কে পুলিস প্রথম মুখ খুললে শক্তি সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়। তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞেস করে, চন্দ্রকান্তবাবু তো তহবিল তছরুপের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে একটা অভিযোগ করেছিলেন।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শক্তি সরকার জবাব দেয়, হাঁ, স্যার। তবে, এর পেছনে কয়েকটা ব্যবসা সংক্রান্ত গোপন কারণ ছিল যা নাকি তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের খাতিরে আমি প্রকাশ করে দিতে পারি না।

একটু সময় চুপ করে থেকে তদন্তকারী অফিসার আবার জিজ্ঞেস করে, চন্দ্রকান্তবাবুর এই শেষ চিঠির বিষয়বস্তু কি আপনি জানেন?

—না আমি জানব কেমন করে? আমি তো সেটা দেখিনি। জবাব দেয় শক্তি।

—তিনি আপনার ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

— তাই নাকি? বিস্মিত শক্তি সরকারের চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে নেমে আসে জলের ধারা। ধরা গলায় সে বলতে থাকে, আমি জানতাম এরকম একটা কিছু তিনি করবেন। চিঠিখানা একবার দেখতে পারি?

অফিসার একটা কাগজের মোড়ক খুলে সেই রক্তমাখা চিঠিখানা দেখায় শক্তি সরকারকে—

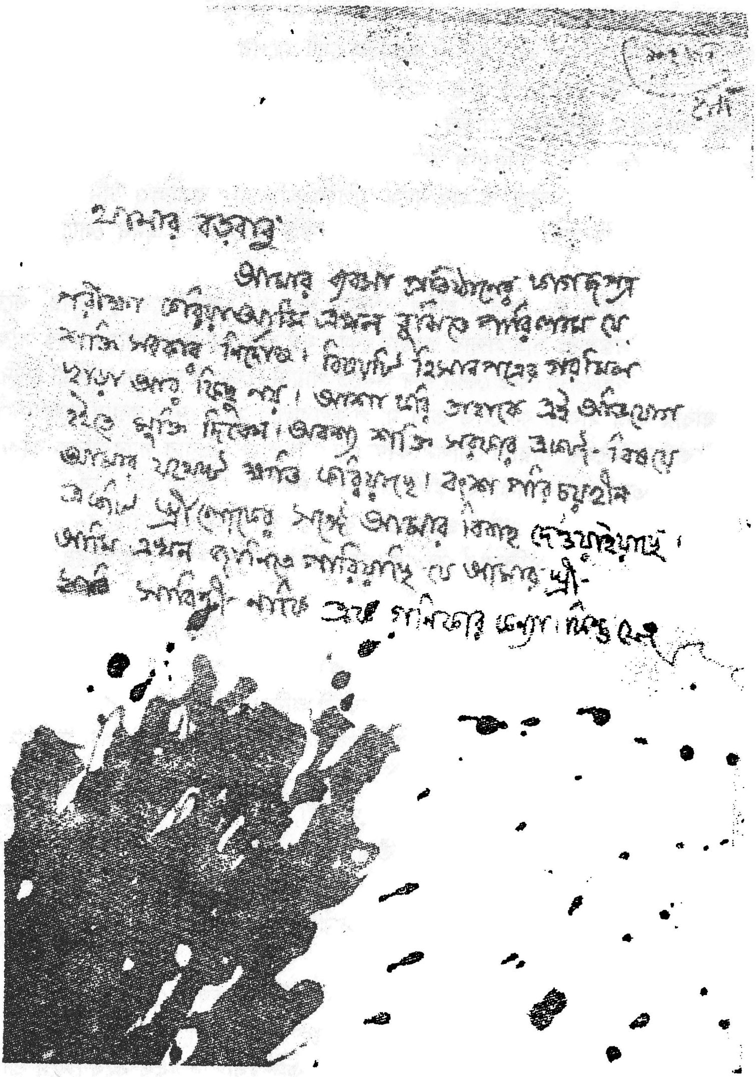
শ্রীযুত বড়বাবু

আমার পূজার প্রতিমাকে ভগবানের পরীক্ষা লইয়াছি। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে শান্তি সরকার নির্দোষ। বিদ্যুদ্দি হিসাবশাস্ত্রের সাহায্যে হয়ত আর কিছু নয়। আপনি যদি তাহাকে এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দিবেন। অবশ্য শান্তি সরকারের ভাবী-বিষয়ে আমার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। বংশ পরিচয়হীন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়াইয়াছে। আমি এখন প্রমাণ পাইয়াছি যে আমার স্ত্রী সাবিত্রী পাপে এই পাপের জন্য দায়ী নয়

রক্তমাখা চিঠি

চিঠিটা অফিসারের হাতে ফেরত দিতে দিতে শক্তি সরকার কেবল বললে, আশ্চর্য!

— কি আশ্চর্য? প্রশ্ন করে অফিসার।

জবাব দেয় শক্তি সরকার, চিঠিতে একদিকে যেমনি তিনি আমার বিরুদ্ধে সেই তহবিল তছরুপের মামলা থেকে আমাকে রেহাই দিতে চেয়েছেন তেমনি আমার বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অভিযোগও এনেছেন। আমি নাকি জেনে-শুনে একটি গণিকা-কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছি।

পুলিস অফিসার চুপ করে থাকে। শক্তি সরকার বলতে থাকে, কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, তাঁর এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে গণিকা কন্যা তা আমি মোটেই জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি যে ওঁর পয়সা-কড়ি হাতিয়ে নেবার লোভেই সে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। তবে, একটা কথা স্যার, নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে এ খবর উনি পেলেন কোত্থেকে?

জবাব দেয় অফিসার, যে করেই হোক এ সংবাদ তিনি যোগাড় করেছিলেন। তবে বুঝতে পারছি না এখবর থানার বড়বাবুকে জানিয়ে তাঁর কি লাভ হতো?

— বোধহয় নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি তাঁর জীবনের আশঙ্কা করেছিলেন। শক্তি সরকার বললে।

— তা'হলে কি আপনার ধারণা এই খুনের সঙ্গে ওঁর স্ত্রী জড়িত?

— মাপ করবেন! এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না।

— আচ্ছা প্রবীরবাবু সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

— আমি কিছু জানি না। তবে তার সঙ্গে যে তার বাবার বনিবনা ছিল না একথা তো সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অফিসার আবার বললে, এটা এখন জলের মতো পরিষ্কার যে বিষয়-আশয়, পয়সা-কড়ির ব্যাপারেই চন্দ্রকান্তবাবু খুন হয়েছেন, কাজেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে এই মুহূর্তে সন্দেহ না করে পারছি না। আর আপনিও সন্দেহমুক্ত হতেন না যদি না মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজের হাতে এই চিঠিখানা তিনি লিখে যেতেন।

— আমাকেও কি আপনার সন্দেহ হয়েছিল?

— নিশ্চয়ই, জোর দিয়ে বলতে থাকে অফিসার, আপনার বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেছেন। আপনাকে হাজতবাস করিয়েছেন, কাজেই আপনার ওপর সন্দেহ করা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই তিনিই যখন চিঠি লিখে আপনার ওপর থেকে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন আপনি যে অন্ততঃ তাঁর মৃত্যুর জন্যে দায়ী নন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শক্তি সরকার একটু ম্লান হেসে বললে, ভাগ্যিস তিনি চিঠিটা লিখে গিয়েছিলেন। নইলে তহবিল তছরুপের মতো আর একটা মামলায় জড়িয়ে পড়তে হতো আমাকে।

যে অবস্থায় সেই রক্তমাখা চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে চিঠিটা চন্দ্রকান্ত নিজে লেখেননি। তবুও সেটা যখন প্রবীরকে দেখান হলো তখন সে স্পষ্টভাবেই জানালে যে ঐ লেখা তার বাবা চন্দ্রকান্তর। এমনকি, সাবিত্রীও অস্বীকার করতে পারলে না যে চন্দ্রকান্ত ঐ চিঠি লেখেন নি। পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করে সাবিত্রীকে, হাতের লেখা যখন আপনার মৃত স্বামীর তখন আপনার নিজের পরিচয় সম্পর্কে তিনি এই চিঠিতে যা লিখেছেন তাও নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করছেন?

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে সাবিত্রী।

—তা'হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে চন্দ্রকান্তবাবুর পয়সাকড়ির লোভেই তাঁর মতো একজন প্রৌঢ়কে আপনি বিয়ে করেছিলেন? জিজ্ঞেস করে অফিসার।

সহসা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে সাবিত্রী। কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে থাকে, না—

না, আপনারা বিশ্বাস করুন, তেমন কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না— সত্যিই ছিল না। আমি কেবল—কেবল—।

কথাটা শেষ না করেই সাবিত্রী কান্নার বেগ সামলাতে না পেরে সেখান থেকে ছুটে চলে যায়।

॥ ৫ ॥

খুনী কে ? প্রবীর, সাবিত্রী, শক্তি সরকারের মধ্যে কেউ? নাকি বাইরের কোন লোক কিম্বা চন্দ্রকান্তর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন ব্যক্তি অথবা তাঁর বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে কেউ? তবে খুনী যেই হোক, খুব হুঁশিয়ার লোক সে। কোন প্রমাণই সে রেখে যায় নি।

তদন্তকারী পুলিস অফিসার অসহায়! আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে খুনীর হদিশ করতে পারলে না কিম্বা খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারলে না কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। তবে এটা স্পষ্ট, খুনের উদ্দেশ্য কোন কিছু চুরি করা নয়, কারণ বাইরের ঘরের দামী জিনিসপত্র এমনকি স্টিলের আলমারিটার গায়েও খুনী হাত দেয় নি। তবে কি চন্দ্রকান্ত যাতে তার বিষয়-আশয় সাবিত্রীকে লিখে দিতে না পারেন তারই জন্যে এই হত্যা? তা'হলে তো দায়ী হতে হয় প্রবীরকে। বাপকে হত্যা করেছে ছেলে! কিম্বা প্রবীর কোন ভাড়াটে লোককে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে? অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন প্রমাণ কোথায়? অথবা, এমনও তো হয়ে পারে সাবিত্রীই ষড়যন্ত্র করে অন্য কাউকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। তার আসল পরিচয় চন্দ্রকান্তর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে হয়তো আশঙ্কা করেছিল চন্দ্রকান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করবেন। তাই, চন্দ্রকান্তকে সরিয়ে দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। বংশ পরিচয় তার যা-ই হোক্ না কেন আইনমতে চন্দ্রকান্তর বিধবা বলে কিছু প্রাপ্য তার হবেই। তাই যদি হয় তা'হলে সাবিত্রীর এই আচার-আচরণ সবটাই কি কেবল অভিনয়? চিঠিতে চন্দ্রকান্ত যা-ই লিখে থাকুন না কেন শক্তি সরকারকেও কি সন্দেহের বাইরে রাখা চলে? এমনও তো হতে পারে যে চন্দ্রকান্ত যে তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে থানার বড়বাবুর কাছে চিঠি লিখছিলেন এ কথা না জেনেই কেবল আক্রোশ বশে সে তাঁকে হত্যা করেছে কিম্বা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে।

হতে পারে অনেক কিছুই, কিন্তু প্রমাণের অভাবে কোন সন্দেহই ধোপে টিকবে না। কাজেই এ ধরনের ঘটনায় পুলিস যা করে থাকে তদন্তকারী অফিসারও তাই করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। আনডিটেক্‌টেড মামলা হিসেবে তদন্তের পরিসমাপ্তি ঘটাতে তৈরি হচ্ছিল। ঠিক এমনি সময়—

না, হত্যাকারী ধরা পড়ে নি, কিম্বা তাকে সনাক্ত করাও যায় নি। শক্তি সরকার আদালতের কাছে দরখাস্ত করে আবেদন জানাল যে চন্দ্রকান্তর সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তহবিল তছরুপের মামলার ওপর যবনিকা ফেলে তাকে যেন রেহাই দেওয়া হয়।

আবেদন যথার্থ। অভিযোগকারী নিজে যেখানে অভিযুক্তকে নির্দোষ বলছেন সেখানে অভিযুক্তকে বিচারের জন্যে আদালতে পাঠান সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিশেষ করে, অভিযোগকারী যেখানে বলছেন যে ব্যাপারটা হিসেবপত্রের গরমিল ছাড়া আর কিছু নয়।

চন্দ্রকান্ত নিজের হাতে লিখেছেন সেই চিঠি। লেখা শেষ হবার আগেই নিহত হলেন তিনি। প্রবীর ও সাবিত্রী দু'জনেই স্বীকার করেছে যে ঐ লেখা চন্দ্রকান্তর নিজের। তবুও কিন্তু পুলিস সরাসরি তহবিল তছরুপের মামলা খারিজ করে দিতে পারে না। নিয়মরক্ষার জন্যে চিঠিটা একবার হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ কণ্ঠধরের কাছে পাঠাতে মনস্থ করে। বিশেষজ্ঞ কণ্ঠধরের আসল নাম বাণীকণ্ঠ ধর। কিন্তু পুলিস ও আইন-আদালত মহলে তিনি ঐ নামেই বিখ্যাত।

চন্দ্রকান্তর বাড়ি থেকে যোগাড় করা হয় তাঁর নিজের হাতে লেখা কিছু কাগজপত্র। এবং

সেই কাগজপত্র ও চিঠিটা তারা পাঠিয়ে দেয় বিশেষজ্ঞের কাছে। কাগজ কলমে বিশেষজ্ঞের সম্মতিটুকু পেলেই মামলা খারিজ করতে আর কোন আপত্তি থাকবে না তাদের।

বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে তদন্তকারী পুলিস অফিসার, আর আশায় আশায় থাকে শক্তি সরকার। এতদিনে তার দুর্ভোগের অবসান হতে চলেছে।

প্রায় মাসখানেক পরে কণ্ঠধরের কাছ থেকে যে রিপোর্ট এল তা দেখে তদন্তকারী অফিসারের তো চক্ষু স্থির। বলেছেন কি ভদ্রলোক? চন্দ্রকান্ত যখন নিজের রাইটিং প্যাডে থানার বড়বাবুকে চিঠি লিখছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর দেহের রক্তে চিঠিখানার একটা দিক ভিজে গিয়েছিল। প্রবীর, সাবিত্রী, শক্তি সরকার এমনকি চন্দ্রকান্তর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই বলেছে যে হাতের লেখা স্বয়ং চন্দ্রকান্তর। আর, কণ্ঠধর কিনা বলছেন যে ঐ লেখা নাকি জাল। চন্দ্রকান্তর হাতের লেখা নকল করে নাকি ঐ চিঠি লেখা হয়েছে। তা'হলে কি কণ্ঠধরের ভুল হয়েছে? কিন্তু তা' কি করে সম্ভব? কণ্ঠধরের মতো ব্যক্তির ভুল হওয়া তো একটা রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাহলে?

থানার তদন্তকারী অফিসার তো কোন্ ছাড়, কণ্ঠধরের খোদ সহকারী-কাম্-শিক্ষানবীশ রজত পর্যন্ত এনিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। রজত সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসেছিল কণ্ঠধরকে, আচ্ছা স্যার, লেখা দুটোর মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও আপনি বলছেন যে চিঠিটা জাল?

মৃদু হেসে কণ্ঠধর বলেছিলেন, হ্যাঁ, বলছি। ভালোমতো দেখতে পারলে তুমিও এ কথাই বলতে।

— আচ্ছা স্যার, চন্দ্রকান্তর নিজের লেখা ও সেই রক্তমাখা চিঠি—এই দু'টোর মধ্যে কোথায় আপনি গরমিল পেয়েছেন?

কণ্ঠধরের স্পষ্ট জবাব, কোথাও নয়।

— তাহলে প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে মিল রয়েছে?

— হ্যাঁ, প্রতিটি অক্ষরের চেহারায় মিল রয়েছে।

— সর্বত্রই মিল এবং কোথাও কোনো গলমিল নেই, এর পরেও আপনি কি করে বলছেন যে চিঠির লেখা জাল?

আবার একটু হাসেন কণ্ঠধর। তারপর বললেন, বলছি এই জন্যে যে চেহারার মিল কোনো মিলই নয়। যে জাল করেছে সে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে চন্দ্রকান্তর লেখার মতো করে চিঠিখানা লিখেছে।

কোথাও এতটুকু ভুল-ভ্রান্তি ঘটে নি? জিজ্ঞেস করে রজত।

জবাব দেন কণ্ঠধর, না, অক্ষরগুলোর চেহারায় কোথাও কোনো ভুল করে নি সেই জালিয়াত।

— তাহলে কী দেখে আপনি বলেছেন যে চিঠির লেখা জাল?

একটু সময় চুপ করে থাকেন কণ্ঠধর। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে বললেন, মন দিয়ে শোনো। অক্ষরগুলোর চেহারার মিলের কোনো দামই নেই এখানে। দেখতে হবে অক্ষরগুলোর চরিত্রে মিল আছে কিনা।

বলতে বলতে কণ্ঠধর নিজের ফাইল থেকে পরের পৃষ্ঠার ছবিখানা বের করে রজতের সামনে ফেলে দেয়।

ছবিখানার ওপর খানিকক্ষণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে রজত কেবল তাকায় কণ্ঠধরের দিকে।

মৃদু হেসে কণ্ঠধর বলতে থাকেন, বুঝতে পারলে না তো? আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি

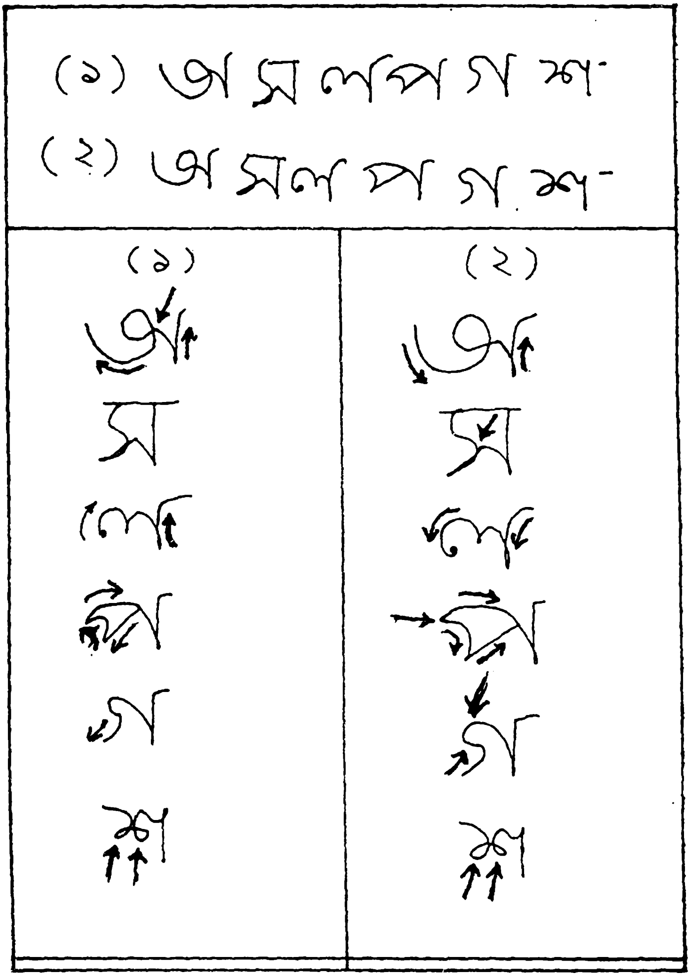

মিল ও গরমিল

ছবির (১) চিহ্নে অ, স, ল, প, গ, শ—এই ছ'টি অক্ষর রয়েছে। এই অক্ষরগুলো ঠিক তেমনি চেহারায় পাওয়া গেছে সেই রক্তমাখা চিঠিখানার মধ্যে। চিঠির যেখানেই এই অক্ষরগুলো রয়েছে সেখানেই তারা ঠিক এই একই ভাবে রয়েছে।

রজত মাথা নেড়ে সায় দেয়।

বলতে থাকেন কণ্ঠধর, ছবির (২) চিহ্নেও দেখ সেই অ, স, ল, প, গ, শ অক্ষর ছ'টি রয়েছে। এগুলো পাওয়া গেছে চন্দ্রকান্তর নিজের লেখার মধ্যে। সর্বত্র একই ভাবে রয়েছে তারা। এবার বল তো এই (১) ও (২)-এর মধ্যে চেহারায় কোনো গরমিল দেখতে পাচ্ছো কিনা।

জবাব দেয় রজত, না স্যার, কোন গরমিল নেই। হুবহু এক।

— হ্যাঁ, ঠিক্ তাই। চেহারায় তারা এক। এ থেকে সাধারণের এই ধারণাই হবে যে, (১) ও (২)-এর লেখক একই ব্যক্তি। অক্ষরের চেহারাই লোককে চিনতে সাহায্য করে। চন্দ্রকান্তর স্ত্রী, পুত্র ও কর্মচারীরাও সেই ধারণাবশেই বলেছিল যে ঐ রক্তমাখা চিঠির লেখক চন্দ্রকান্ত স্বয়ং। কেবল তাই নয়, যে অবস্থায় ঐ চিঠি পাওয়া গেল অর্থাৎ চিঠি লিখতে লিখতে তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন এবং তার দেহের রক্তে চিঠিটা ভিজে গেল—এই অবস্থাটাই চন্দ্রকান্তর নিজের লেখা বলে ঐ চিঠিটাকে চিহ্নিত করতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

রজত চুপ করে থাকে। বলতে থাকেন কণ্ঠধর, কিন্তু সাধারণে ভুল করেছে বলে বিশেষজ্ঞ তো ভুল করতে পারে না। তুমি বিশেষজ্ঞ হতে চলেছ। তোমাকে সাবধান হতে হবে। অক্ষরের চেহারায় ভুললে তোমার চলবে না। তোমাকে দেখতে হবে অক্ষরগুলোর চরিত্র।

চরিত্র বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, স্যার?

জবাব দেন কণ্ঠধর, বোঝাতে চাইছি অক্ষরগুলোর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কীভাবে ওগুলো লেখা হয়েছে।

একটু থেমে কণ্ঠধর আবার রজতকে বলতে থাকেন— মনে রাখবে (১) হচ্ছে রক্তমাখা চিঠির অক্ষর, আর (২) হচ্ছে চন্দ্রকান্তর নিজের লেখার অক্ষর। (১) ও (২)-কে এনলার্জ করে নিচে লম্বালম্বি সাজানো হয়েছে। খালি চোখে (১) ও (২) কে একরকম মনে হলেও মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখলে এদের আসল চরিত্র অর্থাৎ লেখার ধরন বোঝা যাবে।

কণ্ঠধর চুপ করতেই রজত ঝুঁকে পড়ে লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে ওঠে, হ্যাঁ স্যার, এবার যেন এদের তফাৎ একটু একটু বুঝতে পারছি।

— বল তো কী সেই তফাৎ? জিজ্ঞেস করেন কণ্ঠধর।

সামান্য কেশে গলাটা সাফ করে বলতে থাকে রজত, (১)এর লেখক অর্থাৎ রক্তমাখা চিঠির লেখক 'অ' লিখেছে সাধারণ ভাবে অর্থাৎ আগে গোল্লা করে, পরে আঁকড়ি। (২)-এর লেখক চন্দ্রকান্তবাবু নিজে উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ লেজ থেকে একটানে 'অ' লিখতেন। (১)-এর লেখক একটানে 'স' লিখেছে কিন্তু (২)-এ চন্দ্রকান্তবাবু নিজে মাঝখানে থেমে আক্ড়ি দিতেন। তবে—

কথাটা শেষ না করে রজত থামতেই কণ্ঠধর বলে ওঠে, ওকি, থামলে কেন? ভাল করে দেখে বলো 'ল' দু'টোর মধ্যে কি তফাৎ।

মাইক্রোসকোপের নিচে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও কিছু বুঝতে না পেরে রজত হতাশ চোখে তাকাতেই কণ্ঠধর হেসে বললেন, (১)-এর 'ল' হচ্ছে সাধারণভাবে গোল্লা দিয়ে শুরু, আর (২)-এ শুরু উল্টোভাবে আঁকড়ি দিয়ে।

— ঠিক—ঠিক। আনন্দে বলে ওঠে রজত। তারপর আবার পরীক্ষা করতে করতে বললে, (১)-এর 'প' একটানে লেখা। 'গ' মাঝখানে থেকে দু'বারে, আর 'শ'-এর বাঁ দিকের গোল্লা ছোট, ডানদিকেরটা বড়। কিন্তু (২)-এর 'প' মাঝখান থেকে দু'টানে লেখা, 'গ' এক টানে, আর 'শ'-এর বাঁ গোল্লা বড়, ডানটা ছোট।

— রাইট্! প্রশংস কণ্ঠে বলে ওঠেন কণ্ঠধর। তারপর একটু থেমে আবার বলতে থাকেন, লক্ষ্য করে দেখো, অক্ষরের এই বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই একইরকম অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলোই লেখকের 'হেবিট' অর্থাৎ স্বভাব।

রজত লেখাগুলোর ওপর চোখ রেখে হেসে বললে, তবে তো দেখছি (১) ও (২) সম্পূর্ণ আলাদা।

— হ্যাঁ। জবাব দেন কণ্ঠধর।

— তা'হলে (১)-এর লেখক (২)-এর অর্থাৎ চন্দ্রকান্তর লেখা হুবহু নকল করেছে?

— নিশ্চয়ই।

— কিন্তু নকল করার সময় এই ভুলগুলো করল কেন?

— কারণ নকল যে করে সে সর্বদাই লেখার অর্থাৎ অক্ষরগুলোর চেহারার দিকে নজর দেয়। তা'ছাড়া খালি চোখে লেখার ঢং যেমনভাবে দেখায় সেও তা সেভাবেই নকল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেহারাই যে সব নয়, চরিত্র বলেও যে লেখার একটা কিছু আছে তা' তো সে জানে না। তাই এই ভুল।

— তা'হলে, ঐ রক্তমাখা চিঠিখানা চন্দ্রকান্তর নিজের লেখা নয়?

— নিশ্চয়ই না। কেউ নকল করে রক্ত মাখিয়ে মৃতদেহের কাছে ফেলে রেখেছে। এমনও হতে পারে হত্যাকারী চিঠিটা সঙ্গে করেই এনেছিল।

— তা'হলে রক্ত?

একটু সময় চিন্তা করেন কণ্ঠধর। তারপর বললেন, হত্যাকারী যে চন্দ্রকান্তকে গুলি করে তার দেহের রক্ত চিঠির গায়ে মাখিয়ে রেখে চলে গেছে, এতটা ঠিক ভাবতে পারছি না। তবে এমনও হতে পারে চিঠিটা চন্দ্রকান্তকে দেওয়া হয়েছিল পড়তে। তিনি যখন সেটা পড়ছিলেন তখনই তাকে গুলি করা হয়। কিম্বা এমনও হতে পারে চিঠিটা নিয়ে আসার সময় হত্যাকারী ওর গায়ে অন্য কোনো জীবের রক্ত মাখিয়ে এনেছিল।

বিস্মিত কণ্ঠে রজত বললে, দারুণ বুদ্ধিমান তো লোকটা।

হাতের ফাইলটা বন্ধ করতে করতে কণ্ঠধর বললেন, যাক গে, এসব চিন্তা তদন্তকারী অফিসারের। এসব নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনার প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল বলছি যে চিঠিটা চন্দ্রকান্তর নয়। এটা জাল।

হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের এই অভিমতের পরে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তদন্তকারী অফিসারের। এই চিঠির উদ্দেশ্য তহবিল তছরুপের মামলা থেকে নিজের অব্যাহতি। সেই চেষ্টাই করেছিল শক্তি সরকার। তা'ছাড়া সাবিত্রীর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তার আসল পরিচয়ও ফাঁস করে দিয়েছিল। এক ঢিলে দুটো পাখি। তবে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল শক্তি সরকারের। তার বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের মামলা স্বাভাবিক কারণেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল, কারণ হত্যার অপরাধে ফাঁসির হুকুমের পরে তো আর তহবিল তছরুপের মামলা চলে না।

এক গ্লাস সরবৎ

মাত্র কুড়ি বছর।

এই কুড়ি বছর বয়সেই কলেজে কেমিস্ট্রির প্রফেসরের চাকরি পেয়েছিল অভিমন্যু রায়। বলতে গেলে কলকাতার কাছেই এই শহরটি। হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র আধঘণ্টা কিংবা পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ।

এই শহরের মানুষ অভিমন্যু। স্কুল জীবন এখানেই কেটেছে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে এখানকার কলেজেই ইণ্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছিল সে। তারপর প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি ও কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি. এসসি. পাস করে কলকাতায় এসে এম্ এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। সবাই জানতো অভিমন্যু ফার্স্ট ক্লাস পাবেই। তার নিজেরও এমনি ধারণাই ছিল। কিন্তু রেজাল্ট যখন বেরোল তখন দেখা গেল সবাইকে নিরাশ করে অভিমন্যু সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট।

ভীষণ দমে গিয়েছিল অভিমন্যু।

রেসের ঘোড়া জোর কদমে চলতে চলতে সীমানার কাছাকাছি এসে হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়লে চতুর জকির যেমন মনের অবস্থা হয় অভিমন্যুর মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম।

বন্ধুবান্ধবের সমবেদনা কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটের মত লেগেছিল তার। তিন দিন তিন রাত সে বাড়ি থেকে বের হয়নি, দিনরাত শুয়ে বসে নিজের মধ্যে কাটিয়েছে সে।

চতুর্থ দিনে সোজা কলেজে গিয়ে নিজের পুরোন প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করেছিল অভিমন্যু।

আর, দিন সাতেক বাদেই কলেজের সর্বকনিষ্ঠ প্রফেসর অভিমন্যু রায় কেমিস্ট্রির অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছিল ঐ কলেজেই।

কুড়ি বছর বয়সের তরুণ প্রফেসর অভিমন্যু রায় কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল অনায়াসে। মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই এই তরুণ প্রফেসরটি প্রমাণ করেছিল যে অধ্যাপক হতে গেলে পাণ্ডিত্য ছাড়া আর যে একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন অর্থাৎ ছাত্রসমাজকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে টেনে আনার দক্ষতা সেই কৌশলটি তার বিলক্ষণ জানা আছে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই অভিমন্যুকে স্নেহ করতেন প্রৌঢ় প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্র। কিন্তু প্রফেসর হিসাবে তার কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁর এই পুরোন ছাত্রটির জন্যে মনে মনে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন তিনি।

মাঝে মাঝে তিনি অভিমন্যুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতেন। সেখানে সময়ের ওপর কড়া দৃষ্টি না রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকতেন তাঁরা।

এখানেই অভিমন্যুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সদানন্দ মিত্রর কন্যা চিত্রা মিত্রর সঙ্গে।

তন্বী চিত্রা সুন্দরী। বছর ষোল সতের বয়স। সবে স্কুল ছেড়ে ঐ কলেজেই ঢুকেছে। আর্টসের ছাত্রী।

চিত্রার সঙ্গে আলাপের পূর্বে অভিমন্যু জানতোই না যে প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্রর একটি মেয়ে আছে এবং সে ঐ কলেজেরই ছাত্রী।

সেদিনটা ছিল ছুটির দিন।

রাস্তায় আসতে আসতে অভিমন্যু লক্ষ্য করেছিল যে সদানন্দ মিত্রর বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে।

নিশ্চিন্ত মনে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল অভিমন্যু। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে অভ্যাসমত উচ্চারণ করল—"নমস্কার স্যার!"

কিন্তু একি! সদানন্দ মিত্র কোথায়? তাঁর বদলে তাঁর সেই নিজস্ব গদিআঁটা চেয়ারে বসে আছে একটি সুশ্রী মেয়ে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অভিমন্যু। কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল সে। কোনমতে একটা ঢোক গিলে সে উচ্চারণ করল—"ও, স্যার বুঝি বাড়ি নেই?"

কথাকটি বলেই জবাবের আশায় না দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

ততক্ষণে চিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অভিমন্যু শুনতে পায় চিত্রার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর "আপনি যাবেন না, স্যার। বাবা আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।"

ঘুরে দাঁড়ায় অভিমন্যু। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চিত্রার পাশে আর একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

সেইদিন আলাপ হয়েছিল চিত্রার সঙ্গে।

তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে চিত্রা ও অভিমন্যু একজনে আর একজনের অনেক কাছে এসে গেছে। আগে যে অভিমন্যু একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া সদানন্দর বাড়িতে আসতো না সেই অভিমন্যুই এখন ছুটি ছাড়াও কলেজের পর বিকেলের দিকে তাঁর বাড়িতে আসে। উপলক্ষ্য অবশ্য সদানন্দর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু সেই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই তার চঞ্চল চোখজোড়া কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। আলোচনার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে।

সদানন্দ মিত্র অনুযোগ করেন—"তুমি আজকাল বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ, অভিমন্যু।"

লজ্জিত মুখে প্রৌঢ় সদানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে অভিমন্যু। প্রৌঢ় হলেও এককালে সদানন্দ নিজেও যুবক ছিলেন। তাই ব্যাপারটা আঁচ করতে খুব বেশী অসুবিধে হয় না তাঁর।

একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর স্ত্রীকে কাছে ডেকে তিনি বলেন—"ভাবছি, আর দেরি না করে চিত্রার বিয়ে দিয়ে দেব।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেন তাঁর স্ত্রী—"কেন? সবে তো এই ষোল পেরিয়ে সতেরতে পা দিয়েছে চিত্রা। এর মধ্যেই কলেজের পড়া ছাড়িয়ে মেয়েটাকে পার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?"

একটু রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দেয় সদানন্দ—"বিয়ে হলেই যে চিত্রার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে সেকথা কে বললে তোমায়? তাছাড়া সব সময় ভাল পাত্র হাতের কাছে পাওয়াও যায়না।"

স্বামীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে জবাব দেন তাঁর স্ত্রী—"তুমি কি পাত্র ঠিক করে ফেলেছ নাকি।"

কোন জবাব না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন সদানন্দ।

চিত্রার মা আবার বলেন—"তুমি কি তোমার সেই ছাত্র—অর্জুন না কি যেন একটা সেকেলে নাম, ঐ ছেলেটার সঙ্গে চিত্রার বিয়ে ঠিক করেছ?"

এবার বেশ সশব্দেই হেসে ওঠেন সদানন্দ। বলেন—"তুমি তো ঠিকই ধরেছে। তবে ওর নাম অর্জুন নয়, অভিমন্যু।"

গর্বিত কণ্ঠে জবাব দেন তাঁর স্ত্রী—"ঠিকই ধরতে পারি আমরা। তোমাদের মত পুরুষের চোখেই বরঞ্চ অনেক সময় ধরা পড়ে না। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের চোখে এসব ব্যাপার এড়ায় না। চিত্রার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখে আমি কিছুদিন ধরেই এমনটা অনুমান করেছিলাম।"

—"কিন্তু কই, তুমি তো আমাকে কোনদিন এ সম্পর্কে কিছু বলোনি?"

—"বলার দরকার হয়নি, কারণ ঐ বাপ-মা-মরা ছেলেটার সঙ্গে আমার ঐ একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবার কোন ইচ্ছাই নেই আমার।"

—"কিন্তু একটু আগে তুমি নিজেই তো বললে যে চিত্রা নিজেও নাকি—"

সদানন্দর কথা শেষ হবার আগেই তাঁর স্ত্রী ঝংকার দিয়ে ওঠেন—"ঐ একরত্তি মেয়ে, ওর আবার মতামত কি? আমরা ভাল বুঝে যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবো তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে।"

আশাভঙ্গের সুর বেজে ওঠে সদানন্দর কণ্ঠে—"কিন্তু তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। অভিমন্যু একটি জুয়েল। সে..."

এবারেও কথাটা শেষ করতে পারেন না সদানন্দ মিত্র। তাঁর স্ত্রী আবার ঝংকার দিয়ে ওঠেন—"রেখে দাও তোমার জুয়েল! সেদিন ওর মা বাবা সম্বন্ধে যা শুনলাম তাতে।"

কথাটা শেষ না করেই থেমে যান তিনি।

কৌতূহলী সদানন্দ জিজ্ঞেস করেন—"অভিমন্যুর বাবা মা সম্বন্ধে আবার কী শুনলে তুমি? আমি তো যতদূর জানি ওর খুব ছোটবেলায় ওর মা মারা যায়। তারপর থেকেই ওর বাবা নিরুদ্দেশ। অভিমন্যু মানুষ হয়েছে ওর কাকার কাছে।"

রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দেয় তাঁর স্ত্রী—"হ্যাঁ, সেদিন বিপ্রদাসের মুখে সব না শুনলে হয়ত আমিও তাই বিশ্বাস করতাম।" একটু থেমে তিনি আবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে থাকেন—"চমৎকার ছেলে এই বিপ্রদাস। দেখতে শুনতেও যেমনি ভাল, তেমনি পয়সাকড়িও আছে ওদের। কিন্তু ঐ হতভাগীটার কী যে হয়েছে, বিপ্রদাসকে দেখলেই সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সেদিন বিপ্রদাস নিজেই নাকি গরজ করে তার মাকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। আমি তো......"

অধৈর্য কণ্ঠে স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সদানন্দ বলে ওঠেন—"বিপ্রদাস-কাহিনী না হয় পরেই শুনবো। আগে তুমি অভিমন্যুর বাবা মা সম্বন্ধে কী শুনতে পেয়েছ তাই বলো।"

ঠিক এমনি সময় কি একটা কাজে চিত্রা ঘরে ঢুকতেই স্বামী স্ত্রী চুপ করে যান।

।। ২।।

ছোটবেলায় অভিমন্যু নিজেও তাই জানতো। তার বয়স যখন মাত্র আট কি নয়—অর্থাৎ

আজ থেকে প্রায় এগারো-বারো বছর আগে তার মায়ের মৃত্যু হয়। সেই থেকে তার বাবা শুভঙ্কর রায় নিরুদ্দেশ। তার কাকা অর্থাৎ দীপঙ্কর রায় নাকি অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেই থেকে অভিমন্যু তার কাকা দীপঙ্করের বাড়িতেই মানুষ।

শুভঙ্কর ও দীপঙ্কর দুই সহোদর ভাই। লোহালক্কড় ও রঙের ব্যবসা ছিল তাদের এই শহরেই। বলতে গেলে এই শহরে ঐ দুটো বস্তুর সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার ছিল এই দুই ভাই। জয়েন্ট বিজনেস তাদের। হৃদ্যতাও ছিল তাদের মধ্যে যথেষ্ট। শহরের একপ্রান্তে পাশাপাশি একই ধরনের দুটো বাড়িতে আলাদা থাকতো তারা।

চিররুগণা স্ত্রী মৃন্ময়ীকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না শুভঙ্করের। তাছাড়া আর একটা দুশ্চিন্তা ছিল একমাত্র ছেলে অভিমন্যুকে নিয়ে। ছোট ছেলে। দেখাশুনো করবার তেমন কেউ নেই। ঝি চাকরের ওপর ছেলের ভার ছেড়ে দিতে চিরদিনই নারাজ ছিল শুভঙ্কর। তাই অতবড় ব্যবসার পিছনে লেগে থেকেও যতটা সম্ভব নিজের হাতে ছেলের যত্ন নিত সে। স্ত্রী মৃন্ময়ীর পরিচর্যাও সে নিজেই করতো।

মৃন্ময়ী অনেকদিন ঝি চাকরের কথা বলেছে শুভঙ্করকে। কিন্তু শুভঙ্কর সে কথা কোনদিনই কানে তোলেনি। কোন বাইরের লোককে বাড়িতে স্থান দিতে চিরদিনই কেমন যেন একটা আপত্তি ছিল তার।

চারু অবশ্য মাঝে মাঝে এই রুগ্ণা মা ও তার ছেলের যত্ন নিত। চারু অর্থাৎ চারুলতা। দীপঙ্করের স্ত্রী।

দীপঙ্কর ও চারুলতার কোন সন্তান ছিল না। তাই তাদের কাছে পুত্রস্নেহে আদরযত্ন পেত অভিমন্যু। একমাত্র স্কুলের সময়টুকু ছাড়া দিনের অধিকাংশ সময় সে থাকতো পাশের বাড়িতে।

এমনি দিনে অকস্মাৎ একটা বিষাদের ছায়া পড়ল এই দুটি ছোট পরিবারের ওপর। হ্যাঁ, অকস্মাৎই বলতে হবে, কারণ ডাঃ গুপ্তর সুচিকিৎসায় অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছিল মৃন্ময়ী। যে মৃন্ময়ী এতদিন বিছানার ওপর উঠে বসতে পর্যন্ত পারতো না, সে তখন একটু একটু হাঁটতে পারে। তাই তার মৃত্যুকে আকস্মিক মৃত্যুই বলতে হবে।

বিপদ যখন আসে একা আসে না। কাজেই মৃন্ময়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা সাংঘাতিক বিপদ এসে উপস্থিত হল এই সংসারে।

ভাই দীপঙ্কর অনেক চেষ্টা করেছিল। অজস্র অর্থব্যয়। কিন্তু কিছুতেই শুভঙ্করকে আটকানো গেল না।

শেষ পর্যন্ত আট বছরের ভাইপো অভিমন্যুকে নিয়ে এল সে নিজের বাড়িতে। সন্তানহীনা চারুলতা এতদিনে যেন সত্যি সত্যি একটি সন্তানের জননী হতে পারলে। দু'হাতে সে চেপে ধরে অভিমন্যুকে নিজের বুকের ওপর। সদ্যমাতৃহারা অভিমন্যু কাকীমার বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে মায়ের বিয়োগব্যথা ভুলতে চেষ্টা করে। শুভঙ্করের বাড়ির দরজায় পড়ে বিরাট এক তালা। ঐ তালাটাই যেন শুভঙ্করের ছোট্ট সংসারটার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য বহন করে ঝুলতে থাকে।

সামান্য দু চারটা দরকারী জিনিসপত্র ছাড়া দীপঙ্কর তার দাদার বাড়ির কোন জিনিসপত্রই এ বাড়িতে নিয়ে আসেনি।

যেখানের যে জিনিসটি ঠিক সেখানেই তেমনি অবস্থাতেই আছে। কেবল সেই

জিনিসগুলোর মালিকেরাই নেই।

দীপঙ্কর তার দাদার বাড়িটাকে যক্ষের ধনের মত আগলে রাখে। হয়ত তার বিশ্বাস শুভঙ্কর একদিন ফিরে আসবে। সেদিন সে তার হাতে সমস্ত জিনিসপত্র সমেত তার বাড়িটার ভার প্রত্যর্পণ করবে। হয়ত সে আশা করে শুভঙ্কর ফিরে না এলেও তার ছেলে অভিমন্যু বড় হলে তার হাতেই সে তুলে দেবে ঐ বাড়িটার দরজায় ঝুলতে থাকা বড় তালাটার চাবি।

মাঝে মাঝে দীপঙ্কর বাইরে থেকে সেই তালাটাকে টেনে টেনে দেখে। বাড়িটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বন্ধ দরজা জানালাগুলো পরীক্ষা করে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আবার নিজের বাড়ি চলে আসে।

এমনি অবস্থা চলে আসছে আজ দীর্ঘ দিন ধরে। এক আধ বছর নয়, দীর্ঘ এগারো-বারো বছর।

কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনদিন দীপঙ্কর কিংবা তার স্ত্রী চারুলতা শুভঙ্করের বাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢোকেনি, কিংবা কোনদিন অভিমন্যুকে ঐ বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

অভিমন্যু তখন ছোট ছিল। তাই তার কাকার এই বিচিত্র মনোভাবের কারণ বুঝতে পারতো না। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো ঐ বাড়িটার মধ্যে ঢুকতে। কিন্তু দীপঙ্করের কড়া শাসনে সে কোনদিনই সেখানে ঢুকতে পারেনি। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অভিমন্যু তার কাকার সেই বিচিত্র মনোভাবের একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিল—বোধহয় তার কাকার ধারণা ছিল যে তার মায়ের প্রেতাত্মা ঐ অন্ধকার বাড়িটার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। তাই সে তাকে যেতে দিত না সেখানে।

হ্যাঁ, প্রেতাত্মাই বটে। মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার আত্মার মুক্তি হয় না। সে প্রেতাত্মা হয়ে সেখানেই ঘুরে বেড়ায়।

তার মায়ের মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল না—একথা সে জানতে পেরেছে বড় হয়ে তাদের দু'চারজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে। কিন্তু তার মায়ের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়েও যে সাংঘাতিক খবরটি সেদিন সে যোগাড় করেছিল তা শুনে সে খানিক্ষণ বোবা দৃষ্টিতে সেই প্রতিবেশীটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

তারপর একসময় সে পাগলের মত চীৎকার করে উঠেছিল—"মিথ্যে কথা"!

কান্না চাপতে চাপতে সে ছুটে এসেছিল বাড়িতে। সোজা দীপঙ্করের ঘরে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল সে—"আমার মাকে নাকি আমার বাবা বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল, আর সেই অপরাধেই নাকি আমার বাবার যাবজ্জীবন জেল হয়েছে?"

কিছুক্ষণ কোন জবারই দিতে পারেনি দীপঙ্কর। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সেদিন বলেছিল অভিমন্যু—"বল, কাকা, চুপ করে রইলে কেন? বল, বল..."

অন্যদিকে তাকিয়ে সেদিন জবাব দিয়েছিল দীপঙ্কর— "হ্যাঁ অভি, যা শুনেছ সবই সত্যি। ছেলেবয়সে তোমার মনে যাতে কোন আঘাত না লাগে সেই জন্যেই এতদিন কথাটা তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম।"

আর একটি কথাও উচ্চারণ না করে অভিমন্যু নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল সেদিন। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া অভাগিনী মাকে বার বার মনে পড়ছিল তার। মাকে হারানোর ব্যথা নতুন করে বেজেছিল তার বুকে। আর সেই সঙ্গে শুভঙ্করের ওপর জন্মেছিল এক তীব্র ঘৃণা, একটা প্রচণ্ড ক্রোধ।

দীপঙ্কর অবশ্য তারপর সবকিছুই বলেছিল তাকে। বলেছিল, কী অবস্থায় শুভঙ্কর বিষ

খাইয়ে হত্যা করেছিল মৃন্ময়ীকে। বলেছিল, শুভঙ্করকে বাঁচাতে তার চেষ্টা তদ্বিরের কথা।

একে একে সব কথা সেদিন শুনে গিয়েছিল অভিমন্যু। কোন প্রশ্ন করেনি সে দীপঙ্করকে। কেবল শুনতে শুনতে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার বুকের পাঁজর ভেদ করে।

।। ৩।।

বিপ্রদাস চৌধুরী এই শহরেরই ছেলে। পঁচিশ ছাব্বিশের মত বয়স। বেশ সুপুরুষ দেখতে। পড়াশুনায় যদিও তেমন ভাল ছিল না কোনদিনই, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের নানারকম ফিকির তার মাথায় ঘুরতো সেই ছোটবেলা থেকেই। বোধহয় এই স্বভাবটা সে পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে।

তার বাবাও জীবনে বহুরকম ব্যবসা করেছে। শেষ পর্যন্ত তার স্থিতি হয়েছিল ওষুধের ব্যবসায়।

শহরের কেন্দ্রস্থলে যে বড় ওষুধের দোকানটি রয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে তার বাবা। প্রচুর পয়সার মালিক হয়েছিল সে এই ওষুধের ব্যবসা করে।

পিতার ট্রাডিশান বজায় রেখেছিল বিপ্রদাস। তিনবারের চেষ্টায় আই.এ.পাস করে পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল সে। তারপর অর্থবান পিতার অর্থের আনুকূল্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ মোটামত কিছু আক্কেলসেলামী দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাকে।

অবশেষে পিতার ইচ্ছামত সুড়সুড় করে এসে ঢুকেছিল তার ওষুধের দোকানে।

কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্রদাসের বাবা বুঝতে পারলো যে ব্যবসার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে তার। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওষুধের ব্যবসার ফন্দিগুলো আয়ত্ত করে নিল বিপ্রদাস তার বাবার কাছ থেকে।

সেই থেকে অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে সে চালিয়ে যেতে লাগলো সেই ওষুধের দোকান। শুধু চালিয়ে যাওয়া বললে ভুল বলা হবে, দিনে দিনে সেই দোকানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে লাগলো সে।

ছেলের কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন অবসর নিল তার বাবা। তারপর বছরখানেকের মধ্যেই নিশ্চিন্ত মনে একমাত্র ছেলের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হল তাকে।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্র এই শহরের স্থানীয় লোক নন। দূরসম্পর্কের কি রকম একটা আত্মীয়তা ছিল তাঁর বিপ্রদাসের বাবার সঙ্গে। সেই সূত্রে বিপ্রদাস মাঝে মাঝে আসতো তাঁর বাড়ি।

ইদানীং যেন বিপ্রদাস সদানন্দর বাড়ি যাতায়াত একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুখে অবশ্য বলতো প্রৌঢ় সদানন্দ ও তার স্ত্রীর খোঁজখবর নেবার জন্যেই সে আসে। কিন্তু এই বাড়িতে পা দিয়েই তার চঞ্চল চোখদুটো লোভীর মত যাকে খুঁজে বেড়ায় সে হচ্ছে চিত্রা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার রূপলাবণ্যের নদীতে জোয়ারের জল ফেঁপে ফুলে যতই টইটম্বুর হয়ে উঠছে, বিপ্রদাসের দেহের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত ততই চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হচ্ছে।

মানুষের জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানই হচ্ছে বোধহয় জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি। বিপ্রদাস চৌধুরীর জীবনও এই ট্র্যাজেডির ছোঁয়ায় ভারাক্রান্ত। বুকভরা আশা নিয়ে সে প্রবেশ করে সদানন্দর বাড়িতে, আর বুকভরা নিরাশা নিয়ে দিনের পর দিন তাকে ফিরে যেতে হয়। চিত্রা ফিরেও তাকায় না তার দিকে।

অবশ্য ফিরে তাকায় না বললে ভুল বলা হবে। বিপ্রদাস চৌধুরীর দিকে চিত্রা মাঝে মাঝে তাকায় বৈকি। বোধহয় একটু বেশীরকমই তাকায়। কিন্তু বিপ্রদাসের মনে হয় এর চেয়ে না তাকালেই বোধহয় ভালো ছিল।

চিত্রার সেই কৌতুক-দৃষ্টি আর উপহাসতরল কণ্ঠস্বর কিছুতেই সহ্য করতে পারে না বিপ্রদাস।

সদানন্দর বাড়িতে চিত্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই চিত্রা ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে—"এই যে ড্রাগ মার্চেন্ট বাবু, কেমন আছেন!"

কখনও বা বলে—"আচ্ছা, ড্রাগ বাবু, ভেজাল ওষুধে রাতারাতি দাঁও মারা যায়, তাই না?"

নিজেকে একটু সামলে নেয় বিপ্রদাস। তারপর হয়ত বলে—"আচ্ছা, চিত্রা, বল তো তুমি আমাকে দেখলেই ঠাট্টা কর কেন?"

চিত্রার মাও বিপ্রদাসের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। মেয়েকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেন, "সত্যিই, তোর সঙ্গে কি ওর ঠাট্টার সম্পর্ক নাকি, চিত্রা?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভটাকে কামড়ে ধরে, চোখ বুজে দু' কানে আঙুল দিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে চিত্রা বলে ওঠে—"ছি ছি, গুরুজনের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি!" বলেই খিলখিল করে হাসতে হাসতে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু অসীম ধৈর্য বিপ্রদাসের। চিত্রার এই ব্যবহারে মনে মনে আঘাত পায় সে কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ে না। সময় পেলেই একবার এবাড়িতে আসে। আশা-নিরাশার দোলা নিয়ে চিত্রার সান্নিধ্যলাভে তৎপর হয়। তারপরই আসে চিত্রার কাছ থেকে সেই শ্লেষের আঘাত। মনে মনে আহত হয় সে সেই আঘাতে। তবুও বিষাদক্লিষ্ট মুখের ওপর একটা কৃত্রিম খুশির আভা ফুটিয়ে তুলে উৎকর্ণ হয়ে থাকে চিত্রার একটা মিষ্টি কথা শোনবার জন্যে।

সেদিন সন্ধ্যায় বিপ্রদাস খুশী মনে ঢুকলো সদানন্দর বাড়িতে।

দোতলায় উঠে বারান্দা পার হয়ে সবে সে সদানন্দর ঘরে ঢুকতে যাবে, ঠিক এমনি সময় পেছনে সে শুনতে পায় চিত্রার কণ্ঠস্বর—"শুনুন!"

নিজের কানদুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না বিপ্রদাস। চিত্রা ডাকছে! নিজে যেচে ডাকছে!

ঘুরে দাঁড়ায় বিপ্রদাস। দেয়ালের ওপর একটা হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। মুখ তার গম্ভীর। কৌতুকের লেশমাত্র নেই সেই মুখে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায় বিপ্রদাস।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই চিত্রা আবার বলে—"একবার আমার ঘরে আসুন।"

এবার মনে মনে সত্যিই আতঙ্কিত না হয়ে পারে না বিপ্রদাস। বুঝতে চেষ্টা করে—চিত্রার মুখে কি ঝড়ের পূর্বসংকেত?

অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই চিত্রার পিছু পিছু তার ঘরে এসে ঢুকতে হয় তাকে।

বিপ্রদাসকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তার মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে পড়ে চিত্রা।

তারপর একটু কঠিন সুরেই প্রশ্ন করে—"সেদিন রাতে আমার বাবা মাকে আপনি কী বলেছেন?"

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না বিপ্রদাস।

চিত্রা আবার বলে—"প্রফেসার অভিমন্যু রায় সম্বন্ধে আমার বাবা মাকে কী বলেছেন আপনি?"

এবার একটা বিচিত্র হাসি জেগে ওঠে বিপ্রদাসের ওষ্ঠপ্রান্তে। সে জবাব দেয়—"সত্যি কথাটা জানিয়েছি তাঁদের।"

—"কী সেই সত্যি কথা?"—আরও একটু তিক্ত শোনায় চিত্রার কণ্ঠস্বর।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বিপ্রদাস, তারপর বলে—"দেখ চিত্রা, তোমরা মাত্র বছর পাঁচেক হল এখানে এসেছ। কিন্তু আমরা এই শহরেরই ছেলে, জন্ম থেকে এখানেই আছি। প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের বাবা শুভঙ্কর রায় যে এগারো বছর আগে তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে যাবজ্জীবন জেল খাটছে সে খবরটা তোমরা না জানলেও এখানকার স্থানীয় লোকেরা সকলেই জানে।"

ক্রোধের বদলে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে চিত্রার সুন্দর মুখের ওপর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে সে বলে—"কিন্তু আমরা তো শুনেছিলাম অভিমন্যু রায়ের বাবা নাকি তার মায়ের মৃত্যুর পরই নিরুদ্দেশ।"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই ওরা প্রচার করে বেড়ায় নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্যে।"

চিত্রা আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। আর বিপ্রদাস একাগ্রদৃষ্টিতে চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে থাকে।

বিপ্রদাসের ঠোঁটের কোণে এবার যে হাসিটি একবারমাত্র জেগে উঠেই মিলিয়ে যায় তাকে বলা চলে বিজয়ীর হাসি।

একসময় চিত্রার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিপ্রদাস।

।। ৪ ।।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ কিন্তু অন্ধকার তখনও তেমন গাঢ় হয়নি। কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। ভাটার টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে দু'একখানা নৌকো তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ওপারে কারখানার আলোকমালা গঙ্গার জলে প্রতিফলিত হয়ে এই আলো-আঁধারিতে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র সৌন্দর্য। মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ তারকার ভিড়।

এপারে জলের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে দুটো মূর্তি। একটি পুরুষ, অপরটি নারী।

গঙ্গার এই উঁচু পাড়টা অপরিচিত নয় তাদের কাছে। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যায় এখানে বসে গল্পগুজব করেছে তারা অনেকদিন। আধো আলো আধো অন্ধকারে গঙ্গার এই গম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে তারা প্রাণভরে।

কিন্তু আজ তাদের মুখে কথা নেই। এখানে বসে যাদের মুখে একদিন কথার ফুলঝুরি ফুটতো, আজ তারা নির্বাক্, আপন আপন চিন্তায় বিভোর। অতি সন্তর্পণে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিত্রা—"এ কথা তুমি আমাকে এতদিন বলনি কেন?"

তেমনি মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় অভিমন্যু—"লজ্জায়।"

—"কিন্তু তাই বলে তুমি এতবড় একটা মিথ্যা কথা দিয়ে ধোঁকা দিতে চাইবে আমাকে?"

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে অভিমন্যু। চিত্রার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতে নিতে জবাব দেয় সে—"বিশ্বাস করো চিত্রা, ধোঁকা দিতে চাইনি তোমাকে। তবে ছেলে হয়ে বাপের কলঙ্কের কথা নিজমুখে স্বীকার করতে না পারাকে যদি অপরাধ বল, তো আমি সত্যিই তোমার কাছে অপরাধী।"

অভিমানভরা কণ্ঠে চিত্রা বলে—"তুমি যে শুধু সেই কথাটাই আমার কাছে গোপন করেছ তা নয়, তোমার বাবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কথা দিয়ে তুমি সেই সত্যকে ঢাকতে চেয়েছ আমার কাছে।"

একটু সময় চুপ করে থাকে অভিমন্যু। তারপর জবাব দেয়—"তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, চিত্রা। তবে সত্যি বলছি আমার ছেলেবেলায় আমিও জানতাম যে মা'র মৃত্যুর পর আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। কিন্তু একটু বড় হয়ে জানতে পারি যে আসল ব্যাপার তা নয়। মাকে হত্যার অপরাধে তিনি যাবজ্জীবন জেল খাটছেন।"

—"কেন তোমার বাবা এ কাজ করলেন?"

জবাব দেয় অভিমন্যু—"এই 'কেন'র জবাব আমি জানি না, চিত্রা। কাকাকে জিজ্ঞেস করেও সঠিক কোন উত্তর কোনদিন পাইনি। তবে..."

—"তবে?"—অভিমন্যুর শেষের শব্দটা পুনরাবৃত্তি করে চিত্রা।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দেয় অভিমন্যু—"তবে আমার বিশ্বাস বাবা এ কাজ করেননি। পাড়ার লোকের মুখে আমার বাবার চরিত্র সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে তাঁর মত ব্যক্তি এই ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না। না না চিত্রা, তুমি বিশ্বাস করো তিনি কখনও এ কাজ করেননি।"

—"তুমি কি তবে বলতে চাও তোমার নির্দোষ বাবা শুধু শুধু দণ্ডভোগ করছেন?"

সরাসরি চিত্রার কথার জবাব না দিয়ে অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলে চলে অভিমন্যু—"নিশ্চয়ই কোথাও একটা সাংঘাতিক ভুল হয়েছে। আর সেই ভুলের জন্যেই আমার বাবাকে জেল খাটতে হচ্ছে আজ দীর্ঘ এগারো বছর ধরে।"

খানিক্ষণ দুজনেই আবার চুপ করে থাকে।

একসময় চিত্রা মৃদু কণ্ঠে বলে—"তোমার নিজের ধারণা যাই হোক না কেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে আজ তোমার বাবা হত্যা অপরাধে অপরাধী বলেই পরিগণিত। তোমার এই পিতৃকলঙ্ককে কাজে লাগিয়ে তোমার আমার মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে বিপ্রদাস চৌধুরী।"—চিত্রার কথার শেষের দিকটা আবেগময় শোনায়।

—"কিন্তু তাই বলে তোমার বাবা মাও কি এই কথা বিশ্বাস করেছেন?"

—"অত্যন্ত স্বাভাবিক। পুত্র হয়ে তুমি হয়ত তোমার বাবাকে নির্দোষ বলে ভাবতে পারো, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে বিচারে যে ব্যক্তির যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে, তাকে নিরপরাধ বলে ধরে নিতে অন্য কেউ রাজী না হয় তো তাদের কি খুব বেশী দোষ দিতে পার?"

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অভিমন্যু। চিত্রা বলতে থাকে—"মায়ের বরাবরই ইচ্ছা যে বিপ্রদাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তার মত চমৎকার ছেলে তিনি নাকি আর কখনও দেখেননি। কেবল বাবার জন্যেই আমার জীবনে সেই অঘটন এখনও ঘটতে পারেনি। কিন্তু তোমার বাবার সম্বন্ধে এই কথা শোনার পর তিনি জেদ ধরেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

বিপ্রদাসের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।”

একটু থামে চিত্রা। তারপর অভিমন্যুর একখানা হাত জড়িয়ে ধরে আবার বলতে থাকে—“কিন্তু তুমি তো জানো, তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচবো না। না না, তুমি ছাড়া অন্য কোন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা আমি চিন্তা পর্যন্ত করতে পারি না।”

চিত্রার আর একটু কাছে সরে বসে অভিমন্যু। নিজের একখানা হাত আলতোভাবে তার পিঠের ওপর রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—“না না, তুমি যদি একটু শক্ত থাকো তো তোমার মায়ের সাধ্য হবে না তোমার অমতে তিনি বিপ্রদাস চৌধুরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন। তাছাড়া তোমার বাবাও আমাকে খুবই ভালবাসেন।”

—“হ্যাঁ, তা ঠিক। বাবা তোমাকে সত্যিই ভালবাসেন। তবে তোমার বাবার সম্বন্ধে ঐ কথাটা শোনার পর কেমন যেন দোটানায় পড়েছেন তিনি। এদিকে বিপ্রদাসও খুব ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে আমাদের বাড়িতে। কিছুতেই তাকে ঠেকানো যাবে না।”

এমনি সময় পেছনে পায়ের শব্দে অভিমন্যু ও চিত্রা দুজনেই চমকে তাকায়। একটু দূরে আবছা অন্ধকারের মধ্যে যে লোকটি তাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাকে চিনতে ভুল হয় না তাদের।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে চিত্রাই প্রথমে প্রশ্ন করে—“আপনি? আপনি এখানে কেন, বিপ্রদাসবাবু?”

অভিমন্যুর মুখের দিকে একবার ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দেয় বিপ্রদাস—“এত রাত পর্যন্ত তুমি বাড়ি ফেরনি দেখে তোমার মা বাবা খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, তাই আমাকে পাঠালেন তোমার খোঁজে।”

—“তা, আপনি কী করে জানলেন যে আমি এখানে আছি?”

ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় বিপ্রদাস—“একটুআধটু সব খবরই রাখতে হয় আমাদের”—বলেই হঠাৎ সে চিত্রাকে তাড়া দিয়ে ওঠে—“আর দেরি করো না চিত্রা। চল তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।”

—“প্রয়োজন হবে না। একাই যেতে পারবো আমি।” —বলেই অভিমন্যুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই রাস্তার দিকে পা বাড়ায় চিত্রা।

।। ৫ ।।

অভিমন্যু থামতেই ওপাশের ডেকচেয়ারে উপবিষ্ট অহীন সোমের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—“কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, অভিমন্যুবাবু?”

ডিটেকটিভ অহীন সোমের বাইরের ঘরে বসে অহীন ও তার বন্ধু বরুণ কথা বলছিল প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের সঙ্গে।

অভিমন্যু জবাব দেয়—“আপনি যদি দয়া করে এই ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখেন তবে হয়ত আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।”

অহীন জবাব দেবার আগেই বিস্মিত কণ্ঠে বরুণ বলে ওঠে—“দীর্ঘ এগারো বছর পর ঐ ব্যাপারে আবার তদন্ত করতে হবে?”

জবাব দেয় অভিমন্যু—“আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবা এমন জঘন্য কাজ করেননি।”

—"কিন্তু আদালতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয়েছিল যে আপনার বাবাই খুন করেছিলেন আপনার মাকে, তাই তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল।"

—"আদালতে কী প্রমাণ হয়েছিল জানি না, কারণ আমি তখন ছোট। তবে বড় হয়ে এখন বুঝতে পারি নিশ্চয়ই আমার বাবা আদালতে খুনী বলেই প্রমাণিত হয়েছিলেন।"

ঠিক এমন সময় অহীন আবার প্রশ্ন করে—"কিন্তু আপনার বাবা যে আপনার মাকে খুন করেননি তা আপনি বুঝলেন কী করে?"

এক মুহূর্ত থেমে জবাব দেয় অভিমন্যু—"বাবার চরিত্র সম্বন্ধে বাড়ির ও পাড়ার লোকের কথাবার্তা শুনেই আমার ধারণা হয়েছিল যে তাঁর মত শান্ত, গম্ভীর চরিত্রের ব্যক্তি এমন কাজ করতে পারেন না।"

—"তাহলে ব্যাপারটা আপনার অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়?"

অভিমন্যু জবাব দেয়—"হ্যাঁ, প্রথমে অনুমানই ছিল, কিন্তু পরে বাবার নিজের মুখেই শুনেছি তিনি আমার মাকে খুন করেননি।"

—"আপনি কি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—"হ্যাঁ, গত পরশু দমদম সেনট্রাল জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি। তিনি জেলে যাওয়ার পর দীর্ঘ এগারো বছরের মধ্যে আমিই প্রথম তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা করেছিলাম।"

—"কেন আপনার কাকা দীপঙ্করবাবু কিংবা আপনাদের অন্য কোন আত্মীয় এতদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে একবারও দেখা করেননি?"

—"বোধহয় বাবার ওপর ঘৃণায় তারা দেখা করেনি তাঁর সঙ্গে। তারা হয়ত তাঁকে হত্যাকারী বলেই ধরে নিয়েছিল।"

—"আচ্ছা বলুন তো অভিমন্যুবাবু, আপনার বাবা শুভঙ্কর রায় ও আপনার কাকা দীপঙ্কর রায়, এঁরা দুজনেই আপনাদের ব্যবসার পার্টনার ছিলেন, তাই না?"

—"হ্যাঁ। শুনেছি আমার বাবাই প্রথমে ঐ ব্যবসার পত্তন করেন, পরে কাকাকে পার্টনার হিসাবে নিয়েছিলেন।"

—"আপনার বাবার অবর্তমানে তো আপনিই তাঁর অংশের মালিক?"

—"হ্যাঁ।"

—"কিছু মনে করবেন না অভিমন্যুবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। বড় হয়ে আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে দীপঙ্করবাবু আপনাকে ফাঁকি দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যবসাটাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছেন?"

—"না, সেরকম কোন কিছু মনে হয়নি আমার। ছোটবেলা থেকেই আমাকে মানুষ করেছেন আমার কাকা। তাছাড়া কাকা নিঃসন্তান কাজেই তাঁর অবর্তমানে ঐ সমস্ত ব্যবসারই মালিক হবো আমি।"

অহীন আর প্রশ্ন করে না। একটা নিঃশব্দতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। একসময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বরুণ। সে অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে—"তুমি কি এই ব্যাপারটা হাতে নেবে বলে ঠিক করেছ নাকি?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"কিছুই স্থির করতে পারছি না, বরুণ। এগারো বছর আগে আদালতে যে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সেই সম্পর্কে আজ নতুন করে তদন্ত করতে গেলে লোকে হয়ত আমাকে উপহাস করবে। তাছাড়া এত বছর পরে ঐ ব্যাপারের কোন

সূত্র কি আর অবশিষ্ট আছে?''

অনুনয়ের কণ্ঠে অভিমন্যু বলে—''আপনি দয়া করে রাজী হোন। আমার ধারণা, আপনার মত ব্যক্তি চেষ্টা করলে কোন-না-কোন একটা সূত্র অবিষ্কার হবেই হবে।''

একটু ম্লান হাসি হেসে জবাব দেয় অহীন—''ভুলে যাবেন না অভিমন্যুবাবু, আমিও মানুষ। কোন মিরাক্‌ল্‌ ঘটানোর ক্ষমতা আমার নেই। তবে চেষ্টা করতে পারি, এই পর্যন্ত।''

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে অহীন আবার বলে—''আপনাকে আমি এখনই কোন কথা দিতে পারছি না, অভিমন্যুবাবু। আমি আগমীকাল দমদম জেলে একবার আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করবো। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার ওপরই নির্ভর করবে আমি আপনাদের এই ব্যাপারটা হাতে নেব কি না।''

—''বেশ, তাই হবে।'' বলেই উঠে দাঁড়ায় প্রফেসর অভিমন্যু রায়।

।। ৬।।

দমদম সেণ্টাল জেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামে ডিটেকটিভ অহীন সোম। সঙ্গে তাঁর সবসময়ের সঙ্গী ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু বরুণ রায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে দু'জনে এসে দাঁড়ায় জেল গেটের সামনে।

একটি জেল ওয়ার্ডেন কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তাকাতেই অহীন বলে—''জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।''

ওয়ার্ডেনটি একটুকরা সাদা কাগজ অহীনের দিকে এগিয়ে দিতেই অহীন খসখস করে তার ওপর নিজের নাম ও পরিচয় লিখে দেয়।

একটু বাদেই গেটের প্রকাণ্ড লোহার দরজার মধ্যে আর একটি ছোট দরজা খুলে যায়।

মাথা নিচু করে ভেতরে প্রবেশ করে অহীন ও বরুণ।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে প্রবেশ করে দুটো চেয়ার অধিকার করে বসতেই জেল সুপার তাদের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকায়।

মুখে কোন জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একখানা খাম বের করে জেল সুপারের হাতে দেয় অহীন।

চিঠিখানা একনজরে পড়ে নিয়েই একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে জেল সুপার। ব্যস্ততা তার এমনি নয়। স্বয়ং ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিজ্‌নের চিঠি।

স্মিত হাসি হেসে অহীনের দিকে তাকিয়ে জেল সুপার বলে—''একটু অপেক্ষা করুন মিঃ সোম। শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে আপনার ইনটারভিউর এখনই ব্যবস্থা করছি।''—বলেই কলিং বেলে হাত দেয় জেল সুপার।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে প্রবেশ করে একটি ওয়ার্ডেন।

জেল সুপার তাকে যথাযথ নির্দেশ দিতেই ওয়ার্ডেনটি বেরিয়ে যায়।

জেল সুপার অহীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—''কিছু মনে করবেন না, মিঃ সোম। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?''

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—''যে শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ এগারো বছরের মধ্যে বিশেষ কেউ দেখা করতে আসেনি, হঠাৎ তার সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে কেন আমি এসেছি তার

সঙ্গে দেখা করতে—এইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়?"

—ঠিক বলেছেন মিঃ সোম, এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি এতক্ষণ।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দেয় অহীন—"এগারো বছর আগে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া মামলা সম্বন্ধেই গোটাকয়েক খবর জানতে এসেছি শুভঙ্কর রায়ের কাছে।"

অহীনের জবাবের ধরনে বুদ্ধিমান জেল সুপারের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে অহীন এই সম্বন্ধে তার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করতে নারাজ। তাই সে আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে।

এমন সময় একটি ওয়ার্ডেন এসে জানায় যে কয়েদী শুভঙ্করকে ইনটারভিউ রুমে হাজির করা হয়েছে।

ওয়ার্ডেনটির পিছে পিছে অহীন ও বরুণ বেরিয়ে যায় ইনটারভিউ রুমের উদ্দেশে।

একটা টুলের ওপর বসে ছিল শুভঙ্কর রায়। পরনে তার কয়েদীর পোশাক। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি গোঁফ। চোখে মুখে শিক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তার।

বরুণকে নিয়ে অহীন ঘরে ঢুকতেই শুভঙ্কর রায় উঠে দাঁড়ায়।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে অহীন শুভঙ্করকে বলে—"আপনি বসুন, শুভঙ্করবাবু।"

একসময় অহীন শুভঙ্কর রায়ের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"আপনার ছেলের অনুরোধে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, শুভঙ্করবাবু।"

অতি ধীরে ধীরে টেনে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"আমার ছেলের অনুরোধে?"

—"হ্যাঁ, আপনার ছেলে প্রফেসর অভিমন্যু রায়ের অনুরোধেই আসতে হয়েছে আমাদের।"

অভিমন্যুর নাম করতেই শুভঙ্করের চোখদুটো আনন্দে ক্ষণিকের জন্যে একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অহীন নিজেই আবার বলে—"আপনার ছেলের বিশ্বাস যে আপনি নাকি আপনার স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবীকে হত্যার জন্যে দায়ী নন। তাই সে আমাকে অনুরোধ করেছে যাতে আমি নতুন করে এই ব্যাপারে তদন্ত করি।"

ম্লান মুখের ওপর একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"এই এগারো বছর পর ঐ ব্যাপার নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে আর কী ফল হবে, বলতে পারেন?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ, আমার ধারণাও অনেকটা সেইরকম, কিন্তু..."—কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সে।

অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভঙ্কর।

এবার হঠাৎ প্রশ্ন করে বরুণ—"আচ্ছা শুভঙ্করবাবু, শুনেছি আপনি নিজেও নাকি বরাবর বলে এসেছেন যে আপনি নির্দোষ। কিন্তু সেই এগারো বছর আগে বিচারের সময় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেননি আপনি?"

ম্লানকণ্ঠে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"করেছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। সেদিন আমি নিজেই বুঝেছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত ছিল তাতে আমি ছাড়া আর কাউকেই সেই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করা চলে না। কিন্তু, তবুও আমি বলছি মৃন্ময়ীকে আমি হত্যা করিনি। তাকে হত্যা করার কোন কল্পনাই কোনদিন করিনি আমি।"—কেমন যেন করুণ শোনায় শুভঙ্করের শেষের কথাগুলো।

—“তবে কাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয় আপনার?” প্রশ্ন করে অহীন।

—“কাউকেই না। মৃন্ময়ীর মত একটি রুগ্ণা স্ত্রীলোককে কে যে হত্যা করতে পারে তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।”

—“তবে কি আপনার মনে হয় মৃন্ময়ী আত্মহত্যা করেছেন?”

—“না, তাও না। আত্মহত্যার কোন সুযোগই সে পায়নি।”

প্রশ্ন·করে অহীন—“কী অবস্থায় মৃন্ময়ী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল সেকথা একটু খুলে বলবেন কি শুভঙ্করবাবু?”

খানিক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নেয় শুভঙ্কর। তারপর বলতে থকে—“ চিররুগ্ণা ছিল মৃন্ময়ী! অভিমন্যুর জন্মের পর থেকেই নানারকম অসুখে ভুগে ভুগে কষ্ট পাচ্ছিল সে। ডাঃ বৈদ্যনাথ গুপ্ত বরাবরই চিকিৎসা করছিলেন তার। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে থেকেই একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিল মৃন্ময়ী। অল্পস্বল্প হাঁটাচলা করতে আরম্ভ করেছিল সে। সেদিন বিকেলবেলা মৃন্ময়ী আমাকে বললে যে তার খুব সরবৎ খেতে ইচ্ছে করছে। ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়ার নির্দেশ ছিল ডাঃ গুপ্তের। সেইমত অরেঞ্জ কোয়াশ দিয়ে সরবৎ তৈরি করে মৃন্ময়ীকে দিলাম আমি। একগ্লাস সরবৎ সে খেল। বাকীটা পরে খাবার জন্যে রেখে দিল নিজের কাছে। তারপর ব্যবসাসংক্রান্ত একটু বিশেষ কাজে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে ফিরে এসে দেখি মৃন্ময়ী বমি করছে। তার পেটে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ে ডাঃ গুপ্তকে আনালাম।। তারপর দু'দিন দু'রাত যমে মানুষে টানাটানি চললো। শেষে, তৃতীয় দিন দুপুরে মারা গেল সে।”

শুভঙ্কর থামতেই অহীন প্রশ্ন করে—“মৃতদেহের কি পোস্টমর্টেম হয়েছিল?”

—“হ্যাঁ, হয়েছিল। ওর পাকস্থলীতে নাকি প্রচুর পরিমাণ মারকিউরিক ক্লোরাইড বিষ পাওয়া গিয়েছিল।”

—“মৃন্ময়ী দেবী যে সরবৎ পরে খাওয়ার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন তাতেও বোধহয় ঐ বিষ পাওয়া গিয়েছিল?”

—“না। মৃন্ময়ীর মৃত্যুর দিন সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ঐ সরবৎ ফেলে দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ডেকচিটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম আমি। তবে যে গ্লাসে মৃন্ময়ী সরবৎ খেয়েছিল ঐ গ্লাসে সেই বিষ পাওয়া গেছে।”

—“কেন, আপনি ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে গ্লাসটা ধুয়ে রাখেননি?”

—“না। গ্লাসের কথা আমার মনে ছিল না। আর, গ্লাসটা টেবিলের নিচে ছিল বলে আমি লক্ষ্য করিনি।”

একটু সময় চিন্তা করে অহীন আবার প্রশ্ন করে—“আপনি কি পুরোপুরি এক ডেকচি সরবৎ তৈরি করেছিলেন?”

—“হ্যাঁ।”

—“ঐ ডেকচিতে কত গ্লাস সরবৎ ধরে বলতে পারেন।”

—“তা, প্রায় গ্লাস তিনেকের মত।”

—“তাহলে মৃন্ময়ী দেবী মাত্র একগ্লাস সরবৎ খেয়েছিলেন। এবং বাকি দু'গ্লাস সরবৎ পুরো দু'দিন টেবিলের ওপর পড়ে ছিল?”

—“হ্যাঁ, হিসেবমত তাই তো হবে।”

—“আচ্ছা, বলতে পারেন, পুলিস কি সেই অরেঞ্জ কোয়াশের বোতলটাও পরীক্ষা করে

দেখবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ। তখনও বোতলে অনেকটা অরেঞ্জ কোয়াশ ছিল। কিন্তু তাতে নাকি কোন বিষ পাওয়া যায়নি।"

—"আপনি নিজেই কি ডেকচি থেকে সরবৎ গ্লাসে ঢেলে আপনার স্ত্রীকে খেতে দিয়েছিলেন।"

—"না। রান্নাঘর থেকে সরবতের ডেকচি ঘরে নিয়ে আসার সময় গ্লাস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু গ্লাস আনতে যাবো ঠিক এমনি সময় একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাই আমি বাইরে চলে যাই। ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে দেখি মৃন্ময়ী ততক্ষণে নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে একটা গ্লাস নিয়ে এসে সরবৎ ঢেলে খাচ্ছে।"

এই সময় বরুণ প্রশ্ন করে—"তবে তো এই সময় মৃন্ময়ী দেবী নিজেই গ্লাসের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিতে পারেন।"

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"না, তা সম্ভব নয়। মৃন্ময়ী ঐ বিষ হাতের কাছে পাবে কি করে?"

এমন সময় ওয়ার্ডেন এসে অহীনকে জিজ্ঞেস করে তার আরও দেরি হবে কিনা।

জবাবে অহীন জানায় যে আর মিনিট দশেকের মধ্যেই সে তার কাজ শেষ করবে। ওয়ার্ডেন চলে যেতেই অহীন শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা শুভঙ্করবাবু, আপনাদের বাড়িতে কি মারকিউরিক ক্লোরাইড ছিল?"

একটু চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করে শুভঙ্কর। তারপর জবাব দেয়—"মৃন্ময়ীর মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে ডাঃ গুপ্ত তাকে একটা মিকশ্চার খেতে দিয়েছিলেন। ঐ মিকশ্চারে মারকিউরিক ক্লোরাইড ছিল। ডাক্তারের নির্দেশে মৃন্ময়ী দিনে দু'ফোঁটা করে দু'বার চার ফোঁটা হিসাবে মাত্র তিন দিন ওষুধ খেয়েছিল।"

—"তাহলে ঐ মিকশ্চার থেকে খরচ হয়েছিল মাত্র বারো ফোঁটা ওষুধ, তাই না?"

—"হ্যাঁ।"

—"বাকী ওষুধটা কি বাড়িতেই ছিল?"

—"হ্যাঁ, বাড়িতেই তো থাকবার কথা। কিন্তু আমার মনে আছে, পুলিস খানাতল্লাশী করতে এসে ঐ শিশিটা খুঁজে পায়নি।"

—"আপনার অনুমান, কে ঐ শিশিটা সরিয়েছিল?"

—"কে আর সরাবে? বাড়িতে লোক বলতে তো ছিলাম মাত্র আমরা তিনজন। মৃন্ময়ী তো বিছানায়ই শুয়ে থাকতো, আর ছেলে অভিমন্যু তো দিনের অধিকাংশ সময় থাকতো তার কাকার ওখানে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন ও বরুণ। শুভঙ্করও উঠে দাঁড়ায় সেই সঙ্গে।

চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে অহীন বলে—"এগারো বছর আগের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি এইমাত্র যা বলে গেলেন, আশা করি তার সমস্তই নির্ভুল, শুভঙ্করবাবু।"

জবাব দেয় শুভঙ্কর—"হ্যাঁ, ঘটনাটা এগারো বছর আগে ঘটলেও আমার মনে হয় যেন সেটা সেইদিন মাত্র ঘটেছে। এখানে জেলের মধ্যে বসে মনে মনে দিনরাত কেবল এগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করি। তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ও আমার পরিষ্কার মনে আছে।"

ইনটারভিউ রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায় তারা।

।।৭।।

প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্রের বৈঠকখানায় দুখানা চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিলেন সদানন্দ নিজে ও তাঁর এককালের ছাত্র ও বর্তমানের সহকর্মী অভিমন্যু রায়। প্রতিদিনের মত আজও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চেষ্টা করেছিল অভিমন্যু কিন্তু কেমন যেন উৎসাহের অভাবে সদানন্দ মিত্র সেই আলোচনায় তেমনভাবে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না।

সদানন্দের এই নিরুৎসাহ ভাবটা চোখ এড়ায় না অভিমন্যুর। কারণটাও তার অজানা নয়। কিন্তু তবুও যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা মুখের ভাব করে সে সদানন্দকে অলোচনায় টেনে আনতে চেষ্টা করেছিল। শেষে বিফল হয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে সে।

একটু ভালমানুষ গোছের ব্যক্তি এই সদানন্দ মিত্র। শান্ত নির্বিরোধী ব্যক্তি। কলেজের সময়টুকু ছাড়া বাড়িতে সবসময় লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। সংসারের কোন বিষয়েই তেমন মনোযোগ নেই। এমনধারা স্বভাবের লোকের যা হয়ে থাকে সদানন্দবাবুরও তাই। সংসারে স্ত্রীই সর্বময়ী কর্ত্রী। স্ত্রীকে মনে মনে একটু ভয় করেই চলেন সদানন্দবাবু।

এমনি সময় পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর—"হ্যাঁ মা, একেবারে রাজযোটক। খুব ভালো মিল হয়েছে।"

খুশিতে উপচে পড়া কণ্ঠে সদানন্দর স্ত্রী বলেন—"আমার মন কিন্তু আগেই বলেছিল ঠাকুরমশাই, বিপ্রদাস ও চিত্রার ঠিকুজিতে ভালোই মিল হবে।"

বৃদ্ধ ঠাকুরমশাইয়ের কণ্ঠে একটু খোশামোদের আভাস—"বটেই তো, তুমি হচ্ছ গিয়ে মা। মেয়ের ভালো মন্দের কথা মায়ের মন আগেই জানতে পারে।"

বিগলিতকণ্ঠে সদানন্দের স্ত্রী বলতে থাকেন—"তবে দেখুন তো ঠাকুরমশাই, এই সাধারণ কথাটা মেয়েটাকে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারলাম না। এত করে বলি, এত করে বোঝাই, কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়ী কিছুতেই বুঝবে না। কোথাকার একটা বউ-খাকী জেল-কয়েদীর অনাথ ছেলেকে বিয়ে করার জন্যে গোঁ ধরে বসে আছে। আর, মেয়েটারই বা দোষ কী, বাড়ির কর্তাই যদি আশকারা দিয়ে মেয়েটার মাথাটা বিগড়ে দেয় তো অন্যের দোষ কী?"

—"না, মা। ওসব দিকে যেও না তুমি। বিপ্রদাসের মত এমন চমৎকার ছেলে আজকাল লাখে একটা মেলে না। কাল নিজের ঠিকুজিটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে একঝুড়ি সিধে দিয়ে গেছে। বল তো মা, এই বাজারে ঐ একঝুড়ি সিধের দাম কমপক্ষে শ'খানেক টাকা তো হবেই। এমন দেব দ্বিজে ভক্তি আজকাল আর দেখাই যায় না। তুমি আর কিন্তু করো না মা, রাজযোটক যখন হয়েছে তখন এই পাত্র হাতছাড়া করো না তুমি।"

—"হ্যাঁ,, যা বলেছেন ঠাকুরমশাই। যে যাই বলুক বিপ্রদাসের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে আমি দেবই। আমি মা হয়ে মেয়ের ভালো বুঝবো না তো ঐ একরত্তি মেয়েটা নিজের ভালো বুঝবে? আর কর্তার কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। বুড়ো হয়ে ওর ভীমরতি হয়েছে।"

টেবিলের পাশে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে একজন প্রৌঢ় ও একটি যুবক স্থির হয়ে শুনতে থাকেন পাশের ঘরের কথোপকথন। একসময় ব্যথিতকণ্ঠে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে সদানন্দ মিত্র বলেন—"অভিমন্যু!"

লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে সদানন্দর মুখের দিকে তাকাতে পারে না অভিমন্যু। মাথা নিচু করে একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

সদানন্দ আবার বলেন—"অভিমন্যু, তুমি কিছু মনে করো না। আমার অবস্থা তো তুমি বুঝতেই পারছো।"

তবুও জবাব দেয় না অভিমন্যু।

খানিক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। একসময় সদানন্দ নিজেই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেন—"শুনলাম নাকি তোমার বাবার জেলে যাওয়ার ব্যাপারটার নতুন করে তদন্ত করবার জন্যে সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা অহীন সোমকে অনুরোধ করেছ?"

মুখে জবাব না দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয় অভিমন্যু।

সদানন্দ আবার বলেন—"বাপকে মিথ্যা অপবাদ থেকে বাঁচাতে তুমি ছেলের কর্তব্যই করেছ। কিন্তু এর আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সদানন্দর মুখের দিকে তাকায় অভিমন্যু।

সদানন্দ বলতে থাকেন—"তোমার মা'র মৃত্যুর জন্যে তোমার বাবাই যে দায়ী, দীর্ঘ এগারো বছর আগে আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। গোয়েন্দা অহীন সোম সম্বন্ধে যতটুকু আমি জানি তাতে বলতে পারি তিনি সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি। কোন কারণেই সত্য থেকে একচুলও বিচ্যুত হন না তিনি। কাজেই সেই ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অহীন সোম যদি তদন্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে তোমার বাবাই তোমার মা'র মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তবে কোন অবস্থাতেই তিনি তা গোপন করবেন না। প্রকাশ্যেই তিনি তা প্রমাণ করে দেবেন। তখন যে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। এগারো বছর আগে প্রায়-ভুলে-যাওয়া ঘটনাকে খুঁচিয়ে তুলে তখন যে এই শহরে মুখ দেখাতে পারবে না তুমি।"

হঠাৎ টেবিলের ওপর মাথা রেখে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অভিমন্যু। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলতে থাকে—"তবে আমি কী করবো? কী করবো, বলুন? এই অপবাদ, এই গঞ্জনা আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। ঘরে বাইরে সর্বত্রই আমার একমাত্র পরিচয়—আমি খুনির ছেলে। আমার বাবা আমার মাকে খুন করার অপরাধে যাবজ্জীবন জেল খাটছেন। কলেজে ক্লাসরুমে যে ছাত্ররা এতদিন মনোযোগ দিয়ে আমার লেকচার শুনতো তারাই এখন আমাকে দেখলে হাসাহাসি করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এগারো বছর আগেকার ঘটনার কথা যারা এতদিনে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তারাই আবার মহা উৎসাহে তা নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠছে। কেন এমন হল? কে আবার তাদের এই অলোচনায় উৎসাহিত করলো, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। এখন আমি কী করি? এমন ভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।"

ধীরে ধীরে অভিমন্যুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন সদানন্দ মিত্র। মৃদুকণ্ঠে তিনি বলেন—"আমি জানি, কে এই সমস্ত কথা প্রচার করছে।"

—"কে?" বিদ্যুৎবেগে টেবিল থেকে মাথা তুলে সদানন্দর দিকে তাকায় অভিমন্যু।

ধীরকণ্ঠে জবাব দেন সদানন্দ—"অধীর হয়ো না, অভিমন্যু। একটু ধৈর্য্য ধরো। এসবের মূলে রয়েছে বিপ্রদাস। নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে সে তোমার বিরুদ্ধে প্রচারে উঠে পড়ে লেগেছে।"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

একসময় গম্ভীরকণ্ঠে সদানন্দ মিত্র বলেন—"বেশ, সত্য প্রকাশিত হোক। অহীন সোম এসে প্রমাণ করুন তোমার বাবা সত্যিই অপরাধী কি না।"

॥ ৮ ॥

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর

এই সাত দিনের মধ্যে তদন্তে অনেকদূর এগিয়ে গেছে অহীন সোম। নেপালী চাকর বাহাদুরের ওপর কলকাতার বাড়ির ভার ছেড়ে দিয়ে বরুণকে নিয়ে এই ছোট শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে অহীন।

অভিমন্যু ও তার কাকা দীপঙ্কর সাদরে গ্রহণ করেছে এই অতিথি দুজনকে। অহীনের আগমনের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহুলোক এসে হাজির হয়েছিল এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখবার জন্যে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ছিলেন তাদের মধ্যে। পুলিস ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই এসে পরিচয় করে গেছেন অহীনের সঙ্গে। তার সঙ্গে কথাবার্তায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু প্রায় সকলেই আশাহত হয়েছে একটা ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে অহীনের চেহারা। সকলেই ধারণা করেছিল এই ভারতবিখ্যাত গোয়েন্দাটি দেখতে শুনতে তাদের কাল্পনিক অহীন সোমের সঙ্গে মিলে যাবে। কিন্তু তার বদলে অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার অহীন সোমকে দেখে অনেকেই মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

অভিমন্যু ও দীপঙ্কর তাদের যত্নের কোন ত্রুটিই করেনি। দীপঙ্কর রায় তার বাড়ির দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছিল এই দুই বন্ধুর জন্যে।

এখানে এসে প্রথমেই অহীন বৃদ্ধ উকিল জীবনকৃষ্ণ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনিই এগারো বছর আগে আসামী শুভঙ্করের পক্ষে আদালতে মামলা লড়েছিলেন।

এখানকার বারের সিনিয়র উকিল জীবনকৃষ্ণ ঘোষাল। বর্তমানে প্রাকটিস প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। চোখেও ভালো দেখতে পান না আজকাল।

অহীনের নাম শুনেই নিজের বৈঠকখানায় যত্ন করে বসালেন তাকে। তারপর একে একে অহীনের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন।

এই দীর্ঘ দিনে সেই পুরানো মামলার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই ভুলে গেছেন তিনি। তবুও অহীনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন—

"যতদূর মনে আছে, শুভঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে কোন ডাইরেক্ট এভিডেন্স ছিল না। শুধুমাত্র সারকাম্‌স্ট্যানসিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করেই জজসাহেব জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে শুভঙ্কর রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।"

প্রশ্ন করে অহীন—"শুধুমাত্র সারকাম্‌স্ট্যান্‌সিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করেই ট্রান্‌স্‌পোর্টেশন ফর লাইফ—যাবজ্জীবন কারাবাস?"

—"হ্যাঁ, জজসাহেবের কেমন একটা ধারণা জন্মেছিল যে চিররুগ্‌ণা মৃন্ময়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই শুভঙ্কর তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। তাই জুরীদের চার্জ বুঝিয়ে দেবার সময় তিনি এই পয়েন্টের ওপর জোর দিয়েছিলেন।"

—"আপনারা আপীল করেননি?"

—"আপীলের পক্ষে খুব ভালো মামলাই ছিল শুভঙ্করের, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। অনেক বুঝিয়েছিলাম তাকে কিন্তু সে বার বার কেবল একটা কথাই উচ্চারণ

করেছিল—মৃন্ময়ীর মৃত্যুর জন্যে যখন আমিই দোষী সাব্যস্ত হয়েছি তখন আর ওসব ঝামেলা করে কী হবে?”

—“আচ্ছা, সেই মামলাসংক্রান্ত কোন কাগজপত্র কি আছে আপনার কাছে?”

মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন তিনি—“এগারো বছর আগে যে মামলার বিচার হয়ে গেছে তার কাগজপত্র রেখে দেবার দরকার মনে করিনি কোনদিন।”

—“আচ্ছা, আদালতে কি জুডিসিয়াল রেকর্ড পাওয়া যাবে? সেই মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলো একবার পড়তে চাই আমি।”

—“হয়ত পেতে পারেন। রেকর্ডকীপারের কাছে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।”

খোঁজ নিয়েছিল অহীন, এবং পেয়েও ছিল সেই জুডিসিয়াল রেকর্ড। অহীন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিল প্রতিটি সাক্ষীর জবানবন্দি। গভীর মনোযোগ দিয়ে জজসাহেবের রায়ের নকল পড়ছিল সে।

জুডিসিয়াল রেকর্ড যখন পড়া শেষ হলো তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অহীন সোমের সেই এগারো বছরের পুরোন মামলা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে।

তারপর অহীনের অনুরোধে বহু বছর পরে শুভঙ্কর রায়ের বাড়ির দরজা খুলতে হয়েছিল দীপঙ্করকে।

এগারো বছর আগে এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে যে যে বস্তু যেমনভাবে ছিল এখনও প্রায় তেমনিভাবে পড়ে আছে। কেবলমাত্র এই দীর্ঘদিনের অব্যবহারে রাশি রাশি ধুলো জমেছে তার ওপর।

অহীন মনে মনে ভাবে এই ধুলোর ভেতর থেকে এগারো বছর আগেকার ঘটনার কোন নতুন সূত্র বের করবার চেষ্টা নেহাত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও সে প্রতিটি ঘর ভাল করে পরীক্ষা করে।

সিঁড়ির নিচের ছোট্ট অপরিসর ঘরে পড়ে রয়েছে নানারকম খেলনা। এখানে সেখানে নানারকম টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো।

অহীন জিজ্ঞেস করে—“এটা বোধহয় অভিমন্যুবাবুর ছেলেবেলার খেলার ঘর?”

মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে দীপঙ্কর।

অভিমন্যুর সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টার ছলে অহীন বলে—“বাঃ চমৎকার! ছেলেবেলায় দেখছি অভিমন্যুবাবুর সবরকম বিষয়ের ওপরই ঝোঁক ছিল। ঐ চুপসে দুমড়ে যাওয়া বলগুলো দেখে মনে হয় সেদিন যে ছেলে ঐ বলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল সে হয়ত তার ভবিষ্যৎ জীবনে একজন মস্তবড় ফুটবল প্লেয়ার হয়েছিল। আবার ঐ ক্রিকেটের ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প দেখে মনে হয় সে হয়ত হয়েছিল মস্তবড় একজন ক্রিকেটার। ঐ ছবির বইগুলোতে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ার ইঙ্গিত। ঐ কাচের টেস্টটিউব, ভাঙা বিকারগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার একজন উঁচুদরের কেমিস্ট হওয়ার প্রেরণা। আর...”

কথাটা শেষ না করেই মেঝেতে ছড়ানো একখানা কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর কাঁচাহাতে রং-পেনসিল দিয়ে আঁকা কিম্ভুতকিমাকার একটা মনুষ্যমূর্তি দেখতে দেখতে অহীন আবার বলে ওঠে—“আর, এই ছবির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে র‍্যাফেলের ম্যাডোনা কিংবা দা' ভিঞ্চির মোনালিসার আকাঙ্ক্ষা, তাই না অভিমন্যুবাবু?”— বলেই হোহো করে হেসে ওঠে সে।

অভিমন্যু জবাব দেয় না। দীপঙ্কর বলে—"যা বলেছেন। একমাত্র ছেলের কোন আবদারই অপূর্ণ রাখতেন না দাদা।"

হালকা আবহাওয়া থেকে আবার গম্ভীর আবহাওয়ায় ফিরে আসে অহীন। দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে—আচ্ছা দীপঙ্করবাবু, আপনি বলেছিলেন যে সেদিন আপনার দাদা অর্থাৎ শুভঙ্কর রায় যখন আপনার বউদি অর্থাৎ মৃন্ময়ীর জন্যে অরেঞ্জ কোয়াশের সরবৎ তৈরি করেছিলেন তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাই না?" মাথা নেড়ে সায় দেয় দীপঙ্কর।

—"আপনি কি তখন কোন বিশেষ কাজে সেখানে গিয়েছিলেন?"

—"হ্যাঁ, ব্যবসাসংক্রান্ত একটা জরুরী কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন।"

—"অরেঞ্জ কোয়াশ ছাড়া সরবতে তিনি অন্য কিছু মিশিয়েছিলেন?"

—"না, অন্য কিছু মেশাতে দেখিনি আমি। তবে আমি চলে যাওয়ার পর তিনি কি করেছিলেন, আমি জানি না।"

—"আপনি কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?"

—"সরবৎ তৈরী করে দাদা ডেকচিটা নিয়ে বউদির কাছে চলে গেলেন। আর, আমিও চলে গেলাম সেখান থেকে।"

—"আচ্ছা, কোন ব্যাপারে শুভঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছিল কি?"

—"আজ্ঞে না।"

—"আচ্ছা, আপনার স্ত্রী চারুলতা দেবী নাকি মৃন্ময়ী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলেন ঠিক তাঁর সরবৎ খাওয়ার পর। তখন মৃন্ময়ী দেবী আপনার স্ত্রীকে ঐ সরবৎ সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন বলে শুনেছেন?"

—"আজ্ঞে না, তার শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে সাধারণ দু'একটা কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে।"

একটু থেমে চিন্তা করে অহীন। তারপর আবার প্রশ্ন করে— "আপনার স্ত্রী চারুলতা দেবী তো নিঃসন্তান। অভিমন্যুবাবুকে ছেলের মত ভালবাসতেন তিনি, তাই না?"

—"হ্যাঁ।" জবাব দেয় দীপঙ্কর।

অহীন আর কোন প্রশ্ন না করে একে একে সমস্ত ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে।

একসময় সে হঠাৎ প্রশ্ন করে দীপঙ্করকে—"উকিল জীবনকৃষ্ণবাবুর কাছে শুনেছিলাম যে মামলা শেষ হয়ে যাবার পর সেই ছোট ডেকচি ও সরবতের গ্লাস, যা নাকি পুলিস আদালতে দাখিল করেছিল, সেগুলো নাকি আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় দীপঙ্কর।

অহীন জিজ্ঞেস করে—"সেগুলো কি আপনার কাছে আছে?

—"হ্যাঁ, এই বাড়িতেই রেখে দিয়েছিলাম জিনিসগুলো।"

দীপঙ্কর অহীন ও বরুণকে নিয়ে শুভঙ্করের খাবার ঘরে প্রবেশ করে। একটা টেবিলের ওপর কিছু অ্যালুমিনিয়াম ও কাঁসার বাসনপত্র জড়ো করা ছিল। দীপঙ্কর তার ভেতর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ডেকচি ও একটা কাচের গ্লাস তুলে দেয় অহীনের হাতে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসদুটো ভালমত পরীক্ষা করতে থাকে অহীন। বহুদিনের অব্যবহারে অ্যালুমিনিয়ামের স্বাভাবিক রং হারিয়ে গেছে এই ডেকচিটার, তবে উপুড় করে রাখার জন্যে ভেতরের দিকটা তখনও বেশ পরিষ্কার।

অহীনের ইঙ্গিতে বরুণ জিনিসদুটো হাতে নেয়। তারপর তারা বেরিয়ে আসে সেই বাড়ি থেকে। দীর্ঘ এগারো বছর পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে সেই বাড়ির অন্ধকার ঘরগুলো বাইরের আলোহাওয়ার স্বাদ পেয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে।

।।৯।।

স্বভাবতই যারা একটু শান্তপ্রকৃতির লোক তারা যদি কোন কারণে হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠে তবে তারা সেই মুহূর্তে একটা কুরুক্ষেত্রকাণ্ড বাধিয়ে দিতেও পেছপা হয় না। সদানন্দ মিত্রও প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন স্ত্রীর গোঁয়ার্তুমির জন্যে।

সেদিন রাতে নিজের পড়ার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন সদানন্দ। এমন সময় তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—"দিনরাত কি কেবল বইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকলেই চলবে? আজ বাদে কাল যে মেয়ের আশীর্বাদ সেদিকে খেয়াল আছে? বাড়িতে তোমার মত একটা পুরুষমানুষ থাকতে আমাকেই কি শেষে যোগাড়যন্ত্রের জন্যে বাইরে বেরোতে হবে?"

আজ সমস্ত দিনই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে ছিল সদানন্দের। নিজের একমাত্র মেয়ের বিষণ্ণ মুখখানাই বারে বারে চোখের ওপর ভেসে উঠছিল তাঁর। কিন্তু শান্ত মানুষ তিনি, তাই মুখে কোন কথা না বলে চুপ করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন দিনটা।

কিন্তু হঠাৎ স্ত্রীর এই কর্কশ কণ্ঠস্বরে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না তিনি। সশব্দে বইখানা বন্ধ করে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বললেন—"আশীর্বাদ হবে না কাল। বিপ্রদাসের সঙ্গে চিত্রার বিয়ের ব্যবস্থা এখন স্থগিত থাকবে।"

—"স্থগিত থাকবে?" ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে ঝংকার দিয়ে ওঠেন সদানন্দর স্ত্রী।

—"হ্যাঁ, স্থগিত থাকবে। আমার হুকুম।" গম্ভীরকণ্ঠে কথাটা বলে স্ত্রীর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সদানন্দ মিত্র।

সদানন্দর স্ত্রী জেদী হলেও বুদ্ধিমতী। স্বামীর এহেন কথাবার্তার ধরনের সঙ্গে খুব বেশী পরিচিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নন তিনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর একটু মোলায়েম করে তিনি জবাব দেন—"কিন্তু বিপ্রদাসের মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা যে আমি পাকা করে ফেলেছি। এখন যদি তুমি না বল তো..."

স্ত্রীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সদানন্দ বলে ওঠেন—"না, এই বিয়ের ব্যবস্থা কিছুতেই হবে না এখন।"

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই প্রৌঢ়া রমণী। তারপর একসময় বলেন—"তোমার ইচ্ছাটা কি, শুনি?"

—"আমার আর তোমার মেয়ের ইচ্ছাটা কি তোমার জানতে বাকী আছে?"

—"তুমি কি সেই খুনীর ছেলেটার সঙ্গে চিত্রার বিয়ে দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছো নাকি?"

—"না, সেই খুনীর ছেলের সঙ্গে নয়।"

—"তবে?"

একটু সময় চুপ করে থেকে চিন্তা করেন সদানন্দ, তারপর বলেন—"গোয়েন্দা অহীন সোম ঐ বিষয়ে নতুন করে তদন্ত করতে আরম্ভ করেছেন। ঐ তদন্তে যদি প্রতিপন্ন হয় যে

অভিমন্যুর বাবা শুভঙ্কর রায় তার স্ত্রীকে সত্যি হত্যা করেছে, তবে সেই খুনীর ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আমি মোটেই জেদ ধরবো না। কিন্তু যদি অহীন সোম প্রমাণ করতে পারেন যে শুভঙ্কর রায় সত্যিই নিরপরাধ, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে এগারো বছর আগে ভুল করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তবে ঐ অভিমন্যুর সঙ্গেই চিত্রার বিয়ে দেব আমি।

সদানন্দ থামতেই তাঁর স্ত্রী গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বিষণ্ণ-কণ্ঠে বলে ওঠেন—"তুমি কী মনে কর? চিত্রার মঙ্গল কি আমি চাই না?"

এবার একটু ম্লান হাসি ভেসে ওঠে সদানন্দর ঠোঁটের কোণে। জবাব দেন তিনি—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাও। তবে চাওয়ার মাত্রাটা তোমার এত বেশী যে মাঝে মাঝে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেল তুমি।"

—"হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি? তুমি কি মনে কর পাত্র হিসেবে বিপ্রদাস চিত্রার উপযুক্ত নয়?"

—"সেকথা কখনও বলিনি আমি। তবে পাত্র হিসেবে অভিমন্যু কোন অংশেই বিপ্রদাসের চেয়ে খাটো নয়। তাছাড়া মেয়েটার নিজের মতটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।"

—"ঐ একরত্তি মেয়ের মতটাই যদি আসল হয় তো শুধু শুধু দেরি না করে এখনই ওর সঙ্গে চিত্রার বিয়েটা সেরে ফেলছো না কেন?"— একটু শ্লেষের কণ্ঠে কথাটা বলেন সদানন্দর স্ত্রী।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দেন সদানন্দ—"তাই হয়তো দিতাম। শুভঙ্কর রায় যদি দোষীও হয় তো তার ছেলে অভিমন্যু নিশ্চয়ই কোন দোষ করেনি। কিন্তু তোমার আমার আত্মীয়স্বজনেরা নিশ্চয়ই এই যুক্তি মেনে নেবে না। তারা বলবে সদানন্দ মিত্র জেনে শুনে একটা খুনীর ছেলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। তাই ঠিক করেছি, 'খুনীর ছেলে' অপবাদ যদি কোনদিন অভিমন্যুর ঘুচে যায় তো চিত্রাকে আমি ওর হাতেই দেব সেদিন।"

ধীরে ধীরে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

।। ১০।।

অহীনের প্রশ্নে বৃদ্ধ ডাক্তার বি. গুপ্ত এগারো বছর আগে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তারপর একসময় ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলেন—"মৃন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর জন্যে বোধহয় আমিই দায়ী, মিঃ সোম।"

—"আপনি?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর অহীনের।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেন বি. গুপ্ত—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বলতে পারেন।"

একটু থেমে ডাঃ গুপ্ত আবার বলতে থাকেন—"সেদিন যদি আমি ঠিকমত মৃন্ময়ী দেবীর ডায়গ্নসিস করতে পারতাম তবে হয়ত তিনি মারা যেতেন না। শুভঙ্করবাবুর কাছে খবর পেয়ে আমি যখন তাঁর বাড়ি এলাম তখন মৃন্ময়ী দেবী মাঝে মাঝে বমি করছিলেন। পেটে তাঁর দারুণ যন্ত্রণা। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে তাঁর পুরোন রোগটাই হয়ত আবার রিল্যাপস্ করেছে। সেইমত ট্রিট্‌মেণ্ট করে যেতে লাগলাম আমি। অবশ্য তৃতীয় দিনে আসল ব্যাপারটা

বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেইদিন দুপুরেই মারা গেলেন তিনি।”

ডাঃ গুপ্ত থামতেই অহীন প্রশ্ন করে—“তাহলে সরবতের ব্যাপারটা কি আপনি জানতেন না?”

—“হ্যাঁ, মৃন্ময়ীর মুখেই তা শুনেছিলাম আমি। কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি তখন একেবারেই চিন্তা করিনি, কারণ তাঁর স্বামী শুভঙ্করবাবু নিজেই যখন ঐ সরবৎ তৈরী করেছিলেন তখন আর তাতে সন্দেহ করবার মত কী থাকতে পারে?”

একটু থেমে ডাঃ গুপ্ত নিজের চশমার কাচ পরিষ্কার করে নেন। তারপর আবার বলতে থাকেন—“আমার সেদিনের ঐ ধারণাটাই ভুল হয়েছিল। সেদিন আমার মনে কোন সন্দেহই হয়নি যে শুভঙ্কর রায় নিজেই তার স্ত্রীর সরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারেন।”

প্রশ্ন করে অহীন—“পোস্টমর্টেম একজামিনেশনের সময় নাকি মৃন্ময়ী দেবীর পেটে প্রচুর পরিমাণ মারকিউরিক ক্লোরাইড পাওয়া গিয়েছিল, এবং ডাক্তারদের অভিমত নাকি ঐ বিষেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে?”

—“হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা পোস্টমর্টেমের সময় নয়। পোস্টমর্টেমের পর মৃন্ময়ী দেবীর ‘ভিসেরা’ অর্থাৎ ‘স্টম্যাক ওয়াশ’ কেমিক্যাল এক্সামিনারের কাছে পাঠান হয়েছিল। তাঁরাই অভিমত দিয়েছিলেন যে ঐ বিষেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে।”

একটু সময় চুপ করে চিন্তা করে অহীন আবার প্রশ্ন করে—“মৃন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে নাকি আপনি তাঁকে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত একটা মিকশ্চার খেতে দিয়েছিলেন?”

একটু চিন্তা করে জবাব দেন ডাঃ গুপ্ত—“হ্যাঁ, এবেলা ওবেলা দু'ফোঁটা করে দিনে চার ফোঁটা হিসেবে মাত্র তিন দিন তাঁকে ঐ ওষুধ খেতে দিয়েছিলাম আমি।”

—“তবে তো ঐ ওষুধের অ্যাক্‌সনেও তিনি মারা যেতে পারেন।”

মৃদু হেসে ডাঃ গুপ্ত মাথা দুলিয়ে বলেন—“অসম্ভব। ঐ ঘটনার প্রায় মাসখানেক আগে তাঁকে ঐ ওষুধ খেতে দিয়েছিলাম আমি। পরে মৃন্ময়ী দেবীও আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমার কথামত তিনি মাত্র তিন দিন ঐ ওষুধ খেয়েছিলেন। কাজেই প্রায় এক মাস পরে তাঁর পাকস্থলীর মধ্যে ঐ বিষ কিছুতেই পাওয়া যেতে পারে না।”

—“আচ্ছা, ডক্টর গুপ্ত, আপনি যখন মৃন্ময়ী দেবীর চিকিৎসা করছিলেন তখন কি তিনি আপনাকে কখনও বলেছিলেন যে তিনি ঐ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন?”

—“না।”

—“তবে, আপনার ধারণা যে মৃন্ময়ী দেবীকে কেউ ঐ বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে। তিনি আত্মহত্যা করেননি, কেমন?”

—“হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর ঐ বিষ ঐ সরবতের মধ্যেই ছিল। কারণ ঐ সরবৎ খাওয়ার সাত আট ঘণ্টা আগে পর্যন্ত তিনি অন্য কিছুই খাননি বলে শুনেছিলাম। আর, তাছাড়া, মৃন্ময়ী দেবী যে গ্লাসে ঐ সরবৎ খেয়েছিলেন সেই গ্লাসেও মারকিউরিক ক্লোরাইড বিষ পাওয়া গিয়েছিল।”

চিন্তিতমুখে ডাঃ গুপ্তর চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে অহীন সোম।

।। ১১ ।।

দীপঙ্কর রায়ের বাড়ির দোতলার একটা কক্ষে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা পরীক্ষা করছিল অহীন।

ধীরে ধীরে পাশে এসে দাঁড়ায় বরুণ। বন্ধুর পরীক্ষাকার্য দেখতে দেখতে একসময় সে বলে ওঠে—"এগারো বছর আগের সেই বিষের সন্ধান করছ নাকি ঐ ডেকচির মধ্যে?"

ডেকচিটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বরুণের মুখের দিকে তাকায় অহীন। তারপর বলে—"এর মধ্যেই সেই মামলার ঘটনাগুলো ভুলে বসে আছ তুমি?"

—"কি ভুলে বসে আছি?"

—"বাঃ তোমার মনে নেই যে মৃন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর দিন সকালে শুভঙ্কর রায় নিজে এই ডেকচি পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছিলেন? তাই এর ভেতর কোন বিষ পাওয়া যায়নি সেদিন?"

চোখদুটো বিস্ফারিত করে একটা কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সুরে বরুণ জবাব দেয়—"ও...এই কথা! তা তুমি সত্যিই বলেছ, ব্যাপারটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম আমি। তবে এত মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ কী পরীক্ষা করছিলে?"

বন্ধুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অহীন আবার মাথা নিচু করে ডেকচির ভেতরটা পরীক্ষা করতে থাকে।

বরুণ তার এই প্রতিভাধর বন্ধুটির স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তাই আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অহীনের মুখ একসময় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বরুণের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"এক বালতি জল আনতে পার, বরুণ?"

—"জল?"

—"হ্যাঁ, জল।"

দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে বন্ধুর নির্দেশ পালন করতে বরুণ গিয়ে প্রবেশ করে বাথরুমে।

খানিক পরে এক বালতি জল নিয়ে এসে হাজির হয় অহীনের সামনে। ধীরে ধীরে বালতির জল ঢেলে ডেকচিটা ভরতি করে অহীন। তারপর সেই কাচের গ্লাসে একগ্লাস জল ডেকচি থেকে ঢেলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আবার মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে ডেকচিটা।

কোন সাড়াশব্দ না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর কাজ লক্ষ্য করতে থাকে বরুণ। বরুণ লক্ষ্য করে, পরীক্ষা করতে করতে অহীনের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটু সময় স্থির হয়ে বসে কি যেন চিন্তা করে অহীন। তারপর আবার সেই ডেকচি থেকে আর একগ্লাস জল ঢেলে নিয়ে ফেলে দেয় সে। ডেকচিটাকে হাতের ওপর রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে আবার পরীক্ষা করতে থাকে অহীন।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অহীনের মুখ।

ডেকচির জল ঢেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। তারপর ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় এসে একটা ডেকচেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকে। অহীনের সঙ্গে

সঙ্গে বরুণও বারান্দায় এসে আর একখানা চেয়ার অধিকার করে বসে।

এক মিনিট দু মিনিট করে প্রায় পনর মিনিট অতিবাহিত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে চোখ খুলে বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে অহীন—"সবই ঠিক আছে, কেবল একটা লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছি না।"

অহীনের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বরুণ তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। এতক্ষণে অহীনের খেয়াল হল যে বরুণ তার কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি। তাই সে আরও বিশদভাবে বলে—"এগারো বছর আগে শুভঙ্কর রায়ের বাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছিল তার পাত্র পাত্রী এবং প্রতিটি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক সমস্তই ঠিক আছে। কেবল একটা সূত্র খুঁজে পাচ্ছি না...।"—কথাটা বলে একটু থামে অহীন। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—"আমার কি মনে হয় জানো বরুণ? মনে হয় এই ঘটনার সঙ্গে আর কোন ব্যক্তি জড়িত আছে যার খোঁজ সেদিন পুলিস পায়নি। সেই ব্যক্তিটিকে হাতের কাছে পাওয়া গেলে এই হত্যারহস্য সমাধান অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে।"

এবার বরুণ প্রশ্ন করে—"তবে কি তোমার মনে হয় শুভঙ্কর রায় আসলে দোষী নয়? সে তার স্ত্রী মৃন্ময়ীকে হত্যা করেনি।"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"এখনই তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করে যতক্ষণ না তার সঙ্গে কথা বলেত পারছি ততক্ষণ শুভঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে খোলাখুলি কিছু বলতে রাজী নই আমি।"

বরুণ আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে।

* * * * * * * *

গভীর রাত।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। কেবল মাঝে মাঝে সামনের দেবদারু গাছে দু'একটা রাতজাগা পাখির পাখার ঝটপট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশে তারার রাজ্যে আজ চাঁদ অনুপস্থিত। তাই, আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রামগ্ন প্রকৃতিদেবী।

দীপঙ্কর রায়ের বাড়িটাও নিস্তব্ধ। দোতলার বড় ঘরে একখানা খাটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বরুণ। ওপাশের আর একখানা খাট কিন্তু শূন্য। অহীন নেই সেখানে। সে তখন বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে গভীরভাবে চিন্তা করে যাচ্ছে।

এইটাই অহীনের বহুদিনের অভ্যাস। গভীর রাতে সবাই যখন অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে তখন অহীন রাতের অন্ধকারে একা জেগে থেকে জটিল রহস্যজাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। এমনিভাবে অনেক রহস্যের সমাধান করেছে সে।

বরুণ একদিন মাঝরাতে জেগে উঠে অহীনকে এমনিভাবে একা একা বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেছিল। জবাবে অহীন বলেছিল—"জানো বরুণ, রহস্য থাকে অন্ধকারের মধ্যে। সেই রহস্যকে টেনে আলোর মধ্যে নিয়ে আসার অর্থই হল রহস্যের সমাধান করা। তাই রহস্যের অন্ধকারে ঢুকতে হলে অন্ধকারের প্রয়োজন—অনেকটা বিষে বিষক্ষয় আর কি।"—বলেই প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছিল অহীন।

অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কানদুটো খাড়া হয়ে ওঠে অহীনের—'ও কিসের শব্দ?' চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসে অহীন।

সামনে শুভঙ্করের বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই সে চমকে ওঠে। অস্পষ্ট আলোয় সে দেখতে পায় বাড়িটার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে একটা লোক যেন কি করছে। মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন। একমুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পায়ে পায়ে অহীন যখন জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় ততক্ষণে সেই লোকটা জানালাপথে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে একবার ইতস্ততঃ করে অহীন। তারপর সেও সেই জানালাপথে ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতর।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতখানাও স্পষ্ট দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কানদুটো খাড়া করে রাখে অহীন। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

নিঃশব্দে শিকারী বেড়ালের মত অন্ধকারে এ ঘর থেকে সে ঘরে ঘুরতে থাকে অহীন।

হঠাৎ তার কানে আসে একটা সট্ সট্ শব্দ। পাশের ঘরে লোকটার উপস্থিতি টের পায় অহীন। একটা ভারী বস্তু দিয়ে কাঠের ওপর ঘা মেরে চলেছে লোকটা।

ঘরের ভেতর অতর্কিতে ঢুকে পড়ে লোকটাকে জাপটে ধরবে নাকি অহীন? নাঃ তার চেয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ভাল। এই বারান্দা দিয়েই যেতে হবে তাকে। তখন সে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে অহীন।

কিন্তু একি? ভাল করে কিছু বুঝতে পারার আগেই ভারী বস্তু দিয়ে কে যেন আঘাত করে তার মাথায়। মুখে মৃদু আর্তনাদ করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে অহীন।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত সেখানেই পড়ে থাকে সে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মাথার বাঁ দিকটা তখনও একটু একটু জ্বালা করছে। পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বের করে চারিদিকে দেখতে থাকে অহীন। আততায়ীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

ধীরে ধীরে সেই জানালাপথে সে যখন বাইরে এসে দাঁড়ায় তখনও ভোর হতে অনেক দেরি।

নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বরুণ। অহীনের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিস্মিত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে—"তোমার মাথায় রক্ত কিসের, অহীন?"

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় অহীন—"ও...তাই নাকি?"—বলেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করতে থাকে।

বিস্মিত বরুণ ততক্ষণে খাট থেকে নেমে পড়েছে। অহীনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলে—"কী করে এমন হলো?"

জবাব দেয় অহীন—"বলছি, তবে তার আগে ডেটলের শিশিটা একবার নিয়ে এসো।"

।। ১২।।

ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে যায় অহীনের।

বাথরুম থেকে ঘরে ঢুকতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করে দীপঙ্কর। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করে—"বরুণবাবুর কাছে শুনলাম কাল রাতে নাকি একটা লোক আপনাকে আক্রমণ করেছিল?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটা বিবৃত করে অহীন।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে অভিমন্যুও এসে হাজির হয় সেখানে। আক্ষেপের সুরে সে বলে—"দেখুন তো আমাদের এখানে এসে নিজের জীবনটাই বিপন্ন হয়েছিল আপনার।"

মৃদু হেসে অহীন বলে—"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। ওরকম হঠাৎ আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, নিজের বোকামির জন্যেই কাল রাতে বিপদে পড়েছিলাম।"

এমন সময় বরুণ এসে সেখানে উপস্থিত হয়। অহীনের কথাটা কানে যেতেই সে বলে—"নিশ্চয়ই, ঐ অবস্থায় একা একা লোকটাকে অনুসরণ করা মোটেই উচিত হয়নি তোমার।"

বরুণের কথা শেষ হবার আগেই অহীন জবাব দেয়—"আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো বরুণ, এর চেয়েও অনেক কঠিন বিপদের মুখে অনেকবার আমাকে পড়তে হয়েছিল। বোকামি আমার সেইজন্যে নয়। বোকামি হয়েছে এই হাতঘড়িটা হাতে দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করবার জন্যে।"—বলেই তার বাঁ হাতের কবজির সঙ্গে বাঁধা হাতঘড়িটা দেখায় সে।

সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বলতে থাকে অহীন—"অন্ধকারের ভেতর সেই লোকটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম যে ঐ অন্ধকারে লোকটা আমাকে দেখতে পাবে না। ব্যাপারটাও ঠিক তাই। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে লোকটা আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আমার হাতঘড়ির এই রেডিয়াম ডায়েল সমস্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিয়েছিল। অন্ধকারের ভেতর চকচকে এই ডায়েল দেখেই আমার উপস্থিতি টের পেয়েছিল লোকটা।

প্রশ্ন করে অভিমন্যু—"আপনি কি লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

—"না, তা পারিনি। তবে এই ঘটনাটা আপনার পক্ষে একটা সুখবরের ইঙ্গিত দিচ্ছে।"

—"সুখবর?"

—"হ্যাঁ, সুখবর। ঘটনাটা প্রমাণ করেছে যে এগারো বছর আগে আপনার বাবার জেল হয়ে যাবার মধ্যে যে ঘটনার আপাত পরিসমাপ্তি হয়েছিল, ব্যাপারটা আসলে মোটেই তা নয়। তাই আজ দীর্ঘ এগারো বছর পরে ঐ ব্যাপারে নতুন করে তদন্ত শুরু করতেই এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে ঐ বাড়িতে।"

অহীনের কথায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অভিমন্যুর মুখ। অহীন আড়চোখে লক্ষ্য করে দীপঙ্করের মুখ ভাবলেশহীন।

অহীন বলে—"এবার চলুন ঐ বাড়িটা একবার দেখে আসি। কাল রাতে লোকটা ঐ ঘরে ঢুকে কী ভাঙতে চেষ্টা করেছিল একবার পরীক্ষা করে দেখি।"

ঘরে বিশেষ কোন আসবাবপত্র ছিল না। একপাশে একটা বড় কাঠের আলমারি। তার নিচের দিকে তিনটা ড্রয়ারই খোলা পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় দুটো ড্রয়ারে কোন চাবি লাগানো ছিল না। কিন্তু তৃতীয় ড্রয়ারটার চাবি লাগানো ছিল বলেই সেই লোকটা কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে জোর করে খুলেছিল সেটা।

অহীন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে তিনটা ড্রয়ারই একেবারে ফাঁকা।

দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে অহীন—"এই ড্রয়ারে কি ছিল বলতে পারেন, দীপঙ্করবাবু?"

—"আজ্ঞে না, দাদা ঐ ড্রয়ারে কী রেখেছিলেন আমি জানি না।"

—"অভিমন্যুবাবুর পক্ষে কিছু বলা তো বোধহয় সম্ভব নয়, কারণ আপনি তো তখন ছোট ছিলেন, তাই না?"—বলে অভিমন্যুর দিকে তাকায় অহীন।

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অভিমন্যু।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা লোক অহীনের কাছে একখানা চিঠি নিয়ে আসে। লোকটির হাত থেকে চিঠিখানা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে অহীন—"কে পাঠিয়েছে চিঠিটা!"

—"আজ্ঞে, বিপ্রদাসবাবু পাঠিয়েছেন।"

এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই অহীন প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্রের কন্যা চিত্রা সম্বন্ধে সব কথাই শুনতে পেয়েছিল। সেই সূত্রে বিপ্রদাসের নামটা জানা ছিল তার, যদিও এই ব্যক্তিটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি কখনও। চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে অহীন।

ছোট্ট চিঠি। মাত্র দুটো লাইন লেখা।

শ্রদ্ধেয় অহীনবাবু,

আজ রাতে আপনি যদি দয়া করে একবার আমার ওষুধের দোকানে আসেন, তবে আপনার তদন্ত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় একটা দামী খবর দিতে পারি আপনাকে। নমস্কার। ইতি

বিপ্রদাস চৌধুরী

পত্রবাহক লোকটির কাছ থেকে দোকানের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে তাকে বিদায় দেয় অহীন। তারপর চিঠিখানা বরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—"কিছু বুঝতে পারছো, বরুণ?"

চিঠিখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বরুণ জবাব দেয়—"না।"

—ঠিক আছে, দেখা যাক।"—বলে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয় অহীন।

বরুণকে নিয়ে অহীন যখন বিপ্রদাস চৌধুরীর ওষুধের দোকানে এসে হাজির হয়, তখন সেখানে খদ্দেরের প্রচুর ভিড়।

আধুনিক রুচিসম্মতভাবে সাজানো দোকান। তিন-চারজন কর্মচারী কাজ করছে। একপাশে গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে একটি সুদর্শন যুবক বসে বসে কর্মচারীদের এটা ওটা নির্দেশ দিচ্ছে। অহীন কাউন্টারের সামনে এগিয়ে যেতেই একটি কর্মচারী তাকে খদ্দের মনে করে প্রশ্ন করে—"কী চাই আপনার?"

—"বিপ্রদাসবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই সুদর্শন যুবকটি সামনে এগিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করে প্রশ্ন করে—"আপনিই গোয়েন্দা "

—"অহীন সোম।"—বাকীটা পূরণ করে দেয় অহীন নিজেই।

অহীনের নাম শুনেই দোকানের খদ্দেররা একযোগে তার দিকে তাকিয়ে এই বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে দেখতে থাকে।

বিপ্রদাসকে অনুসরণ করে দোকানের পেছন দিকে একটা কক্ষে এসে হাজির হয় অহীন ও বরুণ।

বলতে থাকে বিপ্রদাস—"আজ হঠাৎ পুরোন কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ একটা সইয়ের ওপর নজর পড়ে আমার। সইটা করেছিলেন শুভঙ্কর রায় অনেকদিন আগে।"—বলতে বলতে আলমারি খুলে একটা পুরোন উইয়েকাটা বাঁধানো খাতা নিয়ে এসে অহীনের হাতে তুলে দেয়।

খাতাটাকে উলটেপালটে দেখতে দেখতে অহীন প্রশ্ন করে—"কীসের খাতা এটা?"

জবাব দেয় বিপ্রদাস—"আমার বাবার আমলে একটা নিয়ম ছিল, যারা ডাক্তারের লিখিত অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয়বার কোন প্রেস্ক্রিপ্শান অনুযায়ী ওষুধ নিতে আসতো তাদের এই খাতায় সই করতে হতো। অবশ্য বর্তমানে আর এই নিয়ম চালু নেই।"

কথাটা বলেই বিপ্রদাস খাতা খুলে একটা বিশেষ পৃষ্ঠার ওপর অহীনের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

অহীন তাকিয়ে দেখে একটা ওষুধের প্রেস্ক্রিপশানের নকল রয়েছে সেখানে। নিচে শুভঙ্কর রায়ের একটা ইংরেজী সই। উপরের তারিখটা দেখে একটু চমকে ওঠে অহীন। স্ত্রী মৃন্ময়ীকে যেদিন সরবৎ খাওয়ানো হয়েছিল তার ঠিক আগের দিনের তারিখ দেওয়া রয়েছে উপরে। টানা হাতের লেখা হলেও অহীনের পড়তে অসুবিধা হয় না ওষুধের মধ্যে মারকিউরিক ক্লোরাইডও রয়েছে।

অহীন প্রশ্ন করে—"ওষুধের নামগুলো কে লিখেছিলেন বলতে পারেন?"

—"আমার বাবা।" জবাব দেয় বিপ্রদাস।

—"নিচের সইটা যে ঐ শুভঙ্কর রায়ের তা বুঝলেন কী করে? অন্য কোন শুভঙ্কর রায় তো হতে পারে।"

—"আজ্ঞে না, উপরেই শুভঙ্কর রায়ের ঠিকানা রয়েছে।"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অহীনের। চিন্তিতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—"এই প্রেস্ক্রিপ্শান অনুযায়ী প্রথমবারের ওষুধ কি শুভঙ্কর রায় আপনাদের এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বিপ্রদাস আর একটা পৃষ্ঠা বের করে দেখায়। অহীন লক্ষ্য করে তাতেও বিপ্রদাসের বাবার হাতে লেখা ওষুধের নাম রয়েছে। তবে নিচে কোন সই নেই। তার উপরের তারিখ শুভঙ্করের জবানবন্দিতে বর্ণিত তারিখের সঙ্গে মিলে যায়।

ভাবতে থাকে অহীন—শুভঙ্কর তাহলে মৃন্ময়ীকে সরবৎ খাওয়াবার আগের দিন আর এক শিশি সেই বিষাক্ত ওষুধ এনেছিল? কেনই বা সে কথাটা বরাবর গোপন করে গেছে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অহীন। তারপর সে বিপ্রদাসকে বলে—"এমন একটা খবরের জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ বিপ্রদাসবাবু। এই খাতাটা কিছুদিনের জন্যে আমার কাছে রাখতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

—"আপত্তির কী আছে? আপনার মত একজন ব্যক্তির সামান্য প্রয়োজনে লাগতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি।"

খাতাটা হাতে নিয়ে দুই বন্ধু বাইরে চলে আসে।

।। ১৩।।

দমদম সেন্ট্রাল জেলের ইনটারভিউ রুম।

টেবিলের ওপর খোলা খাতাখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দারুণ চমকে ওঠে শুভঙ্কর রায়। তারপর বলে—"কিন্তু আমি তো ডাঃ গুপ্তের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান মত দ্বিতীয়বার কোন ওষুধ আনিনি।"

—"তবে কি বলতে চাইছেন ঐ সইটা আপনার নয়?"

খানিক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সইটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা করে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"সইটা অবশ্য আমার সইয়ের মতই, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কখনও এই খাতায় সই করেছি বলে মনে পড়ছে না।"

—"তাহলে এই সইটা এখানে এলো কী করে।"

একটু যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে শুভঙ্কর রায়। স্খলিতকণ্ঠে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তাও তো বটে। তবে...বিশ্বাস করুন আমি... আমি এই খাতায় সই করিনি। আমি..."

শুভঙ্করকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে অহীন—"আচ্ছা, আপনার মনে আছে, আপনার বাড়ির পুবদিকের ঘরে যে বড় কাঠের আলমারিটা রয়েছে, তার উপরের ড্রয়ারের মধ্যে কী রেখেছিলেন আপনি?"

খানিক্ষণ চিন্তা করে জবাব দেয় শুভঙ্কর—"ঐ ড্রয়ারগুলোতে কোনদিন কিছু রেখেছিলাম বলে মনে করতে পারছি না।"

—"নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিস রেখেছিলেন ওখানে। তা না হলে উপরের ড্রয়ারে চাবি লাগিয়েছিলেন কেন? খালি ড্রয়ারে কি কেউ চাবি লাগিয়ে রাখে?"

আবার চিন্তা করতে থাকে শুভঙ্কর। তারপর জবাব দেয়— "নাঃ, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

অহীন বলতে থাকে—" মনে করে দেখুন তো শুভঙ্করবাবু। কোন টাকাপয়সা, সোনাদানা কিংবা কোন দরকারী কাগজপত্র..."

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শুভঙ্করের মুখ। জবাব দেয় সে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আমার উইলের একটা ড্রাফ্‌ট রেখেছিলাম ওর মধ্যে।"

—"উইল? কিসের উইল?"

—আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার স্ত্রী মৃন্ময়ী পাবে—এই মর্মে একটা উইলের ড্রাফ্‌ট্‌ তৈরি করেছিলাম একদিন।"

—"ঐ উইলে আপনার সই ছিল?"

—"হ্যাঁ, সইও করেছিলাম একটা। তবে পাকাপাকি উইল তৈরি করিনি বলে সাক্ষীসাবুদের সই করাইনি।"

—"ঐ উইলটাই চুরি হয়ে গেছে সেদিন রাতে।"

—"কে চুরি করেছে? আর ঐ উইল দিয়ে কার কি লাভ হবে? আমার অবর্তমানে যাকে আমার সম্পত্তির মালিক করেছিলাম সে তো আমার আগেই মারা গেছে। কাজেই ঐ উইলের এখন আর কী দাম আছে?"

—"নিশ্চয়ই কিছু দাম আছে, নইলে ওটা চুরি যাবে কেন?"

ফ্যালফ্যাল করে অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রৌঢ় শুভঙ্কর। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যাচ্ছন্ন লাগছে তার কাছে।

* * * * * * * *

সেদিন কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন সদানন্দ মিত্র। ঘরে ঢুকে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি স্ত্রীকে ডাকেন। কিন্তু স্ত্রীর সাড়া না পেয়ে মেয়ে চিত্রাকে ডাকতে থাকেন তিনি।

চিত্রা এসে তার বাবার ঘরে ঢুকতেই সদানন্দ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—"তোর মা কোথায়, চিত্রা?"

বাবার এমন উত্তেজনার কারণ বুঝতে না পেরে চিত্রা জবাব দেয়—"কেন, কিসের জন্যে..."

চিত্রাকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে সদানন্দ বলে ওঠেন— "শীগ্‌গির তোর মাকে একবার ডেকে দে।"

সদানন্দর স্ত্রী বেড়াতে গিয়েছিলেন পাশের বাড়িতে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তিনি। সদানন্দ জিজ্ঞেস করেন—"খবর শুনেছ?"

—"কি খবর?"—বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তাঁর স্ত্রী।

—"তোমার সেই প্রিয়পাত্র বিপ্রদাসকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।"

—"অ্যারেস্ট করেছে? কেন? কি করেছে সে?"

—"অত খবর বলতে পারবো না, তবে শুনেছি গোয়েন্দা অহীন সোম নাকি তাকে অ্যারেস্ট করিয়েছেন। মনে হয় অভিমন্যুর মায়ের হত্যা ব্যাপারেই তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

ভ্রূযুগল কুঁচকে খানিক্ষণ চুপ করে থাকেন সদানন্দের স্ত্রী। তারপর হঠাৎ জবাব দেন—"নিশ্চয়ই সেই হতভাগা গোয়েন্দাটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অভিমন্যু অ্যারেস্ট করিয়েছে তাকে। তা নইলে সেই এগারো বছর আগের ঘটনার সঙ্গে সেদিনের বাচ্চা ছেলে বিপ্রদাস কেমন করে জড়িয়ে থাকবে?"

—"অত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেও না, গিন্নী"—বলতে থাকেন সদানন্দ—"এ আর অন্য কেউ নয়, স্বয়ং অহীন সোম। আজেবাজে কাজ করার লোক নন তিনি।"—বলতে বলতে সদানন্দ বাইরের দিকে পা বাড়ান।

চিত্রা জিজ্ঞেস করে—"এখনই আবার কোথায় চললে বাবা?"

—"একবার অভিমন্যুর বাড়ি যাচ্ছি। পাকা খবরটা নিয়ে আসি।"

দ্রুত পায়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে যান সদানন্দ মিত্র। আর, সমস্ত আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরের মধ্যে ছটফট করতে থাকেন তাঁর স্ত্রী।

।। ১৪ ।।

বরুণ জিজ্ঞেস করে—"তোমার কি মনে হয়, বিপ্রদাস চৌধুরী মৃন্ময়ী দেবীর খুনের সঙ্গে জড়িত?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন।—"পাগল নাকি তুমি? মৃন্ময়ী দেবীর খুনের সঙ্গে বিপ্রদাস জড়িত থাকবে কেমন করে? সে তো তখন খুব ছোট।"

—"তবে তাকে অ্যারেস্ট করালে কেন?"

—"কারণ, সেদিন রাতে এই বিপ্রদাসই শুভঙ্করের বাড়িতে ঢুকে তার আলমারির ড্রয়ার ভেঙে উইলটা চুরি করেছিল, আর সেই সঙ্গে আমাকেও আহত করেছিল।"

—"বর্তমানে যে উইলের কোন দামই নেই তেমন একটা উইল চুরি করতে যাবে কেন বিপ্রদাস?"

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে জবাব দেয় অহীন—"উইলটার কোন দাম না থাকতে পারে, কিন্তু ওটায় শুভঙ্করের যে সইটা ছিল সেটা তার কাছে খুবই দামী।"

—তার মানে? একটু পরিষ্কার করে না বললে যে বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।"

বলতে থাকে অহীন—"অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিপ্রদাস চৌধুরী। আমার এখানে এসে মৃন্ময়ী দেবীর হত্যারহস্য নতুন করে তদন্ত করা দেখে সে বুঝে নিয়েছিল যে শুভঙ্করকে নির্দোষ প্রমাণ করবার পক্ষে কিছু প্রমাণ নিশ্চয়ই আমার হাতে এসেছে। নইলে এগারো বছর আগে আদালতে যে মামলা প্রমাণ হয়ে গেছে তা নিয়ে শুধু শুধু নাড়াচাড়া করার লোক আমি নই। প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্রের কন্যা চিত্রা মিত্রের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল বিপ্রদাস। যেদিন সে জানতে পারলো আমার তদন্তে শুভঙ্কর রায় যদি নির্দোষ প্রমাণ হয়, তবেই অভিমন্যুর হাতে সমর্পণ করা হবে চিত্রাকে। সেদিন থেকে সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে আমার হাতে শুভঙ্কর রায় যেন দোষী সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া চিত্রাকে পাবার তার অন্য কোন রাস্তা নেই। কিন্তু শুধু প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হয়নি বিপ্রদাস। শুভঙ্করের বিরুদ্ধে নতুন কিছু প্রমাণ আমার হতে পৌঁছে দেবার জন্যে সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসের জানা ছিল যে ডাক্তার মৃন্ময়ী দেবীকে যে মিকশ্চার খেতে দিয়েছিলেন, সেই ওষুধ তাদের দোকান থেকেই কিনেছিল শুভঙ্কর। খাতা খুঁজে খুঁজে সে তার বাবার হাতে লেখা সেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শানের নকল বের করে। তারপর মৃন্ময়ীকে সরবৎ খাওয়াবার আগের দিনের একটা তারিখের অন্য একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শানের নকল তুলে ফেলে ইঙ্ক ইরেডিকেটর দিয়ে। আর সেই জায়গায় তার বাবার হাতের লেখা নকল করে ডাঃ গুপ্তের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখে ফেলে। কিন্তু শুভঙ্করকে জড়াতে গেলে তার সইয়ের প্রয়োজন। অনেক চেষ্টা করেও যখন সে তার সই যোগাড় করতে পারলো না, তখন সে অনুমান করে শুভঙ্করের বাড়িতে কাগজপত্রের মধ্যে হয়ত তা পাওয়া যেতে পারে।"

অহীন একটু থামতেই বরুণ প্রশ্ন করে—"দেখতে অমন শান্তশিষ্ট লোকটি এত সাংঘাতিক?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, বরুণ। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে এই বিপ্রদাস চৌধুরী। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে গভীর রাতে শুভঙ্করের বাড়ি থেকে ঐ উইল চুরি করে এনে ওষুধের খাতায় শুভঙ্করের সই নকল করে দেয় সে।"

—"তাই বোধহয় শুভঙ্করবাবু নিজেও ঠিক বুঝতে পারেনি কেমন করে ঐ খাতায় তার সই এলো?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় অহীন। তারপর বলে—"আমার অবশ্য প্রথমেই একটু সন্দেহ হয়েছিল। পরে খাতাটা হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টের কাছে পাঠাতেই সব সমাধান হয়ে গেল। তাছাড়া খবর পেয়েছি— বিপ্রদাস চৌধুরী নাকি আজ আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি করেছে।"

বরুণ মনে মনে ভাবে, অহীনের আজ হয়ত বলার মুড এসেছে। তাই সে আবার প্রশ্ন করে—"আচ্ছা সেদিন তুমি ঐ ডেকচি ও গ্লাস নিয়ে কী পরীক্ষা করছিলে, অহীন? তোমার সেই মিসিং লিঙ্ক অর্থাৎ অন্য এক ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়েছো?"

শামুক যেমন মানুষের সাড়া পেলে নিজেকে গুটিয়ে নেয় অহীনও তেমনি বরুণকে নিরাশ করে চুপ করে যায়। তারপর একটু সময় অপেক্ষা করে সে ধীরে ধীরে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, খুঁজে পেয়েছি তাকে। তবে, তাকে সকলের মধ্যে হাজির করতে না পারা পর্যন্ত কোন কথা বলাবো না আমি।"

* * * * * *

অহীনের আমন্ত্রণে দীপঙ্কর রায়ের বাড়ির দোতলার একটি কক্ষে এসে হাজির হয়েছে দীপঙ্কর, তার স্ত্রী চারুলতা, প্রিন্সিপ্যাল সদানন্দ মিত্র, উকিল জীবনকৃষ্ণ ঘোষাল ও ডাঃ গুপ্ত। ওপাশে অহীনের খাটের ওপর বসে অভিমন্যুকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বরুণ সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে অহীনকে প্রশ্ন করে—"ইনিই কি তোমার সেই মিসিং লিঙ্ক?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ, ইনিই সেই। এঁকে খুঁজে বের করবার কৃতিত্ব আমার নয়, কৃতিত্ব হচ্ছে ঐ ভদ্রমহিলার।"

—বলেই অহীন আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের স্ত্রী চারুলতাকে দেখিয়ে দেয়।

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি চারুলতার ওপর পড়তেই লজ্জায় চারুলতা মাথা নিচু করে।

অহীন বলতে থাকে—"দমদম সেন্ট্রাল জেলে শুভঙ্করবাবুর কাছে জানতে পেরেছিলাম যে মৃন্ময়ী দেবী যেদিন সেই বিষাক্ত সরবৎ খেয়েছিলেন সেদিন থেকে তৃতীয় দিনে তিনি মারা গিয়েছেন, এবং ঐদিনই সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে শুভঙ্করবাবু ডেকচির মধ্যের বাকী সরবৎ ফেলে দিয়েছিলেন। কথাটা শুনেই আমার মনে হয়েছিল দু'দিন দু'রাত যদি অরেঞ্জ কোয়াশ মেশানো সরবৎ একটা অ্যালুমিনিয়াম ডেকচিতে থাকে, তবে ডেকচির ভেতরে নিশ্চয়ই একটা দাগ পড়ে যাবে। তাই যখন সেই ডেকচি ও গ্লাসটা আমার হাতে এলো তখন পরীক্ষা করে দেখি আমার অনুমানই ঠিক। ডেকচির ভেতরের দিকে বৃত্তাকার একটা কালো দাগ। যদিও সেদিন শুভঙ্করবাবু জল দিয়ে সাধারণভাবে ওটা ধুয়েছিলেন কিন্তু ঐ দাগ উঠে যায়নি।"

একটু থেমে অহীন আবার বলতে থাকে—"মৃন্ময়ী দেবী মাত্র এক গ্লাস সরবৎ খেয়েছিলেন সেদিন। ডাঃ গুপ্তও বলেছেন যে মৃন্ময়ী দেবী নাকি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এক গ্লাস সরবৎ খেয়েছিলেন। এদিকে শুভঙ্করবাবু বলেছেন যে তিনি ডেকচি ভরতি সরবৎ তৈরি করেছিলেন সেদিন। কাজেই ডেকচির ভেতর দু'গ্লাস সরবৎ থাকার কথা। কিন্তু আমি জল দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ডেকচি থেকে দু'গ্লাস জল ঢেলে নিলে তবেই বাকী জলের লেভেল সেই সরবতের বৃত্তাকার দাগের সঙ্গে খাপ খায়। এতেই প্রমাণ হয় ঐ ডেকচি থেকে এক গ্লাস নয় আসলে দু'গ্লাস সরবৎ ঢেলে নেয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর এক গ্লাস সরবৎ খেলো কে? শুধু তাই নয়, আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় এখানে। শুভঙ্করবাবু যদি ঐ সরবতে বিষ মিশিয়ে থাকেন তবে যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় গ্লাস সরবৎ খেয়েছিল সেও ঐ বিষে মারা যাবে কিংবা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

দীপঙ্কর এই সময় প্রশ্ন করে—"এমনও তো হতে পরে যে দাদা ডেকচিতে বিষ না

মিশিয়ে গ্লাসের মধ্যে মিশিয়েছিলেন সেই বিষ।"

জবাব দেয় অহীন—"না, তা সম্ভব নয়। মৃন্ময়ী দেবী ডাঃ গুপ্তকে বলেছিলেন যে তিনি নিজেই রান্নাঘর থেকে গ্লাস এনে সরবৎ ঢেলে খেয়েছিলেন, তাই না ডাঃ গুপ্ত?"

ঘাড় নেড়ে সায় দেন ডাঃ গুপ্ত।

অহীন বলতে থাকে—"তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় ঐ সরবৎ কে খেয়েছিল? মৃন্ময়ী দেবী ঐ সরবৎ খাওয়ার পরই শুভঙ্করবাবু কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, এবং ঘণ্টা দুয়েক পর তিনি ফিরে এসে মৃন্ময়ী দেবীকে অসুস্থ দেখতে পান। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এই দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন কেউ এখানে এসেছিল যে ঐ সরবৎ খেয়েছিল, তাই না?"

নীরব থেকে উপস্থিত সকলেই সমর্থন করে অহীনকে।

অহীন এবার বরুণের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—"এই ব্যক্তিটিই আমার মিসিং লিঙ্ক, বরুণ। এগারো বছর আগে শুভঙ্করবাবুর বিরুদ্ধে মামলায় এই ব্যক্তিটিকে দেখা যায়নি।"—বলতে বলতে অহীন সেই বৃদ্ধের দিকে তাকায়। তারপর আবার সে বলতে থাকে—"এই ভদ্রলোক হচ্ছেন শুভঙ্করবাবুর শ্বশুর ধর্মদাস ঘোষ। ইনিই সেদিন মেয়েকে দেখতে এসে মেয়ের অনুরোধে ঐ সরবৎ খেয়েছিলেন। চারুলতা দেবীর সাহায্য না পেলে এঁকে আবিষ্কার করতে পারতাম না আমি।"

—"কিন্তু ইনি এতদিন সেকথা গোপন করেছিলেন কেন?"— প্রশ্ন করে বরুণ।

অহীন জবাব দেয়—"এবার তাহলে শুভঙ্করবাবুর পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। এ খবর আমি যোগাড় করেছি চারুলতা দেবীর কাছ থেকে। এই ধর্মদাসবাবু কোলকাতায় থাকেন। মৃন্ময়ী দেবীর বিয়ের কিছুদিন পরেই শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে কোন ব্যাপারে মন কষাকষি হয়। সেই থেকে শুভঙ্করবাবু কোলকাতায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাননি। স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবীকেও কোনদিন যেতে দেননি সেখানে। কিন্তু ধর্মদাসবাবু তাঁর একমাত্র মেয়েকে মাঝে মাঝে না দেখে থাকতে পারতেন না। তাই তিনি শুভঙ্করবাবুর অজ্ঞাতে মৃন্ময়ী দেবীকে এসে দেখে যেতেন মাঝে মাঝে। আর এই খবরটা একমাত্র জানতেন চারুলতা দেবী। ধর্মদাসবাবু অবশ্য জানতে পেরেছিলেন যে শুভঙ্করবাবু তাঁর মেয়েকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন, কিন্তু শুভঙ্করবাবু যে সেই বিষ ঐ ডেকচির মধ্যে মিশিয়েছিলেন তা তিনি ধারণা করতে পারেন নি। কারণ ঐ সরবৎ তো তিনি নিজেও খেয়েছিলেন। তাছাড়া একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে তিনি এমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে ঐসব কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তাঁর।"

একটু থামে অহীন, তারপর আবার বলতে থাকে—"সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে শুভঙ্করবাবু ঐ সরবতে বিষ মেশাননি। বিষ মেশানো হয়েছিল গ্লাসের মধ্যে। তা না হলে ধর্মদাসবাবুকে আজ আমরা এখানে দেখতে পেতাম না। এগারো বছর আগে যে মামলায় শুভঙ্কর রায় হত্যাকারী প্রমাণিত হয়ে যাবজ্জীবন জেল ভোগ করছেন সেই মামলার সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে এইখানে। ঘটনার এইদিকটা কেউ ভাল করে যাচাই করে দেখেনি সেদিন।"

অহীন থামতেই অভিমন্যু ছুটে এসে সাশ্রুনয়নে জড়িয়ে ধরে তাকে। ভাবাবেগে মুখ দিয়ে কথা সরে না তার। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরাও বিস্মিতদৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন অহীন সোমের দিকে তাকিয়ে থাকে।

।। ১৫।।

পরের ঘটনা খুব দীর্ঘ নয়। অহীনের তদন্তের ওপর ভিত্তি করে জেল থেকে পুনর্বিচারের জন্যে আবেদন করেছিল শুভঙ্কর রায়। দেশের আইনবিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত সেই আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি, কারণ ঐ আবেদনের পিছনে ছিল গোয়েন্দা অহীন সোমের অকাট্য যুক্তি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুনর্বিচারের আদেশ না দিয়ে একটা আপোস রফা হয়েছিল। সেইমত শুভঙ্কর রায়ের দণ্ডাদেশ মকুব করা হয়েছিল। মাসখানেকের মধ্যেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল সে।

* * * * * *

প্রায় মাস তিনেক পরে।

শুভঙ্কর রায় তার পুত্র অভিমন্যু ও পুত্রবধূ চিত্রাকে নিয়ে দেখা করতে এসেছিল অহীনের সঙ্গে। অনেকক্ষণ হাসিঠাট্টা গল্পের মধ্যে কেটে গিয়েছিল তাদের। একসময় বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়ায় তারা। অহীনও কথা বলতে বলতে তাদের বিদায় দেবার জন্যে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় শুভঙ্কর রায়। অহীনের হাত ধরে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করে—"একটা কথা বলবো, অহীনবাবু?"

—"বলুন।"—জবাব দেয় অহীন।

—"এগারো বছর পর একজন দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করে ইতিহাস রচনা করেছেন আপনি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে হত্যার জন্যে কে দায়ী তার জবাব তো দিলেন না কিছু।"

একমুহূর্ত চিন্তা করে অহীন। তারপর মৃদু হেসে জবাব দেয়—"অন্য কোন ব্যক্তি এই হত্যার জন্যে দায়ী বলে মনে হয় না আমার।"

—"তবে?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুভঙ্করের।

—"মনে হয় মৃন্ময়ী দেবী মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো সেই ওষুধ সরবতের সঙ্গে খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।"

খানিকক্ষণ স্থির চোখে অহীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভঙ্কর।—"কিন্তু আমি জানি, সেই ওষুধ হাতের কাছে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তার।"—অস্ফুটস্বরে কথাটা বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে শুভঙ্কর।

হঠাৎ সে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। অহীনের সামনে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—"এই আপনার স্থির সিদ্ধান্ত, অহীনবাবু?"

একটু ম্লান হাসি ভেসে ওঠে অহীনের ওষ্ঠপ্রান্তে। শান্তকণ্ঠে সে জবাব দেয়—"শুনতে চান কে আপনার স্ত্রীর হত্যাকারী?"

ঠিক এমনি সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় অভিমন্যু। শুভঙ্করকে জিজ্ঞেস করে—"তোমার কি দেরি হবে, বাবা?"

জবাব দেয় শুভঙ্কর—"না না দেরি হবে না। এই সামান্য একটু কথা বলেই আসছি আমি।"

দরজার সামনে থেকে সরে যায় অভিমন্যু।

অধৈর্যকণ্ঠে শুভঙ্কর আবার বলে—"বলুন, বলুন কে আমার স্ত্রীর হত্যাকারী।"

—"আপনার ছেলে, অভিমন্যু।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরে যায় শুভঙ্কর—"অভিমন্যু...অভিমন্যু তার মায়ের হত্যাকারী?"—কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে সে।

—"হ্যাঁ, তবে ইচ্ছাকৃত নয়। বলতে পারেন অ্যাক্সিডেন্ট।"

একটু থেমে অহীন আবার বলতে থাকে—"সেদিন আপনার বাড়ির ঘরগুলো দেখতে দেখতে সিঁড়ির নিচের ছোট্ট ঘরটিতে দেখতে পেয়েছিলাম আপনার ছেলের ছোটবেলার নানারকম খেলার সরঞ্জাম। ইতস্ততঃ ছড়ানো জিনিসগুলোর ভেতর দুটো বস্তু নজরে পড়েছিল আমার—সেই সরবতের গ্লাসের মত অবিকল আর একটা ভাঙা গ্লাস ও একটা ওষুধের শিশি। সবার অলক্ষ্যে শিশিটা পকেটে পুরেছিলাম আমি। পরে শিশির উপরের লেবেল দেখে বুঝেছিলাম ঐটাই হচ্ছে সেই মিকশ্চারের শিশি যার ভেতর মারকিউরিক ক্লোরাইড ছিল এবং যেটা আপনার আলমারি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।"

একটু থেমে বাইরের দিকে একবার নজর দেয় অহীন। তারপর কণ্ঠস্বর নিচু করে বলতে থাকে—"আজকের কেমিস্ট্রির প্রফেসর অভিমন্যুবাবু তার ছেলেবেলা থেকেই ওষুধপত্র নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতো। তাই সে যখন লক্ষ্য করলো আপনার স্ত্রী সেই মিকশ্চার আর ব্যবহার করছেন না তখন সে ঐ শিশিটাকে নিয়ে আসে তার খেলাঘরে। তারপর রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসে দুটো গ্লাস। শিশির ওষুধ গ্লাসে ঢেলে খেলা করতে করতে একটা গ্লাস ভেঙে যায়। পাছে ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে চুপিচুপি সে অন্য গ্লাসটা রেখে আসে রান্নাঘরে। সেই গ্লাসে যে তখনও অনেকটা ওষুধ ছিল তা সে লক্ষ্যই করেনি। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, মৃন্ময়ী দেবী সরবৎ খাওয়ার জন্যে ঐ গ্লাসটাই তুলে নেন। ভেতরটা ভাল করে দেখে না নিয়েই সে সরবৎ ঢালে ঐ গ্লাসে।"

স্তব্ধ হয়ে অহীনের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভঙ্কর।

এমন সময় দরজার বাইরে আবার শোনা যায় অভিমন্যুর কণ্ঠস্বর। "বাড়ি ফিরতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে, বাবা।"

—"হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি"—বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় প্রৌঢ় শুভঙ্কর রায়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী

উন্নতির পথ কোনকালেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পদে পদে বাধা, পদে পদে অনিশ্চয়তা। সেই বাধা ও অনিশ্চয়তাকে জয় করে যে এগিয়ে যেতে পারে, সে-ই উঠতে পরে উন্নতির উচ্চ শিখরে। তবে, সেই বাধা-বিপত্তিকে জয় করা মানুষের সঙ্কল্প ও কর্মক্ষমতা দ্বারাই সবসময় সম্ভব হয় না। তার জন্যে আর যে একটা জিনিসের প্রয়োজন তার নাম ভাগ্য। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে সঙ্কল্প ফলবতী হওয়া বাস্তবিকই কঠিন। অনেকের মত বিবেক অর্থাৎ বিবেকানন্দর জীবনেও এটা সত্য। কেবল সত্যই নয়, কঠিন সত্য হয়ে দেখা দিয়ে বারে বারে তাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে।

মা-বাবা আদর করে সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নামে ছেলের নাম রেখেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, নামের মাহাত্ম্যে ছেলে তার ভবিষ্যৎ জীবনে বাধা-বিপত্তি জয় করে এগিয়ে যেতে পারবে ঠিক সেই বীর সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না, অন্ততঃ এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। লেখাপড়া শেখার পরে চাকরি পেয়েও সেই চাকরি নেয় নি বিবেক। তার ঝোঁক ছিল ব্যবসার দিকে। ফ্যাক্টরী করবে—মস্তবড় ফ্যাক্টরী। লোকজন খাটবে, প্রোডাক্শন দেবে। একজন বিখ্যাত শিল্পপতি হয়ে আবির্ভাব ঘটবে বিবেকের।

বিবেকের সেই স্বপ্ন কিন্তু আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। একখানা লেদ মেশিন ও জনা কয়েক কর্মচারী, এই নিয়েই বিবেকের ফ্যাক্টরী। বড় বড় মিল ফ্যাক্টরীতে ঘুরে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ আর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাল তৈরি করে সরবরাহ করে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বিবেক, কিন্তু ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয়। তাই এই আট বছর ধরে চেষ্টা করেও সে আর একখানা লেদ মেশিন কিনতে পারে নি। নিজের এই অক্ষমতার জন্যে মনে মনে বরাবরই একটা খেদ ছিল তার, কিন্তু ইদানীং ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসার হালচাল দেখে তার মনে হচ্ছে আর একখানা মেসিন কিনলে শুধু শুধুই মরচে পড়তো। তার চাইতে বেশি কিছু হতো না। যেখানে একটা মেশিনের কাজের মতো অর্ডার পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠেছে আজকাল, সেখানে আর একখানা মেশিন দিয়ে সে কী করতো?

গোটা পশ্চিম বাংলা জুড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দা। তার ওপর লোড্শেডিং। তারও ওপর তীব্র প্রতিযোগিতা। আগে যে মিল-ফ্যাক্টরী থেকে মাসে চার-পাঁচ শো টাকার অর্ডার সে পেতো এখন সেই টাকাটাই তিন-চার জনের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে শ'খানেক টাকায় এসে ঠেকেছে। আগে পাঁচশো টাকার বিল পাশ করাতে গিয়ে যেখানে একজনকে গোটা পঁচিশেক টাকা দিলেই হতো, এখন একশো টাকার বিলেই প্রায় ঐ পরিমাণ খরচ করতে হয়। এমনিভাবেই আজকাল লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলছে।

তবুও কিন্তু আশা ছাড়ে না বিবেক। ফ্যাক্টরীর তিনজন কর্মীর মাইনেটাও প্রতিমাসে ঠিক মতো দিতে পারে না। অতি সাধারণ ভাবে নিজে জীবনযাপন করে। তবুও কিন্তু আশা ছাড়তে পারে না। এমনি অবস্থা চিরকাল থাকবে না। সুদিন আসবেই। সেই দিনটির জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে বিবেক।

একখানি লেদ মেশিন ও তিনজন কর্মীর অধীশ্বর হলেও একটা বিলিতি ফ্যাক্টরীর সাপ্লায়ারের খাতায় কিন্তু বিবেকানন্দ ঠাকুরের নামটা জ্বল জ্বল করে। সত্যি বলতে কি, এই ফ্যাক্টরীটার জন্যেই বিবেকের সাম্রাজ্যে এখনও টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলে। নইলে এতদিনে তালা পড়তো সেখানে। কেন যেন ঐ ফ্যাক্টরীর পার্চেজ অফিসারের একটু বিশেষ নজর বিবেকের ওপর। অন্যান্য প্রতিযোগীদের চাইতে কিছু বেশি অর্ডারই সে পায় এখানে।

ঐ বিলিতি ফ্যাক্টরীর হেড্ অফিস কলকাতায়। বিল সাব্‌মিট ও পেমেন্ট নেবার জন্যে বিবেককে মাঝে মধ্যেই আসতে হয় হেড্ অফিসে। সেই সূত্রেই তার পরিচয় অপর্ণার সঙ্গে।

সুন্দরী বলা চলে না অপর্ণাকে। বেঁটে ছিপ্‌ছিপে চেহারা। গায়ের রঙ্ বিয়ের বাজারের পরিভাষায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও আসলে কালো। এমনি একটি মেয়ে যে কি করে এই বিলিতি অফিসে চাকরি পেল সেটা বিবেকের কাছে বাস্তবিকই এক আশ্চর্যের বিষয়। অপর্ণার মুখশ্রীও এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু বিল পাশ করার ব্যাপারে অপর্ণার যে বিবেকের প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব সেটুকু না বোঝার মতো বোকা নয় বিবেক। অপর্ণার বিশেষত্বর মধ্যে একমাত্র তার কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ভঙ্গিটি। চমৎকার সুরেলা কণ্ঠে একটু থেমে থেমে কথা বলে অপর্ণা। বিবেকের হাতে বিলের কাগজ দেখে মিষ্টি হেসে সে যখন বলে ওঠে, 'আর একটু আগে এলে আজই এটা পাশ করিয়ে দিতে পারতাম' তখন বিলের কথা ভুলে গিয়ে বিবেক কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে হয়তো বলে, এই হাসিটুকু দেখতে একবার কেন, দশবার আমি এখানে আসতে রাজি।

কলকাতায় চাকরি করলেও অপর্ণা বোস গ্রামের মেয়ে। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। বীরভূম জেলায় ওদের বাড়ি। অবস্থা ভালো। নগদ পয়সা-কড়ি ছাড়াও প্রচুর জমি-জমার মালিক ওর বাবা বিশ্বনাথ বোস। বাপের একমাত্র মেয়ে অপর্ণা। দুই দাদা বিদেশে চাকরি করে, একজন দেশে বাবার কাছে থাকে। বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে একমাত্র তার বৌদি। মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছে।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। বিশ্বনাথের ইচ্ছে ছিল তিনি তাঁর এই একমাত্র কন্যাকে ভালো ঘরে বিয়ে দেবেন। পাত্র হবে ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার। কন্যার রূপের ঘাটতিটুকু তিনি পূরণ করবেন রূপো দিয়ে। কন্যা কিন্তু এদিকে প্রথমে বায়না ধরলে যে স্কুলের গণ্ডী যখন সে কৃতিত্বের সঙ্গে পার হয়েছে তখন মফঃস্বলে শহরের বদলে কলকাতায় ভালো কলেজে সে পড়বে। প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো বিশ্বনাথকে। কলকাতার একটা মেয়ে হস্টেলে থেকে অপর্ণা কলেজের পড়াশোনা শেষ করলে। অবশেষে তার দ্বিতীয় বায়না, এই চাকরির বাজারে এমন একটা বিলিতি অফিসে যখন সে চান্স পেয়েছে তখন এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়া চলে না। মেয়ের ওপর ভয়ানক খেপে উঠলেন বিশ্বনাথ। অপর্ণা বাড়ি এলে প্রথমটায় একচোট নিলেন তাকে। ঘটা করে কন্যার পাত্রের জন্যে ঘটক লাগালেন। এদিকে ততদিনে অপর্ণা তার দাদাদের কাছ থেকে চাকরি করার ছাড়পত্র যোগাড় করে ফেলেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের একটু সমীহ করেই চলেন বিশ্বনাথ। ছাড়পত্রের খবরে তাঁর রাগ গিয়ে পড়লো ছেলেদের ওপর। গম্ভীর হয়ে রইলেন তিনি। এমন কি কলকাতা রওনা হবার আগে অপর্ণা যখন তাঁকে প্রণাম করলে তখনও তাঁর গম্ভীরভাব একটুও কাটলো না।

পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা। ইদানীং কলকাতায় যাতায়াত বেড়ে গেছে বিবেকের। বিকেলে অফিস ছুটির পরে মাঝে মাঝেই বিবেক ও অপর্ণাকে দেখা যায় গড়ের মাঠের দিকে। কখনও

বা সিনেমা কিম্বা একাদেমি অফ ফাইন আর্টসের ছবির মেলায়। ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে তাদের দেখা যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের কোনো গাছের নিচে। সেখানে গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে অপর্ণা, আর ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিবেক।

অবশেষে একদিন অপর্ণার কাছে কথাটা পাড়লে বিবেক। বললে, এমনি ভাবে আর কতদিন চলবে, অপু?

অপর্ণা মাথা নিচু করে একগোছা ঘাসের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সলজ্জ হেসে জবাব দেয়, যতদিন তুমি চাইবে।

—আমি চাইবো? আমার চাওয়াই কি সব? জিজ্ঞেস করে বিবেক। একটু সময় চুপ করে থেকে একবার চকিতে বিবেকের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে জবাব দেয় অপর্ণা, সব না হলেও অনেকটা তো বটেই।

—তোমার বাবা দাদারা কি রাজি হবেন?

—সে ভার তো তোমার ওপর।

—বারে, আমার ওপর কেন? আমার বলাতে কেনই বা তারা রাজি হবেন? তাঁদের রাজি করানোর ভার তো তোমার।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একটু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, দাদারা রাজি হবেন কিনা জানি না। তবে বাবা রাজি হবেন বলে তো মনে হয় না।

—তাহলে? প্রায় আর্ত কণ্ঠস্বর বিবেকের।

—এত ভাবনার কি আছে? তাঁরা যদি মত না-ই দেন তো তাঁদের অমতেই এগিয়ে যেতে হবে।

—পারবে তুমি?

—সন্দেহ হচ্ছে তোমার?

বিবেক অপর্ণার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে, না—না অপর্ণা। এতটুকু সন্দেহ নেই আমার। আমি কেবল ভাবছি অন্য একটা কথা।

কি কথা? অপর্ণার দৃষ্টিতে কৌতূহল।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে বিবেক, আমি কেবল ভাবছি তোমার কথা। উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তুমি। বাবার একমাত্র মেয়ে আর দাদাদের একমাত্র বোন। এদিকে আমার নেই কোনো চালচুলো। না আছে ঘর বাড়ি, না আছে মোটা আয়ের কোনো ব্যবস্থা। থাকার মধ্যে তো কেবল একখানা লেদ মেশিন। ফ্যাক্টরীর পার্চেজ অফিসারদের নেকনজর আছে বলে কোনমতে চলছে।

—ভাবনা কি, আমার চাকরি তো আছে।

—তা' আছে, বলতে থাকে বিবেক,তবে চিরকাল তুমি চাকরি করে আমাদের সংসার চালাবে তাও আমার পছন্দ নয়। আমার মতে বন্যরা যেমন বনে সুন্দর, তেমনি মেয়েদের সৌন্দর্যও ঘরে। বাইরে নয়।

মিষ্টি হেসে অপর্ণা বললে, বেশ তো, তেমন হলে না হয় চাকরি ছেড়েই দেব।

বাপ বিশ্বনাথ বসু তো নন-ই এমন কি অপর্ণার দাদারাও বোনের এই বিয়েতে মত দিলেন না। বিশ্বনাথের মতো তাদেরও সেই একই কথা —অসবর্ণ বিয়ের ফল কখনও ভালো হয় না।

বিশ্বনাথের কথা ছেড়ে দিলেও অপর্ণা বুঝতে পারে তার প্রগতিপন্থী দাদাদের অমতের আসল কারণ অসবর্ণ বিয়ে নয়, বিবেকের মতো চালচুলোহীন একটি পাত্র যার নিয়মিত রোজগার বলে তেমন কিছু নেই। অপর্ণার ছোড়দা তো তার মুখের ওপর বলেই ফেললে, বুঝতে পারছি ঐ ছেলেটাকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত তুই-ই তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিবি। সে ঘর সামলাবে, আর তুই করবি চাকরি।

—না ছোড়দা, তুমি ঠিক বলো নি, বলতে থাকে অপর্ণা, বাঁধা মাইনের চাকরি না করলেও সে বেকার নয়।

—বুঝেছি—বুঝেছি, তোকে আর বলতে হবে না, বলে ওঠে অপর্ণার মেজদা, মেশিনের স্পার্টস তৈরি করে ফ্যাক্টরীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে সাপ্লাই করা আর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লজেন্স বিক্রি করার মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। যাক্‌গে, এ নিয়ে আর অলোচনা করে লাভ নেই। তুই এখন সাবালিকা। কাকে বিয়ে করবি না-করবি তা' তোরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যদি ঐ ছেলেটাকেই বিয়ে করা ঠিক্ করিস তা'হলে তা-ই কর্। আমাদের কিছু বলার নেই।

শেষ পর্যন্ত বিবেককেই বিয়ে করলো অপর্ণা। রেজেস্ট্রী ম্যারেজ। দেশের বাড়িতে গিয়ে বিবেক ও অপর্ণা যখন বিশ্বনাথকে প্রণাম করলে তখন বিশ্বনাথ তাদের কি বলে আশীর্বাদ করলেন তা' তিনিই জানেন। তবে, আলমারী খুলে একটা গহনার বাক্স নিয়ে এসে অপর্ণার হাতে তুলে দিতে দিতে ধরা গলায় কেবল বললেন, এর মধ্যে তোমার মায়ের গহনা আছে। তার ইচ্ছে ছিল, বিয়ের সময় এগুলো দিয়ে তোমাকে সাজানো। তা' তো আর হলো না। যাই হোক্, তোমার মায়ের শেষ ইচ্ছেমতো এগুলো আমি তোমাকেই দিলাম। মায়ের স্মৃতি হিসেবে এগুলো কখনও হাতছাড়া করো না।

শহর ছেড়ে শহরতলীতে দু'কামরার একটা ভাড়া বাড়িতে এসে সংসার পেতেছে বিবেক ও অপর্ণা। এখান থেকেই রোজ অফিসে যাতায়াত করে সে।

বিবেকের অর্ডার সাপ্লাই চলছে। বিশেষ করে, বিয়ের পরে অপর্ণাদের ফ্যাক্টরীর অর্ডারের বড় অংশটাই এখন আসে বিবেকের কাছে। এতে তার ফ্যাক্টরীর শ্রী-ছাঁদের কিছু ইতর-বিশেষ না হলেও কর্মী তিনজনের মাসিক মাইনে মিটিয়ে দিতে এখন আর তেমন বেগ পেতে হয় না। অপর্ণার বাঁধাধরা সময়ের অপিস, আর বিবেকের বাধা-বন্ধনহীন অসময়ের ব্যবসা। বাড়িতে একজনের উপস্থিতির সময় নিয়মিত, আর একজনের অনিয়মিত। এই নিয়ে অপর্ণা মাঝে মধ্যে অনুযোগও করে বিবেককে। বলে, কি হবে যখন-তখন এমনিভাবে ঘোরাঘুরি করে? তার চাইতে কোথাও একটা চাকরি-বাকরির খোঁজ করো।

স্ত্রীর কথায় বিবেক হেসে উঠে বলে, চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে তো অনেক আগেই তা' করতে পারতাম। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। আজ হোক কাল হোক ব্যবসায়ে আমি দাঁড়াবোই। জানো অপু, আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের ধৈর্যের বড়ই অভাব। এইজন্যে আমরা আজ ব্যবসায়ে পিছিয়ে পড়েছি। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি কোনো কিছুতে মনেপ্রাণে লেগে থাকতে পারলে একদিন না একদিন ফল কিছু ফলবেই। চেষ্টা আন্তরিক হলে কোনো দিন কোনো কিছু বিফলে যায় না।

ইতিমধ্যে সংসারে আগমন ঘটলো একজন নতুন অতিথির। কন্যা মিলু দেখতে হয়েছে অবিকল তার বাপের মতো। অপর্ণা হেসে বলে, খুব পয়মন্ত মেয়ে তোমার।

—কি করে বুঝলে? জিজ্ঞেস করে বিবেক।

জবাব দেয় অপর্ণা, মেয়ে দেখতে বাপের মতো হলে নাকি খুব পয়মন্ত হয়।

ছোট্ট মিলুকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বিবেক বলে, হবেই তো। ওর ভাগ্যেই ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে যাবো আমি।

বোধহয় তাই ঠিক। মিলুর জন্মের পর থেকেই বিবেকের ব্যবসায়ের পালে যেন হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। না, যাকে বলে শ্রীবৃদ্ধি তেমন কিছু নয়। তবে মন্দের ভালো কিম্বা মেঘমেদুর আকাশে সূর্যের উঁকি ঝুঁকি মাত্র।

সেই উঁকিঝুঁকিতেই বিবেক আত্মহারা। পরিচিত মহলে পয়মন্ত কন্যা মিলু সম্পর্কে তার সেই উচ্ছ্বাস অনেক সময়ই বাস্তবতা লঙঘন করে অবাস্তবের দিকে যাত্রা করে। মুখে কিছু না বললেও শ্রোতারা মনে মনে বলে, আদিখ্যেতা! মেয়ে যেন আর কারুর হয় না!

মিলুর জন্মের পর থেকে একটা ব্যাপারে বিবেকের ছোট্ট সংসারে শুরু হলো এক অভাবিত অশান্তি। বাড়িতে মিলুকে দেখাশোনা করবে কে? ঝি-চাকরের ওপর ঐটুকু মেয়েকে ফেলে রেখে স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই বাইরে যাওয়া চলে না। তার ওপর এমন বিশ্বাসী ঝি-চাকরই বা পাওয়া যায় কোথায়? কাজেই উপায়ান্তর না দেখে বিবেক একদিন অপর্ণাকে হঠাৎ বলে ফেললে, এবার দেখছি তোমাকে চাকরি ছাড়তেই হলো।

—কেন? প্রশ্ন করে অপর্ণা, চাকরি ছাড়লে যদিও মিলুর দিকে দৃষ্টি দিতে পারবো, কিন্তু এতগুলো টাকা কমে গেলে—?

অপর্ণাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে বিবেক, টাকার চাইতে মিলু নিশ্চয়ই বড়।

অপর্ণা কিছুক্ষণ জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, সংসারে টাকারও তো প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, তা'ঠিক। তবে মিলুকে দেখাশোনার বিনিময়ে নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সংসারের সেই ঘাটতি যেমন করেই পারি আমি পূরণ করে দেবো।

—বেশ তো, যদি পারো তো মন্দ কি? মেয়েকে অন্যের কাছে ফেলে রেখে চাকরি করতে যেতে কি আমারও মন চায়?

বিবেক মুখে যতই চাকরি ছাড়ার কথা বলুক, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোন আগ্রহ দেখায় না। অপর্ণা মনে মনে বুঝতে পারে মাসে মাসে এতগুলো টাকা হারাতে তার মন চায় না। তাই বাধ্য হয়ে ছোট্ট মিলুকে মাঝবয়সী ঝিয়ের কাছে রেখে অফিসে যেতে হয় অপর্ণাকে। তেমন কোনো বিশেষ কাজ না থাকলে বিবেক বাড়িতেই থাকে। সে বেরিয়ে গেলে ঝিয়ের কাছে মিলু সম্পূর্ণ একা।

এমনিভাবেই চলছিল তাদের সংসার। হয়ত আরও কিছুকাল চলতো এমনিভাবে যদি না হঠাৎ একদিন মিলু খাট থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ে যেত।

দোষ অবশ্য ঝিয়ের নয়। মিলুকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে সে গিয়েছিল পাশের ঘরে। এর মধ্যেই সেই দস্যি মেয়ে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে কপাল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড করে বসলে। রাতে বাড়ি ফিরে সব শুনে খানিক্ষণ গুম্ হয়ে রইলো বিবেক। অপর্ণার কোলে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ঘুমন্ত কন্যার দিকে একপলক তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে অপর্ণাকে, কালকেই অফিসে গিয়ে রেজিগনেশন দিয়ে আসবে। মাথায় থাক্ তোমার চাকরি। এমনি বেঘোরে চোখের সামনে মেয়েটার প্রাণ যাবে তা' কিছুতেই হতে পারে না—না, কিছুতেই না।

চাকরি ছাড়ার পরে প্রথম কয়েকটা মাস বেশ টানাটানি চলছিল তাদের। অবশেষে ঈশ্বর বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ কয়েকটা ভালো অর্ডার পেয়ে গেল বিবেক। সংসারের

চাকা ঘুরলো খানিকটা।

বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল এমনিভাবে। বিবেকের ব্যবসা মোটামুটি চলছে। তবে, তার সেই বড় হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। সংসারের খরচপত্র যত বাড়ছে বড় হবার সম্ভাবনা ততই দূরে সরে যাচ্ছে। এযুগের ব্যবসায়ে বড় হতে হলে ভালো পুঁজির দরকার। কিন্তু বিবেকের পুঁজি কোথায়? সংসারই তো শুষে নিচ্ছে সবটুকু।

মিলুর বয়স এখন ছয়। একটা কে. জি. স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিয়েছে অপর্ণা। স্কুলটা ভালো, তবে একটু দূরে। তা' হোক গে দূর, অর্পণার তেমন কিছু অসুবিধে হয় না। সকাল আটটায় সে স্কুলে দিয়ে আসে মেয়েকে, বিকেলে নিয়েও আসে নিজেই।

ইদানীং ভয়ানক পরিশ্রম করে চলেছে বিবেক। সংসারের রসদ জোগাড় করতে হবে। তার চাইতেও বড় কথা, ব্যবসা বাড়াতে হবে। স্বপ্ন কেবল দেখলেই চলবে না, তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বড় হতেই হবে তাকে। অর্ডারের আশায় মিল-ফ্যাক্টরীতে ঘুরে বেড়ায় বিবেক। পার্চেজ অফিসারদের কাছে ধর্ণা দেয়। অবশেষে অর্ডার জোগাড় করে ফিরে আসে নিজের কারখানায়।

অকস্মাৎ একদিন একটা মস্ত সুযোগ এসে গেল বিবেকের সামনে। একটা মস্তবড় নামী কারখানার পার্চেজ অফিসার বিবেককে ডেকে বললেন, আমাদের এই কোম্পানীর সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্ট করতে রাজি আছেন?

—কি কন্ট্রাক্ট? উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বিবেক।

জবাব দেন পার্চেজ অফিসার, বছরভর এই কোম্পানীর যাবতীয় অর্ডার আপনিই পাবেন। নিয়মিত মাল সাপ্লাই করতে হবে আপনাকে।

উত্তেজিত বিবেক একটা ঢোঁক গিলে পার্চেজ অফিসারের কথার পুনরাবৃত্তি করে, সব অর্ডার একা আমিই পাবো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনিই পাবেন। রাজি আছেন?

বিবেক অধীর আগ্রহে পার্চেজ অফিসারের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে যাচ্ছিল। সহসা একটা কথা মনে হতেই মুখখানা শুকিয়ে ওঠে তার। নিজেকে সংবরণ করে সে বললে, আমার তো স্যার, মাত্র একখানা লেদ মেশিন। ঐ একখানা মেশিনে আপনাদের বিরাট চাহিদা পূরণ করবো কী করে? তা'ছাড়া ইনভেস্ট করার মতো এত টাকাও বা কোথায় পাবো?

মৃদু হেসে পার্চেজ অফিসার আবার বললেন, একটু ভেবে দেখুন, সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। দু'একটা অর্ডার পাবার আশায় দিনের পর দিন এখানে ধর্ণা দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্তে একটা মস্ত সুযোগ আপনাকে দিলাম, সেই মুহূর্তেই আপনি পিছিয়ে যচ্ছেন। আরে মশাই, ব্যবসা করতে হলে বুকের পাটা চাই। ভীরু মন নিয়ে কোনরকমে টিকে থাকা হয়তো যায়, কিন্তু বড় হওয়া কিছুতেই যায় না।

মৃদু কণ্ঠে বিবেক বললে, আমার একার পক্ষে আপনাদের বিরাট কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাকে নির্ভর করতে হবে অন্য কারখানার ওপর। কিন্তু তারা তো আর আমার মুখের কথায় কাজ করবে না। নিয়মিত পেমেণ্ট করতে হবে তাদের। আপনারা তো আমার বিলের টাকা শোধ করবেন তিন মাস পরে। এই তিন মাস আমার চলবে কেমন করে। তা'ছাড়া র'মেটিরিয়ালের জন্যেও তো একটা মোটা টাকার দরকার। কমপক্ষে হাজার পঁচিশ তিরিশের ব্যবস্থা না থাকলে আপনাদের কোম্পানীর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করা চলে না।

একটু ভেবে পার্চেজ অফিসার বললেন, তা' অবশ্য ঠিক বলেছেন। পঁচিশ তিরিশ হাজার

টাকা হাতে না নিয়ে এ কাজে নামা চলে না। বিবেক চুপ করে থাকে। পার্চেজ অফিসার মন দেন নিজের কাজে। অবশেষে একসময় তিনি মুখ তুলে বিবেকের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে আবার বললেন, শুনুন বিবেক বাবু, আপনার কাছ থেকে এখনই কোনো জবাব আমি চাইছি না। একমাস সময় দিচ্ছি আপনাকে। ভালো করে ভাবুন, টাকা পয়সা জোগাড় করুন, তারপর এসে আমাকে জবাব দিন। প্রথম চান্স আপনাকেই দিয়েছি। আপনি যদি রাজি হতে না পারেন তা'হলেই কেবল অন্য সাপ্লায়ারদের অফার দেব।

ঈশ্বর যখন দেন তখন বোধহয় এমনিভাবেই দেন। কিন্তু ঈশ্বরের এই দান গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য বিবেকের কোথায়? এমন একটা মস্ত সুযোগ জীবনে হয়তো আর কখনও আসবে না তার কাছে। কল্পনাকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো সুযোগ মানুষের জীবনে বারে বারে আসে না।

কিন্তু কি করবে বিবেক? কোথায় পাবে এত টাকা? কে এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে?

বিবেকের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, আজকাল তুমি এমন গম্ভীর হয়ে থাকো কেন বলো তো? সবসময়ই অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করো। কী হয়েছে তোমার?

একটু ম্লান হেসে অপর্ণার দিকে তাকায় বিবেক। তারপর ধীরে ধীরে সেই পার্চেজ অফিসারের প্রস্তাবের কথা বলতে বলতে অবশেষে বললে, এখনই আমার তিরিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কে দেবে এই বিরাট অঙ্কের টাকা?

বিবেকের দেখাদেখি চিন্তিত হয়ে ওঠে অপর্ণার মুখখানাও। ম্লান কণ্ঠে সে বললে, এতগুলো টাকা কে দেবে তোমাকে?

—তাই তো ভাবছি। চিন্তিত কণ্ঠস্বর বিবেকের।

—আচ্ছা, তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ দিতে পারে না টাকাটা?

তেমনি ম্লান হেসে জবাব দেয় বিবেক, আমার বন্ধু তো! আর কত হবে? ওরা তো সব আমারই মতো দু'চার শো'র খদ্দের। পঁচিশ তিরিশ হাজারের কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন বিবেক বললে অপর্ণাকে, তোমার বাবার তো শুনেছি অনেক টাকা। ইচ্ছে করলে এই টাকাটা তিনি আমাকে অনায়াসেই ধার দিতে পারতেন। এমনি না হয়, ব্যাঙ্কের সুদই আমি দিতাম। কিন্তু—

কথাটা শেষ না করেই বিবেক অপর্ণার প্রতিক্রিয়ার জন্যে একবার আড় চোখে তার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

বিবেকের কথাটা কানে যেতেই মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে অপর্ণার। একটু সময় স্থির হয়ে থেকে বিবেকের মন যাচাই করতে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, বাবার কাছ থেকে হাত পেতে টাকাটা তুমি নিতে পারতে?

—না নেবার কি আছে? জবাব দেয় বিবেক।

—না, তা' হতো না। তোমাকে কিছুতেই তাঁর কাছে হাত পাততে দিতাম না আমি। যে মানুষ তোমাকে আজ পর্যন্ত স্বীকারই করে না, একটা খোঁজখবর পর্যন্ত নেয় না আমাদের, তাঁর টাকা ছুঁতেও আমি রাজি নই।

—তুমি বুঝতে পারছো না অপু, ঐ টাকাটা হাতে পেলে আমি ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারতাম। এরকম সুযোগ সবাই পায় না, আর বারে বারে আসেও না।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অপর্ণা, সম্মান খুইয়ে ব্যবসায়ে দাঁড়ানোর চাইতে যেমন চলছে তেমনিভাবে চলাও ঢের ভালো। কপালে যদি থাকে তা'হলে এমনিতেই দাঁড়াবে। এর জন্যে মান-সম্মান হারিয়ে কারুর কাছে হাত পাততে হবে না।

অপর্ণার যুক্তির ওপরে সেই মুহূর্তে আর কোনো যুক্তি চাপাতে ইচ্ছে হয় না বিবেকের। এমনিতেই সে অপর্ণার কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে। অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে তার মতো একজন মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে বলেই আজ তার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তার ওপর বিবেকের জেদেই সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে বলে সংসারের আর্থিক অনটন বেড়ে উঠেছে। অপর্ণা মুখে কিছু না বললেও বিবেক বুঝতে পারে এমনি টানাটানির মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? চেষ্টার তো ত্রুটি করছে না বিবেক। কিন্তু এ যুগে হাতে পয়সা কড়ি না থাকলে চেষ্টায় কিছু হয় না।

হঠাৎ একটা কথা বলতে গিয়ে মুখ তুলেই কি ভেবে নিজেকে সংযত করে বিবেক। অপর্ণা সেটা লক্ষ্য করে বললে, কি যেন বলছিলে?

—না-না, তেমন কিছু নয়, পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে বলে ওঠে বিবেক, বলছিলাম অন্য একটা কথা। অনেকেই তো শুনি স্ত্রীর গয়না ব্যবসায়ে খাটিয়ে বড় হয়। তোমার বাবা যদি বিয়ের সময় তেমনি দু'চার খানা গয়নাও তোমাকে দিতেন তা'হলে আজ তা' কাজে লাগাতে পারতাম।

স্বামীর ইঙ্গিতটুকু কিন্তু ধরে ফেলে বুদ্ধিমতী অপর্ণা। বিবেক যে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে তা-ও সে বুঝতে পারে। তাই সে মৃদু হেসে বললে, ও নিয়ে দুঃখ করে আর লাভ কি বলো? সাধারণ গরীব ঘরের বাপ-মা মেয়েকে কতটা সোনা-দানা দিতে পারে? তবুও তো মা'র গয়নাগুলো আমি পেয়েছি। ওগুলো তো আর তোমার ব্যবসায়ে দিতে পারি না। মা'র স্মৃতিচিহ্ন ওগুলো। তাই তো প্রাণে ধরে পরতেও পারি না পাছে খারাপ হয়ে যায় বলে।

—তা'তো বটেই, মাথা নেড়ে সায় দেয় বিবেক। তোমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন বলেই তো ওগুলো নেবার কথা বলতে পারি না। নইলে, ওর দাম তো কম নয়। তিরিশ-পঁয়তিরিশ হাজার তো হবেই। ওগুলো তোমার নিজের হলে ওতেই আমি ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারতাম। ব্যবসায়ে একবার দাঁড়িয়ে গেলে ওর চাইতে ঢের বেশি তোমাকে গড়িয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তা' তো হবার নয়। থেকেও নেই। ওগুলো চিরকাল ব্যাঙ্কের লকারেই থাকবে।

বিবেকের কথার ধরনে অপর্ণা বুঝতে পারে ওর নজর পড়েছে ঐ গয়নাগুলোর ওপর। কিন্তু তা' হবে না। প্রাণ থাকতে সে ওগুলো কাউকে দিতে পারবে না। মা'র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই চিরকাল থাকবে তার কাছে।

বিপদের ওপর বিপদ। দুশ্চিন্তার ওপর দুশ্চিন্তা। ফ্যাক্টরীর সেই পার্চেজ অফিসারকে এখনও ফাইন্যাল কিছু বলে নি বিবেক। টাকার জোগাড়ে এখনও সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় রাতে তার ঘুম আসে না। রাত-দিন কেবল তার ঐ একই চিন্তা। কোত্থেকে পাবে এতগুলো টাকা? কে দেবে তাকে?

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। সেদিন বিকেলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে অপর্ণা হাঁপাতে হাঁপাতে যা বললে তাতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল বিবেক।

অপর্ণা গিয়েছিল মিলুকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে। কথা ছিল অপর্ণা মিলুকে নিয়ে ফিরে এলে বিবেক একটু বিশেষ কাজে বেরোবে। ততক্ষণ বিবেকই থাকবে বাড়িতে।

বাইরে যাবার জন্যে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হচ্ছিল বিবেক। হঠাৎ অপর্ণা ফিরে এসে এক নিশ্বাসে প্রশ্ন করে, মিলু ফিরেছে?

—মিলু?বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বিবেক, মিলু একা ফিরবে কেমন করে? তুমিই তো তাকে নিয়ে আসতে গেলে।

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় অপর্ণা, হ্যাঁ, গিয়ে শুনলাম সে নাকি কোন্ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ি চলে গেছে। স্কুলের দারোয়ান যা বললে তাতে মনে হলো তোমার বন্ধু সত্যব্রতবাবু হতে পারে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না সত্যব্রতবাবুর এমন কি দরকার পড়লো ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার? আবার মনে হলো উনি হয়তো আমাদের এদিকেই আসছিলেন। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

—সত্যব্রত তো দিন সাতেক হলো বম্বে চলে গেছে। ফিরবে দিন পনেরো পরে। প্রায় স্খলিত কণ্ঠে বলে ওঠে বিবেক।

—তাহলে কি হবে? কোথায় গেল মিলু? এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে অপর্ণা।

রাত দশটা পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে শুরু করে হাসপাতাল পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেও যখন মিলুকে পাওয়া গেল না তখন বিবেক অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলো থানায়।

থানা অফিসার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমরা একটা মিসিং ডায়েরী করে খোঁজখবর করছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা ঠিক ভালো ঠেকছে না। রাস্তায় একা বেরিয়ে পড়লে এতক্ষণে কোনো না কোনো থানায় ঠিক জমা পড়তো, আর আমরাও খবর পেতাম। তা' যখন হয় নি তখন কেউ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে নিয়ে গেছে।

বিবেক ও অপর্ণা চুপ করে শুনছিল থানা অফিসারের কথা। পরিশ্রম ও দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অপর্ণা। তার ওপর কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছিল তার মুখ-চোখ।

অফিসারটি থামতেই জিজ্ঞেস করে অপর্ণা, মিলুকে ফিরে পাবো তো?

ম্লান হেসে জবাব দেন অফিসার, তা' কি করে বলবো? তবে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবো না। দেখা যাক্।

একটু থেমে অফিসার বিবেকের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, কারুর সঙ্গে আপনাদের কোনরকম শত্রুতা আছে?

খানিকক্ষণ ভেবে জবাব দেয় বিবেক, না তেমন কোনো শত্রুতা তো আমাদের কারুর সঙ্গে নেই।

—কোনো রকম পারিবারিক গণ্ডগোল?

—না, আমাদের না জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে যাবার মতো কোনো পারিবারিক গণ্ডগোল আমাদের নেই। সত্যি বলতে কি, মেয়ের মামার বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঠিক, যাকে বলে হৃদ্যতা, তা' নেই। কিন্তু তারা যে মিলুকে নিয়ে গেছে তা' বিশ্বাস করা শক্ত।

—পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনরকম গণ্ডগোল?

জবাব দেয় বিবেক, আজ্ঞে, তেমন তো কিছু ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ছে না।

অপর্ণা এই সময় বলে ওঠে, কালীপূজোর সময় চাঁদা নিয়ে পাড়ার কয়েকজন মস্তান গোছের ছেলের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। তারা সেদিন শাসিয়েছিল আমাদের। এতদিন পরে তারাই যদি—

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অপর্ণা। বলে ওঠে বিবেক, কিন্তু তারা যে এমন একটা কাজ করবে—

—বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন? বিবেকের কথায় পাদপূরণ করে দেন অফিসার নিজে। তারপর বলতে থাকেন, একালের মস্তানরা যে কি করতে পারে আর কি পারে না সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণাই নেই। যাক্‌গে, আগে আপনার মেয়ের মামার বাড়িতে একবার খবর নিন। আমরাও চারিদিকে খবর নিচ্ছি। দেখা যাক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আর হ্যাঁ, মেয়ের একখানা ছবি দিয়ে যাবেন।

না, পাওয়া গেল না। কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না মিলুর। ছোট্টমেয়েটা যেন রাতারাতি ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল। শোকে দুঃখে এবার শয্যা নিল অপর্ণা। বিবেকের কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ। সারা বাড়িতে শ্মশানের নিঃস্তব্ধতা। তারই মধ্যে মেয়ের নাম ধরে মাঝে মাঝে অপর্ণার ডুকরে ওঠা।

অপর্ণার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছে পাড়ার সেই মস্তানরাই এর জন্যে দায়ী। ওরাই এমনিভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। বিবেককে সে বলে, যাও একবার থানায়। অফিসারকে বলো ওদের এ্যারেস্ট করতে। আমার মন বলছে ওরাই মিলুকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বিবেক বললে, অবুঝ হয়ো না, অপু। পুলিশ এলাকার সব মস্তানদের নামই জানে। এখন তারা তাদের এ্যারেস্ট করবে কি করবে না সেটা তাদের ব্যাপার। আমাদের কথামত তো আর তারা চলবে না।

অপর্ণা আর কিছু না বলে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে বিবেকের দিকে। তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলতে থাকে, তা'হলে বোধহয় আমার মিলুকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরা হয়তো তাকে অন্য কোথাও চালান করে দিয়েছে। হয়তো বা বেচেই দিয়েছে কারুর কাছে। সেখানে হয়তো কতো কষ্ট হচ্ছে তার। হয়তো রাত-দিন আমার মতোই কান্নাকাটি করছে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—

আর বলতে পারল না অপর্ণা। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলতে থাকে বিবেক, এই সময় এভাবে ভেঙে পড়লে কি করে চলবে, অপু? একটু শক্ত হও। দেখছো না, দুঃখে বুক ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও কেমন শক্ত হয়ে রয়েছি আমি?

কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয় অপর্ণা, তুমি তো মিলুর মা নও। মায়ের দুঃখ মা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ বোঝে না। আমি বুঝতে পারছি না, মিলু ছাড়া আমি বাঁচবো কেমন করে।

শান্ত সংযত কণ্ঠে বিবেক বললে, পুলিশ কতটা কি খোঁজ করছে জানি না। তবে, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আজ হোক্ কাল হোক্ তোমার মিলু তোমার কাছে ফিরে আসবেই।

—যদি না আসে কোনদিন?

—না-না, আসবেই। এ জন্মে আমরা তো এমন কোনো অপরাধ করিনি যে ভগবান আমাদের এত বড় শাস্তি দেবেন।

অবশেষে দিন সাতেক পর বিবেকের কথাই সত্যি হলো। খোঁজ পাওয়া গেল মিলুর। তবে, খোঁজ পাওয়া গেলেও তাকে পাওয়া গেল না। এমনকি সে কোথায় আছে তা-ও জানা গেল না।

চিঠিখানা এসেছিল ডাকে। খামের মধ্যে কয়েক লাইনের চিঠি। চিঠিখানার ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে বিবেক, অপু—অপু, শিগগির এদিকে এসো। মিলুর খবর পাওয়া গেছে।

ভেতরের ঘরে শুয়েছিল অপর্ণা। স্বামীর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে অসংযত কাপড়-চোপড় সামলাতে সামলাতে ছুটে আসে সে বিবেকের কাছে।

বলে ওঠে বিবেক, এই দেখো, চিঠি এসেছে। মিলু ভালো আছে। আগামী শুক্রবার রাত ন'টায় সে ফিরে আসবে।

—কে লিখেছে চিঠি? বলতে বলতে স্বামীর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে তার হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে থাকে অপর্ণা। কাঁচা হতের লেখা চিঠির বয়ান খুবই স্পষ্ট।

বিবেকবাবু,

আপনার মেয়ে মিলুকে আমরা নিয়ে এসেছি। সে ভালো আছে। তার জন্যে চিন্তা করবেন না। আগামী শুক্রবার ঠিক্ সন্ধ্যা ছ'টায় এ্যাটাচি কেসে করে নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে এসে দাঁড়াবেন মেট্রো সিনেমার সামনে। কলকাতায় এখন এত গরম সত্ত্বেও যে লোকটির গলায় একটা মাফলার জড়ানো দেখবেন, তার হাতেই এ্যাটাচিটা তুলে দেবেন। রাত ঠিক ন'টায় আপনার মেয়ে ফিরে যাবে আপনার কাছে। বিশ হাজারের একটি পয়সা কম হলেও চলবে না। টাকা না দিলে কিম্বা পুলিশে খবর দিলে পরের দিন মেয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকবে গড়ের মাঠে।

চিঠির নিচে কারুর নাম নেই। তার বদলে আঁকা রয়েছে একখানা ছোরা। লেখক যেন বোঝাতে চাইছে টাকা না পেলে এমনি একটা ছোরা দিয়েই মিলুকে হত্যা করা হবে।

চিঠির নিচের সেই ছোরাটার দিকে কয়েক মূহূর্ত তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে অপর্ণার। বিবেক সেই মুহূর্তে তাকে ধরে না ফেললে সে হয়তো পড়েই যেত।

অপর্ণাকে খাটের ওপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করে বিবেক, শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে, অপু?

একটু সময় বিবেকের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকে যেন তার কথা শুনতে পায় নি, এমনি ভঙ্গিতে স্খলিত কণ্ঠে অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, ওরা—ওরা কি আমার মিলুকে মেরে ফেলবে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বিবেক, ইস্, মেরে ফেলা অত সহজ নাকি? আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

অপর্ণা তেমনি সুরে আবার বললে, কিন্তু চিঠিতে যে লিখেছে পুলিশে খবর দিলে মিলুকে

ওরা মেরে ফেলবে।

—আমি কি আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পুলিশের কাছে যাচ্ছি? গোপনে থানায় গিয়ে পুলিশকে ওদের চিঠিটা দেখাবো। তারপর, সেই মাফলার গলায় বাছাধন বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। টাকা নিতে এসে পড়বে পুলিশের জালে। মারের চোটে তখন মিলুর খবর বলতে বাধ্য হবে।

এতক্ষণ বেশ শান্ত কণ্ঠেই কথা বলছিল অপর্ণা। বিবেক থামতেই সে হঠাৎ কঠিন সুরে বলে ওঠে, না, কিছুতেই তা' হবে না। তুমি কিছুতেই থানায় গিয়ে তাদের খবর দিতে পারবে না। তোমার থানায় যাবার কথা ওরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। আর জানতে পারলেই ওরা মিলুকে—

কথাটা আর শেষ করতে পারে না অপর্ণা। তার আগেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

অপর্ণা একটু শান্ত হলে বিবেক বললে, পুলিশের সাহায্য ছাড়াই যদি মিলুকে ফিরে পেতে হয় তা'হলে তো ওদের কথা মতোই কাজ করতে হবে।

—হ্যাঁ, তাই করবো।

—বিশ হাজার টাকা আগামী শুক্রবারই সেই মাফলার গলায় লোকটার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

এবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অপর্ণা। তারপর জবাব দেয়, হ্যাঁ, তাই দিতে হবে। মিলুর জীবনের চাইতে তো আর বিশ হাজার টাকা বড় নয়।

—তা' তো বুঝলাম, কিন্তু বিশ হাজার টাকা পাবো কোথায়?

—যেমন করে পারো জোগাড় করতে হবে।

—কেমন করে যে জোগাড় হবে তা-ই বুঝতে পারছি না। আজ একমাস ধরে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েও তেমন কিছুই জোগাড় করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্যবসায়ে দাঁড়াবার এমন একটা সুযোগ স্রেফ টাকার জন্যই নষ্ট হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কতগুলো ক্রিমিন্যালের খাঁই মেটাতে এতগুলো টাকা কোত্থেকে জোগাড় হবে?

আবার একটু সময় চুপ করে থাকে অপর্ণা। তারপর জবাব দেয়, বেশ, আমার মায়ের সেই গয়না বিক্রি করে তুমি টাকার জোগাড় করো।

—তোমার মায়ের সেই গয়না? তাঁর সেই স্মৃতিচিহ্ন? বলছো কি অপু? তোমার বাবা-দাদারা জানতে পারলে যে তাঁদের কাছে ছোট হতে হবে তোমাকে।

তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় অপর্ণা, ছোট হই তো হবো। কিন্তু তাই বলে মিলুর কোনো ক্ষতি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। আমার কাছে মায়ের গয়না যতই কেননা বড় হোক্, মিলু আমার কাছে তার চাইতেও অনেক বড়।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বিবেক আবার বললে, তুমি স্থির হয়ে আর একটু চিন্তা করো অপু। এমনিভাবে টাকা দিয়ে কতগুলো ক্রিমিন্যালকে সাহায্য করা কি আমাদের উচিত?

—না—না—না, প্রায় চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা, মায়ের গয়নার টাকা দিয়েই আমি মিলুর মুক্তিপণ দেবো। তোমার পায়ে পড়ি, এতে তুমি আমায় বাধা দিও না। তুমি যদি রাজি না হও তা'হলে আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমিই সেই লোকটাকে টাকা দিয়ে

আসবো।

—তার চাইতে সেই মাফলার গলায় লোকটার হাতে একটা চিঠি দিয়ে আরও কয়েকটা দিন সময় নিই। আর এর মধ্যে আমি না হয় কিছু পয়সাকড়ি জোগাড়ের চেষ্টা করি।

—না—না, চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা আবার। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, না, ওরা হয়তো তা'হলে মেরে ফেলবে মিলুকে।

অগত্যা স্ত্রীর কথায় রাজি হতে হলো বিবেককে।

এলো সেই শুক্রবার। একটা নতুন এ্যাটাচি কেসে থরে থরে সাজানো একশ' টাকার নোট। পুরোপুরি বিশ হাজারই আছে ওতে। একটি পয়সাও কম নেই। অপর্ণা তার মায়ের গয়না বিক্রির টাকার বাণ্ডিলগুলো নিজের হাতে গুণে সাজিয়ে দিয়েছে এ্যাটাচি কেসে।

বিবেকের রওনা হবার মুহূর্তে অপর্ণা এগিয়ে এসে ধরা গলায় বললে, টাকা দেওয়ার পরে সেই লোকটাকে একটু অনুরোধ করো তারা যেন মিলুকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়। আমি যে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছি না।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে ওঠে বিবেকের। মুখে কিছু না বলে কেবল মাথা নেড়ে স্ত্রীর কথার জবাব দিয়ে এ্যাটাচি কেস নিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে একা অপর্ণা। সংসারের যাবতীয় কাজ পড়ে রয়েছে কিন্তু কিছুই করতে তার ভালো লাগছে না সেই মুহূর্তে। থেকে থেকে তার চোখ জোড়া কেবল চলে যচ্ছে টেবিলের ওপর রাখা টাইমপিসটার দিকে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ঘড়িটা যেন তার স্বাভাবিক গতিতে না চলে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে।

ছ'টা বাজলো—সাড়ে ছ'টা—তারপর সাতটা। এতক্ষণে তো বিবেকের ফিরে আসার কথা, কিন্তু সে আসছে না কেন? তবে কি সেই মাফলার জড়ানো লোকটার দেখা পায় নি বিবেক? তাই কি সে অপেক্ষা করছে তার জন্যে? হয়তো কোনরকম সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দলের লোকেরা সেই মাফলার-ওয়ালাকে পাঠাতেই সাহস করে নি। তাই হয়তো বিবেক খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে।

অবশেষে বিবেক ফিরে এলো সাড়ে সাতটায়। বিবেকের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে অপর্ণা। তার অমূলক সন্দেহ। বিবেক তা'হলে সত্যিই লোকটার দেখা পেয়ে তার হাতে টাকা ভর্তি এ্যাটাচি কেসটা তুলে দিয়ে এসেছে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসু চোখে স্বামীর দিকে তাকাতেই বিবেক বলে ওঠে, দিয়ে এলাম টাকা। এখন ওরা মিলুকে ছেড়ে দিলে হয়।

—কিছু বললে সেই লোকটা? তুমি জিজ্ঞেস করলে মিলুর কথা? উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বর অপর্ণার।

জবাব দেয় বিবেক, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছিলাম। অবিশ্যি তারা তাকে কোথায় রেখেছে বললে না। তবে বললে, ভালো আছে। রাত ন'টায় সে ফিরে আসবে।

শবরীর প্রতীক্ষা। ঘরের মধ্যে আপন আপন চিন্তায় বিভোর স্বামী-স্ত্রী তাদের একমাত্র সন্তানের ফিরে আসার মুহূর্ত গুণছে।

পাশের ফ্ল্যাটের দেয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে রাত ন'টা বাজল। কিন্তু কোথায় মিলু?

পনেরো মিনিট কেটে যায়। প্রতীক্ষাই সার, দেখা নেই মিলুর। চোখদু'টো আবার সজল হয়ে ওঠে অপর্ণার। বিবেকের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় সে বললে, আমাদের যথাসর্বস্ব দিয়েও কি আমরা তাকে ফিরে পাবো না?

কি জবাব দেবে বিবেক? একটু নড়ে চড়ে বসে কি যেন বলতে যায় সে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাইরে জেগে ওঠে মোটর গাড়ির শব্দ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দরজা খুলে ঝড়ের বেগে এসে দাঁড়ায়। বাইরে একটা ট্যাক্সি। পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়ির নম্বর জিজ্ঞেস করে। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে জেগে ওঠে মিলুর কণ্ঠস্বর, মা—মা, আমি এসেছি। এই দেখো কাকা কত্ত খেলনা দিয়েছে আমাকে।

দিন কয়েক ধরে বিবেক ও অপর্ণার একমাত্র কাজ হলো মিলুর সঙ্গে কথা বলা। সে এতোদিন কোথায় ছিল, কেমন করে তাকে নিয়ে গেল, কি খেয়েছে, কোথায় ঘুমিয়েছে ইত্যাদি একই প্রশ্ন বারে বারে করেও তেমন কোন পরিষ্কার জবাব পেল না মিলুর কাছ থেকে। কীই বা জবাব দেবে অতটুকু মেয়ে! তবে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল, এই ক'দিন মা-বাবার জন্যে মনটা ছটফট করলেও মিলুর তেমন কোনো কষ্টই হয় নি। সেখানে এই ক'দিনে একজন কাকা জুটে গিয়েছিল মিলুর। সে নাকি খুব ভালবাসতো তাকে। নানারকম খেলনা এনে দিত, লজেন্স টফি এনে দিত মুঠো মুঠো। শুধু তাই নয়, মিলু তার মা-বাবাকে জানিয়ে দিলে যে সে নাকি আবার সেই কাকার কাছে যাবে।

মেয়ের কথায় মা শিউরে উঠে মেয়েকে কোলের কাছে টেনে এনে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, না মা, তোমাকে আর সেখানে যেতে হবে না। আমিই তোমাকে এনে দেব টফি, লজেন্স, খেলনা।

কোনো ব্যাপারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কেটে যাবার পরেই মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব নিকেশ করতে বসে। উদ্বেগাকুল মনে লাভ ক্ষতির চিন্তা আসে না, তখন একমাত্র চিন্তা সেই উদ্বেগের নিরসন। মিলুর ব্যাপার নিয়ে এই কটা দিন ব্যস্ত থাকায় বিবেকের ব্যবসায়ে যে ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সে উঠে পড়ে লাগে। আর, বাড়িতে বসে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষতে কষতে গরম হয়ে ওঠে অপর্ণার ঠাণ্ডা মাথা! মিলুর মুক্তির জন্যে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। হাতছাড়া করতে হয়েছে তার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন সেই গয়নাগুলো। কিন্তু যারা এমনিভাবে তাকে ফাঁদে ফেলে অতগুলো টাকা মুক্তিপণ আদায় করলে তারা কি পার পেয়ে যাবে? কোনো শাস্তিই কি হবে না তাদের?

কিন্তু কেমন করে তাদের শাস্তি দেবে অপর্ণা? তাদের পরিচয়ই তো সে জানে না। তবে, অপর্ণা প্রায় নিশ্চিত যে একাজ বাইরের কোনো লোক করে নি, করেছে পাড়ারই সেই মস্তানগুলো। কালীপুজোর চাঁদার অঙ্কের বহুশত গুণ তারা আদায় করে নিয়েছে এমনিভাবে।

ব্যাপারটা যতই চিন্তা করে ততই অস্বস্তিবোধ করতে থাকে অপর্ণা। নিরুপায়ের গ্লানিতে ভরে ওঠে মন। মস্তান ছোকরাগুলোর হাতে সে এমনি ভাবে পড়ে পড়ে মার খেল! এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

কথাটা একদিন বিবেককে বলতেই চড়াসুরে জবাব দেয় বিবেক, এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করে কী হবে? যা হবার তা' তো হয়েই গেছে। তখনই তো তোমাকে বলেছিলাম পুলিশে

খবর দিতে। তুমিই তো রাজি হলে না।

স্বামীর কথায় অপর্ণা একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, মিলুর কথা চিন্তা করেই তখন রাজি হইনি। তাই বলে এখন তো পুলিশের কাছে যেতে বাধা নেই।

—এখন গিয়ে তুমি কি বলবে?

—বলবো যে মেয়ের মুখ চেয়ে তখন কিছু করতে সাহস পাই নি।

খানিক্ষণ কি যেন চিন্তা করে বিবেক। অবশেষে বললে, শোনো অপু, ইট ইজ নাউ এ লসট গেম্। এই স্টেজে পুলিশের পক্ষে সেই টাকা উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। তবে, যখন বলছো তখন না হয় যাবো একবার থানায়।

—তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

স্ত্রীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিবেক আবার বললে, তোমার যাবার দরকার কি?

জবাব দেয় অপর্ণা, আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো কি পরিস্থিতিতে আমরা তাদের না জানিয়ে টাকাটা দিয়েছি। তোমার চাইতে আমি তাদের ভালোমত বোঝাতে পারবো।

অগত্যা রাজি হতে হয় বিবেককে।

সব শুনে থানার অফিসার তো প্রথমটায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বিরক্তির সুরে বললেন, নিজেদের বুদ্ধিমতো সব কিছু যখন শেষ করেই ফেলেছেন তখন আর আমাদের কাছে এলেন কেন?

জবাব দেয় অপর্ণা, আমরা তখন নিরুপায়। মেয়ের মুখ চেয়েই অতগুলো টাকা আমরা ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

—বেশ তো, একবার আমাদের জানাতে কি দোষ ছিল? আপনাদের মতো লোকের জন্যেই ঐ ধরনের ক্রিমিন্যালরা দিনে দিনে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওরা বুঝে নিয়েছে চাপ দিলেই টাকা আসে। এর পরে ওরা হয়তো অন্য কোথাও আবার এই ধরনের কাজই করবে। দিনের পর দিন এমনি ভাবেই বেড়ে উঠবে ওদের এ্যাক্টিভিটি।

জবাবে অপর্ণা ম্লান কণ্ঠে বললে, আপনারা পুরুষ, সন্তানের জন্যে মায়ের মনের অবস্থা আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। সন্তানের জন্যে মা অনেক কিছুই করতে পারে যা নাকি বাপ পারে না। সেক্ষেত্রে মায়ের কাছে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা একান্তই মূল্যহীন।

একটু থেমে বিবেককে দেখিয়ে আবার বলতে থাকে, অপর্ণা, সত্যি বলতে কি, ওর এতে মোটেই সায় ছিল না। ও চেয়েছিল আপনাদের ব্যাপারটা জানাতে। কিন্তু পাছে মেয়ের কোনো অমঙ্গল হয় সেই ভয়ে আমিই তা' হতে দিই নি।

অপর্ণার কথায় একটু নরম হন পুলিশ অফিসার। তারপর বললেন, যাক গে, যা হবার তা' হয়ে গেছে। কই, সেই চিঠিটা এবার একটু দেখান।

হাত ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা চিঠিটা অপর্ণা টেবিলের ওপর রাখে। পুলিশ অফিসার সেটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে মন্তব্য করেন, কাঁচা হাতের লেখা। লিখতে পড়তে তেমন জানে বলে মনে হয় না।

বিবেক বাবু,

আপনার মেয়ে মিনুকে আমরা নিয়ে এসেছি। সে ভালো আছে। তার জন্য চিন্তা করবেন না। আগামী শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় পকেটে প্যাকেটটি রেখে [illegible] নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে এসে দাঁড়াবেন মেট্রো সিনেমার সামনে। সন্ধ্যায় এমন গুমোট গরম সত্ত্বেও যে লোকটির গলায় একটা মাফলার দেখবেন তার হাতেই প্যাকেটটা তুলে দেবেন। তাতে ঠিক নটায় আপনার মেয়ে ফিরে যাবে আপনার কাছে। বিশ হাজারের একটা পয়সা কম হলেও চলবে না। টাকা না দিলে কিংবা পুলিশে খবর দিলে পরের দিন আপনার মেয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকবে গড়ের মাঠে।

V. Thakur
12.3.63

[illegible] 12/3/63

পণবন্দী-চিঠি

তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যাপারে আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাবে দেয় বিবেক, কাকেই বা সন্দেহ করবো—।

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে অপর্ণা, আমার কিন্তু মনে হয় এটা আমাদের পাড়ার সেই মস্তানদের কাজ। কালীপুজোর চাঁদার ব্যাপারে ওরা আমাদের শাসিয়েছিল। বলেছিল, এর ফল নাকি আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে।

গম্ভীর হয়ে ওঠেন পুলিশ অফিসার। জিজ্ঞেস করেন ওদের নামধাম জানেন?

—সবার জানি না, তবে তিন-চারজনের জানি।

—বলুন তাদের নাম।

নামগুলো টুকে নিয়ে পুলিশ-অফিসার আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনার মেয়ে কি এদের কাউকে চিনিয়ে দিতে পারবে যে নাকি তাকে স্কুল থেকে নিয়ে গিয়েছিল কিম্বা যেখানে তাকে আটকে রেখেছিল? সেখানে হয়তো ও এদের মধ্যে কাউকে দেখে থাকবে।

জবাব দেয় অপর্ণা, না পারার তো কিছু নেই। তবে আমার মনে হয় ওরা নিজেরা হয়তো এ কাজ করে নি। তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে।

—অসম্ভব নয়, বলতে থাকেন অফিসার, ঠিক আছে আপনাদের অভিযোগ লিখে নিচ্ছি। তদন্তও করবো। তবে কতদূর কি হবে বলতে পারি না। টাকা উদ্ধার করার আশা তো প্রায় নেই বললেই চলে। বুদ্ধি করে একশো টাকার নোটের নম্বরগুলোও যদি টুকে রাখতেন তাহলেও না হয় একটা কথা ছিল।

বিবেক ও অপর্ণা চুপ করে থাকে।

অফিসারটি আবার বললেন, এই চিঠিটা আমাদের কাছে থাকবে। ঐ মস্তানদের মধ্যে কেউ এটা লিখেছে কিনা সেটা যাচাই করতে হবে। অলরাইট, এই চিঠিখানাই যে আপনারা এখানে জমা দিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ নিচে একটা সই করুন।

বিবেক চিঠির নিচে একটা সই করে সেখানা তুলে দেয় অফিসারের হাতে। অফিসার নিজেও সই করেন তার পাশে।

মাস তিনেক কেটে গেছে তারপর। এর মধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। এ্যারেস্ট হয়েছে পাড়ার পাঁচ-ছজন মস্তান। পুলিশের জেরার জবাবে তারা বলল যে তারা নাকি ব্যাপারটার বিন্দু বিসর্গও জানে না। তবে হ্যাঁ, কালীপুজোর চাঁদার ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই ঐ বিবেক ঠাকুর নামের ভদ্রলোককে শাসিয়েছিল, কিন্তু তাই বলে পাড়ার একটা বাচ্চা মেয়ে চুরি করে টাকা আদায় করার মতো প্রবৃত্তি নাকি তাদের নেই।

পুলিশের সন্দেহ। যাই যাই করেও যেতে চায় না সেই সন্দেহ। ওদের প্রত্যেকের একখানা করে ফটোগ্রাফ মিলুকে দেখানো হয়েছিল, কিন্তু মিলু ওদের মধ্যে কাউকেই চিনতে পারে নি। অবশেষে ওদের প্রত্যেকের হাতের লেখা জোগাড় করে সেই চিঠিসমেত সেগুলো হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দিলেন তদন্তকারী অফিসার।

বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পেয়ে তদন্তকারী অফিসার তো তাজ্জব। বিশেযজ্ঞ ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হলো নাকি? নইলে এমন রিপোর্ট দেন? মস্তানদের কারুর হাতের লেখার সঙ্গেই নাকি সেই চিঠির লেখা মেলে নি। এই পর্যন্ত ভালই। বোঝা গেল ঐ মস্তানরা নিজের হাতে ঐ চিঠি লেখে নি। এমনও হতে পরে, অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। বিশেষজ্ঞের আরও অভিমত যে ঐ চিঠিখানা যে-ই লিখে থাকুক লেখক তার স্বাভাবিক ডান হাত দিয়ে না লিখে বাঁ হাত দিয়ে নাকি লিখেছে। বিশেষজ্ঞ এটা বুঝলেন কেমন করে? চিঠির লেখা খারাপ ও ভাঙাচোরা

বলে নাকি? কণ্ঠধরকে তাঁর সহকারী রজতও এই প্রশ্ন করেছিল। জবাবে কণ্ঠধর মৃদু হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ, খারাপ ও ভাঙাচোরা লেখা অনভ্যস্ত বাঁহাতের লেখার একটা চিহ্ন বটে। কিন্তু সেটাই সব নয়। ভালো করে চিঠিটার দিকে তাকালে দেখতে পাবে চিঠিখানার তিনটে জায়গায় তিনটে অক্ষর লিখতে লেখক ভুল করেছে বলে অক্ষর তিনটি কেটে দিয়ে আবার নতুন করে লিখেছে। অক্ষর তিনটি হচ্ছে 'এ', 'ল' এবং 'ব'। হ্যাঁ, বলতে পারো ভুল মানুষ মাত্রই করে, আবার সেই ভুল মানুষই সংশোধন করে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ঠিক কথা। সাধারণ ভুল হলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এগুলো তো সাধারণ ভুল নয়। হ্যাঁ, অসাধারণই বটে। ঐ তিনটে অক্ষরই লেখক প্রথমটায় উল্টো করে লিখেছিল। পরে খেয়াল হতেই কেটে দিয়ে ঠিক করে লিখেছে। এখন প্রশ্ন হলো, লেখক উল্টো করে লেখে কখন? অভ্যস্ত ডান হাতে লিখলে আর যে ভুলই হোক না কেন, উল্টো হবে না কিছুতেই। সেটা হতে পারে অনভ্যস্ত বাঁহাতে লিখলে। কাজেই এটাই একটা মস্ত প্রমাণ যে নিজের স্বাভাবিক হাতের লেখা লুকোতে গিয়ে চিঠিখানার লেখক তার বাঁহাতকে কাজে লাগিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞ সেই কণ্ঠধরের অভিমত অনুযায়ী সেই বাঁ-হাতের ব্যাপারটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু তার রিপোর্টের শেষের লাইনটিই হচ্ছে অদ্ভুত। কেবল অদ্ভুতই নয়, অবিশ্বাস্য। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কণ্ঠধর যতই কেন না বিখ্যাত হোন, তিনি নিশ্চয়ই খড়ি পেতে গণনা করেন নি। তা'হলে রিপোর্টের শেষের লাইনটিতে তিনি কেমন করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে চিঠির সেই লেখা অভিযোগকারী স্বয়ং বিবেক ঠাকুরের বাঁহাতের লেখা হতে পারে? কিসের ভিত্তিতে তিনি এই ধরনের সন্দেহ করলেন? বিশেষজ্ঞের কাছে মস্তানদের হাতের লেখা পাঠানো হলেও খোদ অভিযোগকারীর লেখা তো পাঠানো হয় নি। বিবেক ঠাকুরের হাতের লেখার সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ না পেয়েও কেন তাঁর এই সন্দেহ? শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্তের ভিত্তিমূল দৃঢ় করতে তিনি তদন্তকারী অফিসারকে অনুরোধ করেছেন বিবেক ঠাকুরের বাঁ হাতের লেখা পাঠাতে।

তদন্তকারী অফিসার দিশেহারা। বিশেষজ্ঞের এই অদ্ভুত সন্দেহ যদি তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায় তা হলে বলতে হয় যে বাপ তার আদরের একমাত্র কন্যাকে আটকে রেখেছিল নিজের কাছ থেকেই মুক্তিপণ আদায় করতে। সম্পূর্ণ স্ব-বিরোধী ব্যাপার এটা।

এই প্রশ্ন কেবল তদন্তকারী অফিসারের নয়। ঠিক এই প্রশ্নই কণ্ঠধরকে করেছিল তার সহকারী রজত। বলেছিল, আপনার এই সন্দেহের ভিত্তি কি, স্যার? বিবেক ঠাকুরের কোনো হাতের লেখা কি আপনি পেয়েছেন? জবাবে বলেছিলেন কণ্ঠধর, পুলিশের কাছে চিঠিখানা জমা দেবার সময় অভিযোগকারী বিবেক ঠাকুর নিচে ইংরেজিতে সই করেছিল, সেটা দেখেই আমি এই সন্দেহ করছি।

—চিঠি লেখা বাংলায়, আর বিবেক ঠাকুরের সই ইংরেজিতে। বাংলা অক্ষরের সঙ্গে ইংরেজি অক্ষরের তুলনা করেছিলেন আপনি? জিজ্ঞেস করে রজত।

জবাব দেন কণ্ঠধর, কেন, সেটা কি অসম্ভব?

—না স্যার, আমি অসম্ভব বলছি না। তবে বিশেষজ্ঞকে ক্বচিৎ সেরকম সমস্যায় পড়তে হয়। শুনেছি, আপনি নিজেও নাকি অতীতে দু'টো ভিন্ন ভাষার অক্ষরের তুলনা করে অভিমত দিয়েছিলেন।

একটু সময় চুপ করে থাকেন কণ্ঠধর। তারপর, তাঁর স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে বললেন, এক্ষেত্রে অবিশ্যি বিবেক ঠাকুরের ইংরেজি সইয়ের সঙ্গে সেই চিঠির বাংলা অক্ষরের তুলনা করি নি।

কণ্ঠধরের কথায় রজত খানিক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। অদ্ভুত ক্ষমতা কণ্ঠধরের, কিন্তু তিনি সেই মুহূর্তে কি বলতে চাইছিলেন তা' ঠিক বুঝতে পারছিল না রজত।

কণ্ঠধর রজতের অবস্থা অনুমান করে স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে আবার বললেন, এই ব্যাপারটায় আরও একটা স্টেপ এগিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। ভিন্ন ভাষার অক্ষরের সঙ্গে তুলনা নয়, ছবির সঙ্গে অক্ষরের তুলনা।

—ছবির সঙ্গে অক্ষরের তুলনা? আপনি বলছেন কি স্যার, বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়ার মতো অবস্থা রজতের।

বলতে থাকেন কণ্ঠধর, চিঠির নিচে আঁকা এই ছোরাটাকে ভালোমত লক্ষ্য করো। ছোরার ফলাটা আঁকতে গিয়ে লেখক প্রথমে একটা ইংরেজি "ভি" অক্ষর লিখেছে। তারপরে উপরে একটা লাইন টেনে ফাঁকা জায়গাটা কালি দিয়ে ভর্তি করেছে। এটা হলো ছোরার ফলা। এই "ভি" অক্ষরটির সঙ্গে অভিযোগকারীর "ভি" অক্ষরটির তুলনা করো। অভিযোগকারী "ভি" অক্ষরটি লিখছে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে। বাঁদিকের প্রথম লাইনটি তির্যকভাবে সোজা নিচে নেমে না এসে একটু বাঁকাভাবে নেমে আসে, আর দ্বিতীয় লাইনটি ওপরের দিকে ওঠার সময় সামান্য ঢেউ খেলে ভেতরের দিকে খানিকটা ঢুকে যায়। ছোরার ফলার "ভি" অক্ষরটিও অবিকল তাই। এরপরে ছোরার হাতল। এই হাতলটি যেন অবিকল একটি ইংরেজি ক্যাপিট্যাল্ "টি" অক্ষর। সোজা একটা লাইন নিচে নেমে এসেছে, আর মাথার ওপর আর একটা লাইন। এই মাথার ওপরের লাইনের গঠন কিন্তু সত্যিই বিচিত্র। নিচে থেকে শুরু হয়ে ঢেউ খেলে ওপরের দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। অভিযোগকারীর ইংরেজিতে "ঠাকুর" শব্দটির "টি" অক্ষরটিও অবিকল এই রকম। এবার তুমিই বলো রজত, এই বিবেক ঠাকুরকে সন্দেহ করাটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?

সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে রজত, না স্যার, না। আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন। ছবির সঙ্গে এরকম অক্ষরের তুলনা তো এতকাল আমার চিন্তারই বাইরে ছিল।

কণ্ঠধর মৃদুকণ্ঠে আবার বললেন, চিঠিটা যে বাঁহাতে লেখা হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে ভাঙাচোরা লেখা ও উল্টো 'এ', 'ন' এবং 'ব' অক্ষর তিনটির মধ্যে। আর অভিযোগকারীর সইয়ের 'ভি' ও 'টি' অক্ষর দু'টির সঙ্গে কতগুলো অদ্ভুত মিল রয়েছে ছোরাখানার। তাই তো তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছি বিবেক ঠাকুরের বাঁ হাতের লেখা জোগাড় করে আবার পরীক্ষার জন্যে এখানে পাঠাতে। আমার অনুমান, আমি নিশ্চিত অভিমত দিতে পারবো যে চিঠিটা লিখেছে অভিযোগকারী স্বয়ং।

না, নতুন করে পরীক্ষা করার সুযোগ আর পেলেন না কণ্ঠধর। তদন্তকারী অফিসার একদিন বিবেকের বাড়িতে গেলেন তার বাঁ হাতের লেখা জোগাড় করতে।

কথাটা শুনেই বিবেকের মুখখানা হঠাৎ শুকিয়ে ওঠে। পাশে দাঁড়ানো স্ত্রী অপর্ণার দিকে একবার তাকায়। তারপর একটা ঢোক গিলে অফিসারকে বললে, আমি—আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না—।

অফিসার বললেন, হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের সন্দেহ আপনি নিজেই বাঁহাতে ঐ চিঠি লিখে নিজের কাছে পাঠিয়েছেন।

— কি-কি বলছেন আপনি? প্রায় চিৎকার করে ওঠে বিবেক। আপনি কি তা'হলে বলতে চাইছেন আমার মেয়েকে আমিই চুরি করেছি?

— না, চুরি নয়। আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। অবিশ্যি আমার কাছে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে বিশেষজ্ঞের সন্দেহ ঠিক হলে ব্যাপারটা তা-ই দাঁড়ায়।

এবার বেশ জোরেই চেঁচিয়ে ওঠে বিবেক, আমি এ কাজ কেন করতে যাবো? নিজের মেয়েকে—।

কথাটা শেষ করতে পারে না বিবেক। অপর্ণা এতক্ষণ স্থির হয়ে সব শুনছিল। সহসা শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে সে তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, কোম্পানীর সেই পার্চেজ অফিসারের সঙ্গে চুক্তি কি পাকা করে ফেলেছ?

সাপুড়ের হাতের ছোঁয়ায় সাপের মাথা যেমন নিচু হয়ে পড়ে, অপর্ণার কথায় বিবেকেরও ঠিক তেমনি অবস্থা। মুখে আর কথা সরে না তার। মাথা নিচু করে সে চুপ করে থাকে।

বলতে থাকে অপর্ণা, মায়ের স্মৃতিচিহ্ন সোনার গয়নাগুলোকে কি এমনিভাবে নষ্ট না করলে চলতো না?

স্ত্রীর কথায় ধীরে ধীরে মাথা তোলে বিবেক। তারপর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, নষ্ট করি নি। ব্যবসায়ে খাটিয়েছি।

— এরকম একটা বিশ্রী পথে?

— বিশ্রী নয়, বলতে পারো বাঁকা পথে। সোজা পথে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে।

— সোজা পথে একবার চেয়ে দেখলেই পারতে।

— লজ্জা করছিল তোমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন নিজের ব্যবসায়ে খাটাতে।

— এখন বুঝি লজ্জা করছে না? অপর্ণার মুখে মৃদু হাসির চিহ্ন।

— হ্যাঁ করছে। বুঝতে পারি নি যে ধরা পড়বো। ঐ হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ না থাকলে ধরা কিছুতেই পড়তাম না। বিবেকও সামান্য হেসে জবাব দেয়।

ঠিক সেই মূহূর্তে বলে ওঠেন তদন্তকারী অফিসার, বুঝতে পারছি গোটা ব্যাপারটাই আপনাদের ফ্যামিলি ম্যাটার। আমি তা'হলে এবার চলি।

মাকড়সার জাল

রাজস্থানের একটা ছোট দেশীয় রাজ্য। রুক্ষ পার্বত্য আবহাওয়া। দিনের প্রখর রৌদ্রে দিক্‌দিগন্ত ঝলসে যায়। তপ্ত বালির হাওয়ায় জেগে ওঠে ধরিত্রীদেবীর দানবীয় রূপের দীর্ঘশ্বাস—রূঢ়—ভয়ংকর। আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রূপ যায় বদলে। স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় আবার ফিরে আসেন ধরিত্রীদেবী তাঁর সনাতন দেবী রূপে। অন্তর্হিত হয়ে যায় দিনের সেই ভয়ংকর মূর্তি।পরিষ্কার নীল আকাশে চাঁদের আবির্ভাব হয়। তার স্নিগ্ধ আলোর স্পর্শে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বালুকণা চকচক করতে থাকে—যেন ঔজ্জ্বল্যে তারা পাল্লা দিতে চায় আকাশের নক্ষত্ররাজির সঙ্গে।

একদিন এই ছোট রাজ্যটিরও প্রতাপ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। সেদিন হাজার একর জমির ওপর অবস্থিত রাজপ্রাসাদে ছিল প্রাণের জোয়ার। রাজধানীর পথে পথে রাজপুরুষদের পিঠে নিয়ে নক্ষত্র বেগে ছুটে যেত আরবীয় ঘোড়া। গলা উঁচু করে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে সারিবদ্ধ উটের দল চলতো রাজপথ দিয়ে।

আজ আর সেদিন নেই। ভারতবর্ষে গণযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শক্ত হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে গেছে রাজতন্ত্র। সাড়ে তিনশ'র মত দেশীয় রাজ্য মিশে গেছে প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অস্তিত্বের সঙ্গে। তাদের বিশিষ্ট সত্তা চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে একশ' কোটি ভারতবাসীর গণ:.ত্রার মধ্যে।

রাজ্য নেই কিন্তু রাজা আছেন। আছে তাঁদের পরিবার পরিজনেরা। ভবিষ্যতে যে হয়তো একদিন হতে পারতো একটা রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আজ সে ব্যবসা ফেঁদে দু'পয়সা লাভের চিন্তায় মশগুল। সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ অল্প। ভাগীদার অনেক। তাই শুধু সরকারী বরাদ্দের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলে না।

রাজা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন একদিন। লোহালক্কড় থেকে শুরু করে ঘোড়ার ব্যবসা পর্যন্ত সবকিছুই পড়ে তার আওতার মধ্যে। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁকে জলাঞ্জলি দিতে হয় রাজার রাজকীয় মন। উঁচু নজর ক্রমেই নিচু হয়ে আসতে থাকে।

তবে ব্যতিক্রম আছে বৈকি। সহজে ভুলে যেতে পারে না তাঁরা তাঁদের অতীতের ঐতিহ্য। অর্থাভাবে দারুণ সংকটের মধ্যে পড়েও এঁরা কিছুতেই পারেন না ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করতে কিংবা অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করতে।

তাই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর নির্ভর করেই দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন তাঁরা। সর্বদা বাইরের জনসাধারণের সঙ্গে একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাফেরা করেন।

পুরোন দিনের লোকেরা এখনও রাস্তাঘাটে এঁদের দেখলে 'রাজাবাবু' কিংবা 'রাজাসাহেব' বলে সম্বোধন করে। তাতেই কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হন এঁরা। যদিও মনে মনে বেশ ভালই জানেন যে ব্যক্তি এইমাত্র তাঁকে 'রাজাসাহেব' বলে সম্বোধন করলো, ইচ্ছে করলে সে তাঁর মত দু'শজন অতীত দিনের রাজাকে মাইনে দিয়ে পুষতে পারে অনায়াসে।

এই ছোট্ট দেশীয় রাজ্যের রাজা পীতাম্বর সিং এই শেষোক্ত দলে পড়েন। হৃতগৌরব এই রাজ্যটির একদিন অধীশ্বর ছিলেন তিনি। তাঁর একটিমাত্র অঙ্গুলিহেলনে সেদিন অনেককিছুই হতে পারতো। কিন্তু আজ তিনি রাজস্থানের সাধারণ একজন নাগরিক মাত্র।

হাজার একর জমির ওপর সাদা মার্বেল পাথরের বিরাট রাজপ্রাসাদ। বন, উপবন, দীঘি, রাস্তাঘাট প্রভৃতির ওপর যদিও ভারত সরকার হাত দেননি, কিন্তু আজ তার একমাত্র মালিক পীতম্বর সিং নন। অনেক অংশীদার এখন। ভাই, ভাইপো এবং অন্যান্য শরিক। রাজপ্রাসাদের সেই পুরোন দিনের সৌন্দর্যও আজ আর নেই। দেয়াল তুলে প্রাসাদের বিভিন্ন মহল আলাদা করে নিয়েছে শরিকেরা।

প্রাসাদের দরবারকক্ষটি কিন্তু আজও পীতাম্বর সিংয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। পুরোন দরবারকক্ষ ভেঙে এই নতুন দরবারকক্ষ তৈরি করিয়েছিলেন পীতাম্বরের পিতামহ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের সমন্বয়ের চিহ্ন রয়েছে এখানে। দেয়ালের প্রতিটি কারুকার্য আজও পীতাম্বর সিংয়ের পিতামহের শিল্পরুচির পরিচয় বহন করছে।

এই দরবারকক্ষেই একদিন সিংহাসন আলো করে বসতেন পীতাম্বর সিংয়ের পিতামহ। তারপর তাঁর পিতাও সেই রাজসিংহাসন অলংকৃত করে গেছেন বহুদিন। সেদিন বোধহয় তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি তাঁদেরই ভবিষ্যৎ বংশধর পীতাম্বর সিংকে অতি সাধারণ একজন নাগরিক হিসাবে জীবন কাটাতে হবে এই রাজ্যে।

অবশ্য, পীতাম্বর সিং নিজেও অল্প কিছুদিনের জন্যে বসেছিলেন সেই সিংহাসনে। মাত্র বছর দুয়েক। কিন্তু তারপরই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। দিল্লী থেকে এলো জরুরী বার্তা। সিংহাসন ছেড়ে সসম্মানে সরে দাঁড়াতে হলো তাঁকে।

পীতাম্বরের পিতা তখন বেঁচে। পীতাম্বর নিজে তখন যুবরাজ। একদিন সমস্ত রাজ্যে প্রচারিত হলো একটি চমকপ্রদ খবর—যুবরাজ পীতাম্বর সিং নাকি রাজপরিবারের প্রথা ভঙ্গ করে সাধারণ শ্রেণীর একটি রূপবতী মেয়ে মণি বাঈকে বিয়ে করবেন বলে তোড়জোড় করছেন। খবরটা রাজার কানে উঠতেও দেরি হলো না।

একদিন তিনি পীতাম্বরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা। পীতাম্বর জবাব দিলেন—"মহারাজ, যা শুনেছেন তা সত্য"।

—"সত্য?"—তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মহারাজের।

অধোবদনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন পীতাম্বর সিং প্রবলপরাক্রান্ত পিতার সামনে। মহারাজ বলতে থাকেন—"কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। রাজপরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর রাজসিংহাসনের ওপর কোন অধিকার তো থাকবেই না, তাকে নির্বাসনে যেতে হবে।"

পিতার মুখের দিকে একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করে পীতাম্বর সিং মাথা নিচু করে চুপ করেই থাকেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের মত মিসেস সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথা উচ্চারণ করতে পারেন না।

অবিবাহিত থাকার সংকল্প করেন পীতাম্বর সিং। স্বয়ং পিতা পর্যন্ত তাঁর এই সংকল্প থেকে তাঁকে টলাতে পারেন না।

পীতাম্বরের বয়স তখন প্রায় চল্লিশের কোঠায়। এমন সময় হঠাৎ পরলোকের ডাক এলো তাঁর পিতার। চলে গেলেন তিনি।

পীতাম্বর বসলেন সিংহাসনে। তাঁর অভিষেকের দিন তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি বিয়ে করতে সম্মত।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারিদিকে। রাজ্যসুদ্ধ লোকের একটা দুশ্চিন্তা ছিল যে পীতাম্বর সিং বিয়ে না করলে ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। তাই তাঁর বিয়ে করার সম্মতিতে সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রাজপরিবারে পাত্রীর সন্ধানে যাবার জন্যে ঘটকের দল প্রস্তুত হলো। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে পীতাম্বর সিং ঘোষণা করলেন তিনি সেই মণি বাঈকেই বিয়ে করবেন।

এবার খোদ রাজার নিজের সংকল্প। কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হলো না। মনে মনে বিশেষ খুশী না হলেও পাত্রমিত্রের দল রাজাদেশ শিরোধার্য করে নিল।

কিন্তু বাদ সাধলো পীতাম্বরের নিজের বোন রাজকন্যা অহল্যা বাঈ।

ভয়ানক তেজী আর মুখরা স্ত্রীলোক এই অহল্যা বাঈ। অবিবাহিতা কুমারী অহল্যা বাঈ রাজঅন্তঃপুরের সর্বেসর্বা। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের এক রাজকুমার মদন সিংকে মনে মনে ভালবাসত সে। কিন্তু সেই ভালবাসা ছিল একতরফে। অহল্যা বাঈয়ের পিতা বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন মদন সিংয়ের কাছে। কিন্তু মদন সিং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সেই থেকে অহল্যা বাঈ কুমারীই থেকে গিয়েছিল। ভাই পীতাম্বর সিং তাঁর পরলোকগত পিতার ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা না দেখিয়ে সেই মণি বাঈকেই বিয়ে করতে কৃতসংকল্প—এই খবর শুনে সে প্রকাশ্যেই ভাইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করলো।

স্বভাবতই একটু গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি পীতাম্বর সিং। একদিন বোন অহল্যা বাঈকে কাছে ডেকে ভাল করে ধমকে দিলেন। বললেন যে তার মত একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে রাজাদেশের বিরুদ্ধে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে মনে ভাইকে একটু সমীহ করেই চলতো অহল্যা বাঈ। তাই পীতাম্বরের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে সে বুঝতে পারে এবারে আর তাকে সংকল্পচ্যুত করা যাবে না। তা'ছাড়া সে নিজেই হচ্ছে এখন রাজ্যের অধীশ্বর। বেশী জেদ ধরলে হয়তো রাজঅন্তঃপুরে তার নিজেরই সুপ্রতিষ্ঠিত আসন টলে উঠবে।

তাই বাধ্য হয়ে সে আর পীতাম্বরের বিরুদ্ধাচরণ করলো না। শুভদিনে রাজা পীতাম্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রাজ্যের অতিসাধারণ এক ব্যক্তির কন্যা মণি বাঈয়ের।

অপূর্ব সুন্দরী এই মণি বাঈ। যেমন শান্ত স্বভাব তেমনি বুদ্ধিমতি। রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেই সে এখানকার আবহাওয়া ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে রাজপরিবারের মধ্যে যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে সে হচ্ছে অহল্যা বাঈ। তা'ছাড়া অন্তঃপুরের সবকিছুই অহল্যা বাঈয়ের হাতে।

ইচ্ছা করলে মণি বাঈ পীতাম্বরকে বলে অহল্যার কাছ থেকে অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে পারতো। কিন্তু সে কিছুই করলো না। অত্যন্ত সংযতভাবে সে অহল্যার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলো।

রাজঅন্তঃপুরের হালচাল পূর্বের মতই রইলো। অহল্যার কর্তৃত্ব বজায় রইলো পুরোপুরি। আর পাঁচজন অন্তঃপুরবাসীর মত রানী মণি বাঈও অহল্যার ইচ্ছানুযায়ীই চলাফেরা করতে লাগলো সেখানে।

মণি বাঈয়ের আচরণে মনে মনে সন্তুষ্টই হয় অহল্যা। কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে মণি বাঈয়ের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করতে ছাড়ে না সে।

মণি বাঈকে স্ত্রীরূপে পেয়ে পীতাম্বর সিং যেন নবীন জীবন লাভ করলেন। দক্ষতার সঙ্গে

রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

বছরখানেক পরে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলো তাঁদের। পীতাম্বর তার নাম রাখলেন শান্তা বাঈ।

ঠিক এমনি সময় দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এলো পীতাম্বরের চারিদিকে। ভারত সরকারের জরুরী আদেশে তাঁর রাজ্য গেল। আর সেই সঙ্গে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তাঁর মণি বাঈ।

রাজ্য হারিয়েও হয়তো এতটা মুষড়ে পড়তেন না পীতাম্বর, কিন্তু স্ত্রী মণি বাঈয়ের অকাল বিয়োগব্যথা তাঁর মনে যে সাংঘাতিক ঝড় তুললো তা' থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না তিনি।

দীর্ঘকায় পুরুষ পীতাম্বর সিং। দেখতে দেখতে সেই দীর্ঘ দেহ ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। অকালবার্ধক্য যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করলো তাঁকে। গম্ভীর পীতাম্বর আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন পীতাম্বর সিং। বিশেষ করে পোলো খেলায় তাঁর ভারতজোড়া নাম ছিল। সেই খেলাধুলো ছেড়ে দিলেন তিনি। দিনরাত প্রাসাদের একটা নিভৃত কক্ষে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করার কারও হুকুম নেই একমাত্র তাঁর খাস চাকর ছাড়া। এমনকি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলা একরকম ছেড়ে দিলেন তিনি।

এমনিভাবেই সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন পীতাম্বর সিং। আর, পিতামাতার স্নেহরসে বঞ্চিত ছোট্ট শান্তা বাঈ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে পিসী অহল্যা বাঈয়ের কঠিন শাসনের মধ্যে।

।। ২।।

—"বয়স আর এমন কী বেশী? মাত্র তো চল্লিশ। এই বয়সে তো আজকাল কত লোকই বিয়ে করছে। তা'ছাড়া এমন ধনী পাত্র কি সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়?" কথাটি বলে অহল্যা বাঈ সমর্থনের আশায় হীরা বাঈয়ের মুখের দিকে তাকায়।

হীরা অহল্যারই মামাতো বোন। বালবিধবা। পিতা ছিলেন একজন উঁচুস্তরের রাজকর্মচারী। একমাত্র সন্তান হীরা স্বামীর মৃত্যুর পর বাপের কাছেই থাকতো। প্রাসাদ এলাকার বাইরে তাদের বিরাট অট্টালিকা। বয়সে অহল্যার চেয়ে বছরখানেকের ছোট এই হীরা বাঈ।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে অহল্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হীরা।

হীরা ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝতে না পারায় অহল্যা একটু বিরক্তই হয় তার ওপর। এটাই তার স্বভাব। সবসময় কেমন যেন একটা বিরক্তভাব তার। তার ধারণা এই সাধারণ কথাটার মধ্যে বুঝতে না পারার এমন কী আছে?

অহল্যা বিরক্তকণ্ঠে আবার বলে—"বলছি যোগীন্দ্র সিংয়ের কথা। ওর মত একটি সুযোগ্য পাত্র হাতছাড়া করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক সে। তা'ছাড়া সে নিজে যখন শান্তাকে পছন্দ করেছে..."—কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অহল্যা।

হীরা ভেবে পায় না সে কী জবাব দেবে। অহল্যার স্বভাব সে ভালমতই জানে। তার মতের সঙ্গে সায় দিয়ে কথা না বললে সে এখনই হয়তো একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বসবে।

তবু সে আমতা-আমতা করে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তা যা বলেছ দিদি, পাত্র হিসাবে যোগীন্দ্র যোগ্যই বটে, কিন্তু..."

—"কিন্তু?"—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে অহল্যা।

—"কিন্তু বয়সের পার্থক্য একটু বেশী নয় কি?" জবাব দেয় হীরা বাঈ।

ভাঙা কাঁসার থালার মত খনখনে গলায় অহল্যা বলে—"তোমারও দেখছি ভীমরতি হয়েছে। পুরুষমানুষের আবার বয়েসটা কি, শুনি? ওঁরা চৌদ্দতেও যা চল্লিশেও তাই।"

প্রস্তরমূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শান্তা। অনন্যসাধারণ রূপ তার। সতের বছরের এই যুবতীর দেহে যেন ফেটে পড়ছিল সেই রূপ। সে যেন রক্তমাংসের তৈরী কোন জীবন্ত নারী নয়, যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা একখানি চিত্রপট।

হীরা বাঈ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শান্তার কাছে। তার চিবুক ধরে মুখখানা তুলে ধরে খানিকক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে।

দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে ওঠে হীরা বাঈ। একসময় অনেকটা নিজের অজান্তেই মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসে—"এমন প্রতিমাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে তোমরা?"

কথাটা বলেই কিন্তু সচেতন হয়ে ওঠে হীরা বাঈ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে অহল্যা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

আবার সেই খনখনে কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে হীরা বাঈকে উদ্দেশ করে—"আত্মীয়! আত্মীয় না ছাই! মুখে মধু আর অন্তরে বিষ। উপকার করার বেলায় নেই কেউ, কিন্তু বাগড়া দিতে সবাই ব্যস্ত।"

কথাটা বলেই অহল্যা শান্তার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—"মন স্থির করে ফেল শান্তা। শুধু শুধু দুর্ভাবনা করে মনে মনে কষ্ট পেয়ে কোন লাভ নেই। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, আর ঐ যোগীন্দ্র সিংই তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী। তাকে আমি কথা দিয়েছি।"

শান্তা তার আয়ত চোখদুটি মেলে অহল্যার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছলছল করে ওঠে সেই আয়ত চোখের দৃষ্টি। হীরা বাঈয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার বাঁ হাতখানা একটু শক্তহাতে চেপে ধরে সে, যেন হীরা বাঈই তার শেষ ভরসা। যদিও সে ভালভাবেই জানে অহল্যার কথার ওপর কথা বলার ক্ষমতা তার এই ছোটপিসির অর্থাৎ হীরা বাঈয়ের নেই।

অহল্যা বাঈ উঠে দাঁড়ায়। তারপর দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো আলমারি খুলে কতকগুলো জামা কাপড় নিয়ে এসে হীরা বাঈয়ের সামনে ফেলে দিয়ে বলে—"এই দেখ শান্তার বিয়ের সব জামা কাপড় কিনে ফেলেছি আমি। কেমন হয়েছে?"

হীরা বাঈ একবার অহল্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর জামা কাপড়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয়—"ভালই।"

যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে শান্তার বিয়ে দেবার জন্যে মেতে ওঠার কারণ অজানা নেই হীরার কাছে।

রাজপরিবারের সঙ্গে যোগীন্দ্র সিংয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এই রাজ্যেরই একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন যোগীন্দ্রের বাবা। অর্থাভাবে রাজপরিবারের অনেকেই রাজপ্রসাদের তাদের বিভিন্ন অংশ বিক্রি করে দিয়েছিল যোগীন্দ্রের বাবার কাছে। বাবার মৃত্যুর পর যোগীন্দ্র নিজেই সেই সমস্ত বিষয়সম্পত্তির মালিক হলো। রাজপ্রাসাদেরই একটা অংশে সে তার চাকর রঘুকে নিয়ে একা বাস করতো।

বছর পাঁচেক আগে একবার দারুণ অর্থসংকটে পড়ে অহল্যা বাঈ। ভাই পীতাম্বর থেকেও

নেই। বাইরে প্রচুর দেনা হয়ে গেছে। সেই দেনা শোধ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। বাধ্য হয়ে পীতাম্বরকে দিয়ে একটা দলিলে সই করিয়ে রাজপ্রসাদের দরবারকক্ষটি যোগীন্দ্রের কাছে বন্ধক রেখে দশ লাখ টাকা ধার করেছিল সে।

সেই দশ লাখ টাকা বেড়ে বেড়ে সুদে আসলে প্রায় পনের লাখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এতদিনে। দলিলের চুক্তিমত পুরো টাকা শোধ করে দিতে না পারলে ঐ দরবারকক্ষ যোগীন্দ্রের হয়ে যাবে।

ঐ দরবারকক্ষটি সম্বন্ধে কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল অহল্যার। এই সেই দরবারকক্ষ যেখানে তার পিতা, পিতামহ বসে রাজ্যশাসন করে গেছেন একদিন। সমস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই কক্ষটিই সবচেয়ে সুন্দর। এখনও দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণকারীরা এসে এই কক্ষটির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক এই কক্ষের সৌন্দর্য তারা ধরে রাখে তাদের ক্যামেরায়। প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অহল্যা তাকিয়ে তাকিয়ে এই টুরিস্ট সমাগম দেখে আর মনে মনে পুলকিত হয়। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া আভিজাত্যের কথা নতুন করে আবার মনে পড়ে তার।

সেই দরবারকক্ষ এখন লিখে পড়ে দিয়ে দিতে হবে যোগীন্দ্রকে। কোন উপায় নেই তা রক্ষা করার।

শান্তাকে অহল্যা সত্যিই ভালবাসে। কোলেপিঠে করে এই শান্তাকেই মানুষ করেছে সে। কিন্তু যোগীন্দ্র সিং যেদিন অহল্যার কাছে শান্তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলো, সেদিন অহল্যা না বলতে পারেনি। ব্যবসায়ী মানুষ যোগীন্দ্র সিং। সে অহল্যাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে যে শান্তা যদি তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয় তবে সে ঐ দরবারকক্ষের ওপর তার দাবি ছেড়ে দেবে।

উৎসাহিত হয়ে উঠলো অহল্যা। মনে মনে সে সংকল্প করে যেমন করেই হোক সে শান্তাকে রাজী করাবে।

রাজী করিয়েও প্রায় এনেছিল অহল্যা, কিন্তু বাগড়া দেবার লোকের অভাব নেই এই সংসারে।

জ্ঞাতি বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এই বিয়ের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তারা কেউই সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করেনি। একমাত্র তার মামতো বোন হীরা বাঈ এবং তার নিজের এক জ্ঞাতিভ্রাতার বন্ধুপুত্র সুন্দর সিং সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করতে লাগলো যাতে এই বিয়ে না হয়।

নব্যযুবক সুন্দর সিং। এই রাজপ্রাসাদের এক অংশেই বাস করে সে। আইন পাস করে স্থানীয় আদালতে আইনের ব্যবসায় সবে ঢুকেছে।

কিন্তু অহল্যাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে সে এই বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে থাকে দৃঢ় পদক্ষেপে।

।।৩।।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে হীরা বাঈ সবে দিবানিদ্রার আয়োজন করছে, ঠিক এমনি সময় ঝি লছমী এসে খবর দেয়—"একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে।"

চোখ তুলে লছমীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে হীরা—"কি নাম? চিনিস তাকে?"

—"আজ্ঞে না, কখনও তাঁকে দেখিনি।"

—"অন্ততঃ নামটা তো জিজ্ঞেস করে আসতে হয়।"

লছমী এতক্ষণে বুঝতে পারে লোকটির নাম জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তার। তাই সে ফিরে যেতে যেতে বলে—"আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।"

—"না, তোকে আর নাম জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

কথা বলতে বলতে হীরা বাঈ পালঙ্ক ছেড়ে নেমে পড়ে।

বাইরে এসে হীরা বাঈ দেখে একটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার উপরে একটা এক্কাগাড়িতে লোকটির বাক্স প্যাঁটরা, বিছানাপত্র।

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে চাইতেই সে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে হীরার হাতে দেয়।

চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে হীরা বাঈ। লোকটির নাম শ্যামলাল। হীরা বাঈয়ের এক পাঞ্জাবী বান্ধবীর ভাই সে। সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। রাজপ্রাসাদের যে অংশটি গভর্নমেণ্ট থেকে রিকুইজিশন করে নেওয়া হয়েছে, তার সংস্কারসাধনের জন্যে সরকার তাকে নিয়োগ করেছে এখানে। পাঞ্জাবের অধিবাসী সে। বদলী হয়েছে রাজস্থানের একটা শহরে। তাই, তার সেই বান্ধবী হীরা বাঈকে অনুরোধ করছে সে যেন তার ভাইয়ের একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়।

শ্যামলালের বয়স তিরিশ বত্রিশের মত। সাধারণ দোহারা চেহারা।

বাইরের ঘরে এনে বসিয়ে হীরা বাঈ জিজ্ঞেস করে—"রাজস্থানে আপনি বোধহয় এই প্রথম এলেন?"

সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দেয় লোকটি—"হ্যাঁ, এই প্রথম।"

একটু থেমে শ্যামলাল আবার বলে—"আমি আপনার বান্ধবীর ছোটভাই। আপনি আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন।"

শ্যামলালের কথাবার্তায় খুশী হয় হীরা বাঈ। শ্যামলাল বলে, সে মাত্র এ'বছরই সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে সি.পি. ডবলিউ ডি. তে ঢুকেছে। মাত্র মাস কয়েক সে তার নিজের দেশে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরই তাকে এখানে বদলী করা হয়েছে।

অতবড় বিরাট বাড়িতে হীরা বাঈ মাত্র একা থাকে তার ঝি লছমীকে সঙ্গে নিয়ে, তাই স্থানের অভাব নেই তার।

দোতলার একপাশের একটা ঘরে সে শ্যামলালের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।

হীরা বাঈয়ের বাড়িতে থেকে রাজপ্রাসাদে সরকারী চাকরিতে আত্মনিয়োগ করে শ্যামলাল।

* * * * * * * *

প্রাসাদসংলগ্ন রাস্তায় একা হেঁটে যাচ্ছিলো হীরা বাঈ। যাচ্ছিলো সে শান্তার সঙ্গে দেখা করতে। শান্তাকে সে সত্যিই স্নেহ করে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটিবার শান্তাকে না দেখলে তার চলে না। শান্তারও ঠিক একই অবস্থা। সমবয়সী কোন বান্ধবী নেই তার, তাই তার এই ছোটপিসী অর্থাৎ হীরা বাঈয়ের কাছেই সে উজাড় করে ঢেলে দিত তার মনের গোপন কথা।

এমনিভাবেই এই দুই অসমবয়সী নারীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন একটা মধুর সম্পর্ক যা সাধারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে অনেক অনেক উচ্চে।

শান্তা যখন আরও ছোট ছিল তখন সে প্রতিদিন যেত হীরা বাঈয়ের বাড়িতে। হীরা বাঈ এই পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটিকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে স্নেহরসে অভিষিক্ত করে দিত।

হীরা বাঈ বুঝতে পারতো বড়পিসী অর্থাৎ অহল্যা বাঈ তার সঙ্গে শান্তার এই ঘনিষ্ঠতাকে মোটেই পছন্দ করে না। শান্তার মুখেই সে মাঝে মাঝে শুনতে পেত অহল্যা তাকে হীরার কাছে আসতে বারণ করে। কিন্তু অহল্যার সে কথায় কর্ণপাত করতো না শান্তা। লুকিয়ে লুকিয়ে সে এসে হাজির হতো হীরার বাড়িতে। এইজন্যে তাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে অহল্যার কাছে। কিন্তু সেই লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করেই সে তার এই অসমবয়সী বান্ধবীর কাছে পালিয়ে আসতো।

বড়পিসী অহল্যা বাঈয়ের কঠিন শাসন যখন কঠিনতর হতো, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনের বাগানে গিয়ে কাঁদতো সে।

এই বাগান থেকে তার বাবা পীতাম্বর সিংয়ের ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছোট শান্তা খোলা জানালাপথে তার বাবার দীর্ঘ দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হতো সে ছুটে চলে যায় তার বাবার কাছে। তাঁর কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট্ট দুটি হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বড়পিসীর অত্যাচারে কথা সব বলে দেয়।

কিন্তু সাহসে কুলোতো না তার। গম্ভীরমূর্তি পীতাম্বরের মুখের কঠিন মাংসপেশীর ওপর দৃষ্টি পড়লেই বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে থাকতো তার। আস্তে আস্তে খোলা জানালার কাছ থেকে সরে আসতো সে।

রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ পেছনে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পায় হীরা বাঈ। থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পায় সাদা প্যান্টের ওপর কালো কোট ও কালো টাই পরিহিত অ্যাডভোকেট সুন্দর সিং আদালত থেকে ফিরছে। তিরিশের কোঠায় বয়স। সুন্দর সুগঠিত চেহারা।

সুন্দর সিং নিকটে এসে হীরা বাঈকে নমস্কার করে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে কল্যাণ কামনা করে হীরা বাঈ।

তারপর দুজনেই আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

হীরা বাঈ জিজ্ঞেস করে—"নতুন ব্যবসা কেমন লাগছে তোমার?"

জবাব দেয় সুন্দর—"মন্দ নয়। তবে পসার না জমাতে পারলে এ লাইনে কিছুই নেই।"

উপদেশের ভঙ্গিতে হীরা বাঈ বলে—"পসার কি আর একদিনে হবে? লেগে থাকতে হবে, তবেই দেখবে একদিন সাফল্য আসবে।"—একটু থেমে আবার সে বলে—"তোমার বুদ্ধি আছে, অধ্যারসায় আছে। তুমি উন্নতি করতে পারবে।"

মৃদু হাসে সুন্দর সিং। কোন জবাব দেয় না।

সুন্দর সিং একসময় হীরা বাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"এদিকের খবর নিশ্চয়ই শুনেছেন।"

—"কোন্ খবরের কথা বলছো তুমি?"

—"বলছি শান্তা বাঈয়ের কথা।"

—'ও, যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে শান্তার বিয়ের কথা বলছো তুমি?"

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সুন্দর সিং। তারপর আবার বলে—"ঐ বুড়োটার সাথে শান্তার বিয়ে হওয়া মানে হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া।"

সুন্দর সিংয়ের মনোভাব যাচাই করবার জন্যে হীরা বাঈ জবাব দেয়—"না, যোগীন্দ্র সিংকে ঠিক বুড়ো বলা চলে না। বলতে পার, বয়স একটু বেশী।"

—"একটু বেশী মানে? বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশের কম নয় ওর বয়স। ধনী লোক, খায় দায় ভাল, তাই চেহারাটা এখনও ভালই আছে।"

একটু থামে সুন্দর সিং। তারপর আবার বলে—"আপনাকে বলতে বাধা নেই, ঐ লোকটাকে দেখলেই আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। স্রেফ পয়সার জোরে শান্তার মত একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে লোকটা?"

জবাব দেয় হীরা বাঈ—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।"

—"আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, শান্তা বাঈয়ের নিজের এঁই বিয়েতে মত আছে?"

ম্লান হাসি ভেসে ওঠে হীরা বাঈয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে—"তার মত অমতের তোয়াক্কা করে কে?"

—"হ্যাঁ, তা বটে।"—জবাব দেয় সুন্দর—"ঐ পিসীটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। পয়সার লোভেই মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে সে। যোগীন্দ্র সিং নাকি কথা দিয়েছে বিয়ের পর সে শুধুমাত্র দরবারকক্ষটার ওপরই সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবে না, উইল করে শান্তাকেই তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ওয়ারিসান করে দেবে।"

—"তাই নাকি?"—বিস্ময় প্রকাশ করে হীরা বাঈ।

—"হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনেছি।"

কথা বলতে বলতে প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হয় তারা। সুন্দর সিং হীরার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের পথে চলে যায়। আর হীরা বাঈ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে।

।। ৪ ।।

সশব্দে 'হিন্দু ম্যারেজ কোড' বইখানা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুন্দর সিং। তারপর হাতদুটো পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলতে থাকে—"না না, কোন উপায় নেই। ঐ শয়তানটার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই শান্তার।"

—"কিন্তু শান্তা নিজেই যদি এই বিয়েতে বেঁকে বসে?"—প্রশ্ন করে হীরা বাঈ।

—"হিন্দু আইন অনুযায়ী তার গার্জিয়ানেরা তাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারে।"—জবাব দেয় সুন্দর সিং।

—'বল কি? জোর করে?"

—"হ্যাঁ, জোর করে। কারণ শান্তা এখনও নাবালিকা। সাবালিকা হতে তার এখনও এক বছর বাকী।"

খানিক্ষণ চিন্তা করে একসময় হীরা বাঈ আবার প্রশ্ন করে—"এই একটা বছর কোনরকমে এই বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখা চলে না?"

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে হীরার সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর সিং। তার মুখের দিকে খানিক্ষণ

স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বলতে থাকে—"কী করে ঠেকিয়ে রাখবেন, বলুন? আজ যদি আমার টাকা থাকতো তো ঐ টাকা সেই শয়তানটার সামনে ফেলে দিয়ে..."

কথাটা সমাপ্ত না করেই থেমে যায় সুন্দর সিং। তারপর হঠাৎ যেন তার মনে পড়েছে এমনিভাবে জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা, আপনার বাড়িতে একটি ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক থাকেন না? কে তিনি?"

—"আমার এক বান্ধবীর ভাই। সরকারী চাকরি করে।"

—"সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। মনে হলো শান্তা বাঈয়ের বিয়ের ব্যাপারে ভদ্রলোক একটু ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছেন।"

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"তা হবে হয়তো। এমন একটা ব্যাপার যে শুনবে সেই ইন্টারেস্টেড না হয়ে পারবে না।"

—"তা বটে।"—জবাব দেয় সুন্দর সিং—"শুধু ইন্টারেস্টেড নয়, কথাবার্তায় মনে হলো ভদ্রলোক যেন একটু ঐ ব্যাপারে সক্রিয় হতে চাইছেন।"

—"কি জানি! চাকরি করতে এসে এ সমস্ত পারিবারিক ব্যাপারে কেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে শ্যামলাল ঠিক বুঝতে পারছি না।"—বলেই আবার অন্য কথায় চলে যায় হীরা বাঈ। বলে—"একটা উপায় বোধহয় এখনও আছে।"

পায়চারি থামিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে সুন্দর সিং—"কি উপায়?"

—"বিয়ের তো আর একটা দিন মাত্র বাকী। কাল বাদে পরশু বিয়ে। অহল্যা বাঈ যেমন বদমেজাজী একগুঁয়ে স্ত্রীলোক তাতে এই বিয়ে না ঘটিয়ে সে ছাড়বে না। আর ওদিকে যোগীন্দ্র সিং তো ওত পেতে বসে আছে। এই অবস্থায় যদি কিছু করণীয় থাকে তো একমাত্র পীতাম্বর সিংয়ের হস্তক্ষেপেই তা সম্ভব হতে পারে।"

—"পীতাম্বর সিং?"

—"হ্যাঁ, পীতাম্বর সিং নিজে।"

—"কিন্তু তাঁর যা অবস্থা তাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত মানসিক ধৈর্য কি তাঁর আছে?"

—"হ্যাঁ, তা একটা কথা বটে। তবে একবার চেষ্টা করে দেখা চলতে পারে। কি বল?"

সুন্দর সিং কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে কি যেন চিন্তা করতে থাকে। তারপর একসময় বলে—"আমার মনে হয় তার চেয়ে খোদ যোগীন্দ্র সিংয়ের কাছেই গিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে কেমন হয়?"

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"কিছুই হবে না। এমন জিনিস হাতে পেয়ে কিছুতেই তা ছেড়ে দিতে চাইবে না ঐ লোকটা।"

।।৫।।

পরের দিন বিকেলবেলা।

হঠাৎ খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো অহল্যা বাঈ—"তুমি আজ কিছুতেই কোথাও বেরোতে পারবে না, শান্তা।"

—"কেন, বড়পিসী? শান্ত কণ্ঠস্বর শান্তার।

—"কেন? তার কৈফিয়ত তোমার কাছে দিতে হবে আমাকে?

শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় শান্তা—"তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইছি না বড়পিসী। শুধুই জিজ্ঞেস করছি।"

—"কেনই বা জিজ্ঞেস করবে? তোমাকে যেতে বারণ করেছি তাই কি যথেষ্ট নয়?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তা। তার বড় বড় চোখদুটো ছাপিয়ে জল এসে পড়ে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকে অহল্যা বাঈ—"আজ বাদে কাল বিয়ে। চারিদিকে চিঠিপত্র বিলি করা হয়ে গেছে। এখন এই সন্ধ্যাবেলা মেয়ে চললেন ধেইধেই করে নাচতে নাচতে তার সোহাগের ছোট-পিসীর বাড়ি।"

ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক তাই। হীরা বাঈয়ের বাড়ি যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিল শান্তা।

নিজের মনেই গজগজ করতে থাকে অহল্যা বাঈ—"হীরার বাড়ি যাওয়া মানেই হচ্ছে আবার একটা ঘোঁট পাকিয়ে বিয়েটা পণ্ড করার চেষ্টা, তা কি আমি বুঝতে পারি না ভেবেছ? কিন্তু আমার নামও অহল্যা বাঈ, হীরাই বল আর সুন্দরই বল, কেউ এই বিয়ে বন্ধ করতে পারবে না, তা আমি বলে রাখছি। কাল তোমার বিয়ে হবেই। আর হবে ঐ যোগীন্দ্রের সঙ্গেই।"

একসঙ্গে চিৎকার করে অতগুলো কথা বলে হাঁপানি রোগীর মত হাঁপাতে থাকে অহল্যা বাঈ।

—"সুন্দর আর আমাকে আবার এর মধ্যে টেনে আনছো কেন দিদি? এমন কী প্রমাণ তুমি পেয়েছো যাতে বলতে পার যে বিয়েতে ভাংচি দেবার জন্যে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি?"—বলতে বলতে সুন্দর সিংয়ের সঙ্গে হীরা বাঈ এসে হাজির হয় সেখানে।

সুন্দর আর হীরাকে একসঙ্গে দেখে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে অহল্যা বাঈ। খনখনে গলায় আবার সে চেঁচিয়ে ওঠে —"ভেবেছো কি? আমি কিছু খবর রাখি না, না? এই বিয়ে বন্ধ করার জন্যে চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেছো তোমরা? আর সেই সঙ্গে জুটেছে কোথাকার একটা ছোকরা—রামলাল না শ্যামলাল কি যেন তার নাম"—একটু থামে অহল্যা বাঈ। তারপর দম নিয়ে আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—"তা তোমরা যত চেষ্টাই কর না কেন, এই আমি বলে রাখলাম বিয়ে কাল হবেই। তোমরা কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না।"

ঠিক এমনি সময় সেই চিরপরিচিত বন্ধ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল অনেকদিন পরে।

উপস্থিত সকলেই তাকিয়ে রইলো সেই দরজার দিকে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো এক দীর্ঘদেহ পুরুষ। প্রায় ছ'ফুট লম্বা শীর্ণ দেহটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। থমথমে গম্ভীরমুখ।

আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালেন পীতাম্বর সিং। তারপর পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে শান্তার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ডানহাতখানা আলতোভাবে শান্তার মাথার ওপর রেখে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"কী হয়েছে, মা?"

কথা বলতে পারে না শান্তা। তীব্র আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে পীতাম্বরের বুকের ওপর মাথা রাখে সে।

কন্যার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেন পীতাম্বর। তারপর হীরা বাঈয়ের মুখের

দিকে তাকিয়ে আবার সেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—"কী হয়েছে, হীরা?"

কম্পিতকণ্ঠে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"কাল শান্তার বিয়ে।"

—"কার সঙ্গে?"

—যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে।"

একটু সময় চুপ করে থেকে যোগীন্দ্র সিংয়ের পরিচয় মনে করতে চেষ্টা করেন পীতাম্বর সিং। তারপর আবার বলেন—'তা ভালই তো। অর্থবান ব্যক্তি। শান্তা বেশ সুখেই থাকবে তার কাছে।"

সমস্ত আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যায় হীরা ও সুন্দরের! আনন্দে চকচক করে ওঠে অহল্যার মুখমণ্ডল। একটা জয়ের হাসি জেগে ওঠে তার ওষ্ঠপ্রান্তে। মরিয়া হয়ে হীরা বাঈ বলে ওঠে—"কিন্তু যোগীন্দ্রের বয়স তো অনেক। চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে।"

হীরা বাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসেন পীতাম্বর। বোধহয় নিজের কথা মনে করেই তিনি হাসেন। মণি বাঈকে তিনি যখন বিয়ে করেন তখন তাঁর নিজের বয়সও চল্লিশের কম ছিল না। কিন্তু তাতে কি মণি অসুখী হয়েছিল?

পীতাম্বর সিংকে চুপ করে থাকতে দেখে সুন্দর সিং তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"তা'ছাড়া এ বিয়েতে শান্তার নিজের মত নেই।"

সুন্দরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অহল্যা তার খনখনে কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করে কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই পীতাম্বর সিং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অহল্যার দিকে তাকালেন। অহল্যার মত স্ত্রীলোকও সেই দৃষ্টির নীরব শাসনকে অবহেলা করতে পারে না। কিছু না বলেই চুপ করে থাকে সে।

শান্তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পীতম্বর সিং ডাকেন—"শান্তা মা!"

ধীরে ধীরে মাথা তুলে সজলনেত্রে পিতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকায় শান্তা।

পীতাম্বর সিং বলেন—"তোমার নিজের যদি ইচ্ছা না থাকে তবে এ বিয়ে হবে না।"

পীতাম্বরের কথায় আনন্দ ও নিরানন্দের বন্যা বয়ে যায় সেখানে। আশঙ্কায় চুপসে ওঠে অহল্যার মুখ। হীরা ও সুন্দরের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

একমূহূর্ত পিতার মুখের দিকে তাকায় শান্তা। সেই গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখে সে কী দেখতে চেষ্টা করে তা সেই জানে। তার কানের কাছে তখনও যেন বাজতে থাকে পীতাম্বরের সেই কিছুক্ষণ পূর্বের কথাটা—'তা ভালই তো। অর্থবান ব্যক্তি। শান্তা বেশ সুখেই থাকবে তার কাছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে শান্তা একবার তাকায় অহল্যার মুখের দিকে। সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনকারী চিরকুমারী অহল্যার মুখে একটা নীরব কাকুতি। কথা না বলে কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়েই সে যেন বলতে চাইছে—'আমার কথা শোন শান্তা। তোমাকে কোলেপিঠে করে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি আমি। আমি বলছি, যোগীন্দ্রকে বিয়ে করলে তোমার ভাল হবে, মঙ্গল হবে।'

ধীরে ধীরে পিতার দিকে তাকায় শান্তা। তারপর স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেয়—"আমার অমত নেই, বাবা।"

স্তব্ধ হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে হীরা বাঈ ও সুন্দর সিং।

পীতাম্বর সিং কন্যার মাথায় আর একবার হাত রাখেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন।

।। ৬।।

রাত তখন প্রায় বারোটা।

ঘুম আসে না হীরা বাঈয়ের। বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে থাকে শান্তার কথা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা নিজেই কিনা বিয়েতে মত দিয়ে বসলো! কিন্তু কেন? যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তার পর অনেক দিন শান্তা তার বাড়িতে এসেছে। সে বরাবরই লক্ষ্য করেছে শান্তার মুখে চোখে একটা নিরুপায়ের বেদনা মাখানো নীরব স্তব্ধতা। মুখরা অহল্যার হাত থেকে পরিত্রাণ না পাওয়ার বেদনা বলেই সে বরাবর ধরে নিয়েছে সেই নীরব স্তব্ধতাকে। তবে কেন এমন সুযোগ পেয়েও মেয়েটা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলো না? সেকি শুধু অহল্যার ভয়ে? কিংবা তাদের পরিবারটিকে আর্থিক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করার প্রেরণায়?

চিন্তা করে কোন সমাধানে পৌঁছতে পারে না হীরা বাঈ।

হঠাৎ নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে খট্ করে একটা শব্দ কানে আসে তার।

কান খাড়া করে থাকে হীরা বাঈ। মনে হচ্ছে যেন শ্যামলালের ঘর থেকেই আসছে শব্দটা।

কৌতূহলী হয়ে ওঠে হীরা বাঈ, বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না সে, ধীরে ধীরে পালঙ্ক ছেড়ে নেমে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, শ্যামলালই বটে। কিন্তু এত রাতে সে যাচ্ছে কোথায়? একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে নাকি?

কিন্তু কিছুই করতে পারে না হীরা বাঈ। স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার চোখের সামনে দিয়েই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় শ্যামলাল।

একমিনিট দু'মিনিট করে মিনিট দশেক কেটে যায়। হীরা বাঈ তখনও জানালার সামনে তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই চমকে ওঠে হীরা বাঈ। রাতে বাড়ি ফিরে এসে সে যখন শান্তার ব্যাপারটা বলছিল তখন শ্যামলালের মুখ থেকে মাত্র একটা কথা বেরিয়েছিল—'এ অবস্থায় খোদ যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা ছাড়া আর কোন উপায় তো দেখছি না।' তবে কি এই মধ্যরাতে সেই বোঝাপড়া করতেই গেল শ্যামলাল? কথাটা মনে হতেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে মনটা ভরে যায় তার। এত রাতে এখন সে কী করে? এই অল্প কিছুদিনেই সে বুঝতে পেরেছে যে শ্যামলালের বয়স অল্প হলেও ছেলেটি খুব সহজ নয়। একটু ডানপিটে গোছের স্বভাব। তা'ছাড়া শ্যামলালের কথাবার্তায় মনে হয় সে হয়তো শান্তাকে মনে মনে একটু পছন্দই করে। এই অবস্থায় শ্যামলাল যদি শান্তার ব্যাপারে কোন একটা কাণ্ড করে বসে তবে তার জবাবদিহি করতে হবে তাকেই। কারণ শ্যামলাল তার কাছেই থাকে।

এমনিধারা সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে জানালার পাশ থেকে সরে আসে হীরা বাঈ। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একমিনিট চিন্তা করে। তারপর দ্রুতহাতে পোশাক পালটে দরজা খুলে বাইরে চলে আসে।

একবার মনে হয় লছমীকে ডেকে সঙ্গে নেয়। আবার কী মনে করে লছমীর ঘরের দরজার সামনে থেকে ফিরে আসে। নাঃ একা যাওয়াই ভাল। এসব ব্যাপার পাঁচ কান করতে নেই।

কিন্তু এত রাতে একা একা বাইরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? সঙ্গে একটা অস্ত্রশস্ত্র কিছু নিলে ভাল হত না কি? বলা তো যায় না, রাস্তায় কতরকম বিপদ থাকতে পরে।

এমনিধারা চিন্তা করে দ্রুতপায়ে হীরা বাঈ চলে আসে শ্যামলাল যে ঘরে থাকে তার পাশের ঘরে। তার বাবার আমলে এই ঘরেই তাঁর অস্ত্রশস্ত্র থাকতো। এখনও সামান্য কিছু পুরোন দিনের ঢাল তলোয়ার আছে সেখানে। আর আছে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র —একটা পিস্তল আর একটা বন্দুক।

কিন্তু একি? ঘরের দরজা খোলা কেন? দরজার তালা চাবিই বা গেল কোথায়?

ধক করে ওঠে হীরা বাঈয়ের বুক। ত্রস্তপদে ঘরে ঢোকে সে।

পিস্তলটা তো ঐ চামড়ার খাপের সঙ্গে ঝুলোন রয়েছে। কিন্তু বন্দুকটা? বন্দুকটা কই?

হীরা বাঈ চিন্তা করতে চেষ্টা করে শ্যামলাল যখন বাইরে চলে যায় তখন তার হাতে কিছু ছিল কি না। কিন্তু মনে তখন তার সাংঘাতিক উত্তেজনা, তাই কিছুই মনে করতে পারে না সে।

অগত্যা আর সময় নষ্ট না করে পিস্তলটায় গোটাকয়েক বুলেট ভরে নিয়ে পিস্তলের সঙ্গে কড়ালাগানো দড়িটা কোমরে শক্ত করে বেঁধে নেয় হীরা বাঈ। তারপর পিস্তলটা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে বাইরে চলে আসে।

অন্ধকার রাত। জনমানবশূন্য রাস্তা। একটা কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে চলতে থাকে হীরা বাঈ রাজপ্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। কিন্তু সামনে কে যেন এই দিকেই আসছে না! হ্যাঁ, তাইতো। এত রাতে ওদিক থেকে কে আসছে আবার!

লোকটা প্রায় কাছে এসে পড়লো। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারে না হীরা বাঈ।

একমুহূর্ত চিন্তা করে রাস্তার পাশে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

কিন্তু একি? এ যে শ্যামলাল। কিন্তু শ্যামলাল অমনভাবে টলতে টলতে আসছে কেন? তবে কি তবে কি...

পাশ দিয়ে টলতে টলতে চলে যায় শ্যামলাল, তারপর একসময় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে হীরা বাঈ। শ্যামলাল নিশ্চয়ই বাড়ির দিকে গেছে। সেও কি তাকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে যাবে?

কিন্তু তার আগে যোগীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে একবার খোঁজ নিয়ে গেলে হতো না!

প্রাসাদের যে অংশে যোগীন্দ্র সিং তার চাকর রঘু অর্থাৎ: রঘুবীরকে নিয়ে থাকে সেখানে এখনও আলো জ্বলছে।

পায়ে পায়ে পেছনের বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ায় হীরা বাঈ। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই কোথাও, কিন্তু ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে।

বন্ধ জানালার কাঁচের শার্শির মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করতেই দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে হীরা বাঈয়ের। ভয়ংকর বীভৎস দৃশ্য।

সুদৃশ্য কাশ্মীরী কার্পেট মোড়া ঘরের মেঝের ঠিক মধ্যখানে কালো আবলুস কাঠের

একজোড়া টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর সামান্য কিছু কাগজপত্র ছড়ানো। চেয়ারের ওপর বসে দেহটাকে টেবিলের একপাশে হেলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে যোগীন্দ্র সিং। নিথর, নিস্পন্দ দেহ। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই সেই দেহে। মাথার একপাশে একটা গভীর ক্ষত। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে সমস্ত মুখখানাকে বীভৎস করে তুলেছে। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—যেন মৃত্যুর আগে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল যোগীন্দ্র সিং।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে হীরা বাঈয়ের দেহটা বারকয়েক থরথর করে কেঁপে ওঠে। কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটাগুলো বড় হয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে মুখ চোখ বেয়ে। পাদুটো যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাদের নড়াবার ক্ষমতাও যেন নেই তার। দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো অবশ হয়ে আসে হীরা বাঈয়ের।

হঠাৎ পেছনের ঝোপটা যেন নড়ে উঠলো বারকয়েক। সেই ঝোপের আড়ালে কার যেন পদধ্বনি শুনতে পায় সে।

এ অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই সংগত নয়। কেউ হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে এদিকে।

ভারী পাদুটোকে টেনে বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ায় হীরা বাঈ, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে হীরা বাঈ। চলতে চলতে স্থিরভাবে কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গেছে তার। অনেকটা 'নিশিতে পাওয়া' ব্যক্তির মত ছুটে চলেছে সে বাড়ির দিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেবল একটামাত্র চিত্র—যোগীন্দ্র সিংয়ের সেই ভয়ংকর বীভৎস মুখখানা।

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে হীরা বাঈ। বাড়ির সামনে এসে গেছে সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যামলাল।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে হীরা বাঈয়ের দিকে তাকিয়ে শ্যামলাল জিজ্ঞেস করে—"এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?"

কথার জবাব না দিয়ে তীব্রদৃষ্টিতে একবার শ্যামলালের মুখের দিকে তাকায় হীরা বাঈ, তারপর ঝড়ের বেগে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে নিজের ঘরে এসে হাজির হয়। দড়াম শব্দে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অবসন্নের মত পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ে সে।

মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা লাগছে হীরা বাঈয়ের। কোন কিছুই চিন্তা করতে ভাল লাগছে না তার। বালিশের ওপর মুখ গুঁজে কান খাড়া করে দেয়ালঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে থাকে সে, যেন এই মুহূর্তে গভীর মনোযোগ দিয়ে ঐ শব্দ শোনা ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই।

হঠাৎ বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসে হীরা বাঈ। তার পিস্তল? পিস্তলটা কোথায়?

কোমরে হাত দেয় হীরা বাঈ। পিস্তলটা যেখানে গোঁজা ছিল সেখানটা ফাঁকা। কেবল কোমরের সঙ্গে জড়ানো পিস্তলের দড়িটা কড়াসমেত ঝুলতে ঝুলতে তাকে ব্যঙ্গ করছে।

কড়া খুলে কোথায় পড়ে গেল পিস্তলটা? মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে হীরা বাঈ। কিন্তু নাঃ, কিছুই মনে পড়ছে না। এখন সে কী করবে? যাবে নাকি আবার পিস্তল খুঁজতে? না, কিছুতেই না। কিছুতেই সে আর ঐ বীভৎস দৃশ্যের সম্মুখীন হতে পারবে না।

তবে? শ্যামলালকে ডেকে বলবে নাকি তাকে সব কথা? কিন্তু তাতে কি কিছু ফল হবে?

শ্যামলাল কি বিশ্বাস করবে তার কথা?

এমনিভাবে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হীরা বাঈ কখন আবার বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তা সে নিজেই জানে না।

।। ৭।।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় হীরা বাঈয়ের।

ধড়মড় করে বিছানার ওপরে উঠে বসে সে। জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে তার বিছানায়।

বিছানায় বসে বসেই গত রাতের ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা মনে করতে চেষ্টা করে সে।

হঠাৎ তার নজর পড়ে টেবিলের ওপর পড়ে আছে তার পিস্তলের শক্ত দড়িটা। মুহূর্তে তার মাথাটা ঘুরে যায়। এখন তবে উপায়? এতক্ষণে হয়তো পুলিস এসে পড়েছে যোগীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে। হয়তো তারা কুড়িয়ে পেয়েছে তার পিস্তল।

বেশীক্ষণ চিন্তা করার সময় পায় না হীরা বাঈ। দরজার কড়াটা সমানেই শব্দ করতে থাকে।

তবে কি পুলিস এসে গেল তার বাড়িতে? ঐ পিস্তলের সূত্র ধরেই কি তারা তার খোঁজ করছে?

স্পন্দিতবক্ষে পালঙ্ক ছেড়ে নিচে নামে হীরা বাঈ। তারপর কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিতেই ঘরে প্রবেশ করে ঝি লছমী।

শুকনো মুখ লছমীর। চোখদুটো বিস্ফারিত।

লছমীকে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হীরা বাঈ।

হীরা বাঈয়ের একেবারে কাছে সরে এসে ফিসফিস করে লছমী বলে—"খবর শুনেছেন মাইজী?"

—"কি খবর?"—দুরুদুরু বক্ষে প্রশ্ন করে হীরা বাঈ।

—"যোগীন্দ্র সাহেব কাল রাতে খুন হয়েছেন।"

—"তাই নাকি?"—কৃত্রিম বিস্ময় হীরা বাঈয়ের কণ্ঠে।

—"হ্যাঁ মাইজী। এই একটু আগে আমাদের বাড়িতে পুলিস এসেছিল। শ্যামলাল সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেছে।"

পুলিশের নাম শুনেই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে হীরা বাঈয়ের মুখ। কিন্তু লছমীর কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করতে চেষ্টা করে সে।

মৃদুকণ্ঠে সে লছমীকে জিজ্ঞেস করে—"পুলিস এসে আর কিছু বলে গেছে?"

—"কী আর বলবে মাইজী! দরজার ওপর ঘা পড়তেই আমি খুলে দিই দরজা। সামনে তাকিয়ে দেখি পুলিস। আমি তো মাইজী ভয়েই কাঠ। মস্ত গোঁফওয়ালা একটা পুলিস আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—তোর মাইজী কোথায়? আমি জবাব দিলাম—এখনও ঘুমুচ্ছে। সেই গোঁফওয়ালা পুলিসটা খানিকক্ষণ কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—কাল রাতে যোগীন্দ্র সিং খুন হয়েছে, জানিস? আমি তো মাইজী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জানালাম যে আমি জানি না। তারপর সেই লোকটা আবার জিজ্ঞেস করে—তোদের

বাড়ির সেই শ্যামলাল ছোকরা ঘুম থেকে উঠেছে? আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শ্যামলাল সাহেবকে ডেকে দিলাম। তারপর শ্যামলাল সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কী সব কথাবার্তা বলে তাকে নিয়ে চলে গেল তারা।"

একসঙ্গে ফিসফিস করে এতগুলো কথা বলে লছমী জবাবের জন্যে তাকিয়ে থাকে হীরার মুখের দিকে।

চুপ করে থাকে হীরা বাঈ। তারপর একসময় বলে—"আচ্ছা, আমি দেখছি। তুই এখন যা।"

যেতে যেতে দরজার সামনে থেকে ফিরে আসে লছমী। হীরার সামনে দাঁড়িয়ে একবার সন্তর্পণে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে—"একটা কথা জিজ্ঞেস করব, মাইজী?"

—"বল।" ভ্রূ কুঞ্চিত করে জবাব দেয় হীরা বাঈ।

—"আচ্ছা মাইজী, কাল রাতে আপনি আর শ্যামলাল সাহেব কি বাইরে গিয়েছিলেন?"

ধক্ করে ওঠে হীরা বাঈয়ের বুক। লছমী কি ব্যাপারটা টের পেয়েছে নাকি? নিজেকে সামলে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে জবাব দেয়—"কেন? এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

হীরা বাঈয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে এমনি একটা মুখের ভঙ্গি করে জবাব দেয় লছমী—"না, মাইজী। আজ সকালে আপনার ও শ্যামলাল সাহেবের জুতোয় ভিজে ঘাস লেগেছিল কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

—"ভিজে ঘাস?—চমকে ওঠে হীরা বাঈ। মনে মনে সে ভাবে— মেয়েটা তো সাংঘাতিক চালাক। জুতোর সঙ্গে লেগে থাকা ভিজে ঘাস পর্যন্ত নজর এড়ায়নি তার।

জবাব দেয় হীরা বাঈ—"তোর অতশত খবরে দরকার কী? তুই তোর কাজে যা।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় লছমী।

একা দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকে হীরা বাঈ—এখন তার কর্তব্য কী? যোগীন্দ্র সিংয়ের বাড়ি একবার যাবে সে? কিন্তু সেই বিভীষিকার রাজত্বে আর যেতে ইচ্ছা করে না তার। কিন্তু না গেলেও হয়তো কেউ কোন সন্দেহ করতে পারে। অবশেষে সেখানেই যাওয়া সাব্যস্ত করে সে।

রাজপ্রাসাদের যে অংশে যোগীন্দ্র সিং থাকতো সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে হীরা বাঈ দেখে তার আগে অনেকেই এসে হাজির হয়েছে সেখানে।

যোগীন্দ্রের কক্ষের দরজার সামনে পুলিস কনস্টেবল মোতায়েন। একটা সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদেহটা ঢাকা।

পাশের কক্ষে এসে হাজির হয়েছে সুন্দর সিং, শ্যামলাল, যোগীন্দ্রের চাকর রঘুবীর এবং আর একজন ভদ্রলোক, যাকে হীরা বাঈ আগে কখনও দেখেনি। ওপাশে ম্লানমুখে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে অহল্যা বাঈ। একমাত্র পীতাম্বর সিং ও তাঁর মেয়ে শান্তা সেখানে অনুপস্থিত।

হীরা বাঈকে দেখে পুলিস অফিসার জীবনলাল বলে ওঠে —"এই যে আপনি এসে পড়েছেন। আপনাকে ডাকতেই আবার লোক পাঠাব ভাবছিলাম।"

হীরা বাঈ অহল্যার অদূরে একটা চেয়ার অধিকার করে বসে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে জীবনলালের সামনের টেবিলের ওপর। চমকে ওঠে সে। টেবিলের ওপর রয়েছে তারই সেই হারিয়ে যাওয়া বন্দুকটা।

জীবনলাল তার রুক্ষ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস

করে—"তোমার সাহেবকে কাল শেষ কখন তুমি দেখেছো, রঘুবীর?"

যোগীন্দ্র সিংয়ের বহুদিনের ভৃত্য রঘুবীর তার মনিবের কথায় হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। ছোটবেলা থেকে সে যোগীন্দ্রের সঙ্গে আছে। তাই মনিবের এমন অকাল অপমৃত্যুতে বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধরাগলায় রঘুবীর জবাব দেয়—"তখন বোধহয় রাত প্রায় বারোটা।"

—"সাহেব তখন কী করছিলেন?"

—"নিচের ঘরে বসে কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন।"

—"তোমাকে কি ডাকলেন তিনি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কী বললেন?"

—"বললেন, রঘু, কাল বিয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক করেছিস তো? আমি জবাব দিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্তই ঠিক আছে। সাহেব তখন আবার বললেন—তবে যা, তুই গিয়ে শুয়ে পড়। আমার একটু কাজ আছে, শুতে দেরি হবে।"

—"তুমি তখন গিয়ে শুয়ে পড়লে?"—জিজ্ঞেস করে পুলিস অফিসার জীবনলাল।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তখন তোমার সাহেবের কাছে কেউ ছিল?"

রঘুবীর একবার সুন্দর সিংয়ের দিকে তাকায়। তারপর একটা ঢোক গিলে জবাব দেয়—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই সাহেব তখন বসে ছিলেন সেখানে।"

জীবনলাল একনজরে সুন্দর সিংকে দেখে নেয়। তারপর রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে—"ইনি তখন তোমার সাহেবের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছিলেন?"

—"বিয়ের ব্যাপার নিয়ে।"

—"বিছানায় শুয়ে তুমি আর কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?"

—"না।"

—"তারপর কখন তুমি টের পেলে তোমার সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে?"

—"আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সাহেবের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে আমার সন্দেহ হয়। ঘরে ঢুকে দেখি সাহেব..." বলতে বলতে রঘুবীর ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বরের মধ্যে বাকি কথাটা ডুবে যায়।

।। ৮ ।।

পুলিস অফিসার জীবনলালের প্রশ্নে সুন্দর সিং বলতে থাক—"তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। হঠাৎ যোগীন্দ্র সিং টেলিফোনে আমাকে ডেকে বললে যে সে নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বিশেষ জরুরী দরকার। আমি যেন দেরি না করে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। শরীরটা কাল তেমন ভাল ছিল না আমার। তাই এখানে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল।"

এই সময় জীবনলাল তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করে—"তখন রাত ক'টা?"

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় সুন্দর সিং—"বারোটা বাজতে সামান্য কিছু বাকী ছিল

তখন।"—বলেই সে আবার বলে যেতে থাকে—"যোগীন্দ্র সিং ঐ ঘরেই বসে ছিল তখন। আমি ঘরে ঢুকতেই একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি কেন এসেছি তার কাছে। আমি তো একেবারে থ। বললাম—আপনিই তো আমাকে টেলিফোনে ডেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। মাথা নেড়ে যোগীন্দ্র সিং জানায় সে আমাকে কখনই টেলিফোন করেনি। ভাবলাম কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে রসিকতা করে থাকবে। যাই হোক যখন এসে পড়েছি তখন যোগীন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে একটু কথাবার্তাই বলে যাই। এই ভেবে তার উলটোদিকের চেয়ারে বসে কথা বলতে লাগলাম তার সঙ্গে।"

এই সময় একটু থামে সুন্দর সিং, তারপর একবার অদূরে উপবিষ্ট অহল্যা বাঈয়ের দিকে তাকিয়ে আবার বলে যেতে থাকে—"সত্যি কথা বলতে কি, কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হয়েই পড়েছিলাম আমি।"

—"আপনি কী বলছিলেন তাঁকে।"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

—"যাতে এই বিয়ে না হয় সেইজন্যেই অনুরোধ করছিলাম তাকে।"

গম্ভীর মুখে জীবনলাল আবার প্রশ্ন করে—"এই বিয়ে হওয়া না হওয়াতে আপনার কী স্বার্থ?"

একটা ঢোক গিলে বলতে থাকে সুন্দর সিং—"এমন কিছু নয়। অমন সুন্দর মেয়েটার বিয়ে হবে ঐ প্রৌঢ় যোগীন্দ্রের সঙ্গে..."

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সুন্দর সিং।

—"শুধু কি তাই?"

—"তা'ছাড়া আর কী বলুন?"

—"যাক্, সেসব পরে হবে। এখন বলুন যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে কখন আপনি বাইরে এলেন?"

জবাব দেয় সুন্দর সিং—"তখন বোধহয় বারোটা বেজে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সেই বড় দীঘির পাড় পর্যন্ত গেছি আমি, হঠাৎ শুনলাম পেছনে গুলির শব্দ। মনে হলো শব্দটা রাজপ্রাসাদের যোগীন্দ্র সিংয়ের অংশ থেকেই যেন ভেসে এলো। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটলাম সেইদিকে। যোগীন্দ্র সিংয়ের কক্ষের দরজা খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই আমি দেখতে পেলাম টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ।"

—"তারপর?"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

—"আমার মনে হলো আততায়ী বোধহয় পাশের খোলা জানালা দিয়েই তাকে গুলি করেছে। এই কথা ভেবে ঘুরে সেই জানালার পাশের বাগানে গেলাম আমি।"

—"সেখানে গিয়ে কী দেখলেন?"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

—"দেখলাম বাগানের মধ্যে একটা চাঁপাফুলগাছের নিচে পড়ে আছে ঐ বন্দুকটা, আর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ শ্যামলাল।"

—"আপনি শ্যামলালকে দেখে কী করলেন?"

—"শ্যামলালকেই হত্যাকারী ভেবে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। কিন্তু ওর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, ওর সঙ্গে আমি পারবো কেন?

শ্যামলাল একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলে আমার মুখের ওপর। মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম আমি।"

—"তারপর কখন জ্ঞান হলো আপনার?"

—"বোধহয় তখন শেষ রাত। জ্ঞান হতেই দেখি শ্যামলাল নেই। সেই বন্দুকটা পাশে পড়ে আছে। তখন ভয় হলো আমার। এ অবস্থায় আমাকে কেউ এখানে দেখলে আমাকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করতে পরে। তাই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে বাড়ি চলে গেলাম।"

সুন্দর সিং থামতেই পুলিস অফিসার জীবনলাল শ্যামলালের দিকে একটু বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"তারপর, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, আপনার কী বলার আছে?"

শ্যামলালের মুখ বিষণ্ণ-গম্ভীর। ধীরে ধীরে বলতে থাকে সে— "রাত তখন প্রায় বারোটা। একটু বিশেষ কারণে যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম আমি। প্রাসাদের প্রায় কাছেই এসে পড়েছি। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলাম। বাগানের পথ দিয়েই দৌড়ে এলাম আমি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যোগীন্দ্র সিংয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে। বাগানের পথে ঘরে ঢোকবার কোন দরজা নেই, তাই ঘুরে সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার জন্যে বাগানে পা দিতেই ঐ চাঁপাফুলগাছটার নিচে দেখতে পেলাম এই বন্দুকটা পড়ে আছে। মনে হলো আততায়ী এই বন্দুকটা দিয়েই যোগীন্দ্রকে হত্যা করেছে। দাঁড়িয়ে ভাবছি এই বন্দুকটা নিয়ে এখন কী করা যায়, ঠিক এমনি সময় ঐ সুন্দর সিং এসে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। দুজনে মল্লযুদ্ধ করতে করতে মাটিতে পড়ে যেতেই সুন্দর সিংয়ের মুখের ওপর একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সরে পড়ি আমি।"

শ্যামলাল থামতেই জীবনলাল প্রশ্ন করে—"এরকম একটা সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড দেখেও সেখানে থেকে চুপি চুপি সরে পড়লেন কেন আপনি?"

জবাব দেয় শ্যামলাল—"কারণ এই যে ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখলে আমাকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করবে।"

—"আচ্ছা বলুন তো, অত রাত্রে যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন ছিল?"

—"ব্যক্তিগত।"—জবাব দেয় শ্যামলাল।

—"আপনি যোগীন্দ্রকে আগে চিনতেন?"

—"না, এখানে এসে চিনেছি তাকে।"

হীরা বাঈয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে থেমে যায় শ্যামলাল। হীরা বাঈ মনে মনে ভাবতে থাকে—সুন্দর সিং কিংবা শ্যামলাল এ দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন হত্যাকারী। শ্যামলালের জবানবন্দি তার সত্যি বলে মনে হয়। সুন্দর সিংয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পরিশ্রান্ত হয়েই টলতে টলতে শ্যামলাল বাড়ি ফিরছিল। হীরা বাঈ তা স্বচক্ষে দেখেছে। কিন্তু সে যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কেন? তার মনে হয়েছিল যোগীন্দ্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যেই গভীর রাতে সে গিয়েছিল তার কাছে। কিন্তু ঐ বন্দুকের রহস্য! তার বাড়ির বন্দুক এখানে এলো কী করে? তার পরিষ্কার মনে আছে দিন তিনেক মাত্র আগে বন্দুকটা একবার চেয়ে নিয়েছিল সুন্দর সিং এবং সেদিন রাতেই সে সেটা ফেরত দিয়েছিল তাকে। এমনি মাঝে মাঝেই শিকার করবার জন্যে সুন্দর সিং ঐ বন্দুকটা চেয়ে নেয় তার কাছ থেকে। খুব শিকারের ঝোঁক তার।

ভয়ে, ভাবনায় শুকিয়ে ওঠে হীরা বাঈয়ের মুখ। যখন প্রমাণিত হবে ঐ বন্দুকের মালিক হচ্ছে সে নিজে, তখন? সে কী জবাব দেবে?

পুলিস অফিসার জীবনলাল পুলিসী কায়দায় একটা মুখভঙ্গি করে পকেট থেকে একটা

লালরঙের কার্তুজের খোল বের করে টেবিলের ওপর রাখে। তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে —"এই কার্তুজের খোলটা পড়ে ছিল বন্দুকটা থেকে একটু দূরে ঝোপের মধ্যে।" তারপর আলতোভাবে বন্দুকটাকে তুলে ধরে সে আবার বলে—হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ রয়েছে এই বন্দুকের ওপর। সুতরাং আশা করছি তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না। এবার আপনারা বলুন এই বন্দুকটা কার।"

সবাই নীরব। হীরা বাঈয়ের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে। চঞ্চলদৃষ্টিতে সে একবার সুন্দর সিংয়ের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সুন্দরের মুখ তখন গম্ভীর।

বন্দুকটাকে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে জীবনলাল সেই অপরিচিত ব্যক্তিটির মুখের দিকে তাকায়। তারপর জিজ্ঞেস করে—"আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

শিশুসুলভ কণ্ঠস্বর এই লোকটির। বয়স যদিও প্রায় পঁয়তিরিশ বছর কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় যেন আট-দশ বছরের একটি ছেলে কথা কইছে। জীবনলালের প্রশ্নে সেই ভদ্রলোকটি জবাব দেয়—"আমার নাম মহেন্দ্র সিং। আমি হচ্ছি যোগীন্দ্র সিংয়ের ছোটভাই।"

—"আপনি কি এখানে থাকেন?"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

—"আজ্ঞে না। আমি বিদেশে থাকি। মাত্র কাল সকালে আমি এসেছি দাদার বিয়ের চিঠি পেয়ে।"

—"আপনি কি যোগীন্দ্র সিংয়ের আপন ভাই?"

—"আজ্ঞে না, খুড়তুতো ভাই।"

—"আপনি কাল রাতে কোথায় শুয়েছিলেন? রাতে কোন গুলির শব্দ শুনেছিলেন?"

—"আমি একেবারে বাড়ির ভেতরদিকে শুয়েছিলাম। পাশের ঘরেই ঘুমিয়েছিল রঘুবীর। ঐ ঘরগুলো এমনভাবে তৈরী যে দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরের কোন শব্দই শুনতে পাওয়া যায় না।"

—"আচ্ছা আপনি কি জানেন আপনার দাদা কোন উইল তৈরী করেছিলেন কি না?"

—"হ্যাঁ, করেছিলেন। তাতে তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিনি আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"সেই উইল কি আপনার দাদার কাছেই ছিল?"

—"হ্যাঁ। তবে কাল সন্ধ্যায় দাদার মুখে শুনেছিলাম যে সেটা নাকি কিছুদিন আগে হারিয়ে গেছে।"

—"তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ।"

—"তা'ছাড়া আপনার দাদা কি আর কোন উইল করেছিলেন?"

মহেন্দ্র সিং একবার অহল্যা বাঈয়ের মুখের দিকে তাকায়, তারপর জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তিনি নাকি আর একটা উইল করেছিলেন সম্প্রতি।"

—"তাতেও কি তিনি আপনাকেই সবকিছু দিয়ে গিয়েছিলেন?"

—"না।"

—"তবে?"

—"তাঁর ভাবী বধূ শান্তা বাঈকেই নাকি তিনি সব দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ উইল তৈরি করবার ব্যাপারে নাকি তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন এই অহল্যা বাঈ।"

—"এই দ্বিতীয় উইলের কথা আপনি কার কাছে জানতে পারলেন?"

—"কাল সন্ধ্যাবেলা দাদার নিজেরই মুখে।"

—"তা'হলে এই দ্বিতীয় উইলটা নিশ্চয় আপনার দাদার আলমারিতে আছে?"

—"তা' বলতে পারি না।"

এতক্ষণ সাধারণভাবেই কথাবার্তা বলছিল জীবনলাল। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে গেল। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বললে—"কাল রাত এগারোটা নাগাদ আপনি চুপিচুপি আপনার দাদার ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন কেন?"

চমকে ওঠে মহেন্দ্র সিং। কোন কথা না বলে সে চুপ করে থাকে।

—"বলুন!"—তীব্র কণ্ঠস্বর জীবনলালের।

মাথা নিচু করে জবাব দেয় মহেন্দ্র সিং—ঐ দ্বিতীয় উইলটার খোঁজে।"

—"কেন?"

আবার চুপ করে থাকে মহেন্দ্র সিং।

জীবনলাল বলতে থাকে—"আমি যদি বলি ঐ প্রথম উইলটা আপনিই লুকিয়ে রেখেছেন এবং আপনি কাল রাতে আপনার দাদার ঘরে ঢুকে ঐ দ্বিতীয় উইলটা নিয়ে এসে নষ্ট করে দিয়েছেন, তারপর যোগীন্দ্র সিংয়ের ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছেন।"

ভয়ে সাদা হয়ে ওঠে মহেন্দ্র সিংয়ের মুখ। মৃদুকণ্ঠে সে কেবল উচ্চারণ করে—"তাতে আমার লাভ?"

ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে জীবনলাল বলে—"অতি সোজা। আপনি এরপর ঐ প্রথম উইলটা কোর্টে দাখিল করে প্রমাণ করবেন যে দ্বিতীয় উইলের কথা একেবারেই মিথ্যে। আপনার দাদা একটা মাত্র উইলই তৈরি করেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে ঐ প্রথম উইলটা।"

একেবারে ভেঙে পড়ে মহেন্দ্র সিং। কম্পিতকণ্ঠে সে বলতে থাকে—"বিশ্বাস করুন, দ্বিতীয় উইলটা নষ্ট করে ফেলার জন্যে সত্যিই কাল রাতে আমি দাদার ঘরে ঢুকেছিলাম,কিন্তু আমি সেটা হাতে পাইনি। তাছাড়া প্রথম উইলটাও আমি লুকিয়ে রাখিনি। দাদার হত্যার ব্যাপারেও আমি কিছুই জানি না।"

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। হত্যাকারী কে? মহেন্দ্র সিং, শ্যামলাল, না সুন্দর সিং? হত্যার উদ্দেশ্য কী? শান্তার সঙ্গে যোগীন্দ্রের বিয়ে বন্ধ করা, না উইল সংক্রান্ত বিষয়? ভাবতে থাকে জীবনলাল—এক্ষেত্রে মোটিভের ওপর নির্ভর করেই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে হবে। মোটিভ যদি হয় উইল সংক্রান্ত বিষয় তবে বুঝতে হবে মহেন্দ্র সিং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আর যদি দেখা যায় হত্যার মোটিভ হচ্ছে বিয়ে বন্ধ করা, তবে বুঝতে হবে শ্যামলাল কিংবা সুন্দর সিং জড়িত রয়েছে এই ব্যাপারে।

।। ৯।।

পুলিশ অফিসার জীবনলাল যোগীন্দ্র সিং হত্যারহস্যকে যতটা জটিল মনে করেছিল দিন তিনেকের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে ব্যাপারটা তার চেয়ে বহুগুণ জটিল। পরের দিন একটা খবরে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলো জীবনলাল। সেই বাগানের মধ্যে পড়ে থাকা বন্দুকটায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল সেই ছাপগুলো সুন্দর সিংয়ের আঙুলের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

মার্ডার কেসে মৃতদেহের কাছ থেকে একটু দূরে বাগানের মধ্যে পাওয়া গেল একটা বন্দুক, যা দিয়েই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আবার সেই বন্দুকের ওপর পাওয়া গেল এমন এক ব্যক্তির আঙুলের ছাপ যে নাকি নিহত ব্যক্তিকে মোটেই পছন্দ করতো না। শুধু তাই নয়, সেই ব্যক্তির গতিবিধিও খুব সন্দেহজনক। সুন্দর সিং যোগীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্যে যে ঘটনার অবতারণা করেছিল তার সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অত রাতে কে তাকে টেলিফোনে প্রতারণা করতে যাবে? শুধু তাই নয়, হত্যার অব্যবহিত পূর্বে একমাত্র সুন্দর সিংকেই দেখা গিয়েছিল যোগীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে তীব্র ভাষায় বাদানুবাদ করতে। তা'ছাড়া বিয়ে বন্ধ করার ব্যাপারে সুন্দর সিংয়ের যে কী স্বার্থ থাকতে পারে তাও বিশেষ স্পষ্ট নয়। এমন অবস্থায় জীবনলাল যদি সুন্দর সিংকেই হত্যার অপরাধে সন্দেহ করে তবে তাকে তেমন দোষ দেওয়া চলে না।

রাজপ্রাসাদের যে অংশে সুন্দর সিং বাস করে সেখানে এসে উপস্থিত হয় জীবনলাল।

জীবনলাল সুন্দরকে জিজ্ঞেস করে—"বাগানের মধ্যে যে বন্দুকটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা আপনি আগে কখনও দেখেননি?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দেয় সুন্দর সিং—"না।"

একটা মৃদু হাসি ভেসে ওঠে জীবনলালের ওষ্ঠপ্রান্তে। সে আবার বলতে থাকে—"কিন্তু আপনার বোধহয় জানা নেই যে ঐ বন্দুকের ওপর যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গে আপনার আঙুলের ছাপ হুবহু মিলে গেছে।"

চমকে ওঠে সুন্দর সিং। জীবনলালের কথার জবাব না দিয়ে সে চুপ করে থাকে।

—"কি, জবাব দিচ্ছেন না যে?"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

সুন্দর সিং মাথা তুলে একবার জীবনলালের দিকে তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করে।

—"কি, আপনি কিছু বলবেন না?—বলেই একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে—"বেশ, আপনি না বললেও আমিই সব বলছি।—সেদিন রাতে ঐ বন্দুক দিয়ে যোগীন্দ্র সিংকে হত্যা করেছেন আপনি। তারপর বন্দুকটা সেখানে ফেলে রেখে আপনি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হয়তো শ্যামলাল আপনাকে দেখে ফেলে। তাই তাকে আক্রমণ করেছিলেন। তখন বোধহয়..."

জীবনলালকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সুন্দর সিং—"মিথ্যে...মিথ্যে কথা। আমি যোগীন্দ্র সিংকে হত্যা করিনি।"

—"তবে বলুন, বন্দুকের ওপর আপনার অঙুলের ছাপ এলো কী করে?"

শান্তকণ্ঠে এবার জবাব দেয় সুন্দর সিং—"বন্দুকটা আমি ব্যবহার করতাম।"

—"আপনি ব্যবহার করতেন? এটা কি তবে আপনার বন্দুক?"

—"না। তবে এটা আমি মাঝে মাঝেই ব্যবহার করে থাকি।"

—"কিসের জন্যে ব্যবহার করেন?"

—"শিকারের জন্যে।"

—"বেশ, তাই যদি হয় তবে এবার বলুন বন্দুকটার মালিক কে।"

একটু ইতস্তত করতে থাকে সুন্দর সিং। তারপর একসময় বলে ফেলে—"মালিক হচ্ছে হীরা বাঈ।"

—"হীরা বাঈ?"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর জীবনলালের।

—"হ্যাঁ, হীরা বাঈ।"

—"তবে, সেকথা আমাকে আগে বলেননি কেন?"

একটু চিন্তা করে সুন্দর সিং জবাব দেয়—"হীরা বাঈকে এ ব্যাপারে জড়াতে চাইনি আমি।"

—"হুঁ" বলে মুখে একটা শব্দ করে জীবনলাল বলে—"বেশ, তবে আমার সঙ্গে একবার হীরা বাঈয়ের বাড়িতে চলুন।"

পুলিস অফিসার জীবনলালের সঙ্গে সুন্দর সিংকে দেখে হীরা বাঈ চমকে ওঠে। দুরুদুরু বক্ষে সে জীবনলালের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

জীবনলাল প্রশ্ন করে—"সেদিন বাগানে যে বন্দুকটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা কি আপনার?"

সরাসরি জীবনলালের এই প্রশ্ন। তার সঙ্গে সুন্দর সিংয়ের উপস্থিতি। হীরা বাঈ বুঝতে পারে সুন্দর সিং ইতিমধ্যে তাকে সব কথা বলে দিয়েছে। তাই কিছু গোপন করতে চেষ্টা না করে সে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, আমার।"

—"সুন্দর সিং কি এটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন?"

—"হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতেন শিকারের জন্যে।"

—"কবে উনি এটা শেষ ব্যবহার করেছেন?"

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"দিন চারেক মাত্র আগে।"

—"তারপর তিনি আপনাকে সেটা ফেরত দিয়েছিলেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"আপনার স্পষ্ট মনে আছে, আপনি বন্দুকটা ফেরত পেয়েছিলেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"আচ্ছা, বন্দুকটা কোথায় রাখতেন আপনি?"

—"আমার বাবার আমলে যে ঘরে বাবার অস্ত্রশস্ত্র থাকতো সেই ঘরে।"

—"ঘরটা একবার দেখাবেন কি আমাকে?"

জীবনলাল ও সুন্দর সিংকে নিয়ে হীরা বাঈ সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। একনজরে ঘরটা দেখে নিয়ে জীবনলাল জিজ্ঞেস করে—"আপনি জানতেন যে বন্দুকটা ঘরে নেই?"

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"মাত্র কাল রাতে টের পেয়েছি বন্দুকটা চুরি হয়ে গেছে।"

—"তখন রাত কটা?"

—প্রায় বারোটা।"—কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু সাবধান হয়ে যায় হীরা বাঈ। সে বুঝতে পরে 'রাত বারোটা' বলা মানেই হলো তাকে আরও বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যে কথা বলে ফেলেছে তা আর ফেরত নেওয়ার উপায় নেই। তাই সে চুপ করে জীবনলালের পরের প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। জীবনলাল আবার জিজ্ঞেস করে—"এই পাশের ঘরে কে থাকে?"

—"শ্যামলাল।"

—"আপনি যখন বন্দুকের খোঁজে এখানে এলেন তখন শ্যামলাল ঘরে ছিল?"

—"না।"

—"কোথায় গিয়েছিল, জানেন?"

—"আজ্ঞে না।"

—"আপনি দেখলেন দরজার তালা খোলা। বন্দুক নেই। তাই না?"

—"হ্যাঁ।"

—"আপনার কি মনে হয়েছিল যে শ্যামলাল বন্দুকটা নিয়ে যেতে পারে?

দোটানায় পড়ে যায় হীরা বাঈ। সুন্দর সিংকে বাঁচাতে হলে সত্যি কথা বলতে হয়, আবার সত্যি বললে শ্যামলাল বিপদে পড়ে।

হীরা বাঈকে চুপ করে থাকতে দেখে জীবনলাল একটু তাড়া দেয়—"আমার কথার জবাব দিন।"

—"হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়েছিল আমার।"

—"আপনি শ্যামলালকে বন্দুক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

—"হ্যাঁ, আজই সকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

—"সে কী জবাব দিল?"

—"বললে—সে বন্দুক সম্বন্ধে কিছুই জানে না।"

—"আপনার বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে থাকে?"

—"একটা ঝি আছে।"

বন্দুকের ওপর আঙুলের ছাপের সঙ্গে সুন্দর সিংয়ের আঙুলের ছাপ মিলে যাওয়ায় যে আনন্দ হয়েছিল জীবনলালের, হীরা বাঈয়ের কথাবার্তায় সে আনন্দ বহুলাংশে মিইয়ে যায় তার। হীরা বাঈয়ের কথা যদি সত্যি হয় তো বন্দুকের ওপর সুন্দরের আঙুলের ছাপ থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

তবে একটা কথা, যে লোক বন্দুকটা চুরি করলো কিংবা যে ওটা দিয়ে যোগীন্দ্র সিংকে হত্যা করলো তার আঙুলের ছাপ তো বন্দুকটার ওপর থাকার কথা। তবে? তবে কি হীরা বাঈ মিথ্যা বলছে?

পরের দিন সকালে পুলিস অফিসার জীবনলাল এমন দুটো খবর পেল যা পেয়ে সে সাংঘাতিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো।

প্রথম খবরটা হচ্ছে এই যে যোগীন্দ্র সিংয়ের মৃতদেহ যে ঘরে পড়েছিল সেই ঘরের টেলিফোন রিসিভারের ওপর যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গে শান্তা বাঈয়ের আঙুলের ছাপ মিলে গেছে।

প্রথমে সে টেলিফোন রিসিভারের ওপর কোন আঙুলের ছাপ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু যোগীন্দ্র সিংয়ের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন রাতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে লোকটি ডিউটিতে ছিল, সে একটি মূল্যবান খবর দেয়—রাত তখন নাকি প্রায় বারোটা বেজে দশ মিনিট। এমন সময় যোগীন্দ্র সিংয়ের ঘরের টেলিফোন তুলে নাকি নারীকণ্ঠে কেউ বলে—প্লীজ পুট মী...। কিন্তু নম্বরটা না বলেই নাকি রিসিভারটা রেখে দেওয়া হয়।

খবরটা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে জীবনলাল। এই ব্যাপারে মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক জড়িত—অহল্যা বাঈ, হীরা বাঈ ও শান্তা বাঈ। তাই ঐ তিনটি স্ত্রীলোকেরই আঙুলের ছাপ সে পাঠিয়ে দেয় টেলিফোন রিসিভারের ওপরের আঙুলের ছাপের সঙ্গে তুলনা করবার জন্যে।

কিন্তু জীবনলাল ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি যে শান্তার সঙ্গেই ঐ আঙুলের ছাপ মিলে যাবে।

দ্বিতীয় খবরটা কিন্তু আরও বিভ্রান্তিকর। ব্যালাসটিক এক্সপার্ট জানিয়েছেন, যে কার্তুজের

খোলটা সেই বাগানে ঝোপের আড়ালে পাওয়া গিয়েছিল সেটা নাকি ঐ বন্দুক থেকে ছোঁড়া হয়নি।

আশ্চর্য ব্যাপার! একটার বেশী গুলি ছোঁড়া হয়নি সেদিন। আর সেই বন্দুকটার পাশে ঐ একটা মাত্র কার্তুজের খোলই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখন ব্যালাসটিক এক্সপার্ট যখন জানাচ্ছেন যে ঐ বন্দুক থেকে ঐ কার্তুজ ছোড়া হয়নি তখন জীবনলালের সমস্ত সূত্রগুলি একসঙ্গে জট পাকিয়ে যায়।

বিভ্রান্ত জীবনলাল এসে হাজির হয় পীতাম্বর সিংয়ের বাড়ি।

বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে ডেকে পাঠায় সে শান্তা বাঈকে।

ম্লানমুখে ধীর পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হয় শান্তা বাঈ।

শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় জীবনলাল চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। এমন রূপ কি কোন মানুষের দেহে সম্ভব? এ যেন তিলোত্তমা। বিশ্বের সৌন্দর্যভাণ্ডার খুঁজে সেরা উপাদানগুলি সংগ্রহ করে যেন বিধাতা এই নারীকে সৃষ্টি করেছেন!

জীবনলালের ঐ দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে ওঠে শান্তা বাঈ। জীবনলাল একটু লজ্জিত হয়। তারপর সে তাকে প্রশ্ন করে—"তোমাকে মা দু'চারটা প্রশ্ন করব। আশা করি সত্যি জবাব দেবে তুমি।"

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় শান্তা বাঈ।

—"আচ্ছা, যোগীন্দ্র সিং যেদিন নিহত হন সেদিন কি তুমি কোন কারণে তাঁর কাছে গিয়েছিলে?"

চঞ্চলদৃষ্টিতে জীবনলালের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই মাথা নিচু করে থাকে শান্তা।

—"বল, মা, সত্যি কথা বল। কোন ভয় নেই তোমার।"

মুখে শব্দ না করে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় শান্তা বাঈ।

—"কেন গিয়েছিলে বলবে কি?"—প্রশ্ন করে জীবনলাল।

—"একটু প্রয়োজন ছিল।"—শান্তা জবাব দেয়।

—"সেই প্রয়োজনটাই তো জানতে চাইছি আমি।"—মৃদু হেসে বলে জীবনলাল।

শান্তা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

জীবনলাল বলতে থাকে —"যাতে তোমার সঙ্গে যোগীন্দ্র সিংয়ের বিয়ে না হয় তার জন্যে অনুরোধ করতে গিয়েছিলে?"

আরক্তমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় শান্তা বাঈ।

জীবনলাল আবার প্রশ্ন করে—"সেখানে গিয়ে কী দেখলে তুমি?"

শান্তা বাঈ মৃদুকণ্ঠে বলতে থাকে—"ঘরে ঢুকেই দেখি সে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখটা। দারুণ আতঙ্কে আমি আর্তনাদ করে উঠি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। একবার মনে হলো ছুটে বেরিয়ে আসি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম এ অবস্থায় পুলিসে অন্ততঃ একটা খবর দেওয়া উচিত। কেমন করে পুলিসে খবর দেব ভাবছি, ঠিকএমনি সময়ে আমার মনে হলো বাইরে থেকে কে যেন আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। কেন যে আমার এমন মনে হলো বলতে পারি না, তবে আমি বেশ ভালভাবেই অনুভব করছিলাম কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়েই বাইরে অপেক্ষা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোনের ওপর চোখ পড়লো। আবার ছুটে গেলাম টেলিফোনের

কাছে। রিসিভারটা তুললাম। হঠাৎ মনে হলো পুলিস যখন আমার টেলিফোন করার কথা জানতে পারবে তখন তারা কী মনে করবে? এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই রিসিভারটা ছেড়ে দিলাম আমি। তারপর ছুটে চলে এলাম বাইরে।"

শান্তা বাঈ একটু থামে। তারপর আবার বলতে থাকে—"বাইরে আসতেই মনে হলো কে যেন হঠাৎ সরে গিয়ে বাইরের মোটা থামের আড়ালে দাঁড়ালো। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠেছিল আমার। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে আসি।"

—"থামের আড়ালে যে লুকিয়ে ছিল তাকে তুমি দেখতে পাওনি?"—জিজ্ঞেস করে জীবনলালা।

—"না।"—জবাব দেয় শান্তা বাঈ।

"তুমি যখন বাড়ির দিকে ছুটছিলে তখন কি সেই লোকটা তোমার পিছু পিছু ছুটছে বলে মনে হয়েছিল তোমার?"

—"আমার তখন যা মনের অবস্থা তা'তে কেউ আমার পিছু নিয়েছিল কি না তা বুঝতে পারিনি।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জীবনলাল আবার বলে—"তোমাকে আর একটা মাত্র প্রশ্ন করবো আমি—যোগীন্দ্র সিং নিহত হলো, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো না, এতে নিশ্চয়ই তুমি খুশী হয়েছ, কি বল?"

বয়স অল্প হলেও শান্তার বুদ্ধি অল্প নয়, কাজেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জীবনলাল কী বলতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। তাই সে জবাব দেয়—"সে নিহত হওয়ায় আনন্দিত হইনি। তবে বিয়ে বন্ধ হওয়ায় খুশী হয়েছি।"

* * * * * * * *

পরের দিন সকালে যোগীন্দ্রের চাকর রঘুবীর এসে উপস্থিত হয় জীবনলালের সামনে।

রঘুবীরের দিকে তাকিয়ে জীবনলাল প্রশ্ন করে—"কিছু খবর আছে নাকি, রঘুবীর?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—রঘুবীর জবাব দেয়। তারপর পকেট থেকে একখানা ছোট্ট রুমাল বের করে জীবনলালের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে—"আজ সিঁড়ির পাশে পুরোন ইঁট বালির মধ্যে পেয়েছি এটা।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে রুমালটা হাতে নেয় জীবনলাল।

রুমালটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে সে লক্ষ্য করে রুমালের এক কোণে দেবনাগরী হরফে "অ" লেখা আছে।

চিন্তা করতে থাকে জীবনলাল। যোগীন্দ্র সিংয়ের ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের মধ্যে একমাত্র অহল্যা বাঈয়ের নামের আদ্যক্ষর হচ্ছে "অ", তবে কী অহল্যাও সেই রাত্রে সেখানে গিয়েছিল নাকি? কিন্তু অহল্যার তো এই হত্যার ব্যাপারে জড়িত থাকার কথা নয়। কারণ এতগুলো লোকের মধ্যে যোগীন্দ্র সিংয়ের শুভানুধ্যায়ী বলতে একমাত্র অহল্যাকেই সে জানতো। তবে?

একমুহূর্ত বিলম্ব না করে জীবনলাল ছুটে যায় পীতাম্বর সিংয়ের বাড়িতে।

অহল্যা বাঈ কিন্তু কোন কথা অস্বীকার করে না। সে স্বীকার করে যে সে সেদিন সত্যই

শান্তার পিছে পিছে যোগীন্দ্রের বাড়ি গিয়েছিল। তারপর শান্তাকে অনুসরণ করে সে আবার বাড়ি ফিরে আসে।

—"সেখানে আপনি আর কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

একটু চিন্তা করে অহল্যা জবাব দেয়—"না তবে..."

—"তবে কী, বলুন!"—উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর জীবনলালের।

—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি"—বলে উঠে বাড়ির ভেতর চলে যায় অহল্যা।

উৎকণ্ঠিত জীবনলাল অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরে অহল্যা ফিরে এসে তার পোশাকের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে জীবনলালের সামনে রাখে।

চমকে উঠে প্রশ্ন করে জীবনলাল—"এটা কোথায় পেলেন আপনি?"

—"সেদিন রাতে শান্তাকে অনুসরণ করে বাড়ি আসতে রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটা।"

পিস্তলটাকে হাতে নিয়ে দেখতে থাকে জীবনলাল।

একসময় জীবনলাল প্রশ্ন করে—"পিস্তলটা কার বলতে পারেন?"

একটা কঠিন হাসি ভেসে ওঠে অহল্যার মুখে। তারপর জীবনলালের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—"হীরা বাঈয়ের বাবার এরকম একটা পিস্তল ছিল বলে জানতাম।"

পিস্তলটার ওপর দৃষ্টি রেখে জীবনলাল আবার জিজ্ঞেস করে—"হীরা বাঈ তো আপনার বোন হন, তাই না?"

দাঁতে দাঁতে চেপে অহল্যা ফিসফিস করে বলে—"শত্রু!"

জীবনলাল কথাটা পরিষ্কার শুনতে পায় না। তাই আবার অহল্যার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"কী বললেন?"

—"হ্যাঁ, বোন হয়।"—কথাটা বলেই চুপ করে থাকে অহল্যা।

।। ১১।।

প্রবীণ পুলিস অফিসার এই জীবনলাল। জীবনে বহু মামলার তদন্ত করেছে সে। কখনও সফল হয়েছে, কখনও বা বিফলতার গ্লানি মাথায় নিয়ে তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু যোগীন্দ্র সিংয়ের হত্যারহস্যের মত এমন অদ্ভুত মামলা সে কখনও পায়নি।

সাধারণত তদন্ত করতে গিয়ে একটা সূত্র থেকে আর একটা সূত্রের নাগাল পায় তদন্তকারী অফিসার। আর সেইগুলোর সাহায্যেই রহস্যের সমাধান হয়। আবার যে সব মামলার তদন্তে সফলতা আসে না, সেখানে একটা সূত্র থেকে আর একটা সূত্রে যেতে পথ হারিয়ে ফেলে, তাই আর সমাধান করা যায় না।

কিন্তু এই মামলাটা সত্যিই অদ্ভুত। যতই দিন যাচ্ছে একটার পর একটা সূত্র এসেই যাচ্ছে তার কাছে। কিন্তু এই সূত্রের সাহায্যে কোন সমাধানে পৌঁছনো তো দূরের কথা সমস্ত ব্যাপারটাই আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

ভাবতে থাকে জীবনলাল—এই মামলায় অনেকগুলো ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে—সুন্দর সিং, শ্যামলাল, মহেন্দ্র সিং, অহল্যা বাঈ, হীরা বাঈ, শান্তাবাঈ, রঘুবীর এবং

পীতাম্বর সিং। পীতাম্বর সম্বন্ধে সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে এই ব্যাপারে সে মোটেই জড়িত ছিল না। বাকি লোকগুলোর মধ্যে কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যা বলছে তা যাচাই করা ভারী শক্ত। এই মুহূর্তে যাকে মনে হয় হত্যাকারী, পরমুহূর্তেই মনে হয়—না, হত্যাকারী হচ্ছে অন্য একজন। এক্ষেত্রে তবে উপায়?

বিভ্রান্ত জীবনলালের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে একটি কথা—হত্যাকারী কে?—কে?—কে?

এমনিধারা চিন্তা করতে করতে সে এসে উপস্থিত হয় হীরা বাঈয়ের বাড়ি।

দুটো চেয়ারে পশাপাশি বসে কথা বলছিল হীরা বাঈ ও শ্যামলাল, হঠাৎ এই অসময়ে জীবনলালকে দেখে চমকে ওঠে হীরা বাঈ।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে জীবনলাল বলে—"মাফ করবেন, আপনাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম।"

শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দেয় হীরা বাঈ—"না না, কী আর এমন ব্যাঘাত ঘটালেন!"

জীবনলাল একবার শ্যামলালের মুখের দিকে তাকায়। ভাবলেশহীন মুখ শ্যামলালের। মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারা যায় না।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে টেবিলের ওপর রাখতেই বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে হীরা বাঈ।

জীবনলাল কিছু বলার আগেই হীরা বাঈয়ের মুখ থেকে আচমকা কথাটা বেরিয়ে আসে—"এটা কোথায় পেলেন আপনি?"

ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে জীবনলালের। জবাব দেয় সে—"কোথায় পেলাম তা পরে বলছি। তার আগে বলুন এটা বোধহয় আপনার?"

হীরা বাঈ জবাব দেবার আগেই হঠাৎ জীবনলালের নজর পড়ে দেয়ালের ওপর। একটা পেরেকের সঙ্গে কড়া-লাগানো সেই পিস্তলের দড়িটা ঝুলছিল সেখানে। জীবনলাল লক্ষ্য করে পিস্তলের হুকের সঙ্গে কড়াটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে সেই কড়া-লাগানো দড়িটা টেনে নিয়ে বলে—"মনে হচ্ছে কড়া সমেত এই দড়িটাই লাগানো ছিল পিস্তলটার সঙ্গে!"

স্তব্ধ হীরা বাঈয়ের মুখে কথা সরে না।

জীবনলাল আবার বলে—"আশা করি এবার স্বীকার করবেন যে এটা আপনার।"

মৃদু মাথা নেড়ে সায় দেয় হীরা বাঈ।

—"এই বস্তুটা সেদিন রাতে প্রাসাদের সামনে পাওয়া গিয়েছে। এটা ওখানে গেল কি করে বলতে পারেন?"

বলতে বলতে আবার একটু মৃদু হাসি হেসে সে তাকায় শ্যামলালের দিকে।

হীরা বাঈ বুঝতে পারে জীবনলাল শ্যামলালকে সন্দেহ করছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—"এটা আমার সঙ্গে ছিল, কড়া খুলে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল।"

—"আপনার সঙ্গে?"

—"হ্যাঁ, আমার সঙ্গে।"

হীরা বাঈ তখন একে একে সেদিন রাতের ঘটনাটা বর্ণনা করতে থাকে। চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে জীবনলালের কপালে।

—"তা'হলে আপনিও সেদিন গিয়েছিলেন যোগীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে?"

—"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

—"আশ্চর্য ব্যাপার, এখন দেখছি আপনারা সকলেই সেদিন রাতে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ওদিকে আবার সুন্দর সিংয়ের আঙুলের ছাপ সমেত বন্দুক ও কার্তুজের খোলটাও পাওয়া গেল বাগানের মধ্যে, কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন একটা রহস্যাচ্ছন্ন থেকে যাচ্ছে। তা'ছাড়া যোগীন্দ্র সিংয়ের দ্বিতীয় উইলেরও কোন খোঁজ পেলাম না আজ পর্যন্ত।"

এবার কিন্তু শ্যামলালের গম্ভীর মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। মৃদুকণ্ঠে বলে সে—"ঐ বন্দুক থেকে যে ঐ কার্তুজটা ছোড়া হয়নি তা তো আগেই বুঝতে পারা গিয়েছিল।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্যামলালের মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনলাল প্রশ্ন করে—"কেমন করে?"

মুশকিলে পড়ে শ্যামলাল। কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলেই সাবধান হয়ে যায় সে। তাই একটু আমতা আমতা করে বলে—"না...অনেকটা অনুমান বলতে পরেন...এই ধরুন গুলিটা যদি ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হতো তাহলে হত্যাকারী বন্দুকটা খুলে কার্তুজের খোলাটা বাইরে ফেলে রেখে যাবে কেন? খোলটা বন্দুকের মধ্যে থাকলেই বা কী ক্ষতি ছিল তার?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে চিন্তা করতে থাকে জীবনলাল। তারপর একসময় শ্যামলালের মুখের ওপর একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে জবাব দেয় —"হ্যাঁ, কথাটা অবশ্য ভেবে দেখবার মতই বটে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় জীবনলাল।

।। ১২।।

রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে প্রাচীরসংলগ্ন নিচু জায়গাটায় একটা জীর্ণ কুয়ো। তার শানবাঁধানো পাড়ের অবস্থাও জীর্ণতর। জায়গাটা নির্জন। লোকজনের বড় বেশী যাওয়া আসা নেই এদিকে। গোটাকয়েক গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে। এখানে ওখানে দু'চারটা ফণিমনসা জাতের ঝোপঝাড়। বাগানের কাজে জল নেবার জন্যে বহু অতীতে তৈরী হয়েছিল কুয়োটা। এখন প্রায় পরিত্যক্ত।

বেলা প্রায় দশটা তখন। কিছুক্ষণ আগে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই কুয়োর চারিপাশটা কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে যে লোকটি কুয়োর মধ্যে কিছু দেখছিল, সে সুন্দর সিং ছাড়া আর কেউ নয়।

খানিকক্ষণ পর সুন্দর সিং তার কৌতূহলী দৃষ্টি কুয়োর ভেতর থেকে সরিয়ে এনে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন বস্তুর খোঁজ করতে থাকে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে একটু দূরে স্তূপীকৃত কিছু পুরোন ইঁট ও লোহার রডের ওপর।

দ্রুতপদে সেখানে এসে হাজির হয় সুন্দর সিং। একবার সন্তর্পণে দেখে নেয় চারিদিক, তারপর একটা লম্বা লোহার রড তুলে নিয়ে কুয়োর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ সেই প্রান্তর কাঁপিয়ে একটা শব্দ হয়—'গুড়ুম্'। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে কুয়োর পাশে পড়ে যায় সুন্দর সিং। জামার বুকের দিকটা তাজা রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কুয়োর ভেতর কোন ভারী বস্তু পতনের শব্দ হয়—'ঝুপ'।

বাইরে থেকে প্রাসাদের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল পুলিস অফিসার জীবনলাল।

গুলির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায় সে। তারপর ছুটে আসতে থাকে সুন্দর সিংয়ের নিস্পন্দ দেহটার দিকে।

কুয়োর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে জীবনলাল, হঠাৎ তার মনে হলো প্রাচীরের পাশ দিয়ে কে যেন ছুটে পালাচ্ছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে সে চীৎকার করে ওঠে—"শ্যামলাল!"

ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামলাল। হাতের সাহায্যে সে কিছু ইশারা করে জীবনলালকে, তারপর আবার ছুটতে থাকে রাজপ্রাসাদের দিকে।

শ্যামলালের ইশারার অর্থ বুঝতে পারে না জীবনলাল। তার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে সে আবার চিৎকার করে ওঠে—"দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি, শ্যামলাল, নইলে গুলি করবো আমি।"—বলেই জীবনলাল শক্তহাতে কোমরের রিভলভারটা চেপে ধরে।

নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামলাল। একটা প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে সে।

বজ্রমুষ্টিতে শ্যামলালের একটা হাত চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে জীবনলাল বলে—"এইবার হাতে হাতে ধরেছি তোমাকে, কোথায় পালাবে তুমি!"

হাত ছাড়িয়ে পালাবার কোন চেষ্টাই করে না শ্যামলাল, শুধুমাত্র উত্তেজিতকণ্ঠে জীবনলালের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"আসুন, শীগগির আসুন!"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় জীবনলাল। কিছু বুঝতে পারে না সে। শ্যামলাল কোথায় যেতে বলছে তাকে?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্যামলালের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কেবল উচ্চারণ করে—"কোথায়?"

অধৈর্যকণ্ঠে জবাব দেয় শ্যামলাল—"সব কথা বলার সময় নেই এখন, পরে সবই বলবো। এখন শীগগির আসুন আমার সঙ্গে নইলে..."

কথা বলতে বলতে শ্যামলাল একরকম জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে রাজপ্রাসাদের দিকে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় জীবনলালও ছুটে চলতে থাকে তার সঙ্গে।

প্রাসাদে প্রবেশ করে একটা কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় দুজনে। কক্ষের মধ্য তখন রঘুবীর যোগীন্দ্র সিংয়ের একখানা তৈলচিত্র পরিষ্কার করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল সেই ছবিখানার ওপর। তার পায়ে লেগে ছিল চাপ চাপ কাদা।

হঠাৎ শ্যামলাল চিৎকার করে ওঠে—"রঘুবীর!"

সাশ্রুনয়নে দরজার দিকে ফিরে তাকায় রঘুবীর।

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে রঘুবীরের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে শ্যামলাল। দু'হাতে তাকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে সে—"যোগীন্দ্র সিং ও সুন্দর সিংয়ের হত্যাকারীকে শীগগির গ্রেপ্তার করুন দারোগাসাহেব!"

* * * * * * * *

কুয়োর জলের দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে জীবনলাল জিজ্ঞেস করে—"এখানে কি আছে?"

একটা আঁকশির সাহায্যে দড়িবাঁধা একখণ্ড বাঁশের টুকরো তুলতে তুলতে জবাব দেয় শ্যামলাল—"আগে জিনিসটা তুলি, তারপর দেখতে পাবেন।"

চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। কৌতূহলী জনতার ভিড়। প্রাসাদের বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকে এসে হাজির হয়েছে সেখানে—মহেন্দ্র সিং, অহল্যা বাঈ, শান্তা বাঈ এবং আরও অনেকে। খবর পেয়ে হীরা বাঈও এসেছে।

বাঁশের টুকরোর সঙ্গে জড়ানো দড়িটা ধরে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে টেনে তুলতে থাকে শ্যামলাল।

ধীরে ধীরে জলের ওপরে জেগে ওঠে একটা মাঝারি ধরনের বালতি। ভেতর একখানা বড় পাথরের টুকরো।

পাথরখানা তুলে ফেলে বালতির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা কাগজের প্যাকেট তুলে আনে শ্যামলাল। ক্যানভাস ও অয়েল পেপার দিয়ে জড়ানো ঐ প্যাকেটটা।

প্যাকেট খুলতেই পাওয়া গেল দুখানা দলিল—যোগীন্দ্র সিংয়ের দুখানা উইল।

জীবনলাল আর সামলাতে পারে না নিজেকে। দু'হাতে শ্যামলালকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে—"আশ্চর্য! একজন ইঞ্জিনীয়ার হয়েও তদন্তের ব্যাপারে আপনারএত চমৎকার ব্রেইন! উইলের বিষয় আমি একেবারেই মনোযোগ দিইনি। আমার সবসময়ই মনে হয়েছিল ঐ বিয়ের ব্যাপারেই যোগীন্দ্র সিং খুন হয়েছেন।"

একটা রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে শ্যামলালের মুখে। ধীরে ধীরে পকেট থেকে একখানা সুদৃশ্য কার্ড তুলে নিয়ে সে জীবনলালের চোখের সামনে মেলে ধরে।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরে যায় জীবনলাল। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর্যন্ত শক্তি থাকে না তার।

তারপর একসময় বিস্মিতকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে—"আপনি...আপনি শ্যামলাল নন? আপনিই সেই স্বনামধন্য গোয়েন্দা অহীন সোম?"

অহীনের মুখে আবার ভেসে ওঠে সেই রহস্যময় হাসি।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি জীবনলালের। সে আবার জিজ্ঞেস করে—"আপনি এই ব্যাপারে এলেন কি করে?"

মৃদু হেসে জবাব দেয় অহীন সোম—"সবই বলব। কিন্তু তার আগে এই কুয়োর মধ্যে লোক নামিয়ে বন্দুকটা উদ্ধার করুন।"

—"বন্দুক!"—বিস্মিত কণ্ঠস্বর জীবনলালের।

জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ, বন্দুক। যে বন্দুক দিয়ে রঘুবীর যোগীন্দ্র সিং ও সুন্দর সিংকে হত্যা করেছে সেই বন্দুক এই কুয়োর ভেতর ফেলে দেওয়া হয়েছে!"

* * * * * * * *

বলতে থাকে অহীন সোম—"অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এই রঘুবীর। যোগীন্দ্র সিং খুবই বিশ্বাস করতো তাকে। কথায় কথায় সে একদিন বলেও ফেলেছিল রঘুবীরকে যে শান্তা বাঈকে বিয়ে করার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলেই সে তার পুরোন উইল পরিবর্তন করে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তার ভাই মহেন্দ্র সিংয়ের বদলে শান্তা বাঈকে দেবে। এই কথা শোনার পরই রঘুবীরের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপে। সে চিঠি লিখে সমস্ত ব্যাপারটা মহেন্দ্র সিংকে

জানিয়ে দেয় এবং তাকে আশ্বাস দেয় যে যোগীন্দ্র সিং প্রথম উইলটা নষ্ট করে ফেলবার আগেই সে সেটা চুরি করে এনে মহেন্দ্রকে দিয়ে দেবে যাতে ভবিষ্যতে যোগীন্দ্রের মৃত্যুর পর মহেন্দ্র ঐ প্রথম উইলটা নিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট বাধাতে পারে। একটা মোটা টাকার বিনিময়ে মহেন্দ্র সিংও এই ব্যবস্থায় রাজী হয়।"

একটু থামে অহীন, তারপর উপস্থিত সকলের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে—"প্রথম উইলটা হারিয়ে যাওয়ার পরই চিন্তিত হয়ে পড়ে যোগীন্দ্র সিং। তার কেমন একটা ধারণা হয় উইল হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা ষড়যন্ত্র আছে। তাই সে কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি এই ব্যাপারটা হাতে নিই এবং তাকে বলি যে উইল উদ্ধারের ব্যাপারে আমি এমনভাবে কাজ করবো যেন কেউ আমার পরিচয় টের না পায়। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল আমার পরিচয় পেলে হয়তো উইলটা নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। সেইমত যোগীন্দ্র সিং প্রথম উইলটা নিয়ে বেশী হইচই না করে দ্বিতীয় উইল তৈরি করে।"

এই সময় অহীন একবার হীরা বাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর আবার বলতে থাকে—"এখানে এসে ছদ্মবেশে দু'চারদিন ঘোরাফেরা করে আমি একটা খবর যোগাড় করি যে হীরা বাঈয়ের এক বান্ধবী নাকি পাঞ্জাবে থাকে। সেই বান্ধবীর একজন কাল্পনিক ভাই সেজে একখানা জাল পরিচয়পত্র নিয়ে আমি হীরা বাঈয়ের বাড়িতে থাকার অনুমতি পাই। অবশ্য, তার আগে জয়পুরে গিয়ে সি. পি. ডবলিউ. ডি.র চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করে আমার আসল পরিচয় জানিয়ে এখানে রাজপ্রাসাদের কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার অনুমতি নিই।"

অহীন এই সময় শান্তার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—"যোগীন্দ্র সিং দ্বিতীয় উইলটা তৈরি করে বিয়ের তারিখের মাত্র কয়েক দিন আগে। তাতে সে শান্তা বাঈকেই তার অবর্তমানে তার সম্পত্তির মালিক করে দেয়। এই সময় রঘুবীরের মাথায় আরও একটা কঠিন দুর্বুদ্ধি চাপে। সে বুঝতে পারে কেবলমাত্র সম্পত্তির লোভেই অহল্যা বাঈ শান্তাকে যোগীন্দ্রের হাতে দিতে সম্মত হয়েছে। তাই সে তার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে দ্বিতীয় উইলটাও চুরি করে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ঐ রঘুবীর। সে বুঝতে পারে বিয়ের ব্যাপারে ঘোরতর বিরোধী হচ্ছে সুন্দর সিং ও হীরা বাঈ। তাই সে হীরা বাঈয়ের ঝি লছমীর সাহায্যে তার বন্দুকটা চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখে দেয়। রঘুবীর অনুমান করেছিল যে মাত্র তিন চার দিন আগে ঐ বন্দুক যখন সুন্দর সিং ব্যবহার করেছে তখন তাতে নিশ্চয়ই তার আঙুলের ছাপ থাকবে। রঘুবীর তারপর তার প্ল্যান মত কাজ করে যায়। যোগীন্দ্র সিংয়ের নিজের বন্দুক দিয়ে তাকে সে হত্যা করে, কিন্তু বাগানে ফেলে যায় হীরা বাইয়ের বন্দুক আর সেই ব্যবহৃত কার্তুজ।"

এই সময় একবার চমকে ওঠে জীবনলাল। তার মনে পড়ে যায় সেই শ্যামলালরূপী অহীনের যুক্তি—'গুলিটা যদি ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হতো তো হত্যাকারী বন্দুকটা খুলে কার্তুজের খোলটা বাইরে ফেলে রেখে যাবে কেন? খোলটা বন্দুকের মধ্যে থাকলেই বা কী ক্ষতি ছিল তার? এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে।

তবুও সে অহীনকে একবার জিজ্ঞেস করে—"রঘুবীর হীরা বাঈয়ের বন্দুকটা চুরি করে এনে সেটা দিয়ে যোগীন্দ্রকে হত্যা না করে অন্য বন্দুক ব্যবহার করলো কেন?"

—"তার কারণ, হুঁশিয়ার রঘুবীর জানতো হীরা বাঈয়ের বন্দুক ব্যবহার করলে সুন্দর সিংয়ের আঙুলের ছাপ মুছে যাবে।"

চোখদুটো বড় করে ভ্রূজোড়া ওপরের দিকে ঠেলে তুলে জীবনলাল সায় দেয়। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে—"দুটো উইল নিয়ে রঘুবীরের কী উদ্দেশ্য ছিল?

একটু মুচকি হেসে জবাব দেয় অহীন—"নিলাম।"

—"নিলাম?" বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে জীবনলালের মুখে।

জবাব দেয় অহীন—"হ্যাঁ, নিলাম ছাড়া আর কী? রঘুবীর ভেবেছিল যে নিলামে যদি মহেন্দ্র সিংয়ের ডাক বেশী ওঠে তবে সে দ্বিতীয় উইলটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রথমটা তাকে দিয়ে দেবে। আর অহল্যা বাঈয়ের ডাক বেশী হলে প্রথমটা ছিঁড়ে ফেলে দ্বিতীয় উইলটা তাকে দেবে। আর, সেই মর্মে মহেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় সে নিজে এবং অহল্যা বাঈয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় হীরা বাঈয়ের ঝি লছমীকে নিয়োগ করেছিল সে।"

ঠিক এই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অহল্যা বাঈ ধীরে ধীরে মুখ নিচু করে।

অহীন বলতে থাকে —"আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে এই যে যোগীন্দ্র সিং ও সুন্দর সিংকে বাঁচাতে পারলাম না আমি।"

জীবনলাল আবার জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা, সুন্দর সিং ঐ কুয়োর পাড়ে গিয়েছিল কেন?"

একটা বেদনার ছায়া নেমে আসে অহীনের মুখের ওপর। সে বলতে থাকে—"বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই তরুণ অ্যাডভোকেট সুন্দর সিং। যোগীন্দ্র সিংয়ের প্রথম উইলের সাক্ষী ছিল সে। সে যখন জানতে পারলো যে দ্বিতীয় উইলটাও আপনি যোগীন্দ্রের ঘরে খুঁজে পাননি, তখনই সে আমার মত সন্দেহ করেছিল রঘুবীরকে। সেও বুঝতে পেরেছিল যোগীন্দ্র সিংয়ের হত্যার কারণ বিয়ের ব্যাপার নয়, ঐ উইল। তাই সেও আমার মত রঘুবীরের ওপর নজর রেখেছিল। যতদূর মনে হয়, সুন্দর সিং বোধহয় লক্ষ্য করেছিল যে রঘুবীর মাঝে মাঝে ঐ কুয়োর ভেতর উঁকি মেরে তার চোরাই মাল দেখে আসে। তাই সে সেদিন যখন কুয়োর ভেতর দড়িবাঁধা বস্তুটি তুলতে গিয়েছিল তখনই অনন্যোপায় হয়ে রঘুবীর তাকে গুলি করে।"

প্রশংস দৃষ্টি মেলে জীবনলাল তাকিয়ে থাকে অহীনের দিকে। উপস্থিত সকলেই এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখতে থাকে।

একসময় নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অহীন জীবনলালকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—"সময় আর বেশী নেই। আজকে রাতের গাড়িই ধরতে হবে আমাকে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার আপনার কাজ আপনি করুন।"—বলেই সকলের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিয়ে হীরা বাঈয়ের সামনে এসে দাঁড়ায় অহীন। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"আপনার সঙ্গে যে ছলনাটুকু আমাকে করতে হয়েছে, আশা করি সেজন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ছলছল চোখে অহীনের দিকে তাকিয়ে থাকে হীরা বাঈ। মুখে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে সেই সন্তানহীনা নারী আশীর্বাদ করে অহীনকে।

পারলৌকিক

মাঝারি সাইজের একখানি ঘর। ঘরের মেঝে মাটির, মাথায় টালি। এই ঘরখানার লাগোয়া আরও যে দু'খানা ঘর রয়েছে তাতে হ্যারিকেনের আলো জ্বললেও এই ঘরখানা কিন্তু অন্ধকার। না, পুরোপুরি অন্ধকার নয়। এই ঘরেও একটা হ্যারিকেন আছে, তবে তা প্রায় না থাকারই মত। হ্যারিকেনের কাঁচের আবরণের মধ্যে সামান্য একটুকরো আগুন স্থির হয়ে রয়েছে কেবল। সেই অতিসামান্য আলোয় ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখ তারা পরস্পর দেখতে পাচ্ছিল বলেও মনে হচ্ছিল না, কারণ তাদের প্রত্যেকেরই মন সেই মুহূর্তে অন্য এক চিন্তায় বিভোর।

রাত প্রায় দশটা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। শহর এলাকা নয় যে রাস্তায় আলো থাকবে। পুরোপুরি গ্রাম। ঘরখানির ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছ। তার ডালে রাতজাগা পাখির ডানা ঝটপটানির শব্দ।

ঘরের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। যে পাঁচটি মানুষ সেখানে রয়েছে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও অনুভব করা যায় না। যেন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ নয় তারা। যেন কৃষ্ণনগরের কোন ওস্তাদ শিল্পী পাঁচটি মাটির মূর্তি তৈরি করে বসিয়ে রেখেছে সেই ঘরের মধ্যে।

ঘরের আবহাওয়া কিন্তু চমৎকার। এককোণে জ্বলছে গোটাকয়েক ধূপকাঠি। তার গন্ধে পবিত্রতার আমেজ ঘরের মধ্যে। বাস্তবিকই পবিত্র ঘরখানি। একটু আগেই সেখানে ছিটানো হয়েছে গঙ্গাজল। তারও আগে সেই বিকেলে ঘরখানি সুন্দর করে নিকানো হয়েছে গোবরজল দিয়ে।

ঘরের মাঝখানে একটি চাদর বিছানো। তার ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে চারজন পুরুষ। এদের মধ্যে তিনজনই প্রৌঢ়। কেবল বাকি পুরুষটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। বলতে গেলে এই যুবকটিই এই রাতের আসরের মধ্যমণি। যুবকটির সামনে ছড়ানো রয়েছে একখানা বড় কাগজ। তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে একটা লম্বা পেন্সিল। লেখার স্বাভাবিক ভঙ্গি না হলেও সেই অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেই কাগজের ওপর কিছু লিখতে যুবকটি যেন প্রস্তুত। কিন্তু সেই মুহূর্তে যুবকটির মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই নেই। ধীরস্থির শান্ত ভঙ্গিতে কাগজখানার ওপর পেন্সিলটি আলতো ভাবে কেবল ধরে রয়েছে সে। অন্য তিনজন প্রৌঢ় তেমনি আসন পিঁড়ি হয়ে বসে যেন ঘিরে রেখেছে যুবকটিকে। তারা প্রত্যেকেই স্পর্শ করে রয়েছে তাকে।

যুবকটির নাম শতদল—শতদল মাইতি। মাথায় কোঁকড়া চুল। গায়ের রং ফর্সা না হলেও তার আধবোজা চোখ দুটো বেশ টানা টানা। পরনে ধুতি, গায়ে একটা হাফশার্ট। এই শতদলই আমাদের এই কাহিনীর নায়ক। বাকি তিনজন প্রৌঢ় কেবল এই কাহিনীর পার্শ্ব চরিত্র। এদের একজন হরিহর সামন্ত। মাথায় চকচকে টাক। দাড়ি-গোঁফ কামানো। গায়ে জড়ানো পরনের ধুতির একটি অংশ। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। আসরের মধ্যমণি না হলেও এর আসল প্রাণ এই হরিহর। বাকি দু'জনের একজন নৃপেন শাসমল ও অন্যজন অম্বিকা দলুই।

ঘরের মধ্যে এই চারজন পুরুষ ছাড়া আর রয়েছে একজন স্ত্রীলোক—বছর আঠারো উনিশের এক যুবতী। নাম তার সুলতা। যুবতীটি কিন্তু ঠিক আসরে থেকেও নেই। একটু দূরে দেয়াল ঘেঁষে বসে রয়েছে সে। তার কাজল কালো চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে আসরের দিকে। এই কাহিনীর নায়িকা এই যুবতী সুলতা। তার গায়ের রং সামান্য চাপা হলেও মুখখানা সদ্য ফোটা গোলাপের মতো। কুচকুচে কালো চুলের বোঝা যেমন তেমন করে পেছনে খোঁপার আকারে বাঁধা। কানের লতির সঙ্গে সোনা বাঁধানো লাল পাথরের দুটি টব। গলায় রূপোর চেন, হাতে দু'গাছা রূপোর চুড়ি। পরনে লাল-হলুদ ডুরে শাড়ি।

আসরের চারজন পুরুষই প্রায় ধ্যানস্থ। এক গভীর চিন্তায় মগ্ন তারা। এই চিন্তাই পার্থিব বিষয়বস্তুর সঙ্গে অপার্থিব বিষয়ের যোগাযোগের একমাত্র সেতু। অন্ততঃ বিশ্বাসীদের তাই ধারণা। কেবল সুলতাই তেমন চিন্তামগ্ন নয়। তার চোখে মুখে কৌতুহল। এমন আসরে তার উপস্থিতি নতুন না হলেও তার চোখের সেই কৌতূহলী দৃষ্টি কিন্তু এতদিনেও একটু কমে নি। অপার বিস্ময়ের এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন চোখে নিয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শতদলের হাতের দিকে। অপেক্ষা করছে একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যে।

অবশেষে একসময় এলো সেই বিশেষ মুহূর্তটি। শতদলের শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠলো। তার মুখের ওপর থেকে বাহ্যজ্ঞানের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে গেল। থির থির করে কাঁপতে লাগলো তার কলম ধরা হাতখানা। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো হাতের সেই কম্পন। অবশেষে লেখার ভঙ্গিতে কাগজের ওপর চলতে আরম্ভ করলো তার কলম ধরা হাত।

ঠিক এমনি সময় ফিসফিস করে বলে উঠলেন হরিহর, আপনি কে?

কাগজে কলমে কোনো জবাব নেই। শতদলের হাতখানা কাগজের ওপর কেবল আঁকিবুকি কাটতে লাগলো।

সেই দিকে তাকিয়ে হরিহর আবার বললেন, বলুন আপনি কে? লিখুন আপনার নাম।

হঠাৎ থেমে গেল শতদলের হাতখানা। হরিহরের আবার প্রশ্ন, ওকি, থামলেন কেন? আপনার নাম লিখুন।

আবার চলতে লাগলো পেন্সিল। আবার সেই আগের মতো আঁকি-বুকি।

—নাম জানাতে বাধা আছে নাকি আপনার? হরিহরের প্রশ্ন।

এতক্ষণে বন্ধ হলো সেই আঁকি বুকি। তার মধ্য থেকে স্পষ্ট ফুটে উঠলো দু'টি শব্দ—হ্যাঁ আছে।

—তা'হলে আপনি এলেন কেন?

—না।

—আপনাকে তো ডাকি নি।

—হ্যাঁ।

—না-না, আপনি চলে যান।

—না, যাবো না।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না।

—না, আপনি চলে যান। আপনাকে আমাদের দরকার নেই।

একটু সময়ের জন্যে থেমে যায় শতদলের হাত। পরক্ষণেই রেগে গিয়ে লেখার মতো খুব

তাড়াতাড়ি হাতখানা আবার চলতে চলতে লিখতে থাকে, যাচ্ছি। আর ডেকো না।

হঠাৎ শতদলের হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে কাগজের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সুলতা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হ্যারিকেনের আলো উস্কে দিতেই আলোকিত হয়ে ওঠে ঘরখানা। শতদল চোখ মেলে তাকায়, কিন্তু তার চোখে তখনও যেন স্বপ্নের ঘোর। হরিহর হাত বাড়িয়ে শতদলকে কাছে টেনে এনে জোরে বলে ওঠে, ষ্ট্রে—ষ্ট্রে আত্মা এসেছিল। অনেক সময় এমনি ফালতু আত্মা এসে থাকে। বেনেট সাহেবও তাঁর বইতে সেকথা বলেছেন। কী বলেন মাস্টার মশাই?

হরিহরের প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দেন চক গোবিন্দপুরের পোস্ট মাস্টার নৃপেন শাসমল, হ্যাঁ সামন্তমশাই ঠিকই বলেছেন। কেবল বেনেট সাহেব কেন, আর্থার সাহেবের বইতেও তো একথা লেখা আছে।

নৃপেন শাসমল থামতেই অম্বিকা দলুই তাঁর লম্বা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করেন, না ডাকতেই যারা এসে হাজির সেই রবাহূতরা কারা?

জবাব দেন হরিহর, নিচু স্তরের আত্মারা।

।।২।।

প্ল্যানচেটে মৃতের আত্মাকে টেনে আনার পদ্ধতির আবিষ্কারক ফরাসী প্রেততত্ত্ববিদ এম, প্ল্যানচেট। ১৮৫৩ সালে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এই পদ্ধতি। তাঁরই নামানুসারে এই পদ্ধতির নামও প্ল্যানচেট।

শহরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রেততত্ত্ব ও প্ল্যানচেট নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বড় শহরে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সোসাইটিও আছে। সোসাইটির সভ্যরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণাও করে। বলতে গেলে এ এক ধরনের নেশা। একবার এই নেশায় যাকে পায় তার পক্ষে এ থেকে দূরে থাকা প্রায় অসম্ভব। তবে, এসবই শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গাঁয়ের মানুষ, এমনকি যাঁরা শিক্ষিত তাঁরাও এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেদিক থেকে বিচার করলে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত চক গোবিন্দপুরের হরিহর সামন্তকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। এই একটা নেশা। তাঁর নিজের এই নেশা তিনি গাঁয়ের আরও কয়েকজন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের একজন পোস্টমাস্টার নৃপেন শাসমল, অন্যজন অম্বিকা দলুই।

চক গোবিন্দপুর গ্রামটি কিন্তু ছোট নয়। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম; এখানে পঞ্চায়েত সমিতির অফিস আছে, পোস্টঅফিস আছে, হাইস্কুল আছে। কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে যে একটা মেয়েদের স্কুলও নাকি হবে এখানে। গাঁয়ের কয়েকজন উৎসাহী মানুষ এ নিয়ে নাকি বেশ দৌড়াদৌড়িও করছে। এই স্কুলেরই হেডমাস্টার হরিহর সামন্ত। সেকালের বি-এ পাশ। ইংরেজির শিক্ষক তিনি। বেঁটে খাটো চেহারা। মাথাজুড়ে মস্ত টাক। অতি অমায়িক নির্বিরোধী মানুষ। তাঁর এই নির্বিরোধী চরিত্রের জন্যেই স্কুল কমিটির প্রচণ্ড দলাদলির মধ্যেও তিনি হেড মাস্টার হিসেবে এখনও টিকে আছেন। অজাতশত্রু বলতে যা বোঝায় হরিহরবাবু ঠিক তাই। স্কুলই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। বলতে গেলে স্কুল নিয়ে মেতে থাকাই তার প্রধান নেশা। আর দ্বিতীয় নেশা প্রেততত্ত্ব। চক গোবিন্দপুরে বসে আধুনিক প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে যেসব বিদেশী বই ছাপা

হয় তার খবর তিনি রাখেন। কেবল রাখেন বললেই সব বলা হবে না, গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি মাঝে মাঝেই সেই সব বই পোস্টাল ভি পিতে কলকাতা থেকে আনান এবং অবসর সময় তার মধ্যে ডুবে থাকেন। মাঝে মধ্যেই গ্রামের দু'চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসেন তাঁর কাছে। সময়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে তারা এই প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে সমিতি না গড়লেও গাঁয়ের কয়েকজন মানুষকে নিয়ে সমিতির মতোই একটা আসর গড়ে তুলেছেন হরিহর। বলতে গেলে এই আসরে একমাত্র বক্তা তিনি নিজে। বাকিরা কেবল শ্রোতা। হরিহরের বাইরের ঘরে বসে এই অলিখিত সমিতির আসর। মাঝে মাঝে এই ঘরে বসেই প্ল্যানচেটে ডেকে আনা হয় মৃত ব্যক্তির আত্মাকে। তারা আসে। জবাব দেয় অনেক কঠিন প্রশ্নের। গ্রামের সাধারণ মানুষ এসব জানে। আর জানে বলেই হরিহরের এই বাইরের ঘরটির ত্রিসীমানায় আসে না কেউ। বিশেষ করে রাত-বিরেতে তো নয়ই। তারা হরিহরের এই বাইরের ঘরটির নাম রেখেছে 'ভূতের ঘর'। এই ঘরে নাকি অনেক অসম্ভব কাণ্ড ঘটে। গ্রামের অনেকে নাকি সেসব কাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছে। এ বিষয়ে হরিহরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর চকচকে টাকে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বলেন, বাজে কথা—একদম বাজে কথা। তবে হ্যাঁ, আত্মাকে দিয়ে অনেক অসম্ভব কাণ্ড ঘটানো যায়। কোনো জিনিসকে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। আত্মাকে দিয়ে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালানো যায়। এসবই নাকি সম্ভব। অন্ততঃ বিদেশী প্রেততত্ত্ববিদদের তাই মত।

—আপনারাও কি এই ঘরে সেসব করেন? প্রশ্নকর্তা হয়তো জিজ্ঞেস করে।

তেমনি অমায়িক হেসে জবাব দেন হরিহর, এসব কাজ কি এতই সহজ? আমাদের সেরকম মনের একাগ্রতা কোথায়? এই শতদলের মতো একটি ছেলেকে পেয়েছি বলে মাঝে মাঝে একটু আধটু প্ল্যানচেটে বসি। ছেলেটা বাস্তবিকই খুব ভালো মিডিয়ম। আমাদের কাছে তো আত্মা আসেই না। ভালো মিডিয়ম ছাড়া তারা সেই মৃতের রাজ্য ছেড়ে এই পার্থিব জগতে আসতে চায় না। অবশ্য আমরা এটুকুতেই খুশি। এর বেশি আমাদের আকাঙক্ষাও নেই, ক্ষমতাও নেই।

হরিহর সামন্তের তিনজনের সংসারে স্ত্রী মনোরমাই সর্বেসর্বা। সংসারের প্রতি স্বামীর অমনোযোগের ঘাটতিটুকু অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে মনোরমাই পুষিয়ে দেন। আর তা নিয়ে উঠতে বসতে হরিহরকে কথা শোনাতেও ছাড়েন না। বলেন, তোমার আর কি? তুমি তো তোমার স্কুল আর ভূত নিয়েই সর্বদা ডুবে আছো। সংসারের দিকে নজর দেবার মতো সময় তোমার কোথায়?

মনোরমাকে বাস্তবিকই মনে মনে ভয় করেন হরিহর। বিশেষ করে তাঁর জিভখানাকেই হরিহরের বেশি ভয়। কোনোরকম প্রতিবাদের সুযোগ নেই। তাহলেই কুরুক্ষেত্র। তাই, মনোরমা যখন সরব হয়ে ওঠেন, হরিহর তখন নীরবতাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন। অবশ্য মাঝে মাঝে মিনমিনে সুরে দু'একটি কথার জবাব দিয়েই মনোরমার প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মনোরমার কথার জবাবে হয়তো তিনি বলেন, তুমি মিথ্যে বলো নি, গিন্নী। স্কুল আর ভূতের মধ্যেই আমি ডুবে আছি। তবে ব্যাপারটা ঠিক ভূত নয়। আত্মা—মৃতের আত্মা।

—মৃত মানুষের আত্মাই তো ভূত। স্বামীর দিকে চোখ পাকিয়ে বলে ওঠেন মনোরমা।

তেমনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেন হরিহর, সাধারণ অর্থে অবশ্য তাই। তবে আত্মা ঠিক ভূত

নয়। ভূত বলতে—।

হরিহরের কথা শেষ হবার আগেই তাঁর দিকে একটা কটাক্ষ হেনে মনোরমা বলেন, হয়েছে— হয়েছে। সাধারণ অসাধারণ বুঝি না। আমি তো দেখছি সন্ধ্যা হলেই একদল জ্যান্ত ভূত এসে জোটে ঐ বাইরের ঘরে। তাদের সঙ্গে ঐ ভূত নিয়েই তোমার আলোচনা। মাঝে মাঝে আবার ঘর অন্ধকার করে ঐ ছেলেটাকে দিয়ে আজে বাজে কি সব লেখাও।

স্ত্রীর কথায় মনে মনে আহত হন হরিহর। ঐ আজে-বাজে কথাটাতেই তাঁর আপত্তি। কিন্তু সেই আপত্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ করার সাহস নেই তাঁর। কেবল মৃদু কণ্ঠে বলেন, আত্মারা আসে। তারা আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয় শতদলের হাতে। তাই বলছি, ঠিক আজে-বাজে নয় ব্যাপারটা।

হরিহরের জবাবে মৃদু আপত্তির আভাস পেয়েই বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনোরমা। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বলেন, আজে বাজে নয়? বেশ, ধরে নিচ্ছি নয়, কিন্তু যাকে ডাকছো সেই যে আসছে তা বুঝতে পারছো কেমন করে?

স্পষ্ট এ্যাকাডেমিক আলোচনা। এসব ব্যাপারে কথা বলতে যথেষ্ট আগ্রহ হরিহরের। তাই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বেশ খুশিখুশি কণ্ঠে তিনি বলেন, ঠিক বলেছ। যে আত্মাকে ডাকছি সেই যে আসছে তা বুঝতে পারি কী করে? অতি সহজে। যে প্রশ্নের জবাব একমাত্র সেই মানুষটি ছাড়া অন্য কারুর জানার কথা নয়, সেই জবাব যখন শতদলের হাতে লেখা হয় তখনই বুঝতে পারি। তাছাড়া, হাতের লেখা দিয়েও বোঝা যায়। এই তো কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে আনিয়েছিলাম। শতদলের হাতে বেরিয়ে এলো অবিকল রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা।

মনোরমা গ্রাম্য মহিলা। সামান্য লিখতে পড়তে পারেন। তা'ছাড়া স্কুল মাস্টারের স্ত্রী। স্বামীর সাহচর্যে থেকে অনেক মহিলার চাইতেই কিছু বেশি বুঝতে পারেন। হরিহরের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও ঠিক অবিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু এত সহজে স্বামীকে রেহাই দিতেও রাজি নন তিনি। তাই তিনি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। বললেন, বেশ তো, তোমরা পুরুষেরা মিলে যা ইচ্ছে করো। কিন্তু ঐ মেয়েটাকে এর মধ্যে টেনে আনছো কেন? আমার বাপু এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ভালো লাগে না।

—না-না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন হরিহর, লতা তো আমাদের মধ্যে কখনও থাকে না। ও তো বরাবর দূরে বসে আমাদের কাজকর্ম কেবল দেখে।

—দূরেই হোক আর কাছেই হোক, মেয়েটাকেও তো নিজের চেলা বানিয়ে তুলেছ। গোবর দিয়ে ঘর নিকোয়, ধূপ-ধূনো জ্বালায়, শুদ্ধ কাপড়ে অন্ধকার ঘরে বাইরের এক দঙ্গল পুরুষের মধ্যে গিয়ে বসে থাকে। গাঁয়ের পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। তুমি নিজে তো কানে তুলো দিয়ে রেখেছ, তাই কিছু শুনতে পাও না। আমার তো তোমার মতো কানেও তুলো নেই, চোখেও ঠুলি বাঁধি নি। তাই সবই দেখতে পাই, সবই শুনতে পাই।

—তুমি আবার এর মধ্যে কী দেখতে পেলে? মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন হরিহর।

রেগে ওঠেন মনোরমা। হরিহরের মতো মানুষের হাতে পড়ে তাঁর নারী জীবনটা যে নষ্ট হয়েছে সেই একই কথা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে হরিহরকে শুনিয়েও তৃপ্তিবোধ না করে অবশেষে আর একবার তার উল্লেখ করে তিনি বলতে থাকেন, আমার হয়েছে মরণ! এমন লোকের হাতেও পড়েছিলাম! সব দিকে আমাকে নজর রাখতে হবে। ঐ যে মেয়েটা— তোমার ঐ ভূতের ব্যাপারে ওর এত উৎসাহ কেন একবার ভেবে দেখেছ?

আমতা আমতা করে জবাব দেন হরিহর, না ঠিক সেভাবে কখনও ভাবি নি। আমার মেয়ে, আমার কাছে কাছে থেকে এসবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে বলেই কৌতূহল মেটাতে বসে বসে আমাদের কাজ-কর্ম দেখে—।

—থামো তো। স্বামীকে ধমকে ওঠেন মনোরমা, আমার মেয়ে—আমার মেয়ে বলে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। তাও যদি নিজের এই পোড়া পেটে একটা ধরতে পারতাম।

ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে থাকেন হরিহর। কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

সন্তানহীনা নারী জীবনের দুঃখ নিয়ে সেই মুহূর্তে মনোরমা কিন্তু বেশিক্ষণ হা-হুতাশ করেন না। আগের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আবার বলতে থাকেন তিনি, বলি চোখের মাথা যে খেয়ে বসে আছো, তাই কিছু দেখতে পাও না। আমার মতো চোখ কান খোলা থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে যে তোমার ঐ ভূত প্রেতের টানেই মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে ঐ ঘরে বসে থাকে না।

—তবে আর কীসের টান? জিজ্ঞেস করেন হরিহর।

—মানুষের টান। জবাব দেন মনোরমা।

—মানুষের টান?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মানুষের টান। বলতে থাকেন মনোরমা, তোমাদের ঐ নবকার্ত্তিক শতদলের টানই ওর আসল টান।

—বলছো কি তুমি? স্খলিত কণ্ঠস্বর হরিহরের।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

হরিহর আর কিছু না বলে চুপ করে থাকেন। মনোরমা যতই কেন না ঠাট্টা করুক, শতদল বাস্তবিকই সুপুরুষ। হরিহরেরই ছাত্র সে। আবার এই স্কুলেই জুনিয়র টিচারের চাকরি পেয়েছে। শতদলকে বড়ই স্নেহ করেন তিনি। হরিহরের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়েই শতদল যাতায়াত করতে আরম্ভ করেছিল এই প্রেততত্ত্বের আসরে। অবশেষে একদিন স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ হলো যে প্ল্যানচেটে শতদল বাস্তবিকই এক চমৎকার মিডিয়ম। সেই থেকে মিডিয়মের আসনটি পাকা হয়ে গেল তার।

মিথ্যে বলেন নি মনোরমা। শত হলেও তিনি স্ত্রীলোক। এসব ভাব-ভালবাসার ব্যাপারগুলো স্ত্রীলোকের চোখেই আগে ধরা পড়ে। শতদল ও সুলতা সম্পর্কে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ঘুণাক্ষরেও কখনও মনে আসে না হরিহরের। কিন্তু এই মুহূর্তে মনোরমার কথায় তাঁর মনে হয় ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। কথায় আছে যুবক-যুবতী হচ্ছে ঘি ও আগুন। একজন পোড়াতে প্রস্তুত, আর একজন পুড়তে। কাজেই কাছাকাছি হলেই অগ্নিকাণ্ড। তবে কি শতদল ও সুলতা তেমন একটা কাণ্ডই ঘটাতে চলেছে?

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে ওঠে হরিহরের। না—না, যুবক-যুবতীর এই ধরনের অসামাজিক আচরণ তাঁর মন খারাপের আসল কারণ নয়। এসব ব্যাপারে হরিহর খুব লিবারেল। একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে ভালবেসে বিয়েই করে, তাতে যারা গেল গেল রব তুলে পাড়া মাথায় করে তোলে তাদের দলে হরিহর নন। তাঁর মন খারাপের কারণ ভিন্ন। তিনি এতদিন মনে করে এসেছিলেন যে সুলতাকে তিনি বাস্তবিকই প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে সুলতা সত্যিই উৎসাহী। তাই এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সময় সুলতা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, প্ল্যানচেটে বসার দিন নিজেই উৎসাহী হয়ে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখে, ঘর নিকোয়, ধূপকাঠি জ্বালায়, আর কৌতূহলী চোখে প্ল্যানচেটের কর্মকাণ্ড বসে বসে দেখে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এসব

একেবারেই গৌণ। তার আসল উদ্দেশ্য শতদলের সান্নিধ্য।

সত্যিই কি তাই? মনোরমাই কি ঠিক? মনোরমা বলে দেওয়ার পরে এখন যেন সুলতার আচরণের মধ্যে এমন সব অসঙ্গতি তাঁর মনে পড়ছে যেগুলোকে এতদিন তিনি আমলই দিতেন না। তাই কি তাঁদের আলোচনায় যেদিন শতদল অনুপস্থিত থাকে সেদিন সুলতাকেও দরজার কাছে দেখা যায় না?

বেশ তো, তাই যদি হয় তাহলে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে কী লাভ? সুলতা যদি ছেলেটাকে মনে মনে পছন্দই করে থাকে তাতে অন্যায়টা কোথায়? শতদল তো ফ্যালনা নয়। দস্তুর মতো বি-এ, বি-টি। হাইস্কুলের টিচার। দেখতে শুনতে সত্যিই সুপুরুষ। তা'ছাড়া, ওদের অবস্থাও ভাল। সুলতা যদি ঐ ঘরে গিয়ে পড়ে তাতে তো সে সুখীই হবে। তবে আর এর মধ্যে অন্যায় কি?

কেবল ভাবনাই নয়, ভাবনার কথাটা হঠাৎ মুখ ফস্কে বলেই ফেললেন হরিহর। বললেন, ভালই তো। শতদলের মতো ছেলের হাতে পড়া তো ভাগ্যের কথা। লতাও কুৎসিত নয়। তা'ছাড়া, স্কুলে কলেজে না গিয়েও ঘরে বসে ওকে আমি পড়িয়েছি। লেখা-পড়ায় মাথা আছে।এই তো আঠারো বছর মাত্র বয়স। এর মধ্যেই বেনেট সাহেবের স্পিরিচুয়ালজির বই পড়ে বেশ বুঝতে পারে। অবশ্যি মাঝে মাঝে দু'চারটা কঠিন শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না। সেগুলো আমার কাছ থেকে— ।

—ধুত্তেরি তোমার ইসপিরিটলজি। কথার মাঝখানেই স্বামীকে ধমকে থামিয়ে দেন মনোরমা, মেয়ের গুণের আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তাও যদি নিজের মেয়ে হতো। তা, তোমার মতে ওদের এই ভাবসাবের মধ্যে কোন অন্যায় নেই? তোমাদের ঐ নবকার্ত্তিক যদি মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায় তা'হলে তুমি মত দেবে, তাই তো?

কঠিন জেরা। এই জেরার কী জবাব দেবেন তা বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে থাকেন হরিহর।

গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন মনোরমা, কী ভেবেছ তুমি বলো তো? মরার পর তোমার নিজের তো নরকেও স্থান হবে না। আর সেই সঙ্গে তোমার জন্যে আমাকেও নরক ভোগ করতে হবে?

—কেন, নরকের কথা উঠছে কেন? মৃদু কণ্ঠস্বর হরিহরের।

সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন মনোরমা। চড়া গলায় বলতে থাকেন, নরকের কথা উঠবে কেন? উঠবে স্বর্গের কথা, তাই না?

কথার শেষে পরনের লাল পেড়ে শাড়ির ভূলুণ্ঠিত আঁচলখানা একটানে কাঁধের ওপর তুলে মনোরমা হন হন করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন। আর স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আনন্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন হরিহর।

হরিহরের সেই স্বস্তি যে বেশিক্ষণের জন্যে নয় তা বোঝা গেল একটু পরেই। রণংদেহী মূর্তিতে মনোরমা দুম-দাম পা ফেলে আবার এসে হাজির হন হরিহরের সামনে। তারপর হাত-পা নেড়ে বলতে থাকেন, বলো, ঐ মেয়েটার জন্যে আমাকে আর কত পাপের ভাগী করে তুলবে? বামুনের মেয়েকে নিজের কাছে এনে রেখে তার জাত খুইয়েছ। তখন পই পই করে বারণ করলাম, শুনলে না। আজ আবার সেই বামুনের বেটীকে এক মাইতির হাতে তুলে দিয়ে আমাকে পাপের জলে নাকানি চোবানি খাওয়াবার চেষ্টা করছো। ভেবেছো কি আমার সঙ্গে এভাবে শত্রুতা করে তুমি পার পাবে? কক্ষনো নয়। এই আমি বলে রাখলাম,

মেয়েটাকে যদি এভাবে লাই দিয়ে তুমি মাথায় তোল, তাহলে তোমারও একদিন কি আমারও একদিন। কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়বো আমি। সংসারে আগুন দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাবো। এই আমি স্পষ্ট তোমাকে বলে রাখছি।

এতক্ষণে খেয়াল হয় হরিহরের। জাতের বিষয়টি তাঁর একেবারেই মনে ছিল না। তিনি নিজে সামন্ত। সামন্তের মেয়ের বিয়ে হবে মাইতির সঙ্গে—এতে আর বাধা কোথায়? আসলে তিনি ভুলেই গিয়ে ছিলেন যে সুলতা তার নিজের মেয়ে নয়।

।। ৩।।

চক গোবিন্দপুর থেকে ছোট্ট গ্রাম বালিগড়ার দূরত্ব মাত্র দু'ক্রোশ। দূরত্ব সামান্য হলেও গ্রাম দু'টোর অবস্থিতি দু'টো ভিন্ন থানায়। চক গোবিন্দপুর যেখানে মথুরাপুর থানার মধ্যে সেখানে বালিগড়া গ্রামটির থানা জয়নগর। ঐ ছোট্ট গ্রাম বালিগড়ার একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী যেদিন তাঁর শিষ্যবাড়ি থেকে ফেরার পথে মাতলা নদীতে নৌকাডুবি হয়ে মারা গেলেন সেদিন তাঁর একমাত্র কন্যা সুলতার আপন বলতে সংসারে আর কেউ রইলো না। বৈকুণ্ঠর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন। দু'বছরের মেয়ে সুলতাকে বুকে চেপে স্ত্রীর স্মৃতি মনে রেখে বৈকুণ্ঠ আর দ্বিতীয়বার ছাঁদনাতলায় যান নি। প্রতিবেশীদের সাহায্যে নিজেই কোনক্রমে মানুষ করেছিলেন সুলতাকে। অবশেষে সেই নৌকাডুবি।

বৈকুণ্ঠের বেশি বয়সের সন্তান সুলতা। বেশ আদরেই মানুষ হচ্ছিল বাপের কাছে। প্রৌঢ় বৈকুণ্ঠ মাঝে মাঝে মেয়েকে কাঁধে চাপিয়ে চক গোবিন্দপুর গ্রামে বেড়াতে আসতেন বন্ধু হরিহর সামন্তের বাড়িতে। সন্তানহীনা মনোরমা কোলে নিয়ে আদর করতো, দুধ মুড়ি খেতে দিতো, কিন্তু ভুলেও এঁটো খেতে দিতো না মেয়েটার জাত যাবে বলে।

সেই বৈকুণ্ঠ মারা যেতেই হরিহর বালিগড়া গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল নিজের কাছে। সুলতার বয়স তখন চার কি পাঁচ।

জাতবিচার, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি ব্যাপারে মনোরমা চিরকালই একটু বেশি সচেতন। বামুনের মেয়েকে প্রতিপালন করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। স্বামীর কাজে বাধাও দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বামুনের মেয়ের জাত খোয়াবার পাপ আমাদের গায়ে এসে লাগবে। এসব না করাই ভালো। ওকে বরঞ্চ অন্য কোন গাঁয়ে বামুন পরিবারে দিয়ে এসো। ওর খরচ-খরচা না হয় আমরাই দেব!

জবাবে বলেছিলেন হরিহর, ঐটুকু মেয়ে। ওর আবার খরচ-খরচা কি? আসলে ব্যাপার কি জানো গিন্নী, সারা জীবন একটা মেয়ের দায়িত্ব কে চায় ঘাড় পেতে নিতে? মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেও না হয় কথা ছিল।

—কিন্তু তাই বলে একটা বামুনের মেয়ে আমাদের সংসারে—।

—তা' আর কী করা যাবে, গিন্নী? অনাথা মেয়ে, ফেলতে তো আর পারি না। তা'ছাড়া ঐটুকু ছোট্ট মেয়ের আবার জাত কি? যার কাছে মানুষ হবে তার জাতই ওর জাত।

হরিহরের কথায় এবার চটে ওঠেন মনোরমা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, ইস, আমার ভটচায্যি ঠাকুর এলেন বিধান দিতে! এসবের তুমি কি বোঝ? করো তো মাস্টারী আর ভূত পেত্নী নিয়ে কারবার। বামুনের মেয়ের জাত নষ্ট হলে দায়ী হবো আমরাই। মরার পরে আমাদের স্থান নরকেও হবে না।

স্ত্রীর ভাবভঙ্গি সুবিধের নয় মনে করে অবশেষে তূণের শেষ অস্ত্র ছেড়ে ছিলেন হরিহর। সন্তানহীনা নারীর মনের সবচাইতে কোমল জায়গায় আঘাত করতে গিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা জাতের দোহাই দিয়ে ঐটুকু মেয়েকে এবাড়ি থেকে তাড়াতে তোমার মন সায় দিচ্ছে, গিন্নী? ও যদি তোমার পেটের মেয়ে হতো, তা'হলে পারতে ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিতে? নিজের মাকে তো একরকম দেখে নি বললেই চলে। এক ছিল বাপ, সেও অকালে চলে গেল।তবু তো তুমি আমি ওর পরিচিত জেঠাইমা জেঠু। এটুকু পরিচয় আছে এমন কেউও তো আর ওর নেই। লোকে বাড়িতে কুকুর বেড়ালও তো পোষে। ওকে না হয় তেমনি মনে করেই এ বাড়িতে একটু স্থান দাও।

মোক্ষম অস্ত্র। এতেই কাজ হলো। স্বামীর সামনে মনের দুর্বলতা প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না মনোরমা। তাই হরিহর চুপ করতেই একটি কথাও না বলে মনোরমা সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন।

স্ত্রীর সঠিক মনোভাব তখনও বুঝতে পারেন নি হরিহর। তাই তিনি প্রতিমুহূর্তেই আশা কিম্বা আশঙ্কা করছিলেন যে মনোরমা হঠাৎ আবার এসে তাঁর মনোভাব জানিয়ে দিয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। এটাই তাঁর স্বভাব।

কিন্তু হরিহর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন যে মনোরমা আর এলেন না এদিকে, তখন চিন্তিত মনে হরিহর মনোরমার ঘরে উঁকি দিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর নিজের চোখ জোড়াকেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। পাষাণ-প্রতিমার চোখে জলের ধারার কথা পুঁথি-পত্রেই পাওয়া যায়, কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যেও যে তা সম্ভব তা তিনি সেদিনই প্রথম টের পেলেন। তিনি দেখলেন, ঘুমন্ত সুলতাকে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন মনোরমা, আর তার দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

সেই থেকে বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে সুলতা রয়ে গেল হরিহর সামন্তর সংসারে তাঁরই মেয়ে হয়ে। সংসারে বাপ ও মেয়ের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, হরিহরের সঙ্গে সুলতার সম্পর্ক যেন তার চাইতেও মধুর, তার চাইতেও উষ্ণ। মেয়েকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়ালে রাখতে মন সরতো না হরিহরের। সুলতা একটু বড় হতেই বাড়িতে তার লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্ব হরিহর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। হরিহরের যেমনি মেয়ে অন্তপ্রাণ, সুলতারও তাই। জেঠুই তার জীবনের আদর্শ, জেঠুর কথা তার নিজের কাছে বেদবাক্য। হরিহর যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, সুলতা প্রায় সারাক্ষণই তাঁকে অনুসরণ করে ছায়ার মতো। তার জীবনের দুঃখ-আনন্দ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না সবই তার জেঠুকে বললেও একটি ব্যাপারে সে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকার রেখেছিল—হরিহরেরই একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র শতদলের সঙ্গে তার নিজের ঘনিষ্ঠতার খবরটি সে সযত্নেই চেপে রেখেছিল হরিহরের কাছে। নারীসুলভ লজ্জা বাধা দিয়েছিল বলেই হয়তো কুমারী জীবনের এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়টি সে মুখ ফুটে তার জেঠুর কাছে প্রকাশ করতে পারে নি।

সুলতা বিষয়টি সম্পর্কে মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারুক চাই না পারুক, ব্যাপারটা যে সত্যি তাতে কোনোই সন্দেহ ছিল না। তবে মনোরমার বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও অংশতঃ ঠিক। তাদের বাইরের ঘরে পরলোকতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্বের আলোচনার আসরে সুলতার সাগ্রহ উপস্থিতির সম্পূর্ণ কারণটাই যে শতদলের সান্নিধ্য লাভ তা কিন্তু ঠিক নয়। শতদলের সান্নিধ্য তার অবশ্যই কাম্য, কিন্তু প্রেততত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্বের ওপর তার

আকর্ষণও নিতান্ত কম ছিল না। এই বিষয়ের ওপর হরিহরের জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনি তাকে এর দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল। আর সেই আকর্ষণ নেশার পর্যায়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সুলতার জীবনে আবির্ভাব ঘটেছিল শতদলের। তাই সেই নেশা তখনও ঠিকমতো জমে ওঠার সুযোগ পায় নি।

শতদলের নিজের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন। প্রেততত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্বের আসরে আলোচনার চাইতে প্ল্যানচেটে মিডিয়ম হয়ে বিদেহী আত্মার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার দিকেই তার ছিল প্রধান নজর। আর সেই সূত্রেই সুলতার মতো একটি সুশ্রী যুবতীর মনের খবর পাওয়া তার কছে হয়ে উঠেছিল উপরি পাওনার মতো। এ যেন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে হাতের মুঠোয় একখণ্ড দামী মুক্তো উঠে আসার মতো অবস্থা।

একজোড়া যুবক-যবুতী পরস্পরের মনের খবর পেয়ে যেতেই প্রকৃতি শুরু করে দিল তার কাজ। পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠলো তারা। এই চাঞ্চল্য প্রাকৃতিক নিয়মে শতদলের মধ্যে যতটা প্রকট হয়ে উঠলো সুলতার মধ্যে ততটা নয়। পাড়াগাঁয়ের পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ তেমন নেই। তবুও তারই মধ্যে অন্যের চোখের আড়ালে দেখা-সাক্ষাৎ করতো তারা। যখন সেই সুযোগ ঘটতো না তখন হরিহরের বাইরের ঘরে প্রেততত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে তারা পরস্পরের চোখের ভাষায় মনের কথা পড়ে নিতো।

শতদল একদিন সুলতাকে স্পষ্টই বললে, এভাবে আর ভালো লাগে না। আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

কোনো জবাব না দিয়ে সুলতা মাথা নিচু করে থাকে। শতদল সুলতার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার কি মত তাতো বললে না।

আরও কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে অবশেষে একসময় ধীরে ধীরে মাথা তোলে সুলতা। শতদলের চোখে চোখ পড়তেই মনটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। এ কম্পন আনন্দের কম্পন, এ কম্পন এমন এক নিরাপত্তা বোধের কম্পন যা নাকি প্রতিটি নারীই খুঁজে বেড়ায় তার প্রেমাস্পদের মধ্যে। বিশেষ করে সুলতার মতো একটি মেয়ের পক্ষে এ ধরনের নিরাপত্তাবোধ যে কত প্রয়োজনীয় তা একমাত্র সেই বলতে পারে। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে পা দিয়ে সুলতা তার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছিল যে জেঠু-জেঠাইমা তার যত আপনজনই হোক না কেন তাঁদের সঙ্গে তার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। জেঠু তাকে যতই কেন না ভালবাসুন তিনি চিরকাল তার মাথার ওপর থাকবেন না। তাই সুলতার গোটা জীবনের জন্যে চাই নিরাপত্তার আশ্বাস। সেই আশ্বাস তাকে দিতে পারবে এমন একজন প্রেমিক পুরুষ যে তাকে আদর করবে, ভালবাসবে, হাসিমুখে গ্রহণ করবে তার জীবনের সমস্ত দায় দায়িত্ব। একটি ছোট্ট সংসার। সেই পুরুষের হাতে হাত রেখে সেই ছোট্ট সংসার দরিয়ায় নৌকা ভাসাবে তারা। ভয় পাবে না সুলতা। তার পাশেই তো থাকবে সেই পুরুষটি যার মুখে প্রেমের হাসি, চোখে নিরাপত্তার আশ্বাস। সেই আশ্বাসের চিহ্নই সে দেখতে পেয়েছিল শতদলের মধ্যে।

সুলতাকে চুপ করে থাকতে দেখে শতদল বললে, তুমি কি চুপ করেই থাকবে সু? তোমার নিজের মতামত আমাকে বলবে না?

এতক্ষণে মুখ খোলে সুলতা। কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় তার কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করে, সব কথাই কি মুখ ফুটে বলতে হয়? আমার মুখ দেখে কি বুঝতে পরো না?

—তা'হলেও তোমার নিজের মতামত—

শতদলের কথা শেষ হবার আগেই সুলতা আবার বলে ওঠে, তুমি তো সবই জানো। আমার নিজের আবার মতামত কি? জেঠুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

কথার শেষে সুলতা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ভিজে কাপড়ের বোঝা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা বাড়ায়। নিজের মুখে শতদলকে কথাগুলো বলতে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল সে।

বর্ষাকাল। সেদিন বিকেলে বৈঠকখানায় বসে কেবল হরিহর ও সুলতা। সুলতা এসেছিল তার জেঠুর চা নিয়ে। তাঁর চা পান শেষ হলেও সুলতা কিন্তু খালি কাপ নিয়ে ফিরে যেতে পারে নি। জড়িয়ে পড়েছিল হরিহরের পরলোকতত্ত্বের আলোচনার জালে। মাঝে মাঝেই এমনি হয়। যেদিন অন্য কেউ আসে না সেদিন হরিহরের একমাত্র শ্রোতা সুলতা।

সুলতা হরিহরকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জেঠু, তোমরা তো বলো যে প্ল্যানচেটে কাগজের ওপর সেই আত্মার নিজের লেখাই নাকি ফুটে ওঠে। কিন্তু—

—কিন্তু কিরে? বলে ওঠেন হরিহর, এসব আমার কথা নয়। বিলেতের বাঘা বাঘা স্পিরিচুয়ালজিস্টেরই তাই মত। এডওয়ার্ড টি, বেনেট, ফ্রেড আর্চারের মতো ব্যক্তিরাও সেই কথাই তাঁদের বইয়ে লিখেছেন। এই দেখ—বেনেট সাহেব তাঁর বইয়ে কী লিখেছেন।

কথা বলতে বলতে হরিহর তাঁর বইয়ের তাক হাতড়ে বেনেটের বইটা না পেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, একি, বইটা গেল কোথায়? এই তো সেদিনও তো বইটা এখানে ছিল। কী যে মুশকিলে পড়েছি। কোনো একটা বই যদি ঠিক জায়গায় থাকে। হ্যারে লতা, বইটা কোথায় গেল বলতে পারিস?

জবাব দেয় সুলতা, তোমার বইয়ের খবর আমি কী জানি, জেঠু? তবে সেদিন নৃপেন কাকুকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলে না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে ওঠেন হরিহর, ঠিক বলেছিস মা। আমার তো একদম মনেই ছিল না। আর শাসমলও হয়েছে তেমনি। কবে বইটা নিয়ে গেছে এখনও ফেরত দেবার নাম নেই। আজ এলে বলতে হবে।

একটু থেমে হরিহর আবার সুলতাকে বলতে থাকেন, বেশ তো, তুই সেদিন রবিঠাকুরের লেখা দেখিস নি? প্ল্যানচেটে কাগজের ওপর ফুটে উঠলো অবিকল রবিঠাকুরের হাতের লেখা।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সুলতা বললে, হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু—।

—কিন্তু কী?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সুলতা বললে, রবিঠাকুরের লেখার ছবি দেখেছি। কেমন সুন্দর অথচ প্যাঁচানো লেখা। কিন্তু ঐ প্ল্যানচেটের লেখার অক্ষরগুলো কেমন যেন ভাঙা ভাঙা বাঁকা ধরনের বড় বড়।

—আরে হবেই তো—হবেই তো। বলতে থাকেন হরিহর, মরা মানুষের হাতের লেখা কি অবিকল জ্যান্ত মানুষের লেখার মতো হতে পারে? তা'ছাড়া মানুষ যে ভাবে তিনটে আঙুলের ডগায় কলম ধরে লেখে প্ল্যানচেটে তো সেভাবে কলম ধরা হয় না। কাজেই দু'টো লেখার মধ্যে তফাৎ তো কিছু থাকবেই। কিন্তু তাই বলে দু'টো লেখা কখনই ভিন্ন নয়। বেনেট

সাহেব তো বলেন, লেখা তো বটেই, এমনকি হাতের সই পর্যন্ত নাকি একরকম হয়ে থাকে।

কথার শেষে মুখে একটা আক্ষেপের শব্দ করে হরিহর আবার বললেন, বইটা হাতের কাছে নেই, নইলে বইয়ের সেই জায়গাটা তোকে পড়ে শোনাতাম।

সুলতা হরিহরের কথার কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন মনোরমা। খালি চায়ের কাপ পাশে রেখে সুলতাকে তক্তপোষের একপাশে বসে থাকতে দেখে তিনি চড়া সুরে বলে ওঠেন, হায়রে কপাল, সেই কখন চা নিয়ে এসেছিস, এখনও বসে বসে কথা গিলছিস? আমি ভাবলাম মেয়ে বোধহয় রান্নাঘরে রাতের কুটনো কুটছে। তা'নয় বসে বসে বুঝি কেবল ঐ ভূতের কেত্তন!

জেঠাইমার তাড়া খেয়ে সুলতা তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নিয়ে বাড়ির ভেতর উঠে যায়। আর হরিহর আবার একবোঝা কড়া কথা শোনার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হন।

কিন্তু একি কাণ্ড! কোথায় মনোরমার সেই কঠিন মুখ আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ? একেবারে অন্য মানুষ যেন মনোরমা। তক্তপোষের একপাশে বসে হাসি হাসি মুখে হরিহরের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা ভালো খবর আছে। তোমার মেয়ে রাজরানী হতে চলেছে।

—রাজরানী? হরিহর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মনোরমার দিকে। মনোরমা বলতে থাকেন, আজ দুপুরে ননী বোষ্টমী এসেছিল।

—ননী বোষ্টমী? কেন?

নামে পুরুষ হলেও ননী স্ত্রীলোক। এ তল্লাটের সবাই তাকে চেনে। ননী ঘটকীর কাজ করে বেড়ায়। মুখে সর্বদাই তার খই ফোটে। নিজের প্রশংসায় নিজেই পঞ্চমুখ। বলে, এ তল্লাটে আমার মতো আর একটা মানুষ খুঁজে বের করো তো। একটা দু'টো নয়, গণ্ডা গণ্ডা ছেলে-মেয়ে পার করেছি আমি।

সেই ননী বোষ্টমীর আগমনের খবরে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন হরিহর। মুখে কিছু না বলে তিনি কেবল তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

মনোরমা উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে পানের পিক ফেলে আবার ফিরে এসে বসতে বসতে বললেন, ঐ যে গো, হাবিবপুরের তিহারীলাল ভট্‌চায অমন কেউকেটা মানুষ—সেই তো পাঠিয়েছে ননী বোষ্টমীকে। তার সোনার টুকরো ছেলে ডায়মণ্ডহারবার থাকে। ব্যবসা করে। বাপের পয়সা কড়ি তো আছেই, তার ওপর ব্যবসা করে ছেলেও অনেক পয়সা করেছে। সেই ছেলের জন্যে লতাকে তিহারীলালের নাকি মনে ধরেছে। পথে ঘাটে লতাকে হয়তো দেখে থাকবে। পাল্‌টি বামুনের ঘর।

তিহারীলাল নয়, মানুষটির নাম বিহারীলাল। কিন্তু ঐ নামে যেহেতু হরিহরের এক দাদা ছিলেন, তাই মনোরমা ঐ নামটিকে সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। ভাসুরের নাম তো উচ্চারণ করা চলে না।

মনোরমা থামেন। গম্ভীর হয়ে থাকেন হরিহর। হাবিবপুরের বিহারীলালকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। জাতে বামুন হলেও স্বভাবে কসাই। নিজের স্বার্থে সে না করতে পারে এমন কাজ নেই। তার ওপর ভোটের জোরে সে এবার অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছে। যাকে তাকে যখন তখন হাতে মাথা কাটে। লোকের মুখে শোনা যায় তার একমাত্র ছেলে বিষ্টু কন্ট্রাকটরি করলেও স্বভাবে বাপের এককাঠি ওপরে। স্বভাব চরিত্রও নাকি ভালো নয়। যদিও সে এখনও বিয়ে করে নি, কিন্তু লোকে বলে তার নাকি বিশেষ প্রয়োজনও নেই।

ডায়মণ্ডহারবার টাউনে তার নিজের বাড়ি।

হরিহরকে চুপ করে থাকতে দেখে মনোরমা আবার বলে ওঠেন, ওকি, প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে রইলে কেন? কাল সকালে ননী বোষ্টমী এলে তারসঙ্গে একবার হাবিবপুরে গিয়ে পাত্রের বাপের সঙ্গে কথা বলে এসো। মেয়েটার ভাগ্যি ভালো যে রাজার সংসারে পড়তে চলেছে।

এ নিয়ে মনোরমার সঙ্গে কথা বলারও ইচ্ছে ছিল না হরিহরের। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, পাত্রের স্বভাব চরিত্র নাকি তেমন সুবিধের নয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে বলে ওঠেন মনোরমা, রটনা—রটনা। বুঝলে, হিংসের জ্বালায় এসব লোকের রটনা। ননী বোষ্টমী বললে, অমন সোনার টুকরো ছেলে নাকি ভূ-ভারতে আর নেই।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে ননী বোষ্টমী এলেও হরিহরের পক্ষে হাবিবপুর যাওয়া সম্ভব হলো না। সেখানে যাওয়া-তো দূরের কথা বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলেন না তিনি। গায়ে তার দারুণ জ্বর।

একদিন দু'দিন করে সাতটা দিন কেটে গেল। ডাক্তার এলো, ওষুধপত্র চললো, কিন্তু জ্বর তো কমলোই না বরঞ্চ নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিতে আরম্ভ করলো। হরিহরের মাথার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা সুলতা। ওষুধ খাওয়ায় পথ্য করায়, সারারাত জেগে জেগে জেঠুকে হাওয়া করে। এই বিরাট পৃথিবীতে তার একমাত্র অবলম্বন হরিহরকে সে ভালো করে তুলবেই।

শেষে এলো সেই দুর্যোগের রাত। বাইরে মুষলধারে ঝড় বৃষ্টি। ঘরের ভেতরে মনোরমা ও প্রতিবেশীরা। হরিহর একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে চলেছেন। তাঁর মাথার কাছে চোখে আঁচল দিয়ে মনোরমা ও প্রতিবেশীরা। পাথরের মূর্তির মতো স্থির চোখে হরিহরের মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতা। বাইরের ঝড়ের মতো তার মনের মধ্যেও ঝড়ের দাপাদাপি।

শেষ রাতে চলে গেলেন হরিহর। কান্নায় ভেঙে পড়লেন মনোরমা। কিন্তু সুলতার চোখে জল নেই। শোকের ধাক্কায় সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

এই কাহিনীর যবনিকা আবার উঠলো হরিহরের মৃত্যুর প্রায় ছ'সাত মাস পরে। ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হলো মা ও তাঁর পালিতা কন্যার সঙ্গে। শতদলকে বিয়ে করার কথা উচ্চারণ না করলেও সুলতা মনোরমাকে স্পষ্ট বলে দিলে যে সে বিহারীলালের পুত্রবধূ হতে মোটেই রাজি নয়। এদিকে ননী বোষ্টমীর মাধ্যমে মনোরমার ওপর বিহারীলালের চাপ, সুলতাকে সে পুত্রবধূ করবেই।

মেয়েকে বোঝান মনোরমা। বললেন, কথা শোন লতা। তোর কপাল ভালো যে তুই ঐ ঘরে যেতে পারছিস। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না।

—না জেঠাইমা, জবাব দেয় সুলতা, তুমি ওদের না বলে দাও।

মনোরমা রেগে উঠে বলেন, কেন—কেন না বলবো? ঘর-বর কোন্‌টা খারাপ? জবাবে সুলতা বলে, ঘর-বরের কথা বলছি না। জেঠুর যাতে সায় ছিল না, আমার পক্ষে তা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। জেঠুর মত থাকলে একটা ভিখিরীর গলায় মালা দিতেও আমার আপত্তি থাকতো না।

একটু সময় চিন্তা করেন মনোরমা। তারপর বিদ্রূপ কণ্ঠে বললেন, ঐ নবকার্ত্তিকটাকে

বিয়ে করতে ভালো ফন্দি এঁটেছিস দেখছি। জানিস, লোকটা যখন নেই, তখন তার মতামত কোনো কালেই আর জানা যাবে না। আর সেই ফাঁক গলে তুই গিয়ে উঠবি ঐ শতদলের ঘরে, কেমন?

মনোরমার বিদ্রূপ গায়ে না মেখে সুলতা বললে, তুমি তো জানো জেঠাইমা, ঐ বাড়িতে আমার বিয়ে দিতে জেঠুর মত ছিল না।

—কে বললে ছিল না? তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন মনোরমা, আমি সাক্ষী। এটা ঠিক যে প্রথমদিকে তাঁর মত ছিল না। কিন্তু পরে তিনি আর আপত্তি করেন নি।

—সত্যি বলছো তুমি জেঠাইমা? মনোরমার চোখে চোখ রাখে সুলতা?

জবাব দেন মনোরমা, হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

এরপরেও কিন্তু রাজি হয় না সুলতা। তার ধারণা মনোরমা মিথ্যে বলছেন। এই বিয়েতে হরিহরের মত ছিল না।

হরিহরের বাড়িতে যখন এই ঠাণ্ডা লড়াই তখন নবীন স্কুলশিক্ষক শতদল গোটা ব্যাপারটাকে লজ্জাকর মনে করে চুপ করেই থাকে।

গল্প উপন্যাসে এসব ক্ষেত্রে নায়করা যা করে থাকে, সেই পালিয়ে গিয়ে নায়িকাকে বিয়ে করতে তার শিক্ষিত মনের রুচিতে বাধে। এমনকি সুলতার কাছ থেকে এরকম একটা পথের ইঙ্গিত পেয়েও শতদল বললে, না সু, তা হয় না। চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

—কিন্তু এদিকে তোমাদের পঞ্চায়েত প্রধান সেই লোকটা যে আমাকে তার ঘরে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে। তার ওপর বাড়িতে জেঠাইমাও যে উঠতে বসতে ঐ কথাই শোনাচ্ছে। এই বিয়েতে জেঠুর নাকি মত ছিল।

ম্লান হেসে জবাব দেয় শতদল, তা'হলে আর আমি কি বলতে পারি?

একটু থেমে শতদল আবার বললে, তুমি তো বরাবরই বলে এসেছ যে তোমার জেঠুর ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা।

—আমি কিন্তু জেঠাইমার কথা বিশ্বাস করি না। বলতে থাকে সুলতা, ওখানে জেঠুর মত থাকতেই পারে না।

জবাব দেয় শতদল, বেশ তো, তাই যদি মনে করো তা'হলে রাজি হয়ো না। এখন আর সেদিন নেই যে তোমার অমতে জোর করে কেউ তোমার বিয়ে দেবে।

প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটে সুলতার। ঘরে জেঠাইমার লাঞ্ছনা গঞ্জনা—বটেই তো, কাকের ঘরে কোকিল ছানা। স্বভাব যাবে কোথায়? পাখ্‌না গজাতে না গজাতেই ইচ্ছেমতো ফুড়ুৎ করে পালাবার তাল? কালসাপ—কালসাপ! দুধ কলা দিয়ে এতকাল ঘরে একটা কালসাপ পুষেছিলাম।

সুলতা বুঝতে পারে, তার জেঠাইমার কাছে ব্যাপারটা এখন একটা জেদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে যেটা ছিল বামুন কায়েতের ব্যাপার, এখন সেটা স্রেফ জেদ। পরের মেয়েকে নিজের ঘরে এনে মানুষ করলাম, এখন সে নিজের ইচ্ছেয় চলবে কেন?—এই হচ্ছে জেদী স্বভাবের মহিলা মনোরমার রাগের আসল কারণ। তাছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে যা নাকি সুলতা জানে না। বিহারীলালের তো গুণের ঘাটতি নেই। হয়তো বিধবা মনোরমার অভাবের সংসারে কোনরকম আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে সে।

ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে যাঁতি দিয়ে সুপারী কাটতে কাটতে বলতে থাকেন মনোরমা, হয়েছে—হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। যেখানে খুশি এবার চলে যা। আমাকে রেহাই দে। বলি, এত বাড় বেড়েছে যে সেই মরা মানুষটার ইচ্ছেরও কোনো দাম দেয় না! এদিকে মুখে কতসব কথা—জেঠুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। জেঠু যা বলবে তাই হবে। ইস্, কত আদিখ্যেতা!

হরিহরের প্রসঙ্গে আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না সুলতা। জেঠাইমার গঞ্জনায় সেই মুহূর্তে তার চোখ ফেটে জল আসছিল। আঁচলে চোখ মুছে জবাব দেবার জন্যে সে প্রস্তুত হতেই বাইরে নৃপেন শাসমলের কণ্ঠে শোনা যায়, কৈ রে লতামা, এদিকে আয়। যাবার আগে তোদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

গায়ের আঁচল টেনে নিয়ে সুলতা বাইরে আসতেই নৃপেন শাসমল হেসে বললেন, কেমন আছিস রে তোরা? বৌঠান কেমন আছেন?

সুলতা সেকথার জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, আপনি আবার কোথায় চললেন, কাকা?

সুলতার পিছে পিছে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দেন নৃপেন শাসমল, বদলি হয়েছে আমার।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করে সুলতা।

জবাব দেয় নৃপেন, কলকাতায়।

—বদলি কেন, কাকা?

হেসে নৃপেন বললেন, বারে সরকারী চাকরি। বদলি হবো না?

কথা বলতে বলতে সুলতার মুখ চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে আবার বললেন, কী হয়েছে রে তোর? কাঁদছিলি নাকি?

সুলতা চুপ করে থাকে। একহাত ঘোমটা টেনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জবাব দেন মনোরমা, কাঁদবে না? ঐ অভাগীর কান্নার এখনই হলো কি? আরও কত বাকি আছে। লতামা বলতে যে মানুষটা ছিল অজ্ঞান তাঁর কথারই যখন দাম দেয় না তখন ওর কপালে আরও কত কান্না আছে।

সুলতার বিয়ের ব্যাপারটি অজানা নয় নৃপেনের। তাই তিনি মোলায়েম কণ্ঠে সুলতাকে জিজ্ঞেস করেন, তাই নাকি মা? সামন্ত মশাইয়ের কি তোকে হাবিবপুরে বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল?

—হ্যাঁ। সুলতার বদলে জবাব দেন মনোরমা।

একটু সময় চুপ করে থেকে সুলতা বললে, না কাকা। জেঠু তাঁর ইচ্ছের কথা কখনও আমাকে বলেন নি।

—আমাকে বলেছে। মনোরমা আবার বলে ওঠেন।

জবাব দেয় সুলতা—আমি বিশ্বাস করি না।

বাইরের একজন লোকের সামনে এমনি অপমান আর সহ্য হয় না মনোরমার। লাজলজ্জা ভুলে মুখের ঘোমটা সরিয়ে তিনি চোখ পাকিয়ে তাকান সুলতার দিকে।

বিপাকে পড়েন নৃপেন শাসমন। তাড়াতাড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বলে ওঠেন তিনি, আহাহা এ নিয়ে কথা কাটাকাটির কী আছে? হাবিবপুরে বিয়েতে সামন্ত মশাইয়ের মত ছিল কিনা তা

তো এখনও জানা যেতে পারে।

মনোরমা ও সুলতা দু'জনেই কৌতূহলী চোখে তাকায় নৃপেন শাসমলের দিকে।

বলতে থাকেন নৃপেন, পরলোকতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্বে গভীর অনুরাগ ছিল সামন্ত মশাইয়ের। প্ল্যান্‌চেটের ওপর তাঁর ছিল প্রচণ্ড আস্থা। আজ তিনি যখন আমাদের মধ্যে নেই তখন তাঁর আত্মাকে প্ল্যান্‌চেটে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেই তো জবাব পাওয়া যাবে।

—কিন্তু—। বলে ওঠেন মনোরমা।

—কিন্তু কি, বৌঠান? জিজ্ঞেস করেন নৃপেন।

একটু সময় চিন্তা করে মনোরমা আবার বললেন, কিন্তু ওর মধ্যে তো ঐ ছোঁড়া থাকবে। যদি কোনরকম কারসাজি করে?

ভ্রূ কুঁচকে বিষয়টি ভেবে নিয়ে জবাব দেন নৃপেন, না বৌঠান, তেমন কিছু করবার সম্ভাবনা নেই। শতদলকে তো চিনি। এসব ব্যাপারে ছেলেটা বাস্তবিকই খাঁটি। আসলে কি জানেন বৌঠান, প্ল্যান্‌চেটে আত্মা এসে এমনভাবে ভর করে যে ওর নিজের সত্তা বলে তখন আর কিছু থাকে না। আত্মা ওকে দিয়ে যা লেখায় তাই তখন ও লেখে।

একটু থেমে নৃপেন আবার বললেন, আপনারা কিছু ভাববেন না। আগামী সপ্তাহে আমি এখান থেকে চলে যাবো। তার আগে এই বিষয়টির একটা ফয়সালা করেই যাবো।

বিহারীলাল তার পুত্র বিষ্টুকে নিয়ে বাস্তবিকই দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। ছেলেটার পেটে বিদ্যে না থাকলেও মগজে বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধির জোরেই সে ইতিমধ্যে কনট্রাক্টরী করে বেশ কিছু পয়সা জমিয়েছে। পুত্রের এহেন সাফল্যে পিতা বিহারীলাল বাস্তবিকই গর্বিত। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বিষ্টুর স্বভাবচরিত্র নাকি মোটেই ভালো নয়। হাতে কাঁচা পয়সা পেয়ে সে নাকি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসায়। তাই সে উঠে পড়ে লেগেছিল ছেলের বিয়ে দিতে।

বিখ্যাত বাপের বিখ্যাত পুত্র। কাজেই পাত্রীর ঢল নামলো বিহারীলালের বাড়িতে। পুত্রের দাবী পাত্রীকে সুন্দরী হতে হবে। বাপের দাবি কোষ্ঠি-ঠিকুজীর মিল এমন হওয়া চাই যে বৌ এসে যেন ছেলেকে কব্জা করে তার চরিত্র সংশোধন করতে পারে। পুত্রের দাবী মেটে তো বাপের দাবী মেটে না, বাপের দাবী মেটে তো পুত্রের দাবী মেটে না।

অবশেষে পাওয়া গেল সুলতাকে। ননী বোষ্টমী মারফৎ মনোরমার কাছ থেকে পাত্রীর ছবি ও ঠিকুজী চলে গেল বিহারীলালের কাছে। আর, আশ্চর্য ব্যাপার, পিতা-পুত্র দু'তরফের দাবীই মিটলো। গণকঠাকুর বিচার করে রায় দিলেন, এই মেয়ের কাছে পাত্র একেবারে ঢিট্। জোরে কথাটি পর্যন্ত কইতে পারবে না। স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কারুর দিকে নজর দেবার কথা তার মনেই আসবে না।

এতদিনে যখন সঠিক পাত্রীর খোঁজ পাওয়া গেল তখন আর সেটিকে কোনমতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলো না বিহারীলাল।

বিহারীলালের ভরসা যেমন ননী বোষ্টমী ও মনোরমা, সুলতার ভরসা তেমন একমাত্র শতদল। কেবলমাত্র শতদলই প্ল্যানচেটে বসে নিজের ইচ্ছেমতো জবাব লিখে তাকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঐ শতদলকে নিয়েই। গোপনে তার সঙ্গে দেখা করাই অসম্ভব। জেঠাইমা তাকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করেছে। তাঁর চোখ এড়িয়ে কোন কিছু করাই প্রায়

অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসে গেল সেই দিনটি। একটু বেশি রাতেই হরিহরের সেই বাইরের ঘরে পুরনো দিনের মতো বসলো প্ল্যানচেটের আসর। মিডিয়ম সেই শতদল। সঙ্গে আছেন নৃপেন শাসমল ও অম্বিকা দলুই। আজ প্ল্যানচেটে আসবে খোদ হরিহরেরই আত্মা। তিনি নিজে অনেক প্ল্যানচেট পরিচালনা করেছেন, আজ তিনি নিজেই আসবেন।

আগের নিয়মে একটু দূরে বসে আছে সুলতা। তবে আজ আর সে একা নয়। তার পাশে রয়েছেন মনোরমা যিনি নাকি হরিহর বেঁচে থাকতে এই আসরের নাম দিয়েছিলেন 'ভূত প্রেতের আড্ডা'। গরজ বড় বালাই। তাই তিনিও আজ উপস্থিত।

প্রায় অন্ধকার ঘরের বাতাস ধীরে ধীরে ভারি হয়ে ওঠে। কাগজের ওপর কলম ধরে স্থির হয়ে বসে থাকে শতদল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতা বুঝতে পারে যে শতদলের বাহ্যজ্ঞান বলে সেই মুহূর্তে আর কিছু নেই। হরিহরের আত্মা বোধহয় এসেছে। কথাটা ভাবতেই ভয় মিশ্রিত এক আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করে সুলতা। তার জেঠু এতদিন পরে এসেছেন তাদের মধ্যে। তিনি কী জবাব দেবেন কে জানে? আর এই জবাবের ওপরেই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ।

প্ল্যানচেটের আসরে বরাবর প্রশ্ন কর্তা হরিহর। কিন্তু আজ তিনি নিজেই এসেছেন জবাব দিতে। তাই আজ প্রশ্নকর্তা নৃপেন শাসমল।

মনোরমার চোখে মুখে কিন্তু ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি স্থির চোখে কেবল কর্মকাণ্ড দেখছেন। তাঁর মুখের ঘোমটা সরে এসেছে কপালের ওপর।

নিচু অথচ আবেগজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করতে থাকেন নৃপেন শাসমল, আর জবাব লিখতে থাকে শতদল।

নৃপেন শাসমলের প্রশ্ন ঃ

—কে আপনি?

—কী নাম আপনার?

—কোথায় আছেন?

—কেমন আছেন?

—সুলতার বিয়ে হবে?

—বলুন, সুলতার বিয়ে হবে?

—বিহারীলালের ছেলের সঙ্গে সুলতার বিয়েতে আপনার মত আছে?

—বলুন!

—বলুন!

—আপনার স্ত্রী মনোরমা ভালই আছেন। আমার আগের প্রশ্নের জবাব দিন?

—বলুন, বিহারীলালের ছেলের সঙ্গে সুলতার বিয়েতে কি আপনার মত আছে?

—ঠিক করে জবাব দিন।

—কষ্ট হচ্ছে? তবে যান।

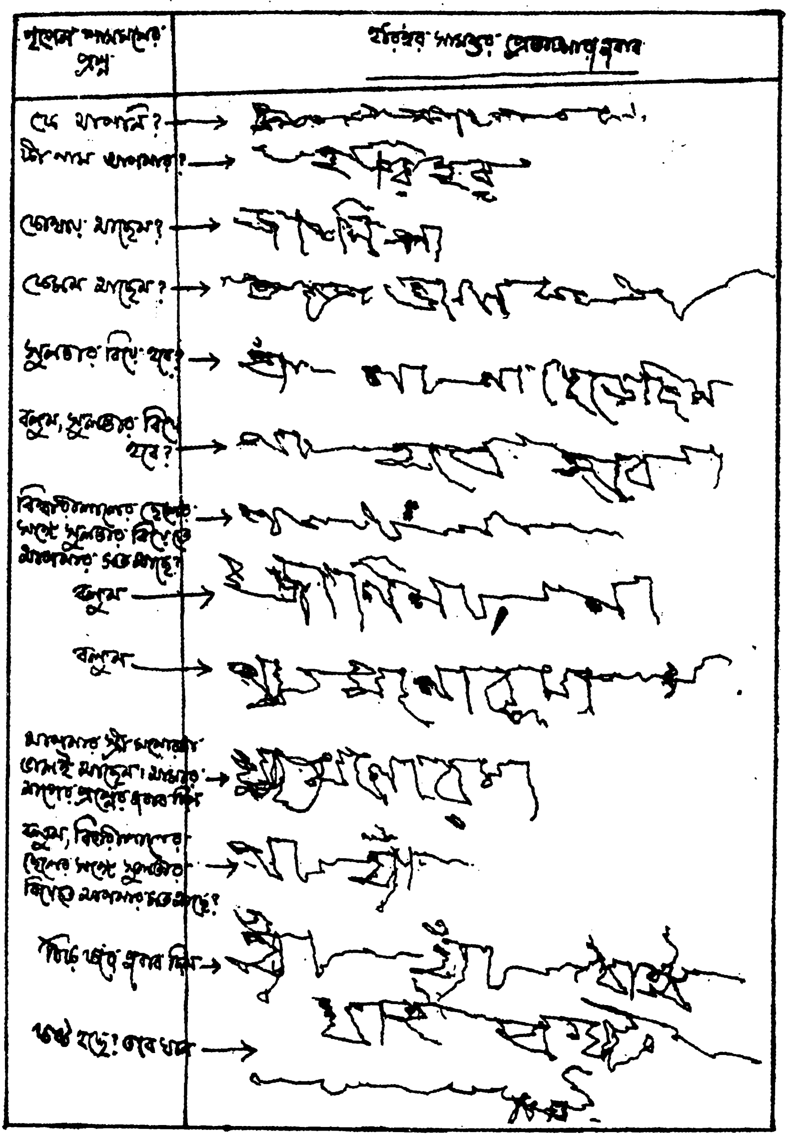

প্ল্যানচেটের লেখা

হরিহর সামন্তর প্রেতাত্মা চলে গেল, আর হরিহরের বিধবা স্ত্রী মনোরমার মুখে হাসি ফুটলো। এতদিনে জানা গেল হরিহরের মতামত। প্রথমে 'না' বললেও শেষে তিনি 'হ্যাঁ' বলে জানিয়ে দিলেন যে এই বিয়েতে তাঁর মত আছে। নৃপেন শাসমল প্ল্যানচেটের লেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে ওঠেন, হ্যাঁ, বেনেট সাহেব তাঁর বইতে ঠিকই লিখেছেন। এই লেখা অবিকল সামন্ত মশাইয়ের লেখার মতোই বটে। অন্য কোন আজেবাজে আত্মা নয়, একেবারে খোদ হরিহর সামন্তর আত্মাই এসেছিল।

এরপরে হবিবপুরের বিহারীলাল ভট্চাযের বাড়িতে সানাই বাজতে যেমনি দেরি হলো না তেমনি চক গোবিন্দপুরে মনোরমার বাড়িতেও।

বিয়ের পরে সুলতা বুড়ি ছোঁয়ার মতো কয়েকটা দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ি হাবিবপুর ছুঁয়ে স্বামী বিষ্টুর সঙ্গে চলে গেল তার ডায়মণ্ডহারবারের বাড়িতে। আর চক গোবিন্দপুরের হাই স্কুলের টিচার শতদল মাইতিও কলকাতার শহরতলিতে একটা স্কুলে মাষ্টারী পেয়ে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে।

ছেলেবেলায় বাপ-মা হারানো মেয়ে সুলতা চেয়েছিল একটি ছোট্ট সংসার। ডায়মণ্ডহারবারের বাড়িতে সেই ছোট্ট সংসার সে পেয়েছে। সুলতা চেয়েছিল একজন প্রেমময় পুরুষ যাকে কেন্দ্র করে সে গড়ে তুলবে সেই সংসার, যাকে অবলম্বন করে এই পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকবে, তাও সে পেয়েছে বিষ্টুর মধ্যে। অন্ততঃ বিয়ের পর দু'তিন মাস তেমনি মনে হয়েছিল সুলতার। কিন্তু অচিরেই ভুল ভাঙলো তার। মোহ কেটে যেতেই স্ব-মূর্তি ধারণ করলে বিষ্টু। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো সুলতার। এ কী হলো? এ কেন হলো? তার নিজের দিক থেকে কোনো ত্রুটিই তো তার নজরে পড়ল না। তবে কেন এমন হলো?

এই 'কেন'র জবাব কোনো উচ্ছৃংখল স্বামীর কোনো স্ত্রীই কোনোদিন পায় নি। তাই সুলতাও পেল না।

বিষ্টু ইদানীং প্রায়ই গভীর রাতে বাড়ি ফেরে পাঁড় মাতাল হয়ে। কোনো কোনো দিন একেবারেই ফেরে না। দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে রাত কাটাতে হয় সুলতাকে। বাড়ি ফিরে এসে বিনা কারণে সে অশ্রাব্য গালগাল দেয় তাকে। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে গালাগালের সঙ্গে সুলতার গালে চড় চাপড়ও পড়ে। প্রথম প্রথম ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে যেতো সুলতা। স্বামী দেবতার এমনি আচরণ সহ্য করতো মুখ বুজে। ভাবতো, চুপ করে থাকলে মাতাল লোকটা হয়তো শান্ত হবে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলে যে তার ধারণা ভুল তখন কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যেই বিষ্টুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে। আর তার ফলে তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়লো বই কমলো না। সুলতা কাঁদতে কাঁদতে হয়তো বলে, কেন তুমি এমন করছো? কী অন্যায় আমি করেছি?

মাতাল বিষ্টু তার টকটকে লাল চোখের ঢুলঢুল দৃষ্টি সুলতার মুখের ওপর ফেলে জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয়, আমার ওপর কথা বলতে এলেই এমনি মার খাবে। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

—ছাই পাঁশ খেয়ে মাঝ রাত্তিরে বাড়ি এসে তুমি এভাবে পাড়া মাথায় করবে, আর আমি চুপ করে থাকবো?

—আলবৎ থাকবে। জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দেয় বিষ্টু, ছাই পাঁশই বলো আর অমৃতই বলো, আমি খাই আমার পয়সায়। তাতে কার কি?

সুলতা আর জবাব দেয় না। সে বুঝতে পরে, এই মুহূর্তে এই বেসামাল লোকটার সঙ্গে

কথা বলে কোনো লাভ নেই। মাঝখান থেকে রেগে গিয়ে হয়তো আরও মারধোর করবে।

দিনের পর দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বিয়ে দিয়ে ছেলেকে সংশোধন করতে না পেরে বিহারীলাল হাল ছেড়ে দিয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারে ছেলের বাড়িতে প্রায় আসেই না। কাজেই তার কাছ থেকে কোনো প্রতিকারের আশা নেই। মনোরমাকে চিঠি দিয়েও কোনো জবাব পায় না সুলতা। তাঁর আচরণে মনে হয়, সুলতাকে বিদায় দিয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। চার-পাঁচখানা চিঠির জবাবে তিনি একখানা চিঠিতে কিছু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে কেবল দায় সারলেন। লিখলেন, পুরুষ মানুষের ওসব একটু আধটু দোষ ত্রুটি থাকেই। ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মন দিয়ে সংসার করো। সুলতার ওপর অত্যাচারের খবরে তিনি একবার তাকে চক গোবিন্দপুর যেতেও লিখলেন না। সুলতা বুঝতে পারল, এই বিরাট পৃথিবীতে তার পাশে দাঁড়াবার মতো একটি মানুষও নেই। যিনি ছিলেন, সেই হরিহর আর বেঁচে নেই। তিনি ছাড়া আর যে দাঁড়াতে পারতো সেই শতদল এখন অনেক দূরের মানুষ।

বিষ্টুর সংসারের অবস্থা বেশ সচ্ছল। ঝি চাকর রাঁধুনী আছে বাড়িতে। সুলতাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না। সংসারে প্রাচুর্যের ছাপ। কিন্তু তার মধ্যেও সুলতা একা—নিদারুণ একা। সে যেন এই বাড়িতে একজন অতিথি। কোনো কর্তৃত্ব নেই তার। মুখ বুজে খাও দাও, থাকো। আর মাঝে মাঝে নিজের দেহের বিনিময়ে বিষ্টুর স্বাভাবিক অস্বাভাবিক জৈবিক প্রয়োজন মেটাও। একটু বেচাল হলেই বিপদ।

মাঝে মাঝে এই বাড়ির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে সুলতার। ইচ্ছে হয় নিজের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে কিম্বা কোথাও পালিয়ে যেতে। কিন্তু যাবে কোথায়? বন-হরিণীর গায়ের নরম মাংসের মতো তার এই ভরা যৌবনই তো তার মহাশত্রু। এ নিয়ে সে কোথায় পালাবে? কে দেবে তাকে আশ্রয়?

ভাবতে ভাবতে চোখ ফেটে জল আসে সুলতার। এ জন্যে তো তার সেই জেঠুই দায়ী। কেন তিনি সেদিন প্ল্যানচেটে জানালেন যে এই বিয়েতে তিনি রাজি? দায়ী শতদলও কম নয়। কেন সে সেদিন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল না? কেন সেদিন তারা সবাই মিলে তার জীবনটাকে এমনি মাটি করে দিলে?

মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয় তার। সত্যিই কি সেদিন প্ল্যানচেটে তার জেঠু হরিহরের আত্মা এসেছিল? নাকি অন্য কোনো আত্মা? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? তার শাসমল কাকা তো প্ল্যানচেটের লেখা দেখে বলেই দিয়েছিলেন যে ঐ লেখার সঙ্গে হরিহরের লেখার নাকি আশ্চর্য মিল। সত্যিই কি তাই? নাকি সেদিন সেটা ছিল নৃপেন শাসমলের অন্ধ বিশ্বাস? আজ এতদিন পরে কে এর জবাব দেবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায় সুলতা। ঘরের দরজা বন্ধ করে আলমারির ভেতর থেকে বের করে সযত্নে ভাঁজ করা সেই প্ল্যানচেটের লেখা। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে লেখাটার দিকে। একবার মনে হয়, হ্যাঁ, তার জেঠুর লেখার মতোই বটে। এক অস্বাভাবিক অবস্থায় হরিহরের হাতের লেখা যেমনটা হতো এ যেন তাই। পরক্ষণেই মনে হয় অন্য কথা। না—না, এ তার জেঠুর লেখা নয়। কি মনে করে একখানা পুরানো পোস্টকার্ড টেনে বের করে সুলতা। হরিহর একবার স্কুলের কাজে দিল্লি গিয়েছিলেন। ওখানকার ঐতিহাসিক বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছিলেন সুলতাকে। লিখেছিলেন—

মা লতা, আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। এখানে আমাকে আরও কয়েকদিন

থাকিতে হইবে। কাজ শেষ হইলেই চলিয়া আসিব। কাজের অবসরে এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখিতেছি। যতই দেখি ততই মুগ্ধ হই। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি দেখিতে দেখিতে আমি যেন সেই সময়ের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলি। ইচ্ছা হয় তোমাদের সকলকে যদি এইসব দেখাইতে পারিতাম তাহা হইলে কতই না ভাল হইত। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে। লালকেল্লা, কুতুবমিনার ছাড়াও দিল্লীতে আরও অনেক কিছু দেখিবার আছে।

যাহা হউক, তোমরা সকলে সাবধানে থাকিবে। আমি ভাল আছি।

ইতি —তোমার জেঠু
হরিহর সামন্ত।

বিছানায় শুয়ে সুলতা একদৃষ্টে দুটো লেখার দিকে তাকিয়ে তাদের মধ্যে মিল ও গরমিল খুঁজতে থাকে। কতগুলো অক্ষরের মধ্যে আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে তার, আবার কতগুলো গরমিল। মিলের দিকে তাকিয়ে একই লোকের লেখা বলতে ইচ্ছে করে তার। আবার গরমিলে ভিন্ন লোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক কোনো সমাধানেই সে আসতে পরে না।

ইদানীং এইটাই সুলতাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। তার জেঠু হরিহরের আত্মা যে ইচ্ছে করে তাকে এই নিষ্ঠুর লোকটার হাতে সঁপে দিয়ে তার সর্বনাশ করেছে তা' বিশ্বাস করতে মনের সায় পায় না সুলতা। তার কেবলই মনে হতে থাকে, সেদিন প্ল্যানচেটে তার জেঠুর আত্মা আসে নি। বেঁচে থাকতে হরিহর বলতেন যে মাঝে মাঝে যাকে ডাকা যায় তার আত্মার বদলে অন্য আত্মা নাকি এসে হাজির হয়। তার জেঠুর বেলায়ও হয়তো তাই হয়েছে। হরিহরের বদলে অন্য আত্মা এসে হাজির হয়েছিল সেদিন। বিষয়টি নিয়ে সুলতা যতই ভাবতে থাকে ততই যেন লেখা দুটোর মধ্যে গরমিলগুলো বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে তার চোখে পড়তে থাকে। আবার মিলগুলো চোখে পড়তেই অন্য ভাবনা এসে উদয় হয় তার মনের মধ্যে। হয়তো সেদিন সত্যি সত্যি হরিহরের আত্মাই এসেছিল।

বিষ্টুর অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে মৃত হরিহরের ওপর অভিমানও সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠে সুলতার। সেদিন প্ল্যানচেটে হরিহরের সম্মতি না পেলে সুলতা কিছুতেই এই বিয়েতে রাজি হতো না। সে ভেবেছিল হরিহরের সম্মতির অর্থই তাঁর আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদের জোরে তার বিবাহিত জীবন ভরে উঠবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে। পাবে সে একজন প্রেমময় পুরুষ, পাবে সে একটি সুন্দর সংসার। সেই প্রেমময় পুরুষটিকে ঘিরে লতার মতো বেয়ে উঠবে সে। সেই হয়ে উঠবে পিতৃ-মাতৃহীন সুলতার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কী সে ভেবেছিল, কী হলো! দয়ামায়াহীন একটা লোকের হাতে পড়ে প্রতিদিন তাকে সহ্য করতে হচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার। কে বাঁচাবে তাকে? কে তাকে উদ্ধার করবে এই নরক থেকে?

অবশেষে একদিন খেতে বসে বিষ্টু সুলতাকে যে কথা শোনালে তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে উঠলো তার। সেই মুহূর্তে সুলতার মনে হতে থাকে তার স্বামী নামক ঐ জীবটির মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কোনো বস্তুর কণামাত্র নেই। লোকটা পশুরও অধম। নইলে—।

প্রথমটায় কিন্তু বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা শুরু করেছিল বিষ্টু। খেতে খেতে পাশে দাঁড়ানো সুলতার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, জানো, একটা মস্তবড় কাজের কনট্রাক্ট পেতে চলেছি। কাজটা করতে পারলে পাঁচ সাত লাখ টাকা প্রফিট।

বিষ্টুর কথায় একটু বিস্ময় বোধ করেছিল সুলতা। এভাবে হেসে হেসে কথা ইদানীং সে প্রায়ই বলে না। তার ওপর নিজের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো নয়ই।

সুলতাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিষ্টু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে খেতে খেতে বললে, তবে কাজটা পাবো কিনা সে বিষয় এখনও নিশ্চিৎ হতে পারি নি। তবে তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো তাহলে কাজটা পাবো বলেই মনে করি।

—আমি? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে সুলতা।

একটু অমায়িক হাসি হেসে জবাব দেয় বিষ্টু, হ্যাঁ, তুমি। তেমন কোনো পরিশ্রমের কাজও নয়। কেবল একটু—। কথাটা শেষ না করেই বিষ্টু আবার খাওয়ার দিকে মন দেয়।

সেই মুহূর্তে সুলতার মনে হয়, এটা একটা সুযোগ। স্বামীকে খুশি করতে পারলে হয়তো তার সংসারে শান্তি আসবে। তাই সে মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ তো, তোমার কাজের যদি সুবিধে হয় তো করবো।

হ্যা-হ্যা করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠে বিষ্টু বললে, আমি জানতাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে সাহায্য না করে তো কে করবে?

ভূতের মুখে রাম নামের মতো বিষ্টুর মুখে কথাগুলো শুনে সুলতা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বলতে থাকে বিষ্টু, আসলে ব্যাপার কি জানো, যে লোকটির হাতে কাজটা দেবার ভার সে আজ এখানে আসবে। তার থাকার জন্যে এখানকার একটা হোটেলে বন্দোবস্ত হয়েছে। অবাঙালী লোকটা এমনিতে ভালো। তবে কিনা একটু—

প্রতিটি কথা এভাবে অসম্পূর্ণ রাখায় কেমন যেন খটকা লাগে সুলতার। তাই সে বললে, বেশ তো কী করতে হবে আমাকে?

—তেমন কিছু না, বলতে বলতে আবার একটু শুকনো হাসি হাসে বিষ্টু, হোটেলে লোকটির সুখ সুবিধার দিকে একটু নজর দিতে হবে তোমাকে।

—আমাকে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর সুলতার, হোটেলে থাকবে তো আমি আবার কী নজর দেব?

—এই দ্যাখো, বলতে থাকে বিষ্টু, তুমি দেখছি তোমাদের হবিবপুরের সেই গেঁয়োই রয়ে গেছ। কিছুই জানো না। আরে বাপু, এরা সব বড় বড় সাহেব। যা-তা জিনিসে কি এদের মন ওঠে? এই—একটু মনোরঞ্জন আর কি?

—কি বললে? চমকে ওঠে সুলতা।

তেমনি শুকনো হেসে জবাব দেয় বিষ্টু, ঘাবড়াচ্ছো কেন? বাঘ তো নয় যে গিলে ফেলবে। মাত্র তো একটা রাতের মামলা।

লজ্জায় রাগে, দুঃখে স্তব্ধ হয়ে থাকে সুলতা। মানুষ কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছলে ঘরের স্ত্রীকে পরের মনোরঞ্জনের জন্যে হোটেলে পাঠাবার প্রস্তাব করতে পারে তা সে ভেবে পায় না।

সুলতার শুক্‌নো মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু আবার বললে, চিন্তা করো না, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসবো। আরে বাপু, এটুকু করলে যদি অত বড় কন্ট্রাক্টটা পাওয়া যায়—।

সুলতা যেন বোবা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। তার সারা দেহের ধমনী ও শিরা-উপশিরার রক্তস্রোত যেন হঠাৎ বন্ধ হেয়ে গেছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে বিষ্টুর। সুলতার মুখ দেখে তার মনের কথা টের পায় সে। সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরের হাল্‌কা চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে ওঠে কর্কশতা। বিরক্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, ওকি, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে যেন তোমাকে মরতে বলেছি।

আরে বাপু, ওসব সতীত্ব ফতিত্ব রাখো। ওতে আজকাল চিঁড়ে ভেজে না। লাখ লাখ টাকা আয় করতে হলে আজকাল এসব করতেই হয়। যাক্‌গে, আজ রাতে সেজেগুজে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। বেচাল হলে বিপদ হবে, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। কথার শেষে এঁটো হাতে বিষ্টু উঠে দাঁড়ায়, আর পাথরের মতো সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে সুলতা।

জামা-কাপড় পরে বিষ্টু বেরোতে যাবে, হঠাৎ সুলতা সেখানে এসে হাজির হয়ে কান্নাভেজা সুরে বলতে থাকে, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তার চাইতে আমাকে তুমি একটু বিষ এনে দাও। এভাবে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।

— আমি চাই। কর্কশ কণ্ঠে বলতে থাকে বিষ্টু, তোমাকে দিয়ে আমি কন্ট্রাক্টটা আদায় করতে চাই। যা বলছি তা করতেই হবে তোমাকে। ওসব নাকি কান্না অনেক দেখেছি। ওসবে আমার মন ভেজে না। কথার শেষে গট গট করে বেড়িয়ে যায় বিষ্টু।

কী করবে এখন সুলতা? কোথায় যাবে—কার কাছে যাবে? কার কাছে গিয়ে এই নরপিশাচের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা জানাবে? কে দেবে তাকে আশ্রয়?

না—না, কেউ নেই। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া পরিত্রাণ লাভের আর কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ, মৃত্যুই একমাত্র পথ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই বিরাট নদী। এপার ওপার প্রায় দেখা যায় না। ডায়মণ্ডহারবার শহরের অন্যতম আর্কষণ এই নদী আর মাত্র কয়েক মাইল এগিয়ে গিয়েই মিশেছে সমুদ্রে। এই নদীর জলই হতে পারে তার একমাত্র আশ্রয়। কেউ টের পাবে না। ভাটার টান থাকলে মৃতদেহটা হয়তো গিয়ে ঠেকবে সমুদ্রের তলদেশে। কিন্তু—।

এই কিন্তুটাকে নিয়েই সুলতার বিপদ। মৃত্যুকে বড়ই ভয় তার। মরতে সে চায় না। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায় সে। একটি ছোট্ট সংসার—একজন প্রেমময় স্বামী—একটি সাদাসিধে নিজস্ব জগৎ। এমনি একটি জগতের কথাই সে ভেবে এসেছিল বরাবর। এমনি একটি জগতের আকর্ষণেই জেঠু হরিহরের আশীর্বাদ নিয়ে সে এসেছিল এই সংসারে। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। স্ত্রীর মর্যাদা তো নয়ই, এমনকি তার সতীত্বও আর নিরাপদ নয় বিষ্টুর কাছে।

রাত তখন প্রায় দশটা। মফঃস্বল শহরের রাত। এর মধ্যেই চারদিক প্রায় নিশুতি হয়ে উঠেছে। নিজের বাড়ির কাছে একটা রিক্সা থেকে নামলো বিষ্টু। রং সে আজও চড়িয়েছে, কিন্তু আকণ্ঠ নয়। আজ যে তার অনেক কাজ। একটি গৃহস্থ বধূর সর্বনাশের পথ যে তাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে। তাকে নিয়ে হোটেলে যাওয়া। সেখানে সুলতাকে লোকটার হাতে তুলে দিয়ে লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্টরিটা বাগানো । কাজেই আজ তার বেসামাল হলে চলবে কেন?

বাড়ি ঢুকতেই পুরানো ঝি সামনে এসে হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললে, সব্বোনাশ হয়েছে দাদাবাবু, সন্ধ্যে থেকে বৌদিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আগেই জানতাম এমনটি হবে। এমন লক্ষ্মীর পতিমেকে রোজ রোজ অমন মারধোর—

— চুপ কর, বুড়ি ঝি'কে ধমকে ওঠে বিষ্টু, আগে বল্, কখন সে গেছে? তোরা এতগুলো মানুষ বাড়িতে থাকতে কেমন করে সে পালালো?

— সে কি গো দাদাবাবু, কখন চলে গেছে তার আমরা কী জানি? আমরা কি রাত দিন বৌদিদিমণির দিকে তাকিয়ে বসে থাকি? সংসারের কাজ কম্মো নেই?

লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট এভাবে হাতছাড়া হওয়ায় রাগে জ্বলতে থাকে বিষ্টু। রক্তবর্ণ চোখে সে কেবল তাকিয়ে থাকে বুড়ি ঝি'র দিকে। দাদাবাবুর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বলতে থাকে

বুড়ি, আমি বাপু হক্ কথার মানুষ, হক্ কথা বলবো। বৌদিদিমণিকে যদি একটু যত্ন আত্তি করতে, তা'হলে এমনটি ঘটতো নি। ছেলেমানুষ—

বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে বিষ্টু বুড়ির দিকে ধেয়ে যেতেই বুড়ি 'বাবাগো মাগো' বলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে থাকে বিষ্টু।

বাড়িতে ঝি চাকরদের' কাছ থেকে এটুকু মাত্র জানা গেল যে সুলতা কখন গেছে তাও যেমন কেউ জানে না, কোথায় গেছে তাও নয়। যাবার সময় সে তেমন কিছু সঙ্গে নিয়ে গেছে বলেও মনে হয় না। হয়তো এক কাপড়েই চলে গেছে। সম্বলের মধ্যে গায়ের সামান্য কয়েকখানা গহনা।

রাতভর সারা শহরটা চষে ফেললো বিষ্টু। সকালে লোক পাঠালে হবিবপুর, চক্ গোবিন্দপুরে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না সুলতাকে। মাঝখান থেকে কথাটা সেই দু'টো গ্রামে তো বটেই এমনকি আশে পাশের গাঁয়েও ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না।

দু'টো দিন ধরে সুলতাকে খুঁজে বেড়িয়ে নাজেহাল হয়ে অবশেষে বিষ্টু শরণাপন্ন হলো থানার-পুলিশের। তারা শহরের এই অবস্থাপন্ন অথচ দুশ্চরিত্র যুবকটিকে ভালই চেনে। থানার ও-সি একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, মাত্র তো ক'টা মাস বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই হাওয়া? হ্যাঁ মশাই, বিয়ের আগে অন্য কারুর সঙ্গে একটু ইয়ে টিয়ে—?

কথাটা যে বিষ্টুর একেবারেই মনে হয় নি তা নয়। কানাঘুষায় শতদলের কথাটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু বিয়ের পরে সুলতার চালচলনে তার কোনো আভাস পায় নি বলেই এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে নি।

ও-সি'র কথায় কিন্তু ফোঁস করে ওঠে বিষ্টু। বিরক্ত কণ্ঠে বললে, ওসব কী বলছেন বড়বাবু? আমার স্ত্রী সেরকম মেয়েই নয়।

— ভালো—ভালো, বলতে থাকে ও-সি, তবে কি আপনাদের মধ্যে তেমন বনিবনা ছিল না?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় বিষ্টু, না, ঠিক তা' নয়। তবে কিনা সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটু আধটু— ।

— তা তো বটেই, মুখ টিপে হেসে বলে ওঠে ও-সি, আসলে ব্যাপার কি জানেন বিষ্টুবাবু, কোনো স্ত্রীই চায় না তার স্বামী বেশি রাতে বেসামাল হয়ে বাড়ি ফেরে। আর কেউ না জানলেও আমরা তো জানি আপনি তাই করতেন। কতদিন বেশি রাতে আমাদের কনস্টেবলদের হাতে ধরা পড়েও আপনি ছাড়া পেয়েছেন। তাই বলছিলাম—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ও-সি একটু থামে। তারপর আবার বললে, ঠিক আছে, আমরা খোঁজ খবর করছি। খবর পেলেই জানাবো।

— আচ্ছা বড়বাবু, আমার স্ত্রী কিন্তু সাঁতার জানতো না।

জবাব দেয় ও-সি, আপনি জলে ডুবে আত্মহত্যার কথা বলছেন? ঠিক আছে। আমরা সেটাও দেখবো। নদীর জলে যদি তার ডেডবডি ভেসে ওঠে তো আপনি খবর পাবেন।

।।৬।।

এই কাহিনীর যবনিকা আবার উঠলো প্রায় পাঁচ বছর পরে বিহারের মজঃফুরপুর জেলায় এক গণ্ডগ্রামে। দেশজুড়ে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় তখন উগ্রপন্থীদের খুনের রাজনীতি চলছে। পথে-ঘাটে রোজই মানুষ খুন হচ্ছে। এর ঢেউ বিহারের কোনো কোনো এলাকায়ও

অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে।

এমনি দিনে এক গ্রীষ্মের দুপুরে একজন দেহাতি যুবতীকে দেখা গেল সম্পূর্ণ শুকনো একটি ছোট্ট নদীর পাড়ে উবু হয়ে বসে বালি খুঁড়ে জল তুলে মাটির কলসী ভর্তি করছে। প্রচণ্ড খরায় বিহারের এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের এই জলই একমাত্র ভরসা।

যুবতীর বয়স বছর পঁচিশ। চেহারায় দেহাতি চাষী শ্রেণীর ছাপ। মাথায় তেলহীন রুক্ষ চুল। গায়ে কয়েকখানা রূপোর অলঙ্কার, পায়ে রূপোর মল, হাতে কাঁচের চুড়ি। পরনের আধময়লা শাড়িখানাও দেহাতি ঢংয়ে পরা, ডান কাঁধে আঁচল। যুবতীর সাজসজ্জা ও চাল-চলনে যতই কেন না জড়িয়ে থাকুক বিহারের শুষ্ক প্রান্তরের রুক্ষতা, তার মুখখানার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেই সেই রুক্ষতার মধ্যে বাংলার সবুজ শ্যামলতার এমন একটা চিহ্ন চোখে পড়বে যা নাকি এই পাঁচ বছরে চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারে নি সুলতা।

মরে নি সুলতা। মরতে পারে নি। বিষ্টুর হাত থেরে পরিত্রাণ পেতে বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেই সে বুঝতে পেরেছিল এই পৃথিবীটা বড়ই কঠিন ঠাঁই। চারদিকেই ছড়িয়ে আছে লোভী শ্বাপদের দল যারা নাকি তার গায়ের ঐ ক'খানা গয়না পেয়েই খুশি নয়, তার ভরা যৌবনকে তছনছ করে দিতেই বেশি তৎপর। আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন সুলতাও প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে অন্যরকম হয়ে ওঠে। বাঁচাতে চেষ্টা করে নিজেকে। সফলও হয়। বুঝতে পারে এই পৃথিবীটা কেবল ঐ জাতীয় নরপিশাচেই পূর্ণ নয়, কিছু কিছু নরদেবতার অস্তিত্ব এখনও রয়েছে এই সংসারে। তাদের শুভবুদ্ধিই বোধহয় এই বিশ্বসংসারটাকে ধ্বংসের হাত থেকে এখনও কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে।

গায়ের গয়না ক'খানা চলে গেছে সুলতার, কিন্তু নারীত্বের গয়না এখনও তার অটুট। স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে সে বুঝতে পারে যে এভাবে অবলম্বনহীন হয়ে বেঁচে থেকে নারীত্বের সেই গয়নাটুকুও আর সে বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। নারী মাংসলোভীরা তা জোর করে ছিনিয়ে নেবেই। তাই এই মুহূর্তে তার একটু আশ্রয় চাই—নিশ্চিন্ত আশ্রয়— এই বিরাট পৃথিবীতে কে সেই নরদেবতা যে নাকি তাকে হাত ধরে কাছে টেনে নেবে?

সভ্যজগতের অসভ্য মানুষের হাত এড়াতে ঘুরতে ঘুরতে অসহায় সুলতা এসে পড়ে বিহারের এই পশ্চাৎপদ এলাকায় চাষী শ্রেণীর দেহাতি মানুষের মধ্যে। এদের শিক্ষা নেই, দীক্ষা আছে। হয়তো তথাকথিত সভ্যতাও নেই, কিন্তু শালীনতা বোধ যথেষ্ট।

একদিন গ্রাম্য রাস্তা ধরে যেতে যেতে সুলতার চোখে পড়ে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে একটা গাছের ছায়ায় বসে একটি তিন চার বছরের ছোট্ট মেয়ে কাঁদছে। সারা গায়ে মাথায় তার ধুলো। একটু দুরে একটা মাটির সরায় কয়েকমুঠো মুড়ি। গোটাকয়েক কাক বাচ্চা মেয়েটাকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই মুড়ি খেয়ে চলেছে।

ধুলো-মলিন শাড়িপরা সুলতা এসে দাঁড়ায় মেয়েটির কাছে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে দু'হাতে চোখ কচলে গম ক্ষেতের দিতে তাকিয়ে আধো আধো দেহাতি ভাষায় কি যেন বলছে যার একবর্ণও বুঝতে পারে না সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সেখানেই বসে পড়ে সুলতা। ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে তুলে নেয় । কাক তাড়িয়ে কথা বলতে বলতে মেয়েটিকে মুড়ি খাওয়াতে থাকে। এতক্ষণে কান্না থামিয়ে মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কেউ কারুর ভাষা বুঝতে না পারলেও ভাষার অতীত মানবিক আবেদনে তখন তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে সুলতা দেখতে পায় ভুট্টা ক্ষেতের মাঝামাঝি একটা

জায়গায় গাছের লম্বা পাতাগুলো নড়ছে। কয়েক মুহূর্ত সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতা। একজন মানুষ কাজ করছে সেখানে। হয়তো এই মেয়েটির মা। মেয়েকে গাছের ছায়ায় মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে মা বোধহয় মাঠের কাজে ব্যস্ত। একটু পরেই সে উঠে আসবে সেখান থেকে।

সুলতার অনুমানই সত্যি। অনেকক্ষণ মেয়েটির কান্নার শব্দ শুনতে না পেয়ে মানুষটি হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে। তবে সে মেয়েটির মা নয়, বাবা।

কিষেণলাল আহীরের বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। কালো মজবুত চেহারা। হাঁটুপর্যন্ত একখানা ধুতি, মাথায় বাঁধা একখানা ময়লা গামছা। পয়সার অভাবে বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল কিষেণলাল। কিন্তু স্ত্রীসুখ বেশিদিন সইলো তা তার। ছ'মাসের মুন্নিকে স্বামীর কোলে তুলে দিয়ে সে একদিন চোখ বুজলো। গাঁয়ের মানুষের শত অনুরোধ উপরোধেও মন টললো না তার। আর সে বিয়ে করলে না। একা হাতে মানুষ করতে লাগলে মুন্নিকে। আর সেই সঙ্গে ক্ষেতের কাজ।

কিষেণলালের প্রশ্নের অধিকাংশ কথা বুঝতে না পারলেও অনুমানের ওপর নির্ভর করে নিজের ভাষায় জবাব দেয় সুলতা। উভয়ে উভয়ের প্রশ্নোত্তরের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র বুঝতে পেরে তাতেই খুশি। কিষেণলাল একদৃষ্টে কেবল তাকিয়ে থাকে সুলতার দিকে। পুরুষের চোখের দৃষ্টির অর্থ স্পষ্টই বুঝতে পারে সুলতা। অপরিচিতা কোনো স্ত্রীলোকের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকা হয়তো অসভ্যতা, কিন্তু কিষেণলালের ঐ দৃষ্টির মধ্যে যে কোনো লোলুপতার আভাসমাত্র নেই তা কিন্তু সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুলতার কাছে। ছোট্ট মুন্নিকে কোলে নিয়ে অপরিচিতা সুলতাকে বসে থাকতে দেখে কিষেণলালের চোখে যে বিস্ময় ও কৌতূহল জেগে উঠেছিল তা' আর এখন নেই। পরিবর্তে সেই চোখে যেন ঝরে পড়ছে কৃতজ্ঞতা। অশিক্ষিত কিষেণলালের মুখে যদি ভাষা থাকতো তা'হলে হয়তো সে বলতো, তুমি যে দেশের লোকই হও না কেন, তুমি দেবী। তাই তো এই মানবশিশুর কান্নায় তুমি এগিয়ে এসে তাকে কোলে নিয়েছ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

সেই দিন থেকেই সুলতার ঠাঁই হলো কিষেণলালের সংসারে।

গ্রাম্য সমাজের নিয়ম-কানুন বড়ই কড়া, তা সে বাংলার গ্রামই হোক, আর বিহারেরই হোক। কিষেণলালের মতো একটা বৌ-মরা জোয়ান মরদের ঘরে সুলতার মতো একটি বাঙালী যুবতী। গ্রাম্য সমাজ ব্যাপারটাকে সহজে পারলে না মেনে নিতে। শুরু হলো কানা-ঘুষা, টানা-পোড়েন। অবশেষে সুলতাকে বিয়ে করে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলো কিষেণলালকে। বিহারী চাষীর বাঙালী বউ।

পাঁচটি বছর কেটে গেছে তারপর। এই পাঁচ বছরে সুলতা প্রাণপণে ভুলতে চেয়েছে বাংলাকে। হয়ে উঠতে চেয়েছে বিহারের গণ্ডগ্রামের এক চাষী বউ। শিখেছে দেহাতি ভাষা, শিখেছে তাদের আচার-আচরণ। মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে তাদের সঙ্গে। কিন্তু নিজের মুখের ওপর থেকে বাঙালী যুবতীর সবুজ লাবণ্যটুকু কি সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পেরেছে? না, পারে নি। আরও পারে নি বাঙালী ভাবনা চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। আজ সে সত্যিই কিষেণলালের ঘরণী। চাষী কিষেণলাল তাকে প্রকৃত অর্থেই দিয়েছে গৃহিণীর সম্মান, দিয়েছে তাকে দু'টি পুত্র সন্তান। আজ তার জমজমাট সংসার স্বামী-পুত্র কন্যা নিয়ে। এদেশের চাষীর ঘরে নিত্য দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যের মধ্যে সুলতা সুখী, সুলতা তৃপ্ত। সে যা চেয়েছিল, কিষেণলালের কাছে তাই পেয়েছে। সুলতা বাঙালী বলেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক কিষেণলাল বেশ সমীহ করেই চলে সুলতাকে। কিষেণলালের সংসারে সুলতার কথাই শেষ কথা।

এত পেয়েও মাঝে মাঝে কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে সুলতা। মনে পড়ে চক গোবিন্দপুরের কথা, মনে পড়ে ডায়মণ্ডহারবারের কথা। তার চাইতে বেশি করে মনে পড়ে তার স্নেহময় জেঠু হরিহরের কথা। এতদিন পরেও কিন্তু মনে সেই খটকা থেকেই গেছে সুলতার। সত্যিই কি সেদিন প্ল্যানচেটে হরিহরের আত্মাই এসে বিষ্টুর সঙ্গে তার বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে গিয়েছিলেন? প্ল্যানচেটের সেই কথা বাস্তবিকই কি হরিহরের? তার স্নেহময় জেঠু সেদিন কি ইচ্ছে করেই তার জীবনটাকে মাটি করে দিতে চেয়েছিলেন? নাকি সেদিন বিষ্টুর মতো একটা পশুর হাতে পড়েছিল বলেই আজ সে কিষেণলালের ঘরের সার্থক ঘরণী?

ডায়মণ্ডহারবারের বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে আসার মুহূর্তে সুলতা যে কয়েকটি টুকিটাকি বস্তু সঙ্গে করে এনেছিল তার মধ্যে হরিহরের একখানা ছবি ছাড়া সেই প্লানচেটের লেখা ও হরিহরের নিজের হাতে দিল্লি থেকে লেখা সেই চিঠিখানাও ছিল। আজও অবসর সময় হরিহরের সেই ছবিখানা দেখতে দেখতে সুলতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কৌতূহল মেটাতে প্ল্যানচেটের লেখার সঙ্গে হরিহরের লেখা মেলাতে গিয়ে দিশেহারা হতে পড়ে। বুঝতে পারে না সত্যিই দু'টো লেখায় কোনো মিল আছে কিনা। কিষেণলাল লেখাপড়া জানে না। স্ত্রীর কাণ্ড দেখে মিষ্টি হেসে দেহাতি ভাষায় জিজ্ঞেস করে, এসব কী, বহু? জবাবে সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেয় সুলতা, আমার জেঠুর তসবির, আর তাঁর লেখা খত। জেঠু আমাকে খুব পেয়ার করতো। তাই মাঝে মাঝে এগুলো দেখি। কিষেণলাল আর কিছু বলতো না। মুগ্ধ চোখে সুলতার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে যেতো।

সেদিন গ্রাম্যপথ ধরে জল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল সুলতা। মাথায় পর পর দু'টো জলের হাঁড়ি। ডান হাতটা আলতো ভাবে হাঁড়ির গায়ে। বাঁ হাতে ধরা ছোট ছেলেটার একটা হাত। বায়না ধরেছিল বলে ছোট ছেলেটাকে আজ সে সঙ্গে এনেছিল।

হঠাৎ রাস্তায় একটি লোকের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ায় সুলতা। থর থর করে কেঁপে ওঠে তার সারা দেহ। সতর্ক না থাকলে সেই মুহূর্তে জলের হাঁড়ি পড়ে গিয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে যেত। কিন্তু যাকে দেখে সুলতার এই ভাবান্তর সেই মানুষটির কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সুলতার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে চলতে থাকে নিজের পথে। লোকটির পরনে পাজামা, গায়ে মোটা কাপড়ের মলিন পাঞ্জাবি। পায়ে ধূলি-ধূসরিত স্যাণ্ডাল। মুখে কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি। উস্কো খুস্কো এক বোঝা চুল মাথায়।

লোকটি এগিয়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সুলতা। অবশেষে একসময় দ্বিধা কাটিয়ে সে বলেই ওঠে, বাবুজী!

সুলতার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ে শতদল। বিহারের এই গণ্ডগ্রামে কে তাকে 'বাবুজী' বলে ডাকলে? কে চিনে ফেললে তাকে? পশ্চিমবঙ্গের ফেরারী আসামী সে। কলকাতায় হুলিয়া বেরিয়েছে তার নামে। শ্রেণী শত্রু খতম অভিযানের একজন প্রথম শ্রেণীর পাণ্ডা শতদল মাইতি। স্কুল শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে এই কাজেই সে মেতে উঠেছিল। এখন ফেরার। মুজঃফরপুর জেলার এই গণ্ডগ্রামে এসে এক ঢিলে দুই পাখি মারছে— আত্মগোপন ও এখানকার সংগঠন।

— বাবুজী! আবার ডাকে সুলতা। শতদল পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় তার সামনে। হঠাৎ শতদল সুলতাকে চিনতে পেরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, একি সুলতা, তুমি? তুমি এখানে? এভাবে? আমরা তো ভেবেছিলাম—

আমি মরে গেছি, তাই তো? মাথা থেকে জলের হাঁড়ি নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে ওঠে

সুলতা।

— হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে। বলতে থাকে শতদল, কলকাতায় থাকলেও তোমার নিরুদ্দেশ হবার খবর কানে এসেছিল। অনেকেই ভেবেছিল স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তুমি নাকি আত্মঘাতী হয়েছ।

জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে সুলতার। বললে, চেয়েছিলাম তাই হতে, কিন্তু পারি নি।

— তাই বুঝি বিষ্টু ভট্চাযের হাত এড়াতে এখানে লুকিয়ে আছো?

চুপ করে থাকে সুলতা। শতদল একটু ম্লান হেসে বললে, আমিও তাই। তবে তুমি বিষ্টুর ভয়ে, আর আমি পুলিশের হাত এড়াতে।

কথার শেষে শতদল একটু থামে। তারপর সুলতার কৌতূহলী মুখের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে নিজের কথা বলে অবশেষে আবার বললে, এখানে নতুন জীবন শুরু করেছো নাকি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সুলতা।

— এটি বুঝি নতুন জীবনের ফসল? কথার শেষে সুলতার ছেলের দিকে তাকায় শতদল।

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে সুলতা।

— লোকটি কে?

সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দেয় সুলতা, এই গাঁয়েরই একজন চাষী।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। অবশেষে শতদলই আবার জিজ্ঞেস করে, কিরকম লাগছে এই পরিবেশ?

— ভালো।

— সুখী হয়েছো তো?

— জানি না। তবে শান্তিতে আছি।

একটু থেমে সুলতা জিজ্ঞেস করে, কোথায় আছো তুমি? কোন্ গাঁয়ে?

— বলা বারণ। তবে দু'একদিনের বেশি একজায়গায় থাকার উপায় নেই। বিহারের পুলিশও পেছনে লেগেছে।

অনুনয়ের সুরে বলে ওঠে সুলতা, এই তো কাছেই আমার বাড়ি। চলো না একবার।

মুখ টিপে হেসে শতদল বললে, তোমার মরদের কাছে আমার কী পরিচয় দেবে?

— পরিচয়? একটু সময় চিন্তা করে সুলতা বললে, আমি ইচ্ছে করে পরিচয় না দিলে সে জিজ্ঞেসও করবে না।

— তোমাকে এতই বিশ্বাস করে তোমার মরদ?

সুলতা কেবল একটু হাসে।

বাস্তবিকই তাই। কিষেণলালের চরিত্রের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না শতদলের। স্বামীর কাছে শতদলের পরিচয় দিতে গিয়ে সুলতা বললে, জানো, ডায়মণ্ডহারবারের সেই লোকটার সঙ্গে বিয়ের আগে এর সঙ্গে আমার ভাব-ভালোবাসা ছিল।

সুলতার কথায় শতদল চমকে উঠলেও কিষেণলাল কিন্তু চমকায় না। কৌতূহলী চোখে শতদলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, সাচ্ বাবুজী?

অস্বীকার করার আর উপায় নেই। তাই মাথা নেড়ে সায় দিতেই হয় শতদলকে।

কিষেণলাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তা'হলে একে বিয়ে করলে না কেন? এর সঙ্গে বিয়ে হলে তো সেই লোকটার অত্যাচার সহ্য করতে হতো না।

— নসীব—সবই নসীব, জবাব দেয় সুলতা, তবে একে সেদিন বিয়ে করলে তো তোমার ঘরে আসতাম না।

হো—হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে কিষেণলাল। হাসতে হাসতে বললে, ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ। তারপর শতদলের দিকে তাকিয়ে তেমনি হাসতে হাসতেই বললে, কি বলেন বাবুজী? সেদিন আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছিল, তাই না?

মানুষ যে কতখানি সহজ সরল হতে পারে সেদিন কিষেণলালের সঙ্গে পরিচয় না হলে হয়তো বুঝতে পারতো না শতদল। সেদিন সে আরও বুঝেছিল কিষেণলালের সংসারে সুলতা বাস্তবিকই সুখী।

আর একদিন শতদল কিষেণলালের বাড়ি এলে কথায় কথায় সুলতা বললে, আচ্ছা, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

— বলো।

— মনে আছে তোমার, আমার বিয়েতে জেঠুর সম্মতি আছে কিনা জানতে তোমরা প্ল্যান্‌চেটে বসেছিলে?

— মনে থাকবে না কেন? স্পষ্ট মনে আছে।

— সেদিন কি সত্যি সত্যি জেঠুর আত্মা এসে তোমার ওপর ভর করেছিলো?

— তা তো বলতে পারবো না। তবে প্ল্যানচেটে মিডিয়াম হয়ে বসলেই আমার ওপর কিসের যেন ভর হতো। সেদিনও তাই হয়েছিল।

— আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় প্ল্যানচেটের লেখা, আত্মার নিজের হাতের লেখা?

— বিলেতের প্রেততত্ত্ববিদ বেনেট সাহেব তো তাই বলেছেন।

সুলতা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে চুপ করে থাকে। শতদল বলে ওঠে, এতদিন পরে এ প্রশ্ন করছো কেন? এসব জেনে এখন তোমার কী লাভ?

জবাবে সুলতা বললে, লাভ লোকসান জানি না। তবে আমার আজও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে জেঠু জেনেশুনে ইচ্ছে করে আমাকে সেদিন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাই আমি এখানে এসেও সেই প্ল্যানচেটের লেখার সঙ্গে জেঠুর লেখা মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি।

— তাই নাকি? কৌতূহলী হয়ে ওঠে শতদল, বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় লেখাগুলো সঙ্গে করে এনেছিলে নাকি?

জবাবে সুলতা বললে, ইচ্ছে করে আনি নি। আমার মানিব্যাগের সঙ্গে চলে এসেছিল।

একটু থেমে সুলতা আবার বললে, আচ্ছা তুমি তো দেশ ছাড়ার পরে এতদিন কলকাতায় ছিলে, আমার মনে পড়ে জেঠুর কাছে যেন শুনেছিলাম যে কলকাতায় নাকি এমন লোক আছে যাদের কাজ কেবল হাতের লেখা পরীক্ষা করা। সত্যিই কি তাই? লেখা পরীক্ষা করে কি বলা যায় এটা কোন্ লোকের লেখা?

সুলতা থামতেই মৃদু হেসে শতদল বললে, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি? জেঠু তোমায় ঠিকই বলেছিলেন। একাজ যাঁরা করেন তাদের বলা হয় লেখার বিশেষজ্ঞ। কলকাতায় আমার একজন বন্ধু ছিল যার বাবা এখনও এই কাজ করেন।

একটু সময়ে চিন্তা করে সুলতা অনুনয়ের সুরে আবার বললে, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো না, সেই ভদ্রলোককে দিয়ে জেঠুর লেখার সঙ্গে প্ল্যানচেটের লেখার তুলনা করানো

যায় কিনা।

— তাতে তোমার লাভ?

জবাব দেয় সুলতা, বলেছি তো, লাভ-লোকসানের কথা নয়। এতদিন ধরে যে কৌতূহল আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। সত্যিই কি সেদিন জেঠুর আত্মা এসেছিল? সত্যিই কি জেঠু নিজের হাতে লিখে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন? কথার শেষের দিকে সুলতার কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারি হয়ে ওঠে।

স্থির চোখে সুলতার মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকে শতদল। তারপর বললে, কাজটা অবশ্যি তেমন কিছু নয়। শঙ্করকে একটা চিঠি লিখে কাগজগুলো তার কাছে পাঠিয়ে দিলেই সে তার বাবাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে দেবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শঙ্করকে চিঠি লিখি কী করে? তাকে চিঠি লিখলেই তো আমার এখানকার ঠিকানায় জবাব পাঠাতে বলতে হবে। কিন্তু আমার কোনো সঠিক ঠিকানাই তো নেই। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে। আজ এবাড়িতে, কাল ওবাড়িতে। এমনি ভাবেই তো আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

— একাজে তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শতদল বললে, হ্যাঁ, আরও চারজন। তবে বাঙালী আমি একাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমনি আমার মাথার দাম ধার্য করেছে নগদ দশ হাজার টাকা, তেমনি বিহার সরকারও ঐ চারজনের মাথার দাম হিসেবে মোটা টাকা ধার্য করেছে।

একটু থেমে শতদল ম্লান কণ্ঠে আবার বলতে থাকে, জানো সুলতা তুমি-আমি দু'জনেই বাংলা মুলুক ছেড়ে এসেছি। তুমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছ, আমি পাই নি। বোধহয় কোনোকালে পাবোও না।

— কেন পাবে না? এসব ছেড়ে দাও না।

— উপায় নেই সুলতা। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে দলের লোকেরা। ছেড়ে দিলেও রেহাই নেই। যাক গে, তুমি ঐ কাগজগুলো নিয়ে এসো। শঙ্করকে লিখে দিচ্ছি যাতে সে তার জবাব তোমার এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। সুযোগমতো একদিন এখানে এসে শঙ্করের জবাব দেখে যাবো।

কাগজপত্র নিয়ে নিজের ডেরায় এসে শঙ্করকে চিঠি লিখতে বসে শতদল—

প্রিয় শঙ্কর,

আশা করি ভালো আছো। কোথায় আছি জানতে চেও না। তবে জেনে রেখো সুখে নেই।

এই সঙ্গে দু'খানা কাগজ পাঠাচ্ছি—একখানা প্রেতাত্মার লেখা অর্থাৎ প্ল্যানচেটে আত্মাকে আনিয়ে তাকে দিয়ে লেখানো, অন্যটা সেই মানুষের মৃত্যুর আগের হাতের লেখা। তোমার বাবাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমাকে জানাবে লেখা দুটো এক লোকের কিনা। বিশেষ প্রয়োজন। নিচের ঠিকানায় জবাব পাঠিও।

আমার ভালবাসা নিও।

ইতি—
শতদল

ঠিকানা
Kishen Lal Ahir
Vill- Bargaon
P.O. – Verao
Dt. Mujaffarpur, Bihar.

একটি মাস কেটে গেছে তারপর। এই একমাসের মধ্যে সুলতার সংসারে কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও মনোজগতে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আর তার জন্যে দায়ী শতদল। যে অতীতকে সুলতা একদিন নির্বাসনে পাঠিয়ে কিষেণলালের সংসারটাকে নিজের বলে আঁকড়ে ধরেছিল, শতদলের হঠাৎ উপস্থিতি তার মধ্যে সৃষ্টি করল সামান্য আলোড়ন। যতই সামান্য হোক, তা' আলোড়ন তো বটে। আর সেই আলোড়নের ফলে মাঝে-মধ্যে ছন্দপতন ঘটতে শুরু করলো সুলতার চিন্তা ভাবনায়। নিজের মনটাকে যাচাই করতে গিয়ে সে এতদিনে বুঝতে পারে যে চেষ্টা করেও সে পুরোপুরি ভুলতে পারে নি শতদলকে। তার মনোবাসনা, শতদল প্রতিদিন অন্ততঃ একটিবার তার বাড়িতে আসুক। মুখে না বললেও সুলতা ভাব-ভঙ্গিতে সে কথা বলতে চেষ্টা করেছে তাকে। শতদল তা বুঝেছে কিনা জানে না সুলতা, কিন্তু শতদল আসে না। প্রতীক্ষা করে বিফল হয় মনের মধ্যে জমে ওঠে অভিমান, সময় সময় নিজের ওপরেই রাগ হয় সুলতার। কিষেণলালের অসন্দিগ্ধ সরল মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধী মনে হয় নিজেকে। এ তার নিজের কেমন ধারা আচরণ?

পার্টির সংগঠনের কাজে ও পুলিশের চোখ এড়াতে শতদল কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন অসময়ে হয়তো এসে হাজির হয় সুলতার বাড়িতে। সামান্য দু'চারটে কথাবার্তা। হয়তো জিজ্ঞেস করে, কলকাতা থেকে শঙ্করের কোনো জবাব এসেছে কিনা। তারপর হয়তো বলে, আসবে—আসবে। ব্যস্ত মানুষ ওর বাবা, তাই দেরি হচ্ছে। জবাব আসবেই।

অবশেষে একদিন এলো সেই প্রতীক্ষিত জবাব। শতদলকে সম্বোধন করে শঙ্করের স্পষ্ট জবাব। শঙ্কর লিখেছে, তার বাবা চিঠি দু'টো পরীক্ষা করে অভিমত দিয়েছেন যে লেখা দু'টো কখনোই একই লোকের নয়। তিনি নাকি আরও বলেছেন যে প্রেতাত্মা যদি এসেই থাকে তবে কার প্রেতাত্মা সেদিন প্ল্যানচেটে এসেছিল তা তিনি জানেন না। হতে পারে হরিহরের প্রেতাত্মাই এসেছিল। কিন্তু প্ল্যানচেটের লেখা যে হরিহরের নয় এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত।

চিঠির এইটুকু পর্যন্ত পড়ে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে সুলতা। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ অভিমত দিলেন যে প্ল্যানচেটের লেখা কখনই হরিহরের নিজের লেখা নয়। এই মুহূর্তে দারুণ এক তৃপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে সুলতার। কিন্তু তার সেই তৃপ্তিটুকু বেশিক্ষণ তার মনটিকে ভরিয়ে রাখতে পারে না। চিঠির পরের অংশটুকু তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক নতুন আলোড়ন। শঙ্কর লিখেছে—

প্ল্যানচেটের লেখা যখন হরিহরের নিজের নয়, তখন কার? এ প্রশ্নের জবাব তুমি না চাইলেও বাবার মনে প্রশ্নটা উদয় হয়েছিল। জবাব খুঁজতে গিয়ে তিনি হঠাৎ আমাকে লেখা তোমার চিঠিখানা দেখে ফেললেন। মনের মধ্যে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠলো। পুরো দু'টো দিন ধরে প্ল্যানচেটের লেখার সঙ্গে তোমার লেখা মিলিয়ে দেখে তিনি অভিমত দিলেন যে ঐ লেখা তোমারই নিজের। হয়তো প্ল্যানচেটে তুমিই হয়েছিলে মিডিয়াম। তোমার ওপরেই হয়তো সেদিন আত্মা ভর করেছিল। জবাব লেখা হয়েছিল তোমারই হাতে। তাই প্ল্যানচেটের লেখা মিডিয়াম ছাড়া অন্য কারুর নয়। লেখার মধ্যে 'ন', হ, জ, ল' প্রভৃতি অক্ষরগুলোর আশ্চর্য সূক্ষ্ম মিলই তার প্রমাণ।

প্রচণ্ড আলোড়ন সুলতার মনের মধ্যে। তবে কি শতদলই তাকে ঠকিয়েছে? সে নিজেই কি সেদিন ইচ্ছে করে নিজের খুশি মতো জবাব লিখেছিল? কিন্তু কেন? কী লাভ তার? তার কি সুলতাকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করার ইচ্ছে ছিল না বলে তার হাত এড়াতে এই

কারসাজিটুকু সেদিন করেছিল শতদল?

সেই মুহূর্তে শতদলের ওপর নিদারুণ অভিমানে মনটা ভারি হয়ে ওঠে সুলতার। তার সেদিনের ভালবাসার মূল্য না দিয়ে শতদল তাকে এড়াতে চেয়েছিল। ধোঁকা দিয়ে তাকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিল বিষ্টুর হাতে।

মেটে ঘরের দাওয়ায় খোলা চিঠিখানি হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে সুলতা। অভিমানের বাষ্প তার চোখের কোণে জলে পরিণত হয়ে টপটপ করে ঝরে পড়তে থাকে।

মনে মনে ভাবে, শতদল অবশ্যই আবার এখানে আসবে। অন্ততঃ শঙ্করের চিঠির খোঁজে আসবে। সেদিন সে তাকে কেবল একটি কথাই জিজ্ঞেস করবে, বলো তুমি, সেদিন তোমাকে ভালবেসে আমি কি কোনো অন্যায় করেছিলাম? আমার কুমারী জীবনের প্রথম পুজোর ডালি তোমাকে অর্পণ করে কি আমি ভুল করেছিলাম? সেই ভুলের মাশুল আদায় করতে গিয়েই কি তুমি আমাকে তুলে দিয়েছিলে বিষ্টুর হাতে?

আপন চিন্তায় বিভোর সুলতা। সারাদিন মাঠে কাজের শেষে কর্ম্মক্লান্ত শরীর নিয়ে কিষেণলাল কখন যে তার পাশে এসে বসেছে তা সে টের পায় নি। স্ত্রীর কান্নাঝরা মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দরদমাখা সুরে প্রশ্ন করে কিষেণলাল, কাঁদছো কেন? চিঠিতে কি কোনো খারাপ খবর আছে?

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয় সুলতা। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, না—না, সেসব কিছু নয়।

— তবে বুঝি দেশের চিঠি পেয়ে দেশের জন্যে মন কেমন করছে? সুলতার হাতে হাত রাখে কিষেণলাল।

একটু সময় চুপ করে থাকে সুলতা। তারপর কিষেণলালের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, সেই বাঙালীবাবু অনেকদিন এদিকে আসে নি। সে এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

কথাটা শুনেই কিষেণলালের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। তারপর স্ত্রীর আরও একটু কাছে সরে এসে তার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি কষ্ট পাবে বলে বলি নি। আজ চারদিন হলো বাঙালীবাবু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

———

সমুদ্র সুন্দরী

।। এক।।

পুলিস ক্লাব। ক্লাব শব্দটি আছে বলে কিন্তু এটা কোন খেলাধুলোর ক্লাব কিংবা ঐ জাতীয় কিছু নয়। আসলে এটা পুলিসের একটা সাময়িক আস্তানা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সব পুলিস অফিসারেরা জেলা সদরে কোন কার্যোপলক্ষে আসে, তারা এসে ওঠে এই আস্তানায়। সামান্য অর্থব্যয়ে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে এখানে। এছাড়া কিছু তরুণ শিক্ষানবিস পুলিস অফিসারও প্রায় পাকাপাকি ভাবে এখানে আশ্রয় নেয়।

আমি নিজেও একজন শিক্ষানবিস পুলিস অফিসার। সেই সূত্রে জেলা সদরের এই পুলিশ ক্লাবে আমিও থাকি। আর আছে আমারই বয়সী আরও কয়েকজন অফিসার।

সেদিনটা ছিল রবিবার। থানার কাজ-কর্ম শিখতে দু-বেলাই থানায় উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকলেও সেদিন বিকেলে আমরা কেউই থানায় যাই নি।

একটু আগেই ক্লাবের লাগোয়া থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বেজেছে। চিত্ত তার খাটিয়ায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সেই বিকেল চারটে থেকে এই ছ'টা পর্যন্ত জল কালি ঘষেই চলেছে তার চামড়ার ক্রসবেল্টে। ঘষা তো নয়, যেন আলতো ভাবে আদর করছে নিজের প্রিয় বেল্টটিকে। উল্টো দিকের খাটিয়ায় চিত হয়ে শুয়ে নিরঞ্জন ওরফে নিরু টিকা-টিপ্পনি কেটে চিত্তকে ক্ষ্যাপাতে ব্যস্ত। একটু দূরে আর একখানা খাটিয়ায় শুয়ে আমি একখানা গল্পের বইয়ের মধ্যে মন বসাতে চেষ্টা করছি।

পাশের রান্নাঘরে শুনতে পাচ্ছিলাম অমিয়র কণ্ঠস্বর। সে তার স্বভাবসিদ্ধ শিথিল কণ্ঠে ক্লাবের রান্নার উড়ে ঠাকুর জগন্নাথকে উপদেশ দিচ্ছিল কেমন করে আটার রুটি গরম রাখা যায়। বলা বাহুল্য, অমিয় ছিল আমাদের ক্লাবের সেই মাসের ম্যানেজার।

আমাদের পাশের খাটিয়ায় ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে শীতল। নির্বিরোধী। কোন ব্যাপারেই সে সাতে-পাঁচে থাকে না। সর্বদাই সে তার গোঁফজোড়া নিয়ে ব্যস্ত। বাঁ হাতে একখানা ছোট আয়না নিয়ে ডান হাতে একখানা ব্লেডের আধখানা ধরে অপূর্ব দক্ষতায় সে গোঁফজোড়ার সৌন্দর্য-সাধনে ব্যস্ত। গোঁফ কাটতে গিয়ে কখনও সে এ গাল ফুলোচ্ছে। কখনও ও গাল। কখনও বা জিভ দিয়ে ওপরের ঠোঁটখানাকে ঠেলে তুলে তাতে ব্লেডের আঁচড় দিচ্ছে। নিরু মাঝে মাঝে ঐ অবস্থায় হাসির কথা বলে শীতলকে হাসাতে চেষ্টা করে ওর বিপদ ডেকে আনতে সক্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু শীতল নির্বিকার। হাসি তো দূরের কথা, মুখের ওপর একটা ভাঁজও ফুটে ওঠে না তার।

এমনি একটা পরিস্থিতিতে হঠাৎ ক্লাবে এসে হাজির হলেন আমাদের লাইকিং দা। বেঁটে-খাটো চেহারা। মাথায়কোঁকড়া চুলের অধিকাংশই সাদা। ছোট কুতকুতে চোখ জোড়ায় সর্বদাই একটা কৌতুকের ছাপ। বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে যে কোন একটা হতে পারে। দু পাটি দাঁতই বাঁধানো। কথা বলার সময় ওপরের পাটি স্পষ্ট নড়বড় করতে থাকে। মুখে সবসময়ই খোঁচা খোঁচা পাকা দাঁড়ি। হাফ হাতার একটা জামার ওপর ঢলঢলে একটা প্যান্ট কোমরের বদলে প্রায় বুকের কাছে জড়ো করে মান্ধাতার আমলের একটা বেল্ট দিয়ে

বাঁধা। হাতে একটা মাঝারি চটের ঝোলা। তাঁর নিত্যসঙ্গী এই ঝোলাটি। ঐ ঝোলাটির মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আছে। দাঁত খোঁটার খড়কে থেকে শুরু করে নখ কাটার নরুণ পর্যন্ত।

বয়সে আমাদের বাবার চেয়ে বড় হলেও লাইকিংদা ঠিক সমবয়সীর মত মেশেন আমাদের সঙ্গে। মজার মানুষ এই লাইকিংদা। ধূমকেতুর মত যখন তখন এসে হাজির হন এই পুলিস ক্লাবে। ঘণ্টা কয়েক, বড় জোর একটা রাত থাকেন আমাদের কাছে। আবার পরের দিনই সকালে উঠে ঝোলাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। লাইকিংদা কোথায় থাকেন, সংসারে তার কে কে আছে, কিছুই জানি না। প্রশ্ন করেও এর জবাব পাওয়া যায় না তাঁর কাছে। মুচকি হেসে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যান তিনি। শুধু আমাদের কাছেই নয় জেলার গোটা পুলিস মহলেই লাইকিংদা পরিচিত। সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি।

শোনা যায় লাইকিংদা নাকি এক কালে পুলিসের দারোগা ছিলেন। কিন্তু কোন্ জেলায় কাজ করেছেন তিনি, কবে রিটায়ার করেছেন এ সম্বন্ধেও কখনও কিছু বলতেন না তিনি। কেউ কিছু জানত না। তবে তাঁর পুলিসি জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি যখন আমাদের শোনাতেন আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকলেও কাহিনীর শেষে আমরা প্রত্যেকেই মনে মনে বলতাম, গুল—মস্ত গুলবাজ এই লোকটি। এই নিয়ে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়তাম না আমরা, কিন্তু লাইকিংদা নির্বিকার। কোন সমালোচনাই যেন স্পর্শ করে না তাঁকে। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেন, কী বললি? ঘোড়ার ডিম খেলে যা! আমি গুল মারছি? তাই যদি বুঝিস, আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে চাস কেন, হতভাগারা?

সত্যিই তাই! লাইকিংদাকে পেলে কেউ ছাড়ে না। এমনকি জেলার ডাকসাইটে অফিসাররাও হাতের জরুরী কাজ ফেলে রেখে লাইকিংদার সঙ্গে দু-দন্ড কথা বলতে ভালোবাসে। আসলে তাঁর কথা বলবার ঢংয়ের মধ্যেই এমন একটা যাদু আছে, যা নাকি আকর্ষণ করে সবাইকে।

লাইকিংদার এই নামটা আমাদেরই দেওয়া। তাঁর আসল নাম সিদ্ধেশ্বর দাসগুপ্ত। বাঁকুড়া জেলায় তাঁর আসল বাড়ি কি না জানি না, তবে তাঁর কথার মধ্যে স্পষ্ট বাঁকুড়ার টান। কখনও রাগতেন না তিনি। তবে নিজের মনোমত কোন কথা না হলেই বারে বারে কেবল একটা কথা ব্যবহার করতেন—ঘোড়ার ডিম খেলে যা! এটা অনেকটা মুদ্রাদোষ তাঁর।

সিদ্ধেশ্বর দাসগুপ্ত কেমন করে যে আমাদের কাছে লাইকিংদা হয়ে উঠেছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। আসলে এই নতুন নামের আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্বটাই নিরুর। প্রথম দিন তাঁকে এই নাম ধরে ডাকতেই লাইকিংদা নিরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা আবার কী ধরনের নাম রে? এত কাল সিধুদা বলে চালালি, আজ হঠাৎ এই ইংরেজি নাম কেন?

নিরু মুখ টিপে হেসে জবাব দিয়েছিল, আপনাকে তো আমরা সবাই দারুণ লাইক অর্থাৎ পছন্দ করি। তাই এই নামেই এবার থেকে ডাকব আপনাকে।

—বেশ তো, যা ইচ্ছে ডাক্। সেই তোদের শেক্সপীয়র কী যেন বলেছিলেন, নামে কী যায় আসে—এমনি ধরনের একটা কী যেন, তাই না?

পরের দিন সকালে লাইকিংদা চলে যেতেই আমরা নিরুকে জিজ্ঞেস করি, কী রে, এত নাম থাকতে সিধুদার এই লাইকিং নামটা রাখলি কেন? সত্যিই তাঁকে আমরা সবাই লাইক করি বলে?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে কৌতুক কণ্ঠে নিরু বলল, সন্ধি—ইংরেজি সন্ধি।

—সেটা আবার কী?

জবাব দেয় নিরু—উনি আমাদের যে সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনান, তার সাড়ে পনের আনাই যে গুল, তা তো স্বীকার করিস?

মাথা নেড়ে সায় দিই আমরা। নিরু বলতে থাকে, তাই ওঁর নতুন নাম। কিং অব লাই— মিথ্যার রাজা। তাই এই লাইকিং শব্দটি তৈরি করেছি।

সেই থেকে সিধুদা আমাদের কাছে হয়ে উঠলেন লাইকিংদা।

লাইকিংদা ক্লাবে ঢুকতেই আমি বই বন্ধ করে খাটিয়ায় উঠে বসে আহ্বান জানাই তাঁকে—আসুন, আসুন লাইকিংদা। কতদিন পরে এলেন এবার!

নিরু তার বিশাল দেহ নিয়ে তড়াক্ করে প্রায় লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে লাইকিংদাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, আসুন আসুন দাদা। তা ভাইদের ভুলে এতকাল অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিলেন নাকি?

সারা মুখে একটা প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে লাইকিংদা নিরুর খাটিয়ার কোণে বসতে বসতে বলেন, সময় পাই কোথায় বল?

—সে কি দাদা, আপনি আবার এই বয়সে কোথাও কোন চাকরি টাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন নাকি?

—রাম কহো! এই বয়সে ওসব চাকরি-টাকরি আর পোষায় না বাপু। তবে জানিস তো, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমারও সেই অবস্থা। চাকরিতে ইতি টেনেছি সেই কবে, কিন্তু এখনও—

কথাটা শেষ না করেই লাইকিংদা থেমে যান। এবার আমি জিজ্ঞেস করি, এই বয়সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ সেজে তদন্ত করে বেড়াচ্ছেন না কি দাদা?

প্রায় তেমনি অবস্থা।—কথাটা বলেই লাইকিংদা চিত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে হতভাগা, তুই এই অসময়ে বেল্ট নিয়ে পড়লি যে!

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় নিরু—না দাদা, অসময়ে নয়। সময় মতই ও কাজ শুরু করেছিল। শেষ হতে অসময় হয়ে গেল। বিকেল চারটে থেকেই ও বেল্টে জল-কালি লাগিয়ে চলেছে।

চিত্ত একটু হেসে বললে, ঐ কালো মোষের কথা বিশ্বাস করবেন না লাইকিংদা। এই তো কিছুক্ষণ আগে আরম্ভ করেছি। কাল মাস্টার প্যারেড্ আছে কিনা।

—ও হো, তাই তো। কাল সোমবার তোদের মাস্টার প্যারেড। তা বেশ, ভাল করে জুতো-বেল্ট পরিষ্কার কর দাদা।

লাইকিংদা এবার শীতলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা তোর খবর কী, শেতল? তুইও বুঝি মাস্টার প্যারেডের জন্যে তৈরী হচ্ছিস?

শীতল এতক্ষণে হাতের ব্লেড নামিয়ে রেখে আয়নার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে লাইকিংদার দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললে, হ্যাঁ দাদা, গোঁফ-জোড়াকে ঠিক—

—বাগে আনতে পারছে না। —শীতলের মুখের কথাটা শেষ করে নিরু মুখ টিপে হাসে।

ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে অমিয় এসে হাজির হয়। লাইকিংদাকে দেখে সোৎসাহে বলে ওঠে, আরে লাইকিংদা যে। তা দাদা, রাতে থাকবেন তো এখানে? জগন্নাথকে আপনার স্পেশাল রুটির কথা বলে দিই?

নির্মল হাসি হেসে লাইকিংদা বললেন, তা বলতে পারিস। তবে তার আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর্ তো ভাই।

হঠাৎ রান্নাঘরে আমাদের কম্বাইন্ড হ্যান্ড উড়িয্যাবাসী জগন্নাথের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে— মু পারিবি না—মু পারিব না—

লাইকিংদা বুঝতে না পারলেও আমরা জগন্নাথের ওই 'মু পারিব না' কথাটার অর্থ বুঝতে পারি। আসলে উড়িষ্যাবাসী জগন্নাথ লাইকিংদাকে ঠিক পছন্দ করে না। কারণ হচ্ছে

তাঁর ঐ স্পেশাল রুটি। লাইকিংদা খুব কম খেতে অভ্যস্ত। রাতে মাত্র দু-খানা আটার রুটি ও সেইসঙ্গে সামান্য একটু গুড়ের বেশি আর কিছু খান না। কিন্তু ওই দু খানা রুটি তৈরি করার ঝকমারি অনেক। পাঁচশো গ্রাম আটাকে ন্যাকড়ায় ছেঁকে ছেঁকে পঁচিশ গ্রামে দাঁড় করাতে হবে। তার মধ্যে সামান্য একটু নুন ফেলে দিয়ে তা দিয়ে লুচির মত সাইজের দু খানা রুটি তৈরি করে তাকে উনুনের পাশে রেখে বিস্কুটের মত লাল করতে হবে। কিন্তু পুড়বে না একটুও। এই দু খানা রুটিই মাত্র খাবেন লাইকিংদা। এতে খরচ কিছুই নেই। কিন্তু পরিশ্রম যথেষ্ট। তাই উনি এখানে এলেই জগন্নাথের মুখখানা ভার হয়ে ওঠে।

।। দুই।।

ক্লাব-ম্যানেজার অমিয়র হুকুমে লাইকিংদার জন্যে চায়ের দোকান থেকে চা এলো আর সেই সঙ্গে এল গোটা কয়েক বিড়ি। লাইকিংদা সিগারেটের বদলে বিড়ি খেতে পছন্দ করেন। তাঁর মতে, বিড়ির ধোঁয়া নাকি মানুষের মগজকে পরিষ্কার রাখতে অদ্বিতীয়। সেকালে দেশে যখন সিগারেটের প্রচলন ছিল না, থানার দারোগাবাবুরা নাকি ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতেন। আর তাতেই নাকি তদন্তের সময় ঘটনার জট অনায়াসেই খুলে ফেলতেন তাঁরা। সমাধান করতেন কঠিন সব রহস্যের, যা নাকি এ কালের দারোগাবাবুরা সিগারেট মুখে দিয়ে পারেন না। বিড়ির নাকি এমনি মাহাত্ম্য।

চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে নিরুর খাটিয়ায় গ্যাঁট হয়ে বসলেন লাইকিংদা। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া সহযোগে চা পান করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি তুই? প্রাইভেট ডিটেকটিভের কথা? তা একরকম বলতে পারিস। তবে জীবনের যে ঝুঁকি আমাকে নিতে হয়েছিল, তাতে আমি যে আবার ফিরে এসে তোদের দেখতে পাব, সে আশা আর ছিল না। নেহাত ঈশ্বরের দয়া আর গুরুর কৃপার জোরেই বেঁচে গিয়েছি।

—কী হয়েছিল দাদা? ডাকাতির তদন্ত করতে গিয়ে ডাকাত দলের পিছু নিয়েছিলেন নাকি?—জিজ্ঞেস করে অমিয়।

লাইকিংদা জবাব দেন, ঘোড়ার ডিম খেলে যা! আমি কি তোদের মত পুলিস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছি যে, ডাকাতি মামলায় তদন্তে যাব? তাহলে তোরা অর্থাৎ থানা-পুলিস দেশে আছে কেন? ও সব তো তোদের কাজ।

এতক্ষণে চিত্ত মিনমিন করে বললে, তাহলে কি কোন স্মাগলার চোরাকারবারীর খপ্পরে পড়েছিলেন?

—না রে না। তার চাইতে কোটি গুণ শক্ত একটা রহস্যময় কাজের ভার পড়েছিল আমার ওপর। আর সেই রহস্যের সমাধান আমি যে ভাবে করেছি, তা যদি পত্রিকাওয়ালারা টের পেত তাহলে কি আর রক্ষা ছিল আমার? ঘটনাটা ফলাও করে ছাপা হতো কাগজে আর তারই ফলে আমাদের দেশে যেসব বিদেশী গুপ্তচরেরা রাতদিন এ দেশের সর্বনাশ সাধনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের হাতেই বেঘোরে আমার প্রাণটা যেত! আমার ওপর ভার পড়েছিল এমন একটা ভয়ঙ্কর রহস্যের সমাধানের যার কোন কূলকিনারা স্বয়ং দিল্লীর সি. বি. আই-কে দিয়েও করানো হয়নি।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে প্রায় নিভন্ত বিড়িটার আগুন এক দমকা টানে উসকে দিয়ে বলতে থাকেন লাইকিংদা, প্রায় মাস তিনেক আগে হঠাৎ একদিন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে এক জরুরী তলব এল আমার কাছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

খবরটা পেয়ে আমি তো অবাক। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার তো তেমন একটা পরিচয় নেই। তিনি হঠাৎ আমাকে তলব করবেন কেন?

যাই হোক, ডেকেছেন যখন তখন যাওয়াই উচিত। তাই একদিন এসে হাজির হলাম রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। বেয়ারার হাতে নিজের নামটা লিখে স্লিপ দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এসে জিজ্ঞেস করেন, আপনিই কি মিস্টার সিদ্ধেশ্বর দাসগুপ্ত?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিতেই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে এর আগে আর কখনো ঢুকি নি। প্রয়োজন হয়নি বলেই ঢুকিনি। নইলে দিল্লীতে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘরের দরজা যার কাছে সর্বদাই খোলা থাকে, তার পক্ষে—

কথাটা শেষ না করেই লাইকিংদা এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকান যার একমাত্র অর্থ—ইচ্ছে হলে তো যে কোন সময়ই আমি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকতে পারি। এটা আর এমন কী?

বলতে থাকেন লাইকিংদা, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরখানা কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো। তোরা তো জানিস, ঠান্ডা আমি সহ্য করতে পারি না। সেই দারুন গ্রীষ্মেও মুখ্যমন্ত্রীর এয়ার-কনডিশনড ঘরে ঢুকে বেশ একটু শীত-শীত করছিল আমার।

মুখ্যমন্ত্রী খাতির করে আমাকে একটা নরম গদিআঁটা চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হট অর কোল্ড?

আমি ভাবলাম, মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইছেন আমার গরম অথবা ঠান্ডা লাগছে কি না? শীত-কাতুরে আমি তাই জবাব দিলাম, কোল্ড।

মুখ্যমন্ত্রী একটা বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারা পেছনের দরজা দিয়ে আমার জন্যে আইসক্রীম নিয়ে এসে সামনের টেবিলের ওপর রাখল।

লাইকিংদা একটু থামতেই আমরা হেসে উঠলাম তাঁর দুর্দশার কথা চিন্তা করে। লাইকিংদাও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বলতে থাকেন, বোঝ্ আমার অবস্থা তখন। কোথায় একটু গরম চা বা কফি খেয়ে শরীরটা গরম করব, তার বদলে কিনা আইসক্রীম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর উপায় কি বল্? লজ্জায় নিজের ভুলের কথা আর স্বীকার করতে পারি না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কাজেই প্রায় দাঁতকপাটির মধ্যেই আমাকে খেতে হল সেই আইসক্রীম।

খাওয়ার শেষে মুখ্যমন্ত্রী আমার পরিচয় নিলেন। দারোগার চাকরি থেকে কবে রিটায়ার করেছি প্রভৃতি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, আপনার মত একজন গুণী ব্যক্তি হাতের কাছে থাকতে আমি কিনা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিসও কোনদিন আপনার কথা বলেন নি আমাকে। শেষে কিনা দিল্লী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিফোন করে আপনার কথা বলাতেই আমি জানতে পারলাম।

একটু থেমে মুখ্যমন্ত্রী আবার বলতে থাকেন, আপনাকে পেয়ে এতদিনে আমার আশা হয়েছে রহস্যের একটা সমাধান হয়ত হবে। এ রাজ্যের পুলিস তো কিছুই করতে পারল না। আই. জি. পি. আমাকে জানালেন, 'স্যার, নদীনালার ব্যাপার হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু বিরাট সমুদ্রের ব্যাপারে আমাদের অফিসাররা কী করবে? আপনি স্যার, ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে একবার ব্যাপারটা তদন্ত করতে বলুন।'

বলতে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী, আই. জি. পির.-র পরামর্শমত আমি দিল্লীতে ডিফেন্স মিনিস্টারকে টেলিফোন করব কি না ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের তো আজকাল নামডাক, ওদের দিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করালে কেমন হয়?

রাজ্যের পুলিস যখন গোটা ব্যাপারটাকে গাঁজা বলে উড়িয়ে দিল, তখন দেখা যাক সি. বি. আই. এই রহস্যের কোন সমাধান করতে পারে কি না। এই ভেবে আমি টেলিফোন করলাম দিল্লীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি সব শুনে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'সি. বি. আই-কে দিয়ে না হয় তদন্ত করাতে পারি, কিন্তু তাতে কি কোন ফল হবে? তার চাইতে আপনাদের সিদ্ধেশ্বরবাবুকে দিয়ে তদন্ত করান। ভদ্রলোক রিটায়ার করলেও তদন্ত সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান। আমাদের দেশ বলেই ভদ্রলোককে দারোগা হিসেবেই রিটায়ার করতে হয়েছে। বিলেত হলে ভদ্রলোক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কমিশনার থেকে রিটায়ার করতেন।'

লাইকিংদা যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাকিয়ে দেখি উপস্থিত সকলের মুখেই একটু চাপা হাসি। লাইকিংদা কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে বলে যেতে থাকেন, আইসক্রীমের ঠান্ডায় আমার দাঁতকপাটি তখন অনেকটা খুলে গেছে। তাছাড়া বিশ্বাস কর তোরা, সেই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নিজের প্রশস্তির কথা শুনে বাস্তবিকই একটু লজ্জা করছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি, তা স্যার, আসল রহস্যটা কী?

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, একজন মানুষ।

—মানুষ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন মানুষ। কোন্ দেশের মানুষ জানি না। কেন সে এ কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাও জানি না। কিন্তু এটা ঠিক তার অত্যাচারে সুন্দরবন অঞ্চলের জেলেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকজন মারাও পড়েছে ইতিমধ্যে। সুন্দরবন অঞ্চলের এম. এল. এ.-রা আমার কাছে একটা স্মারকপত্রও দিয়েছেন। তাতে তাঁরা জানিয়েছেন, এই অত্যাচারের যদি কোন বিহিত না হয়, তাহলে ঐ অঞ্চলের জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ করে দেবে। আর তার ফলে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে কলকাতার মানুষেরা আর মাছের মুখ দেখতে পাবে না। এতে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধবে। রাজ্যের মন্ত্রীমন্ডলীর ওপর আস্থা হারাবে তারা। এবার বুঝতে পেরেছেন কেন আমি এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি?

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় মাথা নেড়ে আমি সায় দিলাম। তারপর বললাম, কে সেই লোকটা যার সম্পর্কে রাজ্যের এত বড় পুলিস-বাহিনীও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না? লোকটা কি এতই শক্তিধর?

তা জানি না। —মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন—তবে লোকটা যে সাঁতারে খুবই পটু তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা জেলেদের ওপর কেমন ধরনের অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে?

মুখমন্ত্রী আমার কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে একটা সরকারী ফাইল আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই ফাইলের কাগজপত্র পড়ে দেখুন। এর মধ্যেই সব খবর পাবেন। এমন কি আই. জি. পি.-র রিপোর্টও রয়েছে এর মধ্যে।

ফাইলটা হাতে নিয়ে একখানা করে পাতা ওল্টাতে থাকি আমি। ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। সুন্দরবন অঞ্চলের জেলেদের অভিযোগ যে, প্রায় বছর খানেক ধরে একটা লোক মাঝ-সমুদ্রে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লোকটা সাঁতারে আশ্চর্য রকমের পারদর্শী। গভীর সমুদ্রে পর্যন্ত লোকটি জলের নীচে ডুব সাঁতার কেটে বেড়ায়। ঝড়-জল কিছুই সে পরোয়া করে না। সেই অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে কোন একটি জেলের ডিঙির কাছে আসে। তারপর বিদ্যুৎবেগে পা দিয়ে লাথি মেরে সে উল্টে দেয় ডিঙি। জেলেদের সারাদিনের পরিশ্রম, ঝুড়ি ভর্তি মাছ ভেসে যায় সমুদ্রে। কেউ বা ডুবে মরে সমুদ্রের জলে।

স্থানীয় পুলিস অনুসন্ধান করে নাকি জানিয়েছে, ব্যাপারটা স্রেফ গাঁজা। ঐ গভীর সমুদ্রে

একা একা এমনি ভাবে সাঁতার কাটার হিম্মত কোন মানুষের থাকতে পারে না। আসলে জেলেরা ভুল দেখেছে। হাঙর বা ঐ জাতীয় কোন সামুদ্রিক জীব হয়তো জেলেদের নৌকো উল্টে দেয় এমনিভাবে। পুলিস নাকি আরও লক্ষ্য করেছে, সমুদ্রের ঐ অঞ্চলটুকুর বাইরে আর দেখা যায় না জীবটিকে। জেলেদের নৌকোও সেখানে নিরাপদ। কাজেই স্থানীয় পুলিস জেলেদের উপদেশ দিয়েছে, সমুদ্রের ঐ অঞ্চলে না যেতে। কিন্তু জেলেরা সেদিকে না গিয়ে পারে না। সব চাইতে বেশি মাছ পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলেই।

পড়া শেষ করে আমি ফাইলটা বন্ধ করতেই মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, কী বুঝলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু?

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম, ব্যাপারটা রহস্যময় হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে। যদি সেই প্রাণীটা বাস্তবিকই কোন মানুষ হয়, তাহলে এটা সত্যিই রহস্যময়। মাসের পর মাস একটা মানুষ গভীর সমুদ্রে সাঁতার কেটে এমনিভাবে জেলেদের নাজেহাল করে চলেছে কেন? কী তার উদ্দেশ্য? লোকটার পরিচয়ই বা কী? আর যদি অন্য কোন সামুদ্রিক জীব হয়, তো ব্যাপারটা জলের মত সহজ। কোন বিশেষ কারণে জীবটা ঐ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করে, আর হাতের কাছে যে জেলে ডিঙি পায় সেটাকেই ডুবিয়ে দেয়।

আমি থামতেই মুখ্যমন্ত্রী আবার বললেন, কিন্তু ঐ এলাকার এম. এল. এ.-রা নিঃসন্দেহ যে, এসব একজন মানুষের কান্ড। জেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা নাকি জানতে পেরেছেন যে, জেলেদের মধ্যে অনেকেই সেই লোকটাকে দেখেছে।

আর কিছু না বলে আমি চুপ করে থাকি। মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, এই রহস্যের সমাধান একমাত্র আপনাকে দিয়েই হতে পারে সিদ্ধেশ্বরবাবু। আপনি দয়া করে কাজটা হাতে নিন। পারিশ্রমিকের কথা না হয় না-ই বললাম, এই কাজে আপনি আমার সরকারের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাবেন। তদন্তের ব্যাপারে আপনার যখন যা প্রয়োজন খোদ আই. জি. পি-র কাছ থেকেই তা আপনি পাবেন। তার ওপর আমার তেমনি নির্দেশই দেওয়া থাকবে। এখন বলুন, আপনি রাজী তো?

লাইকিংদা এইখানে একটু থামেন। তারপর নিরুর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, তোরা তো জানিস, আমি কখনও চট করে কাউকে কোনরকম কথা দিই না। বিশেষ করে কোন তদন্ত সম্পর্কে সর্বদাই আমি বেশ ভেবে চিন্তে কাজ করি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—জোর করে মুখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে নিরু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

আয়নার দিকে তাকিয়ে গোঁফ জোড়ার ওপর ব্লেডের আঁচড় কাটতে কাটতে শেতল জিজ্ঞেস করে, শেষ পর্যন্ত তদন্তের ভার হাতে নিলেন, লাইকিংদা?

সঙ্গে সঙ্গে নিরু বলে ওঠে, তুই একটা আস্ত উজবুক, শেতল। তদন্তের ভার যদি হাতেই না নেবেন, তাহলে আর রহস্যের সমাধান উনি করলেন কেমন করে? আর রহস্যের সমাধানই যদি করতে না পারলেন, তাহলে আর সেই কাহিনী আমাদের শোনাতে বসেছেন কেন?

মুখের ওপর একটু বিজ্ঞের হাসি ফুটিয়ে তুলে লাইকিংদা শেতলকে বললেন, হ্যাঁ রে ভাই, না নিয়ে উপায় কি, বল। শত হলেও আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ। তাই নিজের হাতেই নিলাম সেই রহস্য সমাধানের ভার। আর করলামও তার সমাধান। তবে হ্যাঁ, তোদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছিলেন। এ কাজে তাঁর কাছে যখন যে সাহায্য চেয়েছি, তাই পেয়েছি।

।। তিন।।

লাইকিংদা আবার একটা বিড়ি ধরান। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে থাকেন, বুঝলি, তোদের আই. জি. পি. কিন্তু লোক ভাল। এই তদন্তের কাজে আমার প্রয়োজনের কথা বলতে একদিন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। শুনে তিনি বললেন, খুব ভাল কথা। আমার পুলিসের লোকেরা তো কিছু করতে পারল না। এবার দেখুন, আপনি কিছু করতে পারেন কি না। যদি আপনি সফল হন, তাতেও আমার আনন্দ, কারণ এক কালে তো আপনিও আমাদের ডিপার্টমেন্টেই ছিলেন।

একদিন বিকেলের দিকে গঙ্গার চাঁদপাল ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করল আমাদের মোটর লঞ্চ। সাধারণ লঞ্চ নয় এটা। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যে ট্রলার ব্যবহার করা হয়, আমাদের এই লঞ্চখানাও প্রায় তেমনি। তবে চেহারায় অনেক ছোট।

তদন্তের কাজে যা কিছু ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা তো সঙ্গে নিলামই, সেই সঙ্গে আরও নিলাম একটা ক্যামেরা, তিনটে রিভলভার, একটা বাইনোকুলার এবং এমনি ধরনের আরও কিছু। সঙ্গে কোন পুলিস অফিসার নিলাম না। কেবল দুজন বিশ্বাসী ও সাহসী পুলিস কনস্টেবল অনিল সরকার ও নারায়ণ চৌবে রইল আমাদের সঙ্গে। তা ছাড়া সেই মোটর লঞ্চের ড্রাইভার আবদুল রসুল ও তার সহকারী মহম্মদ গণি তো আছেই। ওদের নিয়ে আমার ছোট দলটির সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচজন।

একমাত্র আমি ছাড়া দলের অন্য সদস্যেরা সকলেই যুবক। নারায়ণ চৌবের বয়সই যা একটু বেশী, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মত। তবে লোকটি দারুণ কর্মঠ। খালি হাতে দশ জনের মহড়া সে একাই নিতে পারে। পালোয়ানের মত চেহারা তার। কনস্টেবল অনিল সরকার দেখতে ছোটখাটো বেটে হলেও খুব বুদ্ধিমান ও সাহসী। সাধারণ পুলিস কনস্টেবলের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান প্রায় দেখাই যায় না। লঞ্চ ড্রাইভার আব্দুল রসুলের বয়স কম হলেও সমুদ্রের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট। সেই ছেলেবেলা থেকে বাপের সঙ্গে নদীতে-সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে এ বিষয় এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিল। ওর সহকারী মহম্মদ গণি-ই দলের মধ্যে বয়সে সব চাইতে ছোট। লঞ্চে আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনার ভার ওই গণির ওপর।

গঙ্গার বুক চিরে বেশ হেলে দুলেই এগিয়ে চলছে আমাদের লঞ্চ। ইচ্ছে করলে দ্রুত লঞ্চ চালিয়ে আমরা সেইদিনই সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার তা ইচ্ছে ছিল না। দিনের আলোয় আমি পৌঁছতে চাইছিলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। আমার ইচ্ছে ছিল, আসল কাজে হাত দেওয়ার আগে সুন্দরবন অঞ্চলের সেই থানায় একবার যেতে হবে। সেখানকার অফিসার -ইনচার্জের সঙ্গে একবার দেখা করে ঐ সম্পর্কে প্রাথমিক খোঁজ খবর নিতে হবে।

গঙ্গার মোহনা বেয়ে সমুদ্রের ছোট বড় খাঁড়ি ধরে সেই থানায় পৌঁছতে আমাদের পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। তোরা তো জানিস, ওই সুন্দরবন অঞ্চলে আমি অনেকদিন চাকরী করেছি। সুতরাং ওখানকার পথ-ঘাট নদী-নালা সবই আমার পরিচিত।

নদীর ঘাটে লঞ্চ বেঁধে রসুল ও গণিকে সেখানে রেখে আমি গিয়ে হাজির হলাম সেই থানায়। সঙ্গে অনিল ও নারায়ণ। একদা আমি এই থানাতেও চাকরী করেছি, ভেবেছিলাম এতদিন পর থানার বাড়িটার অন্যরকম চেহারা দেখতে পাব। কিন্তু গিয়ে দেখি, এই দীর্ঘ দিনেও কোন রকম পরিবর্তন হয়নি। সেই ইটের দেয়াল, মাথার ওপর টিনের ছাউনি।

এমনকি ও. সি. হিসাবে একদিন আমি যে ঘরে বসতাম, বর্তমান ও. সি.-ও ঠিক সেই ঘরখানাই ব্যবহার করে।

অমিয় এই সময় প্রশ্ন করে, আপনি ও. সি. ছিলেন নাকি?

লাইকিংদা কিছু জবাব দেবার আগেই নিরু এক রকম ধমকে ওঠে তাকে, তোর অত খবরে দরকার কি রে? দাদা যা বললেন, মন দিয়ে শুনে যা কেবল। শুনতে ভালো না লাগে তো রান্নাঘরে গিয়ে প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগা। কথার মধ্যে কথা বলে রস ভঙ্গ করবি না।

লাইকিংদা কিন্তু অমিয়র কথাকে আমল না দিয়েই বলতে থাকেন, কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ সুন্দরবন অঞ্চলের সেই থানার কথা। থানায় গিয়ে দেখি, একজন কনস্টেবল ছাড়া গোটা থানায় আর কেউ নেই। অবশ্য এর বেশী কাউকে সেখানে আমি আশাও করি নি। জানি তো ওখানকার অবস্থা। ঐ থানার আওতায় বিরাট এলাকা। এদিকে অফিসার ও কনস্টেবল মিলিয়ে মাত্র কয়েক জনের পোস্টিং সেখানে। কাজেই সময় সময় মাত্র একজন কনস্টেবলকেই থাকতে হয় থানায়।

পরনে একটা খাকী হাফ-প্যান্ট, গায়ে একটা সাদা গেঞ্জি, পায়ে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। এই বেশেই থানার কনেস্টবলটি একখানা চেয়ারে বসে কী যেন একটা বই পড়ছিল। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কী চাই আপনাদের?

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই কনস্টেবলটি হঠাৎ বিস্মিত কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, একি স্যার, আপনি! এতদিন পরে কোত্থেকে এলেন, স্যার?

বলেই সে ছুটে এসে আমার পায়ের ধূলা নেয়।

আমিও এবার তাকে চিনতে পারি। আমি যে বছর চাকরী থেকে রিটায়ার করি, সেই বছরই এই কনস্টেবলটি চাকরীতে ঢুকেছিল। ওর নামটা আমি কিন্তু তখনও মনে করতে পারি না।

আমাকে আমতা আমতা করতে দেখে সে আবার বললে, আমাকে মনে নেই আপনার? সুধাকর—সুধাকর সমাদ্দার আমার নাম। সেই হুগলী জেলার আরামবাগ থানায় আপনার কাছে আমি চাকরী করেছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। —বলে উঠি আমি—অনেকদিন আগেকার কথা। বয়সও আমার হয়েছে। তাই প্রথমটাই চিনতে পারিনি তোমাকে। তা সুধাকর, কতদিন আছ এখানে?

—প্রায় বছর খানেক হলো, স্যার।

একটু থেমে আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তোমাদের ও. সি. এখন কে? কোথায় তিনি? একটু বিশেষ কাজে এসেছি তাঁর কাছে।

সুধাকর জবাব দেয়, আমাদের বড়বাবুর নাম বিকাশ চৌধুরী। এই তো মাস ছয়েক আগে মেদিনীপুর জেলা থেকে বদলি হয়ে এই থানায় এসেছেন। একটা ডাকাতি মামলার তদন্তে বেরিয়ে তিনদিন পরে আজ ফিরলেন। বাড়িতে বিশ্রাম করছেন। ডেকে আনব, স্যার?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আনো। একটু বিশেষ দরকার আছে।

থানায় ঢুকতে ঢুকতে প্রৌঢ় বিকাশ চৌধুরী হাত জোড় করে বলে ওঠেন, নমস্কার, নমস্কার দাদা। সুধাকরের কাছে আপনার পরিচয় পেলাম। আপনি তো এককালে আমাদের ডিপার্টমেন্টের গর্ব ছিলেন। গোটা পশ্চিমবাংলায় আপনার নাম জানে না কে?

বিকাশ চৌধুরী একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করেন, তা দাদা, এবার বলুন, আমাকে দিয়ে আপনার কী প্রয়োজন?

বিকাশবাবুর হুকুমে তার বাড়ি থেকে আমাদের জন্যে চা মুড়ি এল। খেতে খেতে আমি বিকাশবাবুকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বললাম।

শুনতে শুনতে বিকাশবাবু হঠাৎ হেসে ফেললেন। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, এসেছেন যখন তখন তদন্ত করেই দেখুন। তবে আমার ধারণা, জেলে ব্যাটাদের কথার মধ্যে একটুও সত্য নেই। কি দেখতে ওরা কি দেখেছে আর তাই নিয়েই হৈ-চৈ বাঁধিয়েছে। আসলে ওটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। তিমি হতে পারে, আবার হাঙ্গর হওয়াও বিচিত্র নয়।

—কিন্তু এ অঞ্চলে তিমি আসবে কেমন করে? শুনেছি তিমি নাকি শীতের এলাকা ছাড়া আর কোথাও থাকে না। তাছাড়া তিমি তো খুব শান্ত প্রকৃতির প্রাণী।

—তাহলে খুব সম্ভব একটা হাঙ্গর। কোন কারণে ক্ষেপে গিয়ে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলে জেলেদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করছে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, সেই সামুদ্রিক প্রাণীটাকে আপনি দেখেছেন?

মাথা নেড়ে জবাব দেন বিকাশবাবু, না। এই সম্পর্কে তদন্ত করার সময় একাদিক্রমে সাতদিন আমি জেলেদের নৌকোর সঙ্গে আমাদের পুলিস-লঞ্চে করে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই ক'দিনের মধ্যে প্রাণীটার টিকিও দেখতে পাইনি।

—তাহলে সেই সাতদিন জেলেরা বোধহয় নিরুপদ্রবে সমুদ্রে মাছ ধরেছে?

—না, ঠিক নিরুপদ্রবে বলা চলে না, দাদা। জানেন তো আমাদের পুলিসের লঞ্চ গভীর সমুদ্রে চলার উপযোগী নয়। তাই জেলেদের নৌকোর সঙ্গে গভীর সমুদ্রে আমি টহল দিতে পারিনি। তীর থেকে দেড়-দু মাইলের মধ্যে আমি ছিলাম। এখানে অবিশ্যি ঐ সাতদিনে কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে খবর পেয়েছি, যে সব জেলেরা আরও দূরে মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদের একখানা নৌকো নাকি একদিন সেই সামুদ্রিক প্রাণীটা উল্টে দিয়েছিল।

আমি আর কিছু না বলে চুপ করে ভাবতে থাকি। পুলিসের চাকরীতে অনেক কঠিন ব্যাপারেই তদন্ত করেছি। সমাধান করেছি অনেক রহস্যের। কিন্তু সমুদ্রের জলে নেমে কোন তদন্তই কখনো করতে হয়নি। সব কিছুই করেছি ডাঙ্গায়, জলে নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিকাশবাবু আবার হেসে বললেন, কী ভাবছেন দাদা? বলুন, এ ব্যাপারে আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

জবাবে আমি বললাম, একবার ঐ জেলেদের নিজেদের মুখ থেকে শুনতে পেলে ভালো হতো। বুঝতে পারতাম, সত্যিই কি ওদের সকলেরই দৃষ্টিভ্রম না অন্য কিছু।

—বেশ তো—বলতে থাকেন বিকাশবাবু—ওদের নাম ঠিকানা দিচ্ছি। দেখা করুন ওদের সঙ্গে। অথবা যদি বলেন তো ওদের ডেকে পাঠাতেও পারি। থানায় বসেই ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।

আমি বললাম, না ভাই, এখানে বসে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। ওদের কাছে না গেলে সত্যি কথাটা শুনতে পাব না।

—বেশ তো, তাহলে তাই যান। —বলেই বিকাশবাবু একটা ফাইল খুলে কয়েকজন জেলের নাম-ঠিকানা টুকে আমাকে দিয়ে আবার বললেন, আজ তো আর রাত্তিরে ওদের কাছে যেতে পারবেন না। রাতটা একটু কষ্ট করে এখানেই থাকুন। কাল সকালেই যাবেন।

—কেন, এখন গেলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে না?

—না, তা নয়। যেতে যেতেই তো রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া এ তল্লাটে রাতে চলা-ফেরা না করাই ভাল। মাঝে-মধ্যে এদিকেও তো রয়েল বেঙ্গলের দেখা পাওয়া যায়।

অগত্যা সেই রাতে আর গ্রাম গ্রামান্তরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে না করে

বিকাশবাবুর আতিথ্যই গ্রহণ করলাম। থানার লাগোয়া ইন্সপেক্শন্-রুমেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হলো। বলা বাহুল্য রাতের খাবার এল বিকাশবাবুর বাড়ি থেকেই।

পরের দিন খুব সকালেই রওনা হলাম। নদীর ঘাটেই আবদুল রসুল ও মহম্মদ গণির তত্ত্বাবধানে পড়ে রইল আমাদের ট্রলার। সমুদ্রগামী ট্রলার নদীতে চলতে পারলেও সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট খাল-বিলে চলতে পারে না। কাজেই বিকাশবাবু ছোট পুলিসের নৌকার ব্যবস্থা করে দিলেন আমাদের। পথঘাটের নিশানাও বলে দিলেন মোটামুটি।

বেলা দশটা নাগাদ হাজির হলাম একটা গ্রামে। ছোট গ্রাম। পনের কুড়ি ঘর মাত্র বাসিন্দা। তবে সব্বাই জেলে। পুরুষানুক্রমে ওদের মাছ ধরার ব্যবসা।

বিকাশবাবুর দেওয়া নাম ধরে খুঁজতে খুঁজতে একটা বাড়িতে এলাম। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। উঠোনে জাল শুকোচ্ছে। দু-তিনখানা ছোট ডিঙি উপুড় করা রয়েছে এক কোণে। বোধহয় মেরামত করা হচ্ছে।

দু-তিনবার ডেকেও সনাতনের কোন সাড়া পেলাম না। অবশেষে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আমাদের দেখেই বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কী চাই, বাবুমশায়?

বললাম, আমরা থানা থেকে এসেছি। সনাতনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

থানার কথা শুনেই বৃদ্ধের মুখখানা শুকিয়ে ওঠে। বললে, সনাতন আমার ছেলে। ও তো এখন বাড়ি নেই, বাবুমশায়।

—মাছ ধরতে গেছে নাকি?

না বাবুমশাই—বলতে থাকে বৃদ্ধ—যা দিনকাল পড়েছে তাতে আর মাছ ধরে সংসার চালাতে হবে না। এই তো মাস তিনেকও হয়নি। ডিঙি উল্টে নোনা জলে তলিয়ে গিয়েছিল আর কী! ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছে কোন রকমে। সেই থেকে এত করে বলি, দরকার নেই আর মাছ ধরে। প্রাণটাই যদি গেল তো আর মাছ দিয়ে কী হবে? তা বাবুমশাই, কে শোনে কার কথা! একালের ছেলে-মেয়েরা কি বাপ-মায়ের কথা মান্যি করে? তাছাড়া মুখে যতই বলি, পেটের ভাত তো যোগাড় করতে হবে। তাই বিপদ মাথায় করেও নোনা জলে ডিঙি ভাসায় সনাতন। আমরা ঘরে বসে ভগবানকে ডাকি।

বৃদ্ধ থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি, তা সনাতন এখন কোথায়?

জবাবে বৃদ্ধ বললে, আজ ওর শরীরটা ভাল নেই। রাতে একটু জ্বরের মত হয়েছিল। তাই আজ আর মাছ ধরতে যেতে দিইনি। বয়সকালের ছেলে, ঘরে কি আর মন টেঁকে? আছে বোধহয় ধারে-কাছে কোথাও। তা বাবুমশাইরা, থানা থেকে আসছেন শুনে ভয় পাচ্ছি।

হেসে বৃদ্ধকে অভয় দিয়ে বললাম, না, না ভয়ের কিছু নেই। তোমাদের উপকারের জন্যেই আমরা এসেছি। সমুদ্রের জলে তোমার ছেলে যে বিপদে পড়েছিল, সেই ব্যাপারেই ওর সঙ্গে একটু কথা বলতেই চাই।

এবার হতাশ সুরে জবাব দেয় বৃদ্ধ, কী আর হবে সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে বাবুমশাই। কত বাবুই তো এল, মন দিয়ে শুনলো সনাতনের কথা। কাগজে লিখে নিয়ে গেল কত কী! কিন্তু কিছুই তো হলো না আজ পর্যন্ত। এখনো এ অঞ্চলের জেলেরা প্রাণ হাতে নিয়ে নোনা জলে নৌকা ভাসায়। নোনা জলের সেই দত্যিটা কখন যে কার ওপর নজর দিয়ে তার নৌকা উল্টে দেবে তার ঠিক কী! এইতো গত পরশু—না, না, গতকাল গাজীপুর গাঁয়ের একখানা নৌকা উল্টে দিয়েছে দত্যিটা। শুনলাম একজন নাকি তলিয়ে গেছে জলে। এবার আপনিই বলুন বাবুমশাই এভাবে আর ক'দিন চলবে?

আমাদের কথার মধ্যেই বৃদ্ধের ছেলে সনাতন এসে উপস্থিত হলো সেখানে। বাইশ-

তেইশ মত বয়স। কালো কুচকুচে চেহারা। বেশ স্বাস্থ্যবান।

বৃদ্ধ আমাদের দেখিয়ে ছেলেকে বললে, ও সনাতন, এই বাবুরা এসেছেন থানা থেকে তোর সেই বৃত্তান্ত শোনার জন্যে।

বৃদ্ধ থামতেই সনাতন একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, এক কথা আর কতবার কত লোকের কাছে বলব, বাবা? বলে বলে মুখ তো ক্ষয়ে গেল। কিন্তু সুরাহা হলো কিছু?

আমি বুঝলাম, থানা থেকে বিকাশবাবু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এই সনাতন ও তার মত যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের কাছে বারে বারে এসে এ কাহিনী শুনে গেছে। হয়ত তখন ওদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েই অবিশ্বাসের হাসি হেসে ব্যাপারটাকে গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই মর্মেই রিপোর্ট দিয়েছে ওপরের মহলে। কাজেই সরল জেলেরা এখন আর পুলিস কিংবা অন্য কারোর ওপর ভরসা রাখতে পারে না।

অবশেষে সনাতনকে অনেক করে বোঝাতে সে ধীরে ধীরে বলে গেল কাহিনী।

সনাতন থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি, নৌকায় কি তুমি একা ছিলে?

আমার অজ্ঞতায় সাদা ধবধবে দাঁত বের করে একটু হাসে সনাতন। তারপর বলে, না বাবুমশাই, সমুদ্রের জলে কী একা একা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরা চলে? আমাদের নৌকোয় আমরা তিনজন ছিলাম। দুজন বেঁচে গেছি। একজন গেছে তলিয়ে।

—আচ্ছা, তুমি নিজের চোখে সেই জানোয়ারটাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ বাবুমশাই, নিজের চোখে দেখেছি। তবে আপনি তাকে জানোয়ার বলছেন কেন?

জবাব দিই আমি, না, বলছিলাম কোন সামুদ্রিক জন্তুজানোয়ারও তো হতে পারে।

প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে সনাতন। বলতে থাকে সে, দেখুন বাবুমশায় ছেলেবেলা থেকে নোনাজলে মাছ ধরে আসছি। সমুদ্রের জন্তু-জানোয়ারদের ভাল মতই চিনি। তা বাবু, আমার বয়স না হয় অল্প, অনেক বয়স্ক লোকও তো তাকে দেখেছে। আমরা সবাই কি তাহলে ভুল দেখেছি?

—তুমি তাহলে বলতে চাইছ ওটা কোন জন্তু-জানোয়ার নয়?

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় সনাতন, না বাবুমশাই, ওটা একটা মানুষ। আমার আপনার মতই মানুষ।

—কী রকম দেখতে?

—বিলিতি মেমসাহেবের মত।

এতক্ষণে একটা নতুন সূত্র মিলল সনাতনের কথার মধ্যে। সে সাহেব না বলে বলছে মেমসাহেব। তার অর্থ সেই লোকটা কোন পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক।

জিজ্ঞেস করি আমি, পরনে তার কী ছিল, সনাতন?

—কিছু না, বাবু। কিচ্ছু না। একেবারে ন্যাংটো।

—সে কী! ন্যাংটো স্ত্রীলোক!

—হ্যাঁ বাবু। —মাথা নেড়ে সায় দেয় সনাতন।

—মুখখানা কী রকম দেখতে?

—মুখ তো দেখিনি বাবুমশাই। আমি কেন, কোন জেলেই তার মুখ দেখতে পায়নি।

—তাহলে কী করে বুঝলে যে সে স্ত্রীলোক?

—নীচের দিকটা দেখে। ধবধবে ফর্সা দু-খানা পা মেয়েদের মত।

—সেই পা দিয়েই বুঝি লাথি মেরে তোমাদের নৌকা উল্‌টে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ বাবুমশাই। —বলতে থাকে সনাতন—সেই স্ত্রীলোকটা নৌকো থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে পানকৌড়ির মত মাথাটা জলের তলায় ডুবিয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত শূন্যে তুলে

একবার ডিগবাজি খেয়ে নিয়েছিল। তারপর চোখের পলকে আমাদের নৌকোর কাছে এসে একটা প্রচন্ড লাথি মেরে নৌকোটা উল্টে ফেলে দিয়েছিল।

—সেই স্ত্রীলোকটাকে আর দেখতে পাওনি?

—না, বাবুমশাই। তাছাড়া নিজেদের জীবন বাঁচাতেই আমরা তখন এত ব্যস্ত ছিলাম যে, স্ত্রীলোকটির দিকে আর নজর দেওয়ার সময়ই পাইনি। আমি ও আর একজন উল্টে যাওয়া নৌকোটাকে জাপটে ধরে কোন রকমে বেঁচে গেলাম। বাকী লোকটা জলে ডুবে মরল।

শুধু সনাতন নয়, এমনিভাবে পুরো তিনটি দিন আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে জেলেদের খোঁজ নিয়েছি। সকলের কথাই প্রায় এক রকম। তারা সবাই স্ত্রীলোকটার দেহের নীচের অংশ দেখেছে। তার মুখ দেখতে পায়নি কেউ। তবে সবাই একবাক্যে বললে যে, সে কোন পুরুষ নয়, একজন স্ত্রীলোক—মেমসাহেবের মত ফরসা।

জেলেদের সঙ্গে কথা বলে আমার দৃঢ় ধারণা হল যে, তারা কেউ মিথ্যে তো বলেই নি, এমন কী ভুলও দেখেনি। নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রের ঐ অঞ্চলে ওরকম ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কেন সে এরকম করে বেড়াচ্ছে? তার পরিচয়ই বা কী? তাছাড়া একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে গভীর সমুদ্রে ওরকম ডুব সাঁতার দিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি সম্ভব? সে এলই বা কোত্থেকে?

তবে কি স্ত্রীলোকটি কোন ডুবুরী? হ্যাঁ, তা হয়ত হতে পারে। কিন্তু তার ডুবুরীর পোশাক কোথায়? আর সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে কোন মানুষ কি সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে বেড়াতে পারে?

ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময় মনে হয় আমার কাছে। যতই ভাবতে থাকি, ততই গাঢ় হয়ে ওঠে সেই রহস্য।

লাইকিংদা এইসময় একটু থামেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আর এক কাপ চা এনে দেব, লাইকিংদা?

নিরু আমাকে ধমকে উঠে বললে, আবার জিজ্ঞেস করছিস কি রে! লাইকিংদা এত কষ্ট করে এমন একটা কঠিন রহস্যের সমাধান করলেন, আর তুই কিনা চায়ের কথা জিজ্ঞেস করছিস। শীগগীর উড়ের দোকানে গিয়ে এক কেট্‌লী চায়ের অর্ডার দিয়ে আয়।

আমি বললাম, কেন? লাইকিংদা কি একসঙ্গে এক কেট্‌লী চা খাবেন নাকি?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় অমিয়, না বন্ধু, লাইকিংদার চমৎকার আষাঢ়ে গল্প কি গরম চা ছাড়া জমে।

নিরু চটে উঠে বললে, কী বললি রে? লাইকিংদা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন? বেশ, তবে তাই। তুই উঠে যা এখান থেকে। তোকে শুনতে হবে না। তোর মত একটা অবিশ্বাসী গাড়োলকে গল্প শুনিয়ে সময় নষ্ট করবেন না লাইকিংদা।

কিন্তু নিরু যার হয়ে অমিয়কে গালগাল দিচ্ছিল, সেই লাইকিংদার মুখে কিন্তু এতটুকু রাগের চিহ্ন ছিল না। তিনি কেবল প্রশান্ত মুখে ক্ষমাসুন্দর চোখে তাকিয়ে ছিলেন অমিয়র দিকে।

অমিয় এতক্ষণে বুঝতে পারে, লাইকিংদার সামনে আষাঢ়ে গল্প কথাটা উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। তাই নিজের সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আমিই এক কেট্‌লী চায়ের কথা বলে আসছি তোদের সকলের জন্যে।

—হিপ্ হিপ্ হুররে! শত বছর বেঁচে থাক ভাই। —বলতে বলতে নিরু তার বিশাল দেহখানা নিয়ে একবার টুইস্ট নাচ নেচে নেয়।

।। চার।।

চায়ের সাথে কড়া বিড়ির ধোঁয়া গিলতে গিলতে লাইকিংদা আবার শুরু করেন তার সেই কাহিনী।

হ্যাঁ কী বলছিলাম যেন। সেই রহস্যময় স্ত্রীলোকটির কথা যে নাকি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গভীর সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায় আর লাথি মেরে জেলেদের নৌকো উল্টে দেয়।

জেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনদিন পরে আমি ফিরে এলাম থানায়। সঙ্গে আমার দুই সাকরেদ অনিল সরকার ও নারায়ণ চৌবে।

থানার ও. সি. বিকাশ চৌধুরীকে আমার ধারণার কথা বলতেই, তিনি বললেন, বেশ তো দাদা, তাহলে তদন্ত শুরু করুন।

জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। তবে—

—তবে কী দাদা? —জিজ্ঞেস করেন বিকাশবাবু।

—আমি ভাবছি প্রথমে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলটাকে কয়েকদিন ট্রলার নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াতে হবে। দেখা যাক, স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা। আমাদের তো আর ভয় নেই। স্ত্রীলোকটি যতই কেন না শক্তিশালী হোক, এতবড় ট্রলারটাকে নিশ্চয়ই লাথি মেরে উল্টে ফেলতে পারবে না।

—তা বটে! —বলতে থাকেন বিকাশবাবু—তবে একসাথে বেশীদিন সমুদ্রে থাকলে আপনাদের সী সীক্‌নেস অর্থাৎ সমুদ্ররোগ হতে পারে। অভ্যেস নেই তো আপনাদের।

আমি ভেবে দেখলাম, বিকাশবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি? সমুদ্রে টহল দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে অঞ্চলে সেই স্ত্রীলোকটিকে মাঝে মাঝে দেখা যায়, সেখানে ট্রলার নিয়ে টহল দিয়ে একেবারে নিজের চোখে দেখতে হবে। তারপর খুঁজতে হবে সেই রহস্যের সমাধান। এর জন্যে হয়ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু একাদিক্রমে দীর্ঘদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর ফলে যদি আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে তো আমাদের গোটা প্ল্যানটাই মাটি হয়ে যাবে। এ ছাড়া উপায়ও তো কিছু দেখছি না।

শেষ পর্যন্ত বিকাশবাবুই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিলেন—রাতদিন সমুদ্রের জলে ট্রলার ভাসিয়ে আপনাদের ঘুরে বেড়ানোর তো কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা বরং দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াবেন আর রাতে ডাঙায় ফিরে এসে বিশ্রাম করবেন।

জবাবে আমি বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ডাঙায় থাকবো কোথায়? সমুদ্রের ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই বলেই তো জেলেদের মুখে শুনেছি।

বিকাশবাবু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে আপনারা যদি একটু পরিশ্রম করতে রাজী থাকেন, তাহলে আপনাদের থাকার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বিকাশবাবু কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম, কাজে যখন নেমেছি, পরিশ্রমকে ভয় পেলে চলবে কেন?

বিকাশবাবু বলতে থাকেন, গঙ্গার একেবারে মোহনায় বুলচেরি দ্বীপে ফরেস্ট-ডিপার্টমেন্টের একটা আস্তানা ছিল, কিন্তু এখন আর কেউ সেখানে থাকে না। বাঘের উপদ্রবে ওখানকার বাংলো পরিত্যাগ করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা আরও প্রায়

মাইল কুড়ি ভেতরে চলে গিয়ে তাদের নতুন আস্তানা তৈরি করেছে। বুলচেরি দ্বীপের ওই বাংলোটা পেলে আপনাদের সুবিধে হতো, কিন্তু যত দূর শুনেছি, সেই বাড়ি-ঘর নাকি ভেঙে গেছে। কাজেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেই নতুন বাংলোতে হয়ত আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি বললাম, বেশ তো। তবে ট্রলার নিয়ে সেই বাংলোতে যাবো কী করে?

জবাব দেন বিকাশবাবু, তাতে অবিশ্যি তেমন একটা অসুবিধে হবে না আপনাদের। সমুদ্রে টহল শেষ করে প্রতিদিন আপনারা খাড়ি বেয়ে মাতলা নদী ধরে উত্তরে চলে এসে, মাতলা নদীতেই ট্রলারটাকে নোঙর করে রাখবেন। সেখান থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দূরত্ব প্রায় মাইল খানেকের মত। আপনারা হেঁটেই যেতে পারবেন।

অবশেষে তাই ঠিক হলো। একদিন বিকালে থানার ও. সি. বিকাশ চৌধুরীর চিঠি নিয়ে আমি এসে হাজির হলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেই নতুন আস্তানায়। সঙ্গে কনস্টেবল নারায়ণ ও অনিল। ট্রলার রেখে এলাম মাতলা নদীতে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার শচীন অধিকারী বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। দীর্ঘকাল পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে জঙ্গলে একা একা থাকার জন্যে মাঝে মাঝে কেবল একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া আর কোন দোষ নেই তাঁর। কাজ-কর্মেও বেশ পটু।

বিকাশবাবুর চিঠিখানা পড়ে তিনি সোৎসাহে বলে ওঠেন, আরে, এ তো ভালই হলো। আমাদের এত বড় ফরেস্ট বাংলোতে আমরা দশজন মাত্র লোক। আপনাদের তিনজনের থাকতে কোন অসুবিধেই হবে না।

একটু থেমে শচীনবাবু হেসে আবার বললেন, বুঝলেন মশাই, সাত-আট মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই। কাজেই মানুষের মুখ দেখা এখানে ভাগ্যের কথা। প্রতিদিন সকাল হলেই আমরা দশজন সরকারী কর্মচারী কেবল আমাদের নিজেদের মুখই দেখতে পাই। নতুন মুখের দেখা প্রায় মেলেই না। কাজেই আপনাদের তিনজনকে পেয়ে আমাদের ভালোই হল।

আমিও হেসে বললাম, কতটুকু সময়ই বা দেখা-সাক্ষাৎ হবে? খুব সকালে উঠে আমরা ট্রলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ফিরতে তো সেই রাত।

—আরে মশাই, তাতেই হবে। রাতে বসে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। —তারপর একটু গলা খাটো করে আবার বললেন, এখানে যারা আছে তারা সবাই আমার অধীনস্থ কর্মচারী। এদের সঙ্গে তো ঠিক আড্ডা দেওয়া যাকে বলে তা চলে না। —বলেই মৃদু হাসতে থাকেন শচীনবাবু।

দিন কয়েক বেশ ভালোই কাটল। সকালে ট্রলার নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই সমুদ্রে। সারাদিন সমুদ্রের সেই অঞ্চলে জেলেদের নৌকার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। বিকেলে সূর্য অস্ত গেলে মাতলা নদীতে ট্রলার নোঙর করে পায়ে হেঁটে ফিরে আসি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আস্তানায়।

কিন্তু মুশকিল হলো, এই হাঁটা পথটুকুকে নিয়ে। মাইল খানেকের মত পথ। পথ না বলে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে চলা ফালি বললেই ভালো হয়। আমরা যখন এই পথটুকু পার হই তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে আসে। হাতের টর্চ জ্বেলে কোনরকমে পথ চলি আমরা।

একদিন এই পথে যেতে যেতেই দূরে বাঘের গর্জন কানে এল আমাদের। আমরা প্রায় বাংলোর কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। বাঘের ডাক কানে আসতেই পড়ি মরি করে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম ফরেস্ট বাংলোয়। বেচারী কনস্টেবল নারায়ণ চৌবে। বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে প্রাণের দায়ে ছুটে এসে বেচারীর প্রায় আধমরা অবস্থা।

কথাটা শুনে শচীনবাবু চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তাই তো, বড় মুশকিল হলো দেখছি। আমরাও খবর পেয়েছি, এই এলাকায় বাঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কাজেই সন্ধ্যের পর এই পথে আপনাদের আর হেঁটে আসা চলবে না।

আমি বললাম, তাহলে উপায়?

জবাবে শচীনবাবু বললেন, বেলা থাকতে থাকতে এই পথে আপনাদের ফিরে আসতে হবে।

—তার মানে সমুদ্রে জেলেদের মাছধরা শেষ হবার আগেই আমাদের সেখান থেকে রওনা দিতে হবে। তাতে তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, শচীনবাবু।

শচীনবাবুও চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, তাছাড়া আর তো কোন উপায়ও দেখছি না। আমাদের এই বাংলোতে একখানা জীপ থাকলেও নাহয় এই পথটুকু আপনাদের জীপে করে আনার ব্যবস্থা করতাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই আমি বললাম, আচ্ছা, ও. সি. বিকাশবাবুর কাছে যেন শুনেছিলাম গঙ্গার ঠিক মোহনায় বুলচেরি নামে যে একটা দ্বীপ আছে ওখানে নাকি আপনাদের একটা বড়ো বাংলো ছিল।

—হ্যাঁ ছিল। বলতে থাকেন শচীনবাবু—বাংলো না বলে একটা দুর্গও বলা চলত। খুবই মজবুত করে ওটা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ডিপার্টমেন্ট ওটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

—কেন?

—একে ঐ অঞ্চলে বাঘের উৎপাত খুব বেড়ে গেল। তার ওপর মোহনার প্রায় গায়ের কাছে বেশিদিন থাকার জন্য নোনা জলে ডিপার্টমেন্টের লোকজনেরও শরীর খারাপ হতে শুরু করল। তাই শেষ পর্যন্ত ওটা ত্যাগ করে আমাদের বাংলো সরিয়ে আনা হলো এখানে। তাও প্রায় হয়ে গেল আজ সাত-আট বছর।

—সেই থেকে বাংলোটা সেখানে খালি পড়ে আছে?

—হ্যাঁ। প্রায় তাই বলতে পারেন। ব্যবহার না করায় বাড়িটা ভেঙে পড়েছিল। মাত্র বছর খানেক আগে ডক্টর জ্যাকব নামে কেরালার একজন মৎস্য বিশেষজ্ঞ আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নিয়ে ওই বাড়িটাকে মেরামত করে ওখানে তাঁর ল্যাবরেটরি তৈরি করেছেন।

—কিসের ল্যাবরেটরি? —আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

—মাছের।

—কী মাছের?

বলতে থাকেন শচীনবাবু, সামুদ্রিক মাছের। সমুদ্রের এই অঞ্চলে যে মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী মাছের পরিমাণ কত এবং অনুপযোগী মাছকে ফেলে না দিয়ে তাকে কেমন করে মানুষের ব্যবহারে লাগানো যায়, তাই নিয়েই তাঁর গবেষণা। এদেশে মাছের তীব্র সংকট বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ ব্যাপারে নাকি খুব উৎসাহী।

—আপনাদের সেই বাংলোটা গঙ্গার মোহনার খুব কাছাকাছি বলেই শুনেছি।

—হ্যাঁ, জল থেকে প্রায় শ তিনেক গজ মাত্র দূরে। জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। পাড় খুব উঁচু বলে জোয়ারের সময় বাংলো জলে ডুবে যায় না।

—আচ্ছা শচীনবাবু, ওখানে আমাদের থাকার একটা ব্যবস্থা করা যায় না? তাহলে আর জঙ্গল পথে হাঁটার সমস্যাও থাকে না। আর আমাদের ট্রলারটাকেও আমরা প্রায় চোখের

সামনেই নোঙর করে রাখতে পারি।

জবাব দেন শচীন অধিকারী,—ডক্টর জ্যাকব অবিশ্যি লোক খারাপ নন। আমি বললে রাজী না হয়ে পারবে না। বাংলোটা তো আসলে আমাদেরই। তবে তার গবেষণায় যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে তো—

—না, না—বলে উঠি আমি—তাঁর গবেষণা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাবো কেন? আমরা থাকবো আমাদের কাজ নিয়ে।

—বেশ তবে সেই ব্যবস্থাই করছি।

।। পাঁচ।।

বাস্তবিকই বাংলো না বলে দুর্গ বলা উচিত। অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাট কাঠের বাংলো। চার-পাঁচখানা বিভিন্ন আকারের ঘর। চারিদিকে মজবুত কঠের গুঁড়ি দিয়ে এমনভাবে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে হাতি এসেও সেই প্রাচীর ভাঙতে পারবে না। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সুন্দরবনে হাতি নেই। বাঘ-ভালুকের পক্ষে ঐ উঁচু প্রাচীর ডিঙোনো সম্ভব নয়। বাংলো এলাকার সব ঘরগুলোই প্রায় নতুন। দেখেই বোঝা যায়, মেরামত করতে প্রচুর খরচ হয়েছে।

ডক্টর জ্যাকব একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। কেরালার মানুষ হয়েও ভালো বাংলা বলতে পারেন। কথা বলেন কম। রাতদিন নিজের ল্যাবরেটরি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর নিজস্ব সামুদ্রিক ট্রলারে সমুদ্র-অভিযানে বের হন। সমুদ্রের নীচে থেকে বিভিন্ন জাতের মাছ তুলে এনে ল্যাবরেটরির বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামে সাজিয়ে রেখে তা দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

ডক্টর জ্যাকব ছাড়া আর আছেন তাঁর সহকর্মী মিঃ সাকসেনা। এই ভদ্রলোকও বাংলা বলতে পারেন। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। এ ছাড়া আছে জাগুয়ার ও হায়েনা নামে দুজন চাকর শ্রেণীর লোক। ওদের আসল নাম কেউ জানে না। তবে চেহারায় উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের লোক বলে মনে হয়। জাগুয়ার ও হায়েনাকে খুবই পছন্দ করেন ডক্টর জ্যাকব। ওরা বাংলোর যাবতীয় কাজকর্ম এমনকি রান্নাবান্না পর্যন্ত করে। তাছাড়া বাংলোর প্রহরীর কাজও করে ওরাই। জাগুয়ারের চেহারাটা পালোয়ানের মত; আর হায়েনার মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। চোখের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

আমাদের থাকার জন্য একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমদিন ডক্টর জ্যাকবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, শচীনবাবুর চিঠিতে জানলাম যে, আপনারা নাকি জেলেদের নৌকা ডুবির ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছেন। তা, কিছু সূত্র পেয়েছেন নাকি?

জবাবে আমি বললাম, না, না, বলতে গেলে এখনও তো কাজই শুরু করিনি। জেলেদের নৌকার সঙ্গে থেকে সমুদ্রের ঐ এলাকায় কেবল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

সহানুভূতির সুরে ডক্টর জ্যাকব আবার বললেন, হ্যাঁ, দেখুন একবার চেষ্টা করে। এর আগেও তো একদল পুলিস অফিসার এসে তদন্ত করে গেছেন। কিন্তু কিছুই তো করতে পারেন নি তারা। গরিব জেলেদের বড়ই কষ্ট। ওদের রুজি-রোজগার তো প্রায় বন্ধ হতে বসেছে।

ডক্টর জ্যাকব থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা আপনি তো শুনেছি মাছের খোঁজে প্রায়ই ডুবুরীর পোশাক পরে সমুদ্রের তলায় নামেন। আপনার কী মনে হয়?

—কিসের ব্যাপারে? —জিজ্ঞেস করেন ডক্টর জ্যাকব।

আমি জবাব দিই, দিনের পর দিন কে এমনিভাবে জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে তাদের বিপদে ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন?

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে ডক্টর জ্যাকব পাল্টা প্রশ্ন করেন, জেলেদের নিজেদের কী ধারণা?

সত্যি কথা চেপে গেলাম আমি। তদন্তের ব্যাপারে সব সময় সব কথা প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বললাম, ওদের তো ধারণা কোন সামুদ্রিক জীব এমনি কাজ করে বেড়াচ্ছে।

একটু সময় চিন্তা করে ডক্টর জ্যাকব জবাব দেন—যতদূর মনে হচ্ছে ওদের ধারণাই সত্যি। চারিদিকে যে গুজব ছড়িয়েছে, একজন স্ত্রীলোক নাকি এই কাজ করে বেড়াচ্ছে, তার কোন ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

ডক্টর জ্যাকবের কথায় আমি মনে মনে সাবধান হয়ে উঠি। বুঝতে পারি, আমি না বললেও জেলেদের মুখে সমুদ্রের জলে সেই স্ত্রীলোকের কথা ডক্টর জ্যাকবের কানেও উঠেছে। হয়ত আমার সত্যি কথাটা চেপে যাওয়ার বিষয়টি ধরে ফেলে ইচ্ছে করেই কথাটা আমাকে শোনালেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম, আপনার তো শুনেছি সমুদ্রের অভিজ্ঞতা প্রচুর। কী ধরনের জীব হতে পারে বলে আপনার অনুমান?

একটু হেসে বললেন ডক্টর জ্যাকব—বলা শক্ত। বিশাল সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা কতটুকু? তবে হাঙ্গর জাতীয় কিছু একটা হতেই পারে।

—এখানকার গভীর সমুদ্রের নীচে আপনি কখনও হাঙ্গর দেখেছেন?

—না, তা অবিশ্যি দেখি নি। তবে এখানকার সমুদ্রতলের যে পরিবেশ তাতে এই অঞ্চলে হাঙ্গর থাকতেও পারে।

ডক্টর জ্যাকবের মত তাঁর সহকারী মিঃ সাকসেনাও এই অঞ্চলের জেলেদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি তো একদিন বলেই ফেললেন, ট্রলার নিয়ে সমুদ্রের জলে আমাদেরও তো ঘুরতে হয় মাছের সন্ধানে। যদি কোনদিন সেই জীবটা আমার চোখে পড়ে, তাহলে সেদিন এক গুলিতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব। এই আপনাকে বলে রাখলুম মিঃ দাসগুপ্ত।

একটা সপ্তাহ বুলচেরি দ্বীপের বাংলোয় বেশ ভালোই কাটে আমাদের। সকালে জেলেদের নৌকার সঙ্গে ট্রলার নিয়ে চলে যাই গভীর সমুদ্রে। জেলেরা সারাদিন মাছ ধরে। আর আমরা বসে বসে তাই দেখি। আমাদের, বিশেষ করে আমার চোখ থাকে সমুদ্রের দিকে। মনে আশা, যদি একবার দেখতে পাই সেই স্ত্রীলোকটিকে। ট্রলারের ডেকে বসে নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখি শক্তিশালী বাইনাকুলার। কিন্তু নিরাশ হতে হয় আমাকে। দেখা দেয় না সেই রহস্যময়ী স্ত্রীলোক কিংবা সামুদ্রিক কোন জীব। এমনকি কোন হাঙ্গর জাতীয় জীবও চোখে পড়ে না আমার।

তবে জেলেদের সঙ্গে ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে টহল দেওয়ায় একটা ফলও কিন্তু হাতে হাতে পাওয়া গেল। এই ক'দিনের মধ্যে সেই সামুদ্রিক জীবটি একখানি জেলে ডিঙিও উল্টে দেয়নি। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই জেলেদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিল। প্রাণের ভয়ে সমুদ্রে মাছ-ধরা যারা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল তারাও এবার জেলে-ডিঙি নিয়ে এগিয়ে এল মাছ ধরতে। অবশেষে একদিন—

হ্যাঁ, একদিন আমার সাক্ষাৎ ঘটলো সেই সামুদ্রিক জীবটির সঙ্গে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জেলেরা কেউই ভুল বলেনি।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। আবদুল রসুল ও মহম্মদ গণি ট্রলারের ইঞ্জিনঘরে। কনস্টেবল নারায়ণ চৌবে গামছা পরে নিজের রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। মহম্মদ গণির হাতের রান্না সে খায় না। কনস্টেবল অনিল সরকার ডেকের এককোণে বসে রিভলভারে তেল লাগাচ্ছিল, আর আমি তাকিয়েছিলাম সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ—

—নিজের চোখে দেখলেন সেই জীবটিকে? —লাইকিংদার কথার মাঝখানেই বলে ওঠে চিত্ত।

নিরঞ্জন ওরফে নিরু আর সামলাতে পারে না নিজেকে। এমন একটা সাংঘাতিক সময় প্রশ্ন করে এমন রসভঙ্গ! হঠাৎ সে বাঘের মত গর্জন করে ওঠে—এই উজবুক, চুপ করবি কিনা বল!

আমরাও সেই মুহূর্তে চোখ পাকিয়ে তাকাই চিত্তর দিকে। বেচারা চিত্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি লাইকিংদার দিকে তাকিয়ে বলে, আই অ্যাম সরি, লাইকিংদা। আপনি বলুন।

এসব বাধা যেন বাধাই নয়, এমনি একটা ভঙ্গীতে মৃদু হেসে বলতে থাকেন লাইকিংদা, হঠাৎ আমার মনে হলো কিছু দূরে সমুদ্রের জলে যেন একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে সেদিকে তাকাতেই যে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল তা আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। প্রথমে দুখানা পা জেগে উঠল সেই ঘূর্ণির মধ্যে। পরক্ষণেই জেগে উঠল কোমর পর্যন্ত একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোকের দেহ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দেহটা, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একখানা জেলে ডিঙি শূন্যে লাফিয়ে উঠেই আবার আছড়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। নোনা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে দুজন জেলে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করে উঠল।

আমার নির্দেশে ট্রলার এগিয়ে গেল সেদিকে। জেলে দুজনকে তোলা হল ট্রলারে। ভয়ে তখনও তারা থরথর করে কাঁপছিল।

আমি তখন নিঃসন্দেহ, যে প্রাণীটিকে দেখলাম সেটা কোন সামুদ্রিক জীব নয়। একজন স্ত্রীলোক। গায়ের রঙ দেখে ইউরোপীয়ান বলেই মনে হয়। তবে অসীম তার শক্তি। অতবড় জেলে ডিঙিটাকে দুটো লোক সুদ্ধ লাথি মেরে শূন্যে তুলে ফেলতে অস্বাভাবিক শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি ঐ ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকটির আছে। পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিধর পুরুষের চাইতেও শক্তিশালী ঐ স্ত্রীলোকটি।

কিন্তু কেন? কেন সে এমন কাজ করে বেড়াচ্ছে? কী তার পরিচয়? এসব করে কী লাভ হচ্ছে তার? কোথায় সে থাকে?

সেদিন বিকেলে আস্তানায় ফেরার পথে এই প্রশ্নগুলোই তোলপাড় করে তুলছিল আমার মনকে।

বাংলোতে ফিরে বারান্দায় চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে করতে ঐ কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ ডক্টর জ্যাকব স্বয়ং এসে হাজির হলেন সেখানে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অর্ভ্যথনা করলাম তাঁকে। ডক্টর জ্যাকব আর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আপনার কনস্টেবলদের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি আজ সেই সামুদ্রিক জীবটিকে দেখেছেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, কেমন করে সে জলে ডিঙি ডুবিয়ে দেয় তাও দেখলাম নিজের চোখে। সত্যি অদ্ভুত কান্ড!

—কী মনে হয় আপনার? হাঙ্গর জাতীয় কোন জীব?

—না, না মিস্টার জ্যাকব, এতদিনে আমি নিঃসন্দেহ যে, অসীম শক্তিধর একজন ইউরোপীয়ান মহিলা এই কান্ড করে বেড়াচ্ছে।

—মহিলা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহিলা। আর কোন ভুল নয়। এতদিন শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করেছি। আজ নিজের চোখে দেখে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হলো। আপনার-আমার মতই মানুষ সে।

একটু সময় চুপ করে থেকে ডক্টর জ্যাকব আবার বললেন, এবার কী করবেন ভেবেছেন?

জবাব দিলাম আমি, এই রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। তবে কোন্ পথে তা এখনও বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, মিস্টার জ্যাকব, আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন?

—আমি আর কী সাহায্য করতে পারি? পুলিসের তদন্তের ব্যাপারে আমার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমি তো রাতদিন আমার গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তা, যদি কখনও কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো আমাকে বলবেন। চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

—বেশ, বেশ। প্রয়োজন হলে ঠিকই বলব।

জ্যাকব একটু হেসে আবার বলেন, এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও তো আমার ল্যাবরেটরি দেখতে এলেন না, মিস্টার দাসগুপ্ত। একদিন আসুন না।

—হ্যাঁ যাবো। সম্ভব হলে কালই আপনার ল্যাবরেটরি দেখে আসব। শুনেছি আপনার ল্যাবরেটরিতে নাকি নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সামুদ্রিক মাছ আছে।

—তা আছে।

কথার শেষে চলে যান ডক্টর জ্যাকব। আমি আবার ডুবে যাই আমার চিন্তার মধ্যে।

শুধু সেদিনই নয়, এর আগেও একদিন ডক্টর জ্যাকব তার ল্যাবরেটরি দেখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নিজের কাজ নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত থাকি যে তা আর হয়ে ওঠে না। কাজেই পরের দিন গেলাম ডক্টর জ্যাকবের ল্যাবরেটরিতে।

ল্যাবরেটরি তো নয়, যেন অ্যাকোয়ারিয়ামের মেলা। চারিদিকে সুন্দরভাবে সাজানো ছোট-বড় মাঝারী সাইজের অ্যাকোয়ারিয়াম। তাতে রয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের ছোট-বড় সামুদ্রিক মাছ। কি চমৎকার তাদের গায়ের রঙ। কোনটা যেন গায়ে রঙ-বেরঙের জার্সি পরেছে। কোনটার মুখখানা আবার বুলডগের মত। কোনটার দেহের তুলনায় মাথাটা মস্ত বড়। আবার কোনটার মাথা এতই ছোট যে প্রায় বোঝাই যায় না।

ডক্টর জ্যাকব ও সাকসেনা ঘুরে ঘুরে দেখালেন তাঁদের ল্যাবরেটরি। সেই সঙ্গে বলতে থাকেন মাছের পরিচয়। কোন্ মাছের বিষ আছে, কোন্টার নেই, কোন্টা খেতে সুস্বাদু, কোন্টা তা নয়, বিষাক্ত মাছের বিষ কোন্ প্রক্রিয়ায় ফেলে দিয়ে মানুষের খাওয়ার যোগ্য করে তোলা যায় প্রভৃতি নানা ধরনের কথা তাঁরা বলে চললেন। বাস্তবিকই দেখে-শুনে অভিভূত হয়ে পড়ি আমি। ডক্টর জ্যাকবের মাছ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে ওঠে। সুদূর কেরালার মানুষ হয়ে বছরের পর বছর তিনি পড়ে আছেন এই পান্ডববর্জিত জঙ্গলে নিজের গবেষণা নিয়ে। মনে মনে ভাবি, একেই বোধহয় বলে সত্যিকারের সাধনা। প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাজই তো হল মানুষের মঙ্গলের জন্যে নিরলস সাধনা করা। ডক্টর জ্যাকব তেমনি একজন একনিষ্ঠ সাধক বলেই আমার মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে।

।। ছয় ।।

ডক্টর জ্যাকব সম্পর্কে প্রথম আমার খটকা লাগে কনস্টেবল অনিলের কথায়। অবিশ্যি তারও আগে কনস্টেবল নারায়ণ চৌবে একদিন আমাকে বলেছিল, বুঝলেন স্যার, এখানকার ঐ জাগুয়ার আর হায়েনা লোকদুটো তেমন সুবিধের নয়।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন?

—আমরা যতক্ষণ এই বাংলোয় থাকি, ওরা ততক্ষণই আমাদের চোখে চোখে রাখে।

হেসে আমি বলেছিলাম, এ তোমার চোখের ভুল চৌবে। আমরা কি চোর না ডাকাত যে, আমাদের ওরা চোখে চোখে রাখবে?

—না স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, ওদের নজর কেবলই আমাদের দিকে। আমরা কখন কী করি, কোথায় যাই, সব ওরা লক্ষ্য করে। সেদিন ঐ ল্যাবরেটরির পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে একবার উঁকি দিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, জাগুয়ার আমার দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে আছে, যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমি হেসে বলেছিলাম, তা তুমিই বা কেন কাউকে না বলে উঁকি দিতে গেলে?

নারায়ণ চৌবে আমার কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল, আমার নামও নারায়ণ চৌবে। ব্যাটা জাগুয়ার যদি সেদিন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তো ওকে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম। নারায়ণের হাতের রদ্দা কী জিনিস, তা তো এ ব্যাটা জানে না।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, না, না চৌবে। হঠাৎ মাথা গরম করে এসব করতে যেও না। ভুলে যেও না, এরা আমাদের দয়া করে এখানে আশ্রয় দিয়েছে। নইলে আমাদের অসুবিধার সীমা থাকত না।

নারায়ণ চৌবে সেদিন আর কিছু না বলে নিজের মনেই কেবল গরগর করেছিল।

চৌবের কথায় আমল না দিলেও, অনিলের কথায় কিন্তু আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে যাব, হঠাৎ অনিল এসে ফিসফিস করে বললে, আচ্ছা স্যার, ওদের ওই ল্যাবরেটরিতে সেদিন কী দেখলেন?

অনিলের প্রশ্নের আসল অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বললাম, দেখলাম নানারকমের মাছ।

—আর কিছু দেখেন নি স্যার?

—কিসের কথা বলছ তুমি?

—এই ধরুন নানারকম যন্ত্রপাতি।

যন্ত্রপাতি?—একটু সময় মনে করতে চেষ্টা করে আমি আবার বললাম, না, না, যন্ত্রপাতি আর কী থাকবে?

—কিন্তু স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, ঐ জ্যাকব সাহেব যখনই ট্রলারে চেপে সমুদ্রে যান, তখনই তাঁর পিছু পিছু জাগুয়ার আর হায়েনা চটের থলেতে মুড়ে ভারি ভারি যন্ত্রপাতি ট্রলারে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার ফেরার সময়ও তিনি চটের থলিতে মুড়ে যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে আসেন।

হেসে আমি বললাম, এতে সন্দেহের কী থাকতে পারে অনিল? ডক্টর জ্যাকব প্রতিদিনই তো একবার করে সমুদ্রে গিয়ে ডুবুরীর পোশাক পরে জলের নীচে নেমে নানারকম মাছ সংগ্রহ করেন। ঐ যন্ত্রপাতি বোধহয় সেই জন্যেই ব্যবহার করা হয়।

—কিন্তু স্যার, আমাদের ট্রলার ড্রাইভার আবদুল রসুল তো অন্য কথা বললে। ও নিজে একজন ভালো ডুবুরীও বটে। সেদিন তাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে বললে, ডুবুরীর পোশাক পরে জলে নামতে আলাদা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কী? ট্রলারের সঙ্গেই তো যন্ত্রপাতি লাগানো থাকে। তাই দিয়েই তো ডুবুরীর খাঁচাটাকে ধীরে ধীরে জলে নামানো হয়। আবার ওপরে টেনে তোলাও হয়।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে আমি আবার জিজ্ঞেস করি, কী ধরনের যন্ত্রপাতি তিনি ট্রলারে নিয়ে যান, তা তুমি দেখেছ?

—না স্যার। চটের থলিতে জড়ানো থাকে সেগুলো। তবে একদিন একটা বড় থলের ফাঁক দিয়ে একটা যন্ত্রের অংশ দেখতে পেয়েছিলম। গোল দেয়াল ঘড়ির মত যন্ত্র। তাতে ঘড়ির কাঁটার মত কাঁটা লাগানো।

কথাটা ভাববার মতই বটে! ডক্টর জ্যাকব সমুদ্রে নামেন মাছ ধরার জন্যে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার মত যন্ত্র নিয়ে কী করেন তিনি? তবে কী মাছ ধরার জন্যে ঐ ধরনের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? তাছাড়া আর একটা কথা, এই সব যন্ত্রপাতি তিনি রাখেন কোথায়? বাংলোতে তো গোণাগুনতি ঘর। একমাত্র ল্যাবরেটরিতেই তো ওগুলো রাখা সম্ভব। কিন্তু সেখানেও তো ঐ ধরনের কোন যন্ত্র আমার চোখে পড়েনি।

পরের দিন আব্দুল রসুলকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে বললে, না সাহেব, মাছ ধরতে ঐ ধরনের কোন যন্ত্রপাতি লাগে বলে তো শুনিনি।

যাই হোক, ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক হলেও এ নিয়ে আমি তেমন একটা মাথা ঘামানো তখনও প্রয়োজন মনে করিনি। আমি যে কাজে এসেছি, তার সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক? ডক্টর জ্যাকব কি তাঁর সহকর্মী সাকসেনা, যা ইচ্ছে করুক, তাতে আমার সেই সমুদ্রের নারী রহস্য সমাধানে কতটুকু সাহায্য করবে? এইসব সাত-পাঁচ ভেবে আমি কেবল অনিলকে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলতে উপদেশ দিলাম।

একদিন রাতে অনিল আবার আমাকে বললে, বুঝলেন স্যার, সেদিন সাকসেনাকে ওদের ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। জামা-কাপড়ে তার কালি-ঝুলি মাখা। মনে হলো যেন কোন যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করে তিনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আপনি তো স্যার বলছেন, সেখানে কোন যন্ত্রপাতিই নেই।

জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, তেমন কিছু তো নজরে পড়েনি।

অনিল আবার বললে, আমার কিন্তু মনে হয়, সেদিন ডক্টর জ্যাকব আপনাকে ল্যাবরেটরির সব কিছু দেখায় নি।

মনের সন্দেহ আরও একটু দৃঢ় হয় আমার। ল্যাবরেটরিতে মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে তাঁরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু জামাকাপড়ে কালি-ঝুলি মাখা থাকবে কেন? তাছাড়া এইসব যন্ত্রপাতি ওরা রাখেনই বা কোথায়?

মনের সন্দেহ দৃঢ় হতেই কৌতূহল বেড়ে ওঠে আমার। মনে মনে ঠিক করি একদিন সুযোগমত ডক্টর জ্যাকব কিংবা সাকসেনাকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে ঐ ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে।

মনের কথাটা অনিলকে বলতেই সে উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। বললে, ঠিক আছে স্যার, সুযোগমত আপনাকে খবর দেব।

সুযোগ এসে গেল একদিন। সাধারণত জাগুয়ার, হায়েনা পালা করে সারা রাত গোটা বাংলো পাহারা দেয়। সেদিন হায়েনার শরীর খারাপ। একা জাগুয়ার রাত দুটো পর্যন্ত বাংলো পাহারা দিয়ে শেষে ক্লান্ত হয়ে বাইরের খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই

শুরু হলো তার নাকডাকা।

তক্কে তক্কে ছিল অনিল। জাগুয়ার ঘুমিয়ে পড়তেই সে এসে ঠেলে তুলল আমাকে। অবশেষে প্রস্তুত হয়ে আমি ও অনিল আমাদের ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে ল্যাবরেটরির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতে একটা টর্চ ও অনিলের হতে একটা রিভলভার।

ল্যাবরেটরির দরজার সাধারণ তালাটা খুলতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না অনিলের। এসব কাজে সে সত্যিই ওস্তাদ।

ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে টর্চের আলোয় ঘরখানাকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। না, কোন যন্ত্রপাতিই আমাদের চোখে পড়ল না। চারিদিকেই অ্যাকোয়ারিয়ামের কাঁচের বাক্স। অসময়ে টর্চের আলো চোখে পড়তেই মাছগুলো ছোটাছুটি শুরু করল জলের মধ্যে।

নিরাশ কণ্ঠে ফিসফিস করে আমি অনিলকে বললাম, না হে, আমাদের সন্দেহ অমূলক। কিছুই নেই এখানে।

—কিন্তু স্যার, আমি নিজের চোখে এই ঘর থেকে সেই যন্ত্রপাতিগুলো বের করতে দেখেছি। আবার ফিরিয়ে আনতেও দেখেছি। সেগুলো তবে কোথায়?

তাই তো! —বলতে বলতে আমি ল্যাবরেটরির একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বড় দেয়াল আলমারির কাছে এসে দাঁড়াতেই অনিল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, দেখুন তো স্যার, এই আলমারির মধ্যে কী আছে?

আলমারির ডালাটা খোলাই ছিল। পাল্লা দুটো টানতেই আমি ও অনিল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোথায় আলমারি। এটা যে একটা দরজা! ভেতর থেকে একটা সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে।

কিছুক্ষণ সেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর অনিল। অন্ধকারেই টের পাচ্ছিলাম অনিলের মুখে বিজয়ীর হাসি। অবশেষে এক সময় দুর্গা নাম স্মরণ করে আমি ও অনিল পা বাড়ালাম সেই সিঁড়ির দিকে।

বেশী দূর নামতে হলো না আমাদের। মাটির নীচে একখানা বিরাট ঘর। ঘর না বলে একটা ছোটখাট ফ্যাক্টরী বলাই ভালো। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে লোহালক্কড়, নাট-বল্টু, লোহা ও পলিথিনের নানা আকারের পাইপ। অনেকগুলি ঘড়ির কাঁটার মত যন্ত্রও পড়ে রয়েছে একপাশে। একটা মাঝারি আকারের লেদ্-মেসিনও চোখে পড়ল। দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে এরা কী করে? মাছ ধরার জন্যে যে এসব ব্যবহার করা হয় না, তা তো স্পষ্ট। আর মাছের গবেষণার জন্যেও এসবের প্রয়োজন হয় না নিশ্চয়ই। তাহলে এই যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে ডক্টর জ্যাকব প্রতিদিন সমুদ্রের জলে গিয়ে নামেন কেন? কী তাঁর উদ্দেশ্য?

কথাগুলো মনে উদয় হলেও এ নিয়ে এই সময় ওখানে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ ভাববার সময় নেই। কে কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে বিপদ ঘটাবে, তার ঠিক কী। স্পষ্ট বোঝা যচ্ছে ডক্টর জ্যাকব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চায় না যে, এই ব্যাপারটা আমরা জানতে পারি।

আমি ও অনিল আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াই।

অনিল ল্যবরেটরির দরজা ভেজিয়ে পাল্লায় তালা লাগাতে যাবে, হঠাৎ ডক্টর জ্যাকবের ঘরের লণ্ঠনের আলো জ্বলে ওঠে। আর পর মুহূর্তেই ডক্টর জ্যাকব চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন

জাগুয়ারকে।

সর্বনাশ! আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। ধরা পড়লে বিপদ হতে পারে। তাই আর বিলম্ব না করে আমি ও অনিল দ্রুতপায়ে ছুটতে থাকি আমাদের ঘরের দিকে। পেছনে খোলা অবস্থাতেই পড়ে থাকে ল্যাবরেটরির দরজা ।

।। সাত।।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা এমন মুখ করে থাকি যেন কিছুই হয়নি। বাংলোর টানা লম্বা বারান্দায় দেখা হয় ডক্টর জ্যাকব ও সাকসেনার সঙ্গে। কিন্তু তাদের কথাবার্তায় এমন কিছু বোঝা যায় না যে, তারা আমাদের সন্দেহ করেছে। তবে এটা ঠিক যে, তারা বুঝতে পেরেছে, আগের দিন রাতে কেউ লুকিয়ে ঢুকেছিল তাদের ল্যাবরেটরিতে। ঘরের খোলা দরজাই তার প্রমাণ। কেবল অনিল এক সময় ফিসফিস করে আমাকে বললে, ঐ জাগুয়ার ব্যাটার চোখের দৃষ্টিতে মনে হয় যেন ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে, স্যার।

জবাবে আমি বললাম ঠিক আছে। চুপ করে থাক। আমরা যে কিছু টের পেয়েছি, তা ওদের বুঝতে দিও না।

সেদিন ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে সেই স্ত্রীলোকটির চাইতে ডক্টর জ্যাকবের কথাই আমার বারে বারে মনে পড়তে থাকে। কে এই ডক্টর জ্যাকব? সত্যিই কি মাছ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যেই তিনি এখানে আছেন? এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি তাঁর?

কিন্তু কে এর জবাব দেবে? কার কাছ থেকেই বা ডক্টর জ্যাকব সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে পারি?

হঠাৎ আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শচীন অধিকারীর কথা মনে পড়ল। ঐ ভদ্রলোক তো এই অঞ্চলে অনেকদিন আছেন। উনি হয়ত ডক্টর জ্যাকব সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আমাদের দিতে পারেন।

পরের দিন খোদ ডক্টর জ্যাকবের কাছেই পাড়লাম কথাটা। বললাম, সমুদ্রের ঐ মহিলা সম্বন্ধে তদন্ত করতে এসে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছি, ডক্টর জ্যাকব। তাই ভাবছি, পরামর্শ করার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেই শচীনবাবুর কাছে একবার যাব।

—বেশ তো যান না। —শান্ত কণ্ঠে জবাব দেন ডক্টর জ্যাকব।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডক্টর জ্যাকব আবার জিজ্ঞেস করেন, কখন যাবেন?

—ভাবছি আজ বিকালে সমুদ্র থেকে ফিরে এসে ট্রলার নিয়ে যাব।

—কিন্তু তাতে তো রাত হয়ে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা-পথে যেতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়তে পারেন।

চিন্তিত কণ্ঠে আমি বললাম, কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী। এখানে তো আর গাড়ি-ঘোড়া নেই।

গাড়ি-ঘোড়ার কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললাম। কারণ আমরা জানতাম, এখানে ডক্টর জ্যাকবের একখানা জীপ গাড়ি আছে। মনে আশা, হয়ত তিনি ওই জীপখানা কয়েক ঘন্টার জন্যে আমাদের ছেড়েও দিতে পারেন। জীপে এখান থেকে ফরেস্ট বাংলোতে যেতে মিনিট চল্লিশের বেশি লাগে না।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। আমার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরে ডক্টর জ্যাকব বললেন, বেশ তো, ভাল মনে করেন তো আমার জীপখানা নিয়ে যেতে পারেন। ঘন্টা কয়েকের তো মাত্র ব্যাপার।

তাই ঠিক হলো। বিকেলে ট্রলার নিয়ে ফিরে এসে জীপে চেপে বসলাম আমি। পেছনের সীটে বসল চৌবে। জীপ চালিয়ে নিয়ে যাবে অনিল। পুলিস ডিপার্টমেন্টে কিছুদিন ড্রাইভারের কাজও সে করেছিল।

জীপ স্টার্ট দেওয়ার মুহূর্তে ডক্টর জ্যাকব এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, পথ-ঘাটের কথা জেনে নিয়েছেন তো? জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ভুল হলে কিন্তু বিপদে পড়বেন।

আমি বললাম, রাস্তা ভুল হবে কেন? বলতে গেলে তো মাত্র একটাই রাস্তা।

—হ্যাঁ, খুবই সাবধানে যাবেন। জঙ্গলের সরু রাস্তায় গাছের সঙ্গে যেন ধাক্কা না লাগে। তাছাড়া পথে জন্তু-জানোয়ার বিশেষ করে বাঘের কবলে পড়লে কী করতে হবে, তা জানা আছে তো?

জ্যাকবের কথায় আমি অনিলের দিকে তাকাই। অনিল আমতা আমতা করে বলে, না, ঠিক—

—সে কী! এসব অঞ্চলে জীপ চালাতে হলে তো ওইসব নিয়ম-কানুন জানা বিশেষ প্রয়োজন। নইলে তো বাঘের কবলে পড়ে নির্ঘাৎ মৃত্যু। এই অঞ্চলটি তো বাঘের মস্ত একটা আস্তানা।

জ্যাকবের কথা শুনে অনিলের মুখটা শুকিয়ে ওঠে। এমনি একটা পরিস্থিতিতে নিজের, বিশেষ করে আমার, জীবনের ঝুঁকি নিতে বোধহয় একটু ভয় পায় সে।

ডক্টর জ্যাকব অনিলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আমাকে বললেন, বুঝলেন মিস্টার দাসগুপ্ত, আপনার ড্রাইভার বোধহয় একটু ভয় পেয়েছে। তা পাবারই কথা। যাক্‌গে, আপনাদের এ জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। আমাদের হায়েনা এই অঞ্চলে অনেকদিন গাড়ি চালাচ্ছে। ওর উপর আপনারা ভরসা করতে পারেন। হায়েনাই আপনাদের নিয়ে যাবে।

হায়েনার প্রসঙ্গে আমি একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। তাকিয়ে দেখি অনিল ও চৌবের মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে ডক্টর জ্যাকবকে কিছু বলাও শোভা পায় না। তাই অগত্যা নিজেদের বরাতের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হায়েনার গাড়ির সওয়ারী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের থাকে না ।

লাইকিংদা এই সময় একটু থেমে একটা বিড়ি ধরালেন। সেই ফাঁকে আমি বললাম, দাদা, শেষ পর্যন্ত জেনে-শুনে আপনি ওদের ফাঁদে পা দিলেন?

বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জবাব দেন লাইকিংদা,—দেখ, কানাই, জীবনে কখনও-সখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, তখন জেনে-শুনেও অন্যের ফাঁদে পা বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না, বুঝলি?

আমি চুপ করে থাকি। লাইকিংদা আবার শুরু করেন, হ্যাঁ শোন্ তারপর—। বুঝতেই তো পারছিস, সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও সেখানে সূর্যের আলো পড়ে না। তার ওপর তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে হায়েনা। তার পাশে আমি। পেছনে অনিল ও নারায়ণ চৌবে।

চলতে চলতে জীপটা হঠাৎ একটা শব্দ করে থেমে গেল। আমি হায়েনাকে জিজ্ঞেস করি, কী হলো?

—কিছু না সাহেব। এখনই ঠিক হয়ে যাবে। —বলেই হায়েনা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির বনেট খুলে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

পেছন থেকে অনিল বলে উঠল, গাড়ির ডিস্ট্রিবিউটারে বোধহয় কোন গন্ডগোল আছে।

জবাব দেয় হায়েনা, না, না, ডিস্ট্রিবিউটর ঠিক আছে। ব্যাটারীটা একটু কমজোরী। একটু

ঠেললেই স্টার্ট হবে।

আমি গাড়িতে বসেই থাকি। অনিল ও চৌবে নেমে এসে জীপ ঠেলতে থাকে। নিজের সীটে বসে হায়েনা স্টার্ট দিতে চেষ্টা করে জীপে।

এক সময় হায়েনা বলে ওঠে, নাঃ, এতে হবে না। আরও জোরে ঠেলতে হবে। জোরে ঠেললে ঠিক স্টার্ট হবে।

এবার আমিও নেমে আসি জীপ থেকে। তারপর আমরা তিনজনে মিলে ঠেলতে থাকি জীপ। ড্রাইভারের সীটে হায়েনা।

অকস্মাৎ গর্জন করে ওঠে জীপের ইঞ্জিন। পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তীরের মত ছুটে যায় গাড়িটা। আমরা কিছু বুঝতে পারার আগেই জীপটা পেছনে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা তিনজন কেবল বোকার মত সেই দিকে তাকিয়ে থাকি।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যায় নিঃশব্দে। এতক্ষণে নিজেদের বিপদ বুঝতে পারি আমরা। ঐ হায়েনা শয়তানটা বাঘের পেটে পাঠাবার মতলব করেই এমনিভাবে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলে আমাদের ফেলে রেখে পালিয়েছে। হয়ত এই ব্যবস্থায় ডক্টর জ্যাকবেরও সায় ছিল।

হঠাৎ পাশের জঙ্গলে একটা শব্দ হতেই কান খাড়া হয়ে ওঠে আমাদের। বাঘ নাকি? তাহলে তো সর্বনাশ। পাশে তাকিয়ে দেখি অনিল ও চৌবের অবস্থা ঠিক আমার মতই। ভয়ার্ত চোখে তারা তাকিয়ে আছে জঙ্গলের দিকে।

সেই মুহূর্তে, সেই অবস্থায়, আমাদের কি করণীয়, তা আমার মাথায় আসছিল না। কিন্তু একটা কিছু যে করা এখনই প্রয়োজন তা আমি বুঝতে পারছিলাম। এমনিভাবে সুন্দরবনের এই গভীর জঙ্গলে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঘের পেটে যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। অবশ্য দুটো রিভলভার রয়েছে আমাদের সঙ্গে কিন্তু এই অস্ত্র দিয়ে কতক্ষণ যুঝতে পারব?

অকস্মাৎ অনিল কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী উপায় হবে স্যার?

অনিলের কথা শেষ হবার আগেই চৌবে সহসা বাংলা ভাষা ভুলে মাতৃভাষায় বলে ওঠে, শের আভি মার ডালেগা, স্যার। হায় রামজী!

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই আমি বলে উঠি, অনিল, চৌবে, আর কোন উপায় নেই। শীগগীর গাছে উঠে পড়।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ খুব কাছ থেকে জেগে ওঠে পিলে-কাঁপানো বাঘের হুঙ্কার। বুকটা ধড়াস করে ওঠে আমার। তাকিয়ে দেখি. চৌবে থরথর করে কাঁপছে। খুনী-ডাকাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে যে নারায়ণ চৌবের বুক কাঁপে না, সুন্দরবনের এই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বরে তার প্রায় অজ্ঞান হবার মতই অবস্থা। শুধু চৌবে কেন, সেই মুহূর্তে আমার ও অনিলের অবস্থাও প্রায় ওরই মতো।

বাঁচার তাগিদে আমরা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। যে করেই হোক, বাঁচতে হবে। অনিল তরতর করে একটা মোটা গাছে চড়ে বসল। দেখে মনে হলো, ওর গাছে চড়ার অভ্যেস আছে। অনিলের দেখাদেখি আমিও অনেক কষ্টে সেই গাছে উঠতে চেষ্টা করতে থাকি।

একে বয়স হয়েছে, তায় অভ্যেস নেই। কাজেই গাছে চড়তে গিয়ে হাত-পা ছড়ে যেতে থাকে আমার। তবুও বাঁচার তাগিদে উঠতে থাকি ওপরে। হঠাৎ নীচে জেগে ওঠে একটা কান্নার শব্দ। ঘাড় নীচু করে তাকিয়ে দেখি, চৌবে হাউ হাই করে কাঁদছে। আর হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে বলছে, আমার কী হবে, স্যার? শের জরুর মার ডালেগা। আমি তো গাছে চড়তে জানি না, স্যার।

সত্যিই তো, চৌবের কী হবে? ওকি শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটে যাবে?

অবশেষে কসরত করে আমি ও অনিল যখন নারায়ণ চৌবের আড়াই মনী বিশাল দেহখানাকে টেনে গাছের ওপরে তুললাম, তখন ওর শরীরটা ঘামে সপ্‌সপ্‌ করছে, আর ক্লান্তিতে আমার দেহ অবসন্ন।

সারাটা রাত গাছের ওপরে কাটল আমাদের। নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে বাঘের আনাগোনা টের পেলাম আমরা। তীব্রবেগে ছুটে যেতে দেখলাম একদল হরিণকে। শুনতে পেলাম জংলী শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। অবশেষে সকাল হতেই জঙ্গলের সেই বিভীষিকা অনেকটা কমে এল। একটু বেলা হতেই গাছের ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়ল জঙ্গলে। তখন আমরা নেমে এলাম গাছ থেকে।

নেমে তো এলাম, এখন যাবো কোন্ দিকে? মনে মনে চিন্তা করলাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার শচীন অধিকারীর বাংলো আমরা চিনি না। আর সেখানে এই অবস্থায় গিয়েও লাভ কী আমাদের? তার চাইতে ডক্টর জ্যাকবের বাংলোতে যাওয়াই ভাল। শত্রুপুরী হলেও ওটাই বোধহয় এখান থেকে কাছে। তাছাড়া, আমাদের ট্রলারও সেখানেই নোঙর করা আছে।

অবশেষে ডক্টর জ্যাকবের বাংলোতে যাওয়াই সাব্যস্ত করে আমরা রওনা হলাম সেইদিকে। মনে মনে ঠিক করলাম, ওখানে যদি আবার থাকতেই হয় তো খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা ওদের প্রথমবারের অকৃতকার্যতা দ্বিতীয়বারে ঢাকতে চেষ্টা করতে পারে।

আমরা যখন বাংলোয় এসে পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে আমরা বাংলোর বারন্দায় এসে বসে পড়তেই ছুটে এলেন ডক্টর জ্যাকব, ছুটে এলো সাকসেনা ও জাগুয়ার। কিন্তু দেখা পেলাম না হায়েনার।

ডক্টর জ্যাকব এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত অভিনয় শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, ভগবানের অশেষ করুণা যে আপনারা আবার সুস্থ দেহে ফিরে আসতে পেরেছেন। ব্যাটা জানোয়ার কোথাকার। আচ্ছা করে চাবুক মেরেছি সেই ইডিয়টটাকে। সারা রাত কোথায় কটিয়েছে কে জানে। আজ সকালে এসে খবর দিল যে, আপনারা নাকি ফরেস্ট বাংলোতেই থাকবেন। তাই সে জীপ নিয়ে ফিরে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, তাই যদি হবে তো হায়েনাকে চাবুক মেরেছেন কেন?

আমার প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে বলতে থাকেন ডক্টর জ্যাকব, বুঝলেন মিস্টার দাসগুপ্ত, ওর কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। দারুণ মিথ্যেবাদী লোকটা। জেরা করতেই সত্যি কথা বলে ফেললে। তারপর রেগে গিয়ে চাবুক চালালাম। ভেবেছিলাম এখনই আবার আপনাদের খোঁজে জীপ পাঠাব। কিন্তু তার আগেই আপনারা এসে গেলেন।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি—আমাদের জঙ্গলে ফেলে রেখে হায়েনা কেন জীপ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল? কী উদ্দেশ্য ছিল তার?

—কিছু না মশাই, কিছু না। স্রেফ কৌতুক! ব্যাটার স্বভাবই ওই রকম। পেট ভর্তি মদ গিলে গাড়ি চালাতে গেলেই ও মাঝে মাঝে এমনি কৌতুক করে। তা শয়তানটাকে আজ ভালোমত শাস্তি দিয়েছি। জীবনে আর এমন কাজ ও করবে না।

এরপরে আর কিছু বলা চলে না। কাজেই রয়ে গেলাম সেই বাংলোয়। তবে খুব সতর্কভাবে চলতে লাগলাম আমরা।

।। আট ।।

ইদানিং ডক্টর জ্যাকবের ওপর একটু কড়া নজর রেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, মাছধরা ও তা নিয়ে গবেষণা করা ছাড়াও অন্য কোন কাজে তিনি প্রতিদিন সমুদ্রের নীচে রকমারী যন্ত্রপাতি নিয়ে নামেন। দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা জলের নীচে থাকেন তিনি। তারপর আবার ওপরে উঠে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন কিছু পুরানো যন্ত্রপাতি। এগুলোই সম্ভবত তাঁর গোপন ফ্যাক্টরীতে মেরামত করে আবার নিয়ে যান সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে সাকসেনাও সঙ্গী হয় তাঁর।

এ ছাড়া কিছু দিন লক্ষ্য করে আরও একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়ল। ডক্টর জ্যাকবের মাছধরা বড় ট্রলারটা প্রতিদিন সমুদ্রের একই জায়গায় তাঁকে নামিয়ে দেয়। আবার সেখান থেকেই তুলে নিয়ে আসে তাঁকে। একটা বড় লোহার খাঁচায় চড়ে ডুবুরীর পোশাক পরে ডক্টর জ্যাকব সমুদ্রে নামেন। সঙ্গে থাকে সেই যন্ত্রপাতি।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই এমন হলো যে, সমুদ্রের সেই উলঙ্গ মহিলার রহস্য ভুলে গিয়ে জ্যাকব-রহস্যই দিনরাত আমার মাথায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। অনেক চিন্তা ভাবনা করেও সেই রহস্যের কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে অবশেষে একদিন চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই প্রস্তুত হলাম আমরা।

বলতে বলতে লাইকিংদা একটু থামেন। আমরা তাঁর সেই চরম ব্যবস্থার কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকি, তাঁর মুখের দিকে। কাহিনীর আকর্ষণে সেই মুহূর্তে তাঁর কথা বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার কথা ভুলে যাই আমরা।

লাইকিংদা আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকেন, তোরা তো ইদানিং খবরের কাগজে প্রায়ই বিমান ছিনতাইয়ের খবর পড়ছিস। কিন্তু সমুদ্রের বুকে জাহাজ কিম্বা ট্রলার ছিনতাইয়ের খবর কখনও তোদের চোখে পড়েছে? সেদিন কিন্তু তেমনি একটা কান্ড করতে প্রস্তুত হয়েই আমাদের ছোট ট্রলার নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম ডক্টর জ্যাকবের নোঙর করা বড় ট্রলারটার দিকে।

বড় ট্রলারের মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। কাজেই ওরা আমাদের কোনরকম সন্দেহ করেনি। অনিল ও চৌবেকে নিয়ে আমি গিয়ে উঠলাম ওদের ট্রলারে। তারপর সারেঙ-এর ঘরে আমি ওদের ডেকে পাঠালাম।

ডক্টর জ্যাকবের ট্রলারে সারেঙ ছাড়াও আরও চারজন মাঝিমাল্লা ছিল। ওরা সবাই এসে জড়ো হতেই হঠাৎ স্বমূর্তি ধরলাম আমরা। আমার চোখের ইঙ্গিতে অনিল ও চৌবে কোমর থেকে টেনে তুলল তাদের গুলিভর্তি রিভলবার। আতঙ্কে মাঝি-মাল্লাদের মুখ নীল হয়ে উঠল। আমি চড়া সুরে তাদের হুকুম দিলাম, বড় ট্রলারটাকে সমুদ্রের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে।

প্রথমটায় ওরা একটু হতভম্ব হয়ে রইল। সেই মুহূর্তে আমার নির্দেশ প্রতিপালন করা উচিত কিনা বুঝতে পারল না। বৃদ্ধ সারেঙ প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে চাইল আমাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনিল তার রিভলবারটা সারেঙের মুখের সামনে তুলে ধরতেই সে চুপ করে গেল। তারপর মাথা নেড়ে আমার নির্দেশ প্রতিপালন করতে সম্মত হলো।

অনিল ও চৌবের তত্ত্বাবধানে চারজন মাঝি-মাল্লাকে পাঠিয়ে দিলাম ট্রলারের ইঞ্জিনঘরে। আর আমার হেপাজতে রইল সারেঙ স্বয়ং।

উপকূল থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে সমুদ্রের বুকে দাঁড়ালো ডক্টর জ্যাকবের বড় ট্রলার। সঙ্গে সঙ্গে এল আমাদের ছোট ট্রলারটি। আমি চারিদিকে তাকিয়ে এবং কম্পাসের কাঁটায় চোখ রেখে বুঝতে পারলাম ঠিক জায়গাটিতেই এসে দাঁড়িয়েছে ট্রলার।

লাইকিংদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেন, তদন্তের ব্যাপারে জীবনের সব চাইতে বড় ঝুঁকি নিতে সেদিন প্রস্তুত হলাম আমি। বড় ট্রলারের সারেঙ ও মাঝি-মাল্লাদের সবাইকে একটা কক্ষে বন্ধ করে রাখলাম। বাইরে রিভলভার হাতে পাহারায় রইল নারায়ণ চৌবে। আমাদের ছোট ট্রলার থেকে ডেকে নিয়ে এলাম আবদুল রসুলকে। চৌবে ও রসুলকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে বড় ট্রলারের এককোণে রাখা বাক্স থেকে বের করে নিয়ে আসা ডুবুরীর পোশাক দুটো পরলাম আমি ও অনিল। তারপর প্রস্তুত হয়ে আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডুবুরীর খাঁচার মধ্যে।

খোদাতালার নাম স্মরণ করে আবদুল রসুল জলের নীচে খাঁচা নামিয়ে দেওয়ার যন্ত্রের হাতলে হাত রাখল। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে আমি ও অনিল খাঁচা সমেত নামতে লাগলাম সমুদ্রের নীচে।

নামছি তো নামছিই। এর আগে সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না আমার। জীবনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল। সেই সঙ্গে একটা দারুণ কৌতূহল আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দেখতে হবে, এখানে সমুদ্রের তলায় কী আছে। ডক্টর জ্যাকব প্রতিদিন যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে নেমে কী করেন।

একসময় সমুদ্রের তলদেশে নানারকম ছোট বড় মাছ ও সামুদ্রিক জীব আলোর সাড়া পেয়ে ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। তাদের লেজের ঝাপটায় চঞ্চল হয়ে উঠল সমুদ্রের নীচের শান্ত জল।

হঠাৎ সার্চ লাইটের আলো একটা জায়গায় এসে পড়তেই আমরা চমকে উঠলাম। এ কী! এখানে যে একটা ছোটখাট ফ্যাক্টরী গড়ে তোলা হয়েছে। সমুদ্রের গভীরে একটি ছোট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এটা কিসের ফ্যাক্টরী?

খাঁচার দরজা খুলে আমি ও অনিল সার্চ লাইট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সেই ফ্যাক্টরীর কাছে। চারিদিকে সরু-মোটা নানা ধরনের লোহার ও পলিথিনের পাইপ। একটা মোটা পলিথিনের পাইপ সেখান থেকে সোজা চলে গেছে বাইরের দিকে। সেই পাইপ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম না। কাঁটা লাগানো বড় বড় ঘড়ির মত যন্ত্র লাগানো রয়েছে পাইপের এখানে-ওখানে। কাঁটাগুলো ডাইনে-বাঁয়ে নড়াচড়া করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল যে ওগুলো চালু রয়েছে।

এতক্ষণে ডক্টর জ্যাকব ও তাঁর দলবলের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে। তাঁদের গবেষণা স্রেফ ভাঁওতা। সমুদ্রের নীচে এই ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব রয়েছে ডক্টর জ্যাকবের ওপর। এটাকে দেখাশোনা করতেই তিনি প্রতিদিন এখানে আসেন। নোনা জলে বিকল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ল্যাবরেটরীর পাশে মাটির নীচের মেরামতি কারখানা থেকে মেরামত করে নিয়ে গিয়ে আবার সেগুলোকে ব্যবহার করেন। কিন্তু কেন, কী হয় এখানে?

সার্চ লাইটের আলোয় আমি ও অনিল ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি জলের নীচের সেই বিচিত্র ফ্যাক্টরী। আমাদের দেহের সঙ্গে বাঁধা অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্যে নিঃশ্বাস নিতে থাকি স্বচ্ছন্দে। কেবল জলের তলায় হাঁটতে গিয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছিল আমাদের। জলের নীচে দেহ হাল্কা হয়ে যায়। সেই হাল্কা দেহের ভারসাম্য সব সময় ঠিক রাখতে না পেরে মাঝে মাঝে টলে পড়ছিলাম আমরা।

সহসা একটা কথা মনে পড়তেই দারুণ চমকে উঠি আমি। বছর দশেক আগে চাকরীতে থাকতে একবার আমাকে আসামের ডিগবয় যেতে হয়েছিল একটা তদন্তের ব্যাপারে। ভারতবর্ষের একটা বিখ্যাত তৈল-কেন্দ্র সেই ডিগবয়। মাটির নীচে থেকে তেল উত্তোলন করা হয় এখানে। সেই ক্রুড অয়েল রিফাইন অর্থাৎ পরিষ্কার করে তৈরী হয় পৃথিবীর সব চাইতে প্রয়োজনীয় বস্তু—পেট্রল। যার আরেক নাম লিকুইড গোল্ড অর্থাৎ তরল সোনা। হ্যাঁ সোনার মতই দামী বস্তু এই পেট্রল। আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু।

সমুদ্রের নীচের এই ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতি দেখে সেই ডিগবয়ের কথাই মনে পড়ে আমার। সেখানেও এমন ধরনের যন্ত্রপাতি আমি দেখেছিলাম।

যতই দেখতে থাকি, ততই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠি আমি। শুধু উত্তোলন নয়, সেই তেল মোটা পলিথিনের পাইপের সাহায্যে চুরি করা হচ্ছে। সমুদ্রের এই জায়গাটা ভারতবর্ষের জলসীমার মধ্যে। এই তেলের ওপর একমাত্র অধিকার আমাদের দেশের। গোটা পৃথিবী জুড়ে তেলের হাহাকার। সুন্দরবনের এই তেল সমৃদ্ধ উপকূল থেকে আমাদের দেশের সম্পদ কেউ চুরি করে নিচ্ছে। সম্ভবত কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হাত রয়েছে এতে। একা কোন মানুষের পক্ষে গোপনে সমুদ্রের তলদেশে এমনি ড্রিলিং অর্থাৎ খনন কার্য চালিয়ে তেল চুরি করা সম্ভব নয়। সেই বিদেশী রাষ্ট্রেরই অনুচর ওই ডক্টর জ্যাকব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা।

বলতে থাকেন লাইকিংদা, তোরা বোধহয় জানিস কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে মাঝে মধ্যে সাপ বেরিয়ে পড়ে। পুলিসের তদন্তের ব্যাপারেও মাঝে-মধ্যে এমন ঘটে। ছিঁচকে চোর ধরতে গিয়ে একটা ভয়ঙ্কর খুনী ধরা পড়ার নজীরও আছে। আমার অবস্থাও সেদিন ঠিক তেমনি। সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে বেড়ানো একটি স্ত্রীলোকের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল এমন এক বিরাট ষড়যন্ত্র, যার সঙ্গে আমাদের গোটা দেশের স্বার্থ জড়িত।

সেই মুহূর্তে মনটা খুশী হয়ে ওঠে আমার। এখনই জল থেকে উঠে আমাদের ছোট ট্রলার নিয়ে ছুটতে হবে থানার দিকে। সেখান থেকে বেতার মারফত এই ভয়ঙ্কর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

জলের নীচে কথা বলা যায় না। তাই আকার ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম অনিলকে। বিস্ময়ে অনিল স্তব্ধ হয়ে রইল। সেই মুহূর্তে আমার কেবলই আপশোস হচ্ছিল, কেন আমি জলের তলায় ছবি তোলার উপযোগী একটা ক্যামেরা নিয়ে এলাম না। তাহলে তো এখানকার ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। তবুও মন্দের ভালো, জলের তলায় লিখবার মত বিশেষ ধরনের কাগজ কলম আমার সঙ্গে ছিল। তাই দিয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ফ্যাক্টরীর মোটামুটি একটা ছবি আঁকতে লাগলাম আমি।

আঁকা শেষ হলে কাগজটা মুড়ে হাতে নিয়ে আমি ও অনিল এসে চড়ে বসলাম সেই খাঁচায়। এবার ইঙ্গিত করতেই আবদুল রসুল যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে টেনে তুলবে ওপরে।

হঠাৎ জলের মধ্যে জেগে উঠল একটা গুম গুম শব্দ। ঢেউ জাগল সমুদ্রের নীচের শান্ত জলে। পরক্ষণেই কিছু বুঝতে পারার আগেই একটা প্রচন্ড ধাক্কায় আমি ও অনিল খাঁচা থেকে ছিটকে বাইরে গড়িয়ে পড়লাম। আমার হাত থেকে খসে পড়ল সেই ভাঁজ করা কাগজখানা। দপ করে নিভে গেল সার্চ লাইটের আলো। সহসা একাট ভারী বস্তুর আঘাতে আমি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লাম সেখানে।

।। নয়।।

জ্ঞান যখন ফিরল, তাকিয়ে দেখি আমি একটা ছোট্ট কেবিনের মধ্যে শুয়ে আছি। অনিল

আমার পাশে বসে ক্লান্ত ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি উঠে বসতেই অনিল জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে, স্যার?

জবাবে আমি বললাম, খুব দুর্বল লাগছে।

—আমার অবস্থাও ঠিক তাই, স্যার। আমিও একটু আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছি।

—আমরা এখন কোথায়?— প্রশ্ন করি আমি।

জবাব দেয় অনিল, তা ঠিক বলতে পারব না, স্যার। তবে একটু আগে উঠে গিয়ে ওপাশের কাঁচের জানলায় চোখ লাগিয়ে সমুদ্রের জল দেখতে পেয়েছি। সেই সঙ্গে অনেক সামুদ্রিক মাছ।

কথাটা শুনেই আমি বলে উঠলাম, তাই নাকি? তাহলে বুঝতে পেরেছি, কোন সাবমেরিনের মধ্যে রয়েছি আমরা। জলের নীচ দিয়ে সাবমেরিন যাচ্ছে। তাই জানলা দিয়ে সামুদ্রিক মাছ দেখতে পেয়েছ তুমি। বোধহয় এখানে আমরা বন্দী।

—বোধহয় নয়, সত্যিই আপনারা বন্দী।

কথাটা কানে যেতেই আমি আর অনিল একযোগে তাকাই কেবিনের ছোট্ট দরজার দিকে। একজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। লোকটির মুখে বাংলা ভাষা শুনেও কিন্তু তাকে বাঙালী বলে মনে হলো না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আমরা কোথায় রয়েছি, বলবেন কি?

—একটা সাবমেরিনে।

—কাদের সাবমেরিন?

—আপনার প্রশ্নের জবাব দেব না। আমার ওপর হুকুম রয়েছে, জ্ঞান ফিরে এলে আপনাদের নিয়ে যেতে। কাজেই এবার আপনারা চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের কাছে।

—কে তিনি? কোথাকার লোক?

—আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। আপনার প্রশ্নের জবাব তিনিই দেবেন। এবার চলুন।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে এসে দেখি একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি বসে আছেন। বুলডগের মত ভয়ঙ্কর মুখখানা তাঁর গম্ভীর।

আমরা এসে দাঁড়াতেই একটা বিদেশী ভাষায় তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পথ প্রদর্শক সেই প্রথম লোকটি বললে, ক্যাপ্টেন আপনাদের বসতে বলছেন।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে আমি ও অনিল বসতেই সাবমেরিনের সেই ক্যাপ্টেন বিদেশী ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সেই আগের লোকটি ইন্টারপ্রিটার অর্থাৎ তর্জমাকারীর ভূমিকা অবলম্বন করে কখনও বাংলা কখনও ইংরেজীতে আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল তার বক্তব্য। আবার আমার জবাবও সেই বিদেশী ভাষায় বলতে লাগল ক্যাপ্টেনকে।

—আপনারা এখন আমাদের বন্দী। আমার সাবমেরিনে এখন রয়েছেন আপনারা। আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলে আমাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাবেন।

জবাবে আমি বললাম, বন্দী হয়েছি যখন, তখন আপনাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতেই চেষ্টা করব।

—আপনারা কি পুলিসের লোক?

—হ্যাঁ, আমি এককালে পুলিস ছিলাম। এখন রিটায়ার করেছি।

—সমুদ্রের জলে নেমেছিলেন কেন?

—ডক্টর জ্যাকব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

—ডক্টর জ্যাকবকে কি আপনার দেশের সরকার সন্দেহ করেন?

—না, এখনও করেননি।

—তার মানে আপনারা ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিলেই আপনাদের সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই না?

—সরকার কী করবেন, বলতে পারি না।

ক্যাপ্টেন একটু সময় চুপ করে থাকেন। সেই সুযোগে আমি জিজ্ঞেস করি, বুঝতে পেরেছি, আপনারাই এমনিভাবে আমাদের দেশের সম্পদ পেট্রল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কেমন করে তা পাচার করছেন জানতে পারি কি?

ক্যাপ্টেন আবার একটু চিন্তা করে জবাব দেন, আপনাদের মুক্তির আর যখন কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন আপনাদের খুলে বলতে আপত্তি নেই। আপনাদের দেশের জলসীমানার মধ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে গোপনে ড্রিলিং চালিয়ে আমরা তেল তুলে নিচ্ছি। সেই তেল পলিথিনের পাইপের সাহায্যে উপকূল থেকে পনের মাইল দূরে আমাদের জাহাজে চলে যাচ্ছে। একটা জাহাজ তেল ভর্তি হলে আর একটা জাহাজ এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানে।

—পনের মাইল দূরে আপনাদের জাহাজ রেখেছেন কেন?

—কারণ, আপনাদের জল-সীমানা মাত্র বারো মাইল। তার বাইরে আর্ন্তজাতিক জল-সীমানায় রয়েছে আমাদের জাহাজ, যাতে টের পেলেও আপনারা জাহাজ আটক করতে না পারেন।

—কোন্ দেশের অধিবাসী আপনারা?

—এই প্রশ্নের জবাব দেব না।

আমি চুপ করতেই ক্যাপ্টেন আবার জিজ্ঞেস করেন, আমাদের এই তেল উত্তোলনের খবর কি আপনারা আপনাদের সরকারকে জানিয়েছেন?

ম্লান হেসে আমি বললাম, তার সুযোগ পেলাম কোথায়? তার আগেই তো জলের নীচে আমাদের বন্দী করেছেন।

আমার জবাবে ক্যাপ্টেনের মুখে ছড়িয়ে পড়ে খুশির হাসি। তবে তিনি হয়ত সেই হাসি হাসতে পারতেন না, যদি জানতেন, সেই মুহূর্তে জলের ওপরে কী ঘটছে।

সমুদ্রের নীচে থেকে আমাদের সংকেতের প্রতীক্ষা করতে থাকে আব্দুল রসুল। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। কিন্তু আমাদের কোন সাড়াশব্দ পায় না সে। অবশেষে সে বুঝতে পারে যে, আমাদের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে। তাই সে তখন হাতল ঘুরিয়ে শূন্য খাঁচাটা টেনে তোলে ওপরে। সেই খাঁচার মধ্যেই পাওয়া যায় আমার হাতে আঁকা সেই ফ্যাক্টরীর ছবিটা। কিছু বুঝতে না পেরে সে কাগজটা নিয়ে এসে হাজির হয় চৌবের কাছে। অবশেষে তারা দুজনে পরামর্শ করে আমাদের ছোট্ট ট্রলারে চেপে বুলচেরি দ্বীপটিকে বাঁয়ে ফেলে মাতলা নদী ধরে সোজা এগিয়ে যায় থানার দিকে। সঙ্গে আমার আঁকা ছবিখানা। বন্ধ কক্ষে আটক থাকে বড় ট্রলারের সারেঙ ও মাঝি-মাল্লারা।

ক্যাপ্টেন আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ডক্টর জ্যাকব সম্বন্ধে খবর নিতেই এই অঞ্চলে এসেছেন?

জবাবে আমি বললাম, না। জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার তদন্তে এসেছিলাম।

—কিছু জানতে পারলেন?

—হ্যাঁ, একজন সাঁতারু মহিলা এই কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

—দেখেছেন তাকে?

—হ্যাঁ দেখেছি।

—কিরকম দেখতে?

—সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

—আর কিছু জানতে পেরেছেন?

—না।

ক্যাপ্টেনের মুখে এবার ফুটে ওঠে দীর্ঘ হাসি। সেই সঙ্গে আমাদের সেই ইন্টারপ্রিটারও হাসতে থাকে। তাদের সেই হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা তার পরিচয় জানেন?

হাসতে হাসতে জবাব দেন ক্যাপ্টেন, হ্যাঁ, শুধু জানিই না, সেই মহিলা আমাদের সঙ্গেই থাকেন।

—তাহলে আপনাদের নির্দেশেই তিনি গরীব জেলেদের এবাবে নাজেহাল করছেন?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—কিন্তু কেন?

—কারণ আমরা চাই না জেলেরা এদিকে মাছ ধরতে আসে। তাতে আমাদের গোপন কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই ওদের মনে ভয় জন্মাবার জন্যেই আমরা ঐ মহিলাকে নিয়োগ করেছি।

—উনি বুঝি একজন ওস্তাদ সাঁতারু?

আবার একটু হাসেন ক্যাপ্টেন। তারপর বলেন, হ্যাঁ, ওস্তাদ তিনি। অস্বাভাবিক তার পায়ের জোর। আমাদের নির্দেশে সাবমেরিনের একটা গোপন ছিদ্রপথে বেরিয়ে গিয়ে পায়ের ধাক্কায় জেলে ডিঙি উল্টে দিয়ে আবার ফিরে আসেন এখানে। দেখবেন নাকি তাঁকে?

আমি বললাম, এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেলে তো ভালই হতো। জিজ্ঞেস করতাম তাঁকে, স্ত্রীলোক হয়ে কেমন করে তিনি এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারছেন?

—বেশ তো, তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন কথাটা। দেখুন তিনি কী জবাব দেন। —বলেই ক্যাপ্টেন বিদেশী ভাষায় অন্য লোকটিকে কিছু নির্দেশ দিতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললে, চলুন আমার সঙ্গে।

পুলিশ-ক্লাব সংলগ্ন থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে এগারোটা ঘোষণা করা হয়। কাহিনীর আকর্ষণে আমরা ভুলে যাই পরের দিনের মাস্টার প্যারেডের প্রস্তুতির কথা। বেচারা শেতলের জন্যেই খুব দুঃখ হয়। লাইকিংদার কাহিনীর দিকে মন দিতে গিয়ে সে তার সাধের গোঁফজোড়া ভুলে সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলে মনের দুঃখে আর্তনাদ করে উঠতেই নিরু এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, ভুল যখন করেই ফেলেছিস, সংশোধন করে নে।

গোঁফ কামিয়ে ফেলার ভুল যে চট করে সংশোধন করা চলে না, সে কথা বোধহয় সেই মুহূর্তে নিরু নিজেও ভুলে গিয়েছিল।

এদিকে লাইকিংদার কাহিনী শুনতে শুনতে চিত্তও আর এক কান্ড করে বসল। জুতোয় জল-কালি লাগাবার বদলে অন্যমনস্কভাবে সে নিপুণ হাতে মাথার টুপির কাপড়ের ওপর জল-কালির মোটা প্রলেপ লাগিয়ে ব্রাশ চালাতে চালাতে হঠাৎ 'এই যাঃ' বলেই মাথায় হাত

দিয়ে বসে পড়ল। এপাশ থেকে আমি বলে উঠলাম যাক্ গে, এতে কী হয়েছে, তবুও তো তোর বরাত ভাল যে, ভুলে নিজের গালে কালির প্রলেপ লাগাসনি। এখন চুপ কর্।

লাইকিংদা সেই সাবমেরিনের মধ্যে একজন বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। গল্পের টানে আমরাও তখন চলেছি তাঁর সঙ্গে। সেই সমুদ্র-সুন্দরীর রহস্যের এখনই সমাধান হবে। আমরা জানতে পারব, সেই বিদেশিনীর পরিচয়।

হঠাৎ দরজার কাছে আমাদের ক্লাবের ঠাকুর-কাম চাকর জগন্নাথের আবির্ভাব। পরক্ষণেই সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, মু পারিব না। মু কাম ছাড়ি দিব। রাত এগারোটা বাজি গেলা।

কাহিনীর দোর গোড়ায় এসে এমন রসভঙ্গ করলে কার না রাগ হয়! নিরু তার বিশাল দেহ নিয়ে 'তবে রে ব্যাটা' বলে জগন্নাথের দিকে তেড়ে যেতেই 'ওরে বাপ্‌রে' বলে জগন্নাথ এক লাফে গিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। তারপর সেখানে বসেই নিজের মনে বকবক করতে থাকে।

ফিরে এসে নিরু আবার জাঁকিয়ে বসে লাইকিংদার দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর?

বলতে থাকেন লাইকিংদা, লোকটার পেছনে আমি ও অনিল এসে দাঁড়ালাম সাবমেরিনের নীচের দিকে একটা লম্বা ঘরের সামনে। ভাবলাম একজন মহিলার ঘরে ঢোকার আগে লোকটি নিশ্চয়ই দরজায় টোকা দেবে। আর সেই মহিলা দরজা খুলে দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু তার বদলে সেই লোকটি একটি কাঁচের জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে আমাদের ডেকে বলল, আসুন, দেখুন।

ছি ছি! এমনিভাবে একজন মহিলার কক্ষে উঁকি দেওয়া ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে লোকটি মৃদু হেসে বললে, আসুন, লজ্জার কিছু নেই।

এবার আমি ও অনিল এগিয়ে গিয়ে কাঁচের জানলায় চোখ রাখতেই বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে যাই। একি স্বপ্ন না সত্যি! পৃথিবীতে এও কি সম্ভব? এমন অসম্ভব সম্ভব হলো কী করে? বিস্ময়ের চরমে পৌঁছে আমাদের মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি সেই পরমাশ্চর্য নারীর দিকে। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে একজন সমুদ্র বিজ্ঞানীর কথা। বিশাল সমুদ্রের রহস্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, হোয়্যার আওয়ার সায়েন্স এন্ডস, দি রিয়েল মিস্ট্রি অব্ দ্য সী বিগিন্‌স। আমাদের বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সমুদ্রের আসল রহস্য। কাজেই গোটা পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ যে বিরাট জলরাশি, তার রহস্যের কতটুকু খবর রাখে এ যুগের বিজ্ঞান?

লাইকিংদা একটু থামতেই আমি বলে উঠি, বুঝতে পারছি, নারী হয়েও সে কোন নারী নয়। বোধহয় কোন বিচিত্র সামুদ্রিক জীব।

অমিয় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। কোন মৎস-কন্যা নিশ্চয়ই। তার নীচের অংশ মাছের মত, আর ওপরের অংশ নারীর মত। মৎস্য-কন্যার চেহারা তো এমনই হয় বলে শুনেছি।

—দূর গবেট! চুপ কর্। —অমিয়কে ধমকে উঠে বলতে থাকে নিরু, শুনলি লাইকিংদা তাকে দুখানা পা দিয়ে জেলে ডিঙি উল্টে ফেলতে দেখেছেন, আর তুই কিনা বলছিল মৎস্য-কন্যা।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় চুপ করে থাকে অমিয়। লাইকিংদা আমাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলতে থাকেন, একটু ধৈর্য ধরে সবটা শোন আগে। তারপর বলছি।

পুরো দুটো দিন আমাদের থাকতে হলো সেই সাবমেরিনের মধ্যে বন্দী হয়ে। অবিশ্যি জলের নীচে সাবমেরিনের মধ্যে দিন রাত বোঝা যায় না। কেবল ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা আটচল্লিশ ঘন্টা বন্দী হয়ে রয়েছি সেখানে। অবশেষে তৃতীয় দিন আমাদের নিয়ে এসে তোলা হলো উপকূল থেকে পনের মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে সেই তেলবাহী বিদেশী জাহাজে। ঐ জাহাজে করেই ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে ওদের দেশে আটকে রাখবে, যাতে এই পেট্রল চুরির কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমরা কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি না করি।

এই তেলবাহী জাহাজের মাঝি-মাল্লা সবাই বিদেশী। ওদের কারুর কথাই আমরা বুঝতে পারছিলাম না। কোন ইন্টারপ্রিটার অর্থাৎ দোভাষীও ছিল না সেখানে। কাজেই ওদের সঙ্গে আকারে ইঙ্গিতেই চালাতে হতো কথাবার্তা।

একটা বন্ধ কেবিনে আমাদের আটকে রাখা হলো। পাঁচদিন ছিলাম সেই জাহাজে। অবশেষে একদিন টের পেলাম জাহাজে তেল ভরা শেষ হয়েছে। পরের দিন সকালেই জাহাজ নোঙর তুলে রওনা হবে। তার আগেই এখানে এসে দাঁড়াবে আর একখানি জাহাজ।

এই পাঁচদিন আমরা আমাদের কেবিনে চুপ করে বসেছিলাম না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মনে মনে বলছিলাম, বাঁচতে আমাদের হবেই। যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। বিদেশের মাটিতে গিয়ে মরার চাইতে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করাও ঢের ভাল। আমাদের দেশের সম্পদ পেট্রল চুরির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতেই হবে। বন্ধ করতে হবে, এই চুরি! পুলিসের চাকরীতে থাকতে চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। রিটায়ার করার পরও সেই কাজ আমার ফুরোয়নি। চাকরীতে থাকি চাই না থাকি দেশের স্বার্থ রক্ষা করা প্রতিটি স্বদেশ-প্রেমিক নাগরিকেরই পরম কর্তব্য।

এই পাঁচদিন ধরে জাহাজ থেকে পালাবার আশা নিয়ে আমি ও অনিল কেবিনের কাঠের দেয়ালের খানকয়েক তক্তা একটু একটু করে আলগা করতে চেষ্টা করেছি। অবশেষে সফলও হলাম একদিন। ঐ তক্তা সরিয়ে সেইদিন রাতেই এখান থেকে পালাবার সংকল্প করলাম। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম দু-একখানা লাইফ-বোট প্রতিদিনই মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে জাহাজের সঙ্গে। জাহাজের খালাসীরা অবসর সময়ে ঐ বোটে চড়ে সমুদ্রের জলে মাছ ধরে। আমরা ঠিক করলাম, ঐ লাইফ-বোটে চড়েই আমরা পালাবো।

গভীর রাত। জাহাজের ইঞ্জিন ঘরের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। ডেকের ওপর একটা মৃদু আলো জ্বলছে। ইঞ্জিন ঘরে রাতের ডিউটিতে নিযুক্ত দু-তিনজন কর্মী ছাড়া আর সবাই যে যার কেবিনে নিদ্রামগ্ন।

কেবিনের দেয়ালের তক্তা সরিয়ে প্রথমে অনিল ও পরে আমি বেরিয়ে এলাম নিঃশব্দে। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিলাম চারিদিক। না, কেউ কোথাও নেই। তারপর বিড়ালের মত পা টিপে টিপে জাহাজের ডেকের সঙ্গে ঝোলানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে একখানা লাইফ-বোটে চড়ে বসলাম।

।। দশ ।।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম আমরা। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে নির্বিঘ্নে মুক্তি লাভ ঘটলো আমাদের। এবার সোজা পাড়ি দিতে হবে উপকূলের দিকে।

কিন্তু কোথায় উপকূল? চারিদিকেই কেবল জল আর জল। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় আলোর ঝিলিক। কম্পাস সঙ্গে না থাকায় দিক ঠিক করতে পারছিলাম

না। অবশেষে ঈশ্বরের দেওয়া কম্পাসের ওপর নির্ভর করতে হলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে দিক ঠিক করে নিলাম।

জাহাজ থেকে পালিয়ে আসার সময় আমাদের বিছানার একখানা চাদর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তাই দিয়ে কোনমতে একটা পাল খাটিয়ে হালের কাছে বৈঠা নিয়ে বসলাম আমি। সমুদ্রের জোরালো হাওয়ায় তর তর করে চলতে লাগল আমাদের নৌকা।

সারারাত এমনিভাবে চলল আমাদের। সকাল হলো। পূব আকাশে আবীর ছড়িয়ে সূর্যদেব মুখ দেখালেন। হঠাৎ আমাদের নজর পড়ল দূরে একখানা জাহাজের ওপর।

মনে মনে ভাবলাম, উপকুলের এত কাছে কোন শত্রু জাহাজ হতেই পারে না। এখানা নিশ্চয়ই কোন মিত্র জাহাজ। কাজেই আর দ্বিধা না করে সেই জাহাজের দিকেই এগোতে লাগলাম আমরা।

অনুমান মিথ্যে নয় আমাদের। আমাদের দেশেরই জাহাজ ওটা। তবে যুদ্ধ জাহাজ। আমাদের একদিনের অনুপস্থিতিতে অনেক কিছুই ঘটে গেছে আমাদের দেশে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভাইজাগ থেকে উপকূল-রক্ষী জাহাজ বহরের একখানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছেন এই অঞ্চলে। সঙ্গে পাঠিয়েছেন কয়েকজন জল ও তেল বিজ্ঞানীকে। আমার হাতে আঁকা জলের নীচের সেই ফ্যাক্টরীর ছবিটির সঠিক অর্থই করেছিলেন তাঁরা।

আমাদের পরিচয় পেয়ে যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বিজ্ঞানীর দল ঘিরে ধরলেন আমাদের। মুখে তাঁদের হাজারো প্রশ্ন।

উপকূলের প্রায় কাছে সমুদ্রের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ডক্টর জ্যাকবের সেই বড় ট্রলার। পাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে দুলছিল আমাদের ছোট্ট ট্রলারটি। জাহাজের ক্যাপ্টেনের মুখেই শুনলাম, দুদিন আগে বিরাট পুলিস-বাহিনী এসে গ্রেপ্তার করেছে ডক্টর জ্যাকব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের। তল্লাসীর সময় বাংলোর মধ্যে মাটির নীচের সেই মেরামতির কারখানাটিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ট্রলার দুটোর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো আমাদের যুদ্ধ জাহাজ। আমাদের দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে নিজের বিরাট ভুড়ির কথা ভুলে গিয়ে নারায়ণ চৌবে ট্রলার ও জাহাজের রেলিং টপকে লাফাতে লাফাতে এসে আমাকে ও অনিলকে জড়িয়ে ধরল। আমি আদর করে ওর গোঁফজোড়াকে একটু নেড়ে দিলাম।

হঠাৎ আমার চোখ পড়ল বড় ট্রলারটির দিকে। তার ডেকের সামনে ডুবুরীর পোশাক পরা দুজন লোক। খাঁচায় করে তাদের জলের নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্য সেখানে তোড়জোড় চলছে।

আমি তাড়াতাড়ি চিৎকার করে বললাম, না, না জলে ডুবুরী নামাবেন না। বিপদ হবে।

আমার চিৎকারে কয়েকজন বিজ্ঞানী এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কিসের বিপদের কথা বলছেন, মিস্টার দাসগুপ্ত? ডুবুরী পাঠিয়ে আগে সমুদ্রের নীচের অয়েল প্ল্যান্টটা সার্ভে করাতে হবে। তারপর সেই পনের মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন কেটে দিয়ে পাইপের মুখটাকে আমাদের উপকূলের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে আমরাই তেল উত্তোলন করতে পারি। কোটি টাকা খরচ করে সমুদ্রের নীচে প্ল্যান্ট বসিয়ে ওরা আমাদের দেশের তেল চুরি করেছে। এবার আমরাই ওটাকে নিজেদের কাজে লাগাবো।

আমি বললাম, তা ঠিক। কিন্তু এই অবস্থায় ডুবুরী পাঠালে আমাদের মত বিপদ হবে। শত্রুদের সেই সাবমেরিন এই এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের কাছে বোধহয় টর্পেডো আছে। টর্পেডোর সাহায্যে ওরা যে কোন মুহূর্তে আমাদের এই দামী যুদ্ধ জাহাজখানাকে

ঘায়েল করতে পারে।

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন। মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে তিনি বলে ওঠেন, তাই নাকি? তাহলে তো আমাদের জাহাজের সাবমেরিন বিধ্বংসী অস্ত্র ডেপ্‌থ চার্জ প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিতে হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই দিন। ওরা এখন মরিয়া হয়ে উঠবে। এত দামী অয়েল প্ল্যান্টটা হারিয়ে ওরা আমাদের যে কোন ধরনের ক্ষতি করতে পারে।

আমার হস্তক্ষেপে ডুবুরীদের জলে নামানো বন্ধ হয়। বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে থাকে, আর যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে থাকি আমি।

অকস্মাৎ সমুদ্রের জলের ওপর নজর পড়তেই আমি চিৎকার করে উঠি, সাবমেরিন! সাবমেরিন এসে পড়েছে! ঐ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।

সত্যিই তো। জলের ওপর মাথা তুলে রয়েছে কালো রঙের একটা বস্তু। আমার চিৎকারে অনেকেই ছুটে আসে সেখানে। ক্যাপ্টেন তাঁর গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার দিয়ে বস্তুটাকে দেখে নিয়েই বুঝতে পারেন, ওটা পেরিস্কোপের নলই বটে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর নৌ-সৈন্যদের নির্দেশ দেন—চার্জ।

কড় কড় শব্দে যেন একটা বাজ পড়ল সমুদ্রের জলে। একবার-দুবার-তিনবার। ডেপ্‌থ চার্জের প্রচন্ড বিস্ফোরণে সমুদ্রের জলরাশির একটা বিরাট অংশ আকাশে উঠেই আবার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সামনের ট্রলার দুখানা কাগজের নৌকার মত দুলতে লাগল জলের ওপর। সমুদ্রের জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল আমাদের। বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমরা তাকিয়ে থাকি জলের দিকে।

মিনিট খানেক কেটে যেতেই জলের ওপর ভেসে ওঠে সাবমেরিনের টুকরো টুকরো অংশ। আনন্দে চীৎকার করে উঠি আমি, ঘায়েল হয়েছে—ধ্বংস হয়েছে সাবমেরিন।

হঠাৎ প্রচন্ড তেলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তাকিয়ে দেখি গোটা এলাকা জুড়ে জলের ওপর তেলের স্রোত।

বিজ্ঞানীরা সহসা হায় হায় করে ওঠেন, সর্বনাশ সর্বনাশ হয়েছে! ডেপ্‌থ চার্জের বিস্ফোরনে সাবমেরিনের সঙ্গে সমুদ্রের নীচের অয়েল প্ল্যান্টটাও ধ্বংস হয়েছে, তাই তেল উঠছে সেখান দিয়ে। হায় হায়, কোটি টাকার প্ল্যান্টটা আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না।

ম্লান কন্ঠে আমি বললাম, এখন তবে উপায়? আমাদের দেশের সম্পদ এমনিভাবে সমুদ্রের জলে ভেসে যাবে?

একটু ম্লান হেসে একজন বিজ্ঞানী জবাব দিলেন, না, না, তা হবে কেন? তেলের পাইপ ধ্বংস হওয়াতে তার মধ্যে যে তেল ছিল, সেই তেলই কেবল জলে ছড়িয়ে পড়েছে। অয়েল প্ল্যান্ট তো আর জলের ফোয়ারা নয় যে, নিজে নিজে তেল উঠবে। যন্ত্রপাতি যখন সব ধ্বংস হয়েছে তখন নিজে নিজে তেল ওঠাও বন্ধ হবে। তবে একটা উপকার এতে হয়েছে। আমরা এতদিনে জানতে পেরেছি সুন্দরবনের এই উপকূলে তেল রয়েছে। ভবিষ্যতে আমরাই এখানকার সমুদ্র গর্ভে ড্রিলিং করে তেল উত্তোলন করব।

লাইকিংদা এবার একটু থামেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিত কন্ঠে আবার বললেন, সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে তেলের সন্ধানের কথা আজ-কাল প্রায়ই তো তোরা খবরের কাগজে পড়িস। কিন্তু তার পথ প্রদর্শক যে এই শর্মা তা কি ঘূণাক্ষরেও টের পেয়েছিস কোনদিন?

—বলতে বলতে লাইকিংদা একটু প্রশান্ত হাসি হেসে নিজের মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

গোঁফ হারানোর দুঃখ ভুলে গিয়ে শেতল এই সময় জিজ্ঞেস করে, সেই রহস্যময়ী সমুদ্র-সুন্দরীর শেষ পর্যন্ত কী হলো? কী ধরনের জীব সেটা?

শেতলকে সমর্থন করে আমরাও বলে উঠি, ঠিক, ঠিক। কে সেই উলঙ্গ নারী, যে নাকি নারী হয়েও নারী নয়?

জবাবে বলতে থাকেন লাইকিংদা, ঘন্টা কয়েক পরে নৌকায় চেপে আমরা যখন বুলচেরি দ্বীপের দিকে যাচ্ছিলাম তখন সমুদ্রের চড়ায় দেখতে পেয়েছিলাম সেই রহস্যময়ীকে। সে তখন মৃত। ডেপ্‌থ চার্জের প্রচন্ড বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটেছিল তার। সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে তার দেহটা এসে আটকে গিয়েছিল বালির চড়ায়।

আমাদের সঙ্গী একজন নাবিকের কাছ থেকে তার ক্যামেরাটা টেনে নিয়ে সেই রহস্যময়ীর কয়েকখানা ছবিও তুললাম। ইচ্ছে ছিল, তার সেই অদ্ভুত দেহটাকে নিয়ে গিয়ে যাদুঘরে পাঠাব। কিন্তু তার সুযোগ আর হলো না। হঠাৎ একটা প্রচন্ড ঢেউ এসে সেই রহস্যময়ীর দেহটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সন্ধান আর পেলাম না।

কাহিনী শেষ করে লাইকিংদা থামতেই আমাদের সবাইকে হঠাৎ কাশির সংক্রামক রোগে পেয়ে বসে। আসলে ওটা আসল কাশি নয়। নকল কাশির সাহয্যে হাসি চেপে রাখার প্রচেষ্টা মাত্র।

অমিয় আর হাসি চাপতে না পেরে শব্দ করেই হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, এবার আপনি সত্যিই মাত করেছেন লাইকিংদা। জব্বর গুল ঝেড়েছেন।

অমিয়র কথায় রাগের বদলে হেসে উঠলেন লাইকিংদা। নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ঘোড়ার ডিম খেলে যা। আমি গুল মারছি বলে তোরা মনে করছিস? যদি এখুনি সেই সমুদ্র-সুন্দরীর ফোটো তোদের দেখাতে পারি?

—তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করব। —জবাব দেয় অমিয়।

—বেশ। তবে তাই দ্যাখ্। —বলেই লাইকিংদা তাঁর ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একখানা মোটা বই টেনে নিয়ে নিরুর বিছানার ওপর ফেলে দেন। আমরা একযোগে তাকিয়ে দেখি, সেটা একখানা শারদীয়া সংখ্যা।

এর মধ্যে আছে নাকি সেই ছবি? —আমি জিজ্ঞেস করি।

লাইকিংদা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলেন, পাতা খুলে দ্যাখ্।

একখানা পাতা খুলতেই আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ি তার ওপর। এও কি সম্ভব? ঈশ্বরের এ কী বিচিত্র সৃষ্টি! এমন প্রাণীর কথা তো কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি!

হঠাৎ চিত্ত মিন মিন গলায় বলে ওঠে, শুনেছি এরকম একটা ছবি নাকি কোথায় কোন্ বিদেশী কাগজে ছাপা হয়েছিল।

লাইকিংদাও দমবার পাত্র নন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দেন, ঠিকই শুনেছিস, তবে এটা শুনিস নি যে, সেই ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষ এই শর্মার কাছ থেকে কেঁদে-ককিয়ে সেটি যোগাড় করেছিল।

আমাদের মুখে আর কোন কথা নেই। একদৃষ্টে আমরা কেবল তাকিয়ে থাকি সেই বিচিত্র সমুদ্র-সুন্দরীর ছবিখানার দিকে।

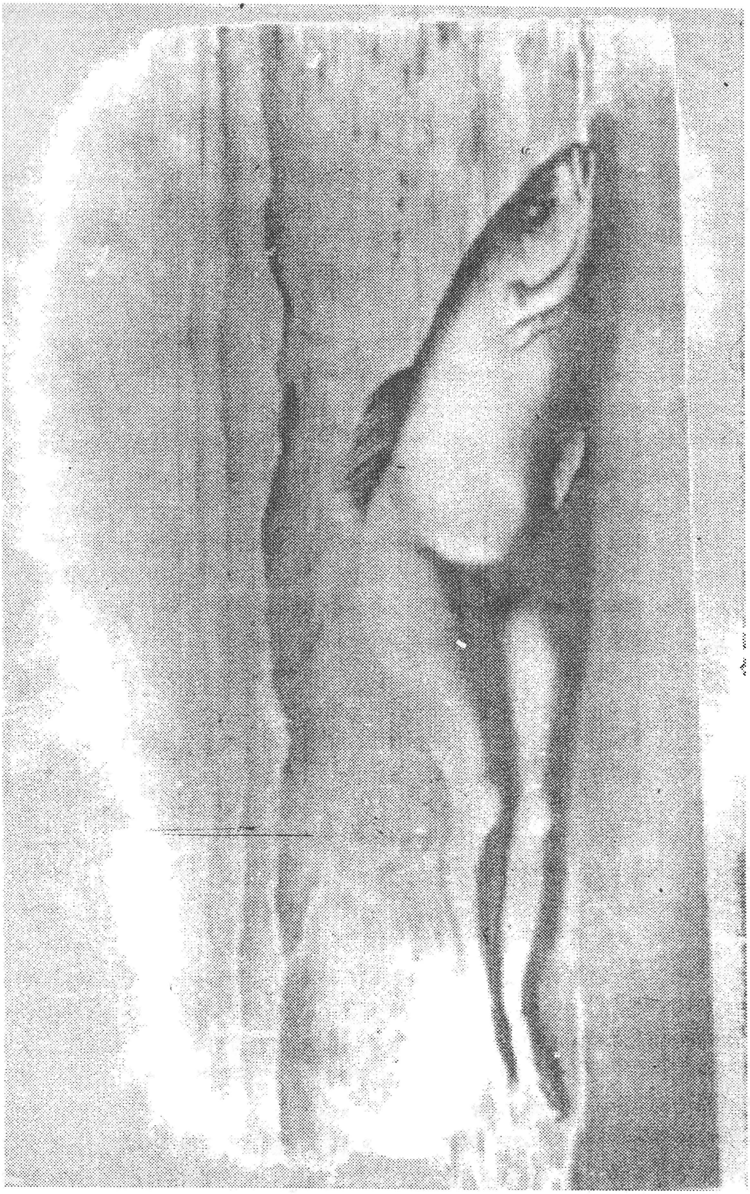

সমুদ্র সুন্দরী

পঞ্চম রামেসিসের মমি

।। এক ।।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর বনবিহারী পাঠক তাঁর বন্ধু জন স্টুয়ার্টের চিঠিখানা পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মনে মনে বললেন একেই বলে সত্যিকারের বন্ধু। বনবিহারী নিজে শত চেষ্টা করেও যা পারেননি, স্টুয়ার্টের চেষ্টায় তাই সম্ভব হতে চলেছে। চিঠিখানা এইরকম—

প্রিয় পাঠক

অনেক চেষ্টা-তদ্বিরের পরে অবশেষে মিশর সরকারের সম্মতি আদায় করেছি। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো পঞ্চম রামেসিসের যে মমিটা রয়েছে সেই মমির দেহে জড়ানো কাপড়ের এক টুকরো কেটে নেওয়ার অনুমতি মিশর সরকার দিয়েছে তোমার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে। তবে শর্ত একটাই—মমির দেহের যেন কোনরকম ক্ষতি না হয়। বুঝতেই তো পারছো, মহামূল্যবান এই মমির কোনরকম ক্ষতি মনুষ্য ইতিহাসের এক মস্ত ক্ষতি। কাজেই সেটা বিচার করে তোমাকে কাজ করতে হবে। এই চিঠি পাওয়ামাত্র তুমি আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে এসো। আমিও সুয়েজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে এয়ারপোর্টে তোমাকে রিসিভ করবো। আশা করি ভালো আছো। তোমার আমার থাকার ব্যবস্থা হবে হোটেল ডি-প্যারিসে।

ইতি তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
জন স্টুয়ার্ট

মুখের হাভানা চুরুটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে চিঠিটা বার কয়েক পড়লেন ডক্টর পাঠক। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা এতদিনে সার্থক হতে চলেছে। পৃথিবীর যে সব দেশের মিউজিয়ামে মমি রয়েছে সেই সব দেশের সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পত্রালাপ করেও কোন ফল হয়নি। কোন দেশের সরকারই তাঁকে অনুমতি দেয়নি। প্রত্যেকেরই সেই একই যুক্তি—এতে মহামূল্যবান মমির ক্ষতি হবে। তাই ডক্টর পাঠক যখন হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন তখন খোদ মমির দেশ অর্থাৎ মিশর সরকার বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে অনুমতি দিলো ডক্টর পাঠককে।

এই কলকাতা শহরেই ব্রিটিশ নাগরিক স্টুয়ার্টের সঙ্গে বনবিহারীর আলাপ । বনবিহারী তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের এক উজ্জ্বল ছাত্র। স্টুয়ার্টের বাবা ছিলেন কলকাতার ব্রিটিশ হাই-কমিশনের একজন উঁচু অফিসার। স্টুয়ার্টের লেখাপড়া অবশ্য বিলেতে। ছুটি ছাটায় তিনি কলকাতায় আসতেন তাঁর বাবার কাছে। আর্কিওলজি অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন স্টুয়ার্ট। লেখাপড়ার শেষে বনবিহারী কলকাতার সায়েন্স কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা করলেও স্টুয়ার্ট কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে আর যুক্ত রাখতে পারলেন না। সুয়েজ ক্যানেল অথরিটির একটা বড় চাকরি নিয়ে তিনি চলে গেলেন মিশরের সুয়েজ অঞ্চলে। তাঁর কাজের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের কোন সম্পর্কই আর রইলো না। কিন্তু তবুও এই বিষয়টির প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমলো না। সুয়েজ ক্যানেল অথরিটির দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও অবসর সময়ে প্রত্নতত্ত্বের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। সুযোগ পেলেই পিরামিড অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন।

কোথায় কলকাতা, আর কোথায় মিশরের সুয়েজ। এই দূরত্ব কিন্তু দুই বন্ধুর সম্পর্কের মধ্যে কোন ছেদ ঘটাতে পারেনি। নিয়মিত চিঠির আদান প্রদান চলতো তাঁদের মধ্যে। অবশেষে

তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে বনবিহারী চলে যেতেই দুই বন্ধু খানিকটা কাছাকাছি এসে পড়লেন। একদিকে মিশরের সুয়েজ খাল, আর অন্যদিকে তুরস্ক। মাঝে প্রায় ছশো মাইলের ভূমধ্য সাগরের ব্যবধান।

এযুগে পৃথিবীতে আশ্চর্য জিনিসের শেষ নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে কত আশ্চর্য ও অতি আশ্চর্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু সেকালে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মধ্যে একটি আশ্চর্য ছিল মিশরের মমি। হাজার হাজার বছর আগে মিশরের 'ফারাও' অর্থাৎ সম্রাট এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে তাঁদের দেহগুলো কাপড়ে মুড়ে রেখে দেয়া হতো। সেই কাপড়ের সঙ্গে মাখানো থাকতো এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার গুণে হাজার হাজার বছর ধরে মৃতদেহগুলো অবিকৃত অবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকতো। পৃথিবীর কোন কোন দেশের মিউজিয়ামে সাড়ে চার-হাজার বছরের পুরানো মমিও দিব্যি অটুট আছে। শোনা যায়, মিশরের প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট তুতেন খামেনের মমিও নাকি খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা।

একালে মমি নিয়ে গবেষণাও কম হয়নি। বিজ্ঞানীরা এই হাজার হাজার বছর আগের অটুট মৃতদেহ নিয়ে অনেকরকম গবেষণাই করেছেন। সেকালের মানুষ সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু যে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সেযুগে মৃতদেহকে অটুট রাখা হতো তার খবর একালের বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অজানা। চেষ্টা করেও তাঁরা তার হদিশ করতে পারেন নি। এই বিষয়টির ওপর গবেষণা করতে ডক্টর বনবিহারী পাঠক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আর এই কাজে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু জন্ স্টুয়ার্ট। ইংরেজি ছাড়া জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলে বনবিহারী, আর আরবি, ফার্সি সহ অনেকগুলো প্রাচ্য ভাষায় দখল ছিল স্টুয়ার্টের।

কনকনে শীতের রাতে আলেকজান্দ্রিয়া এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামলেন বনবিহারী। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর বয়স। বেঁটে-খাটো গোলগাল চেহারা। মাথায় বিরাট টাক, গায়ের রং ময়লা। পরনে গরম স্ট্রাইপ্‌ড স্যুট। নাকের নিচে হিটলারি কায়দার ছোট্ট গোঁফ। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। স্যুটের ওপর দামী ফারের লংকোট।

সামান্য মালপত্র ট্রলিতে চাপিয়ে বনবিহারী এসে দাঁড়ালেন প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে। তিনি আশা করেছিলেন এখানেই তিনি দেখা পাবেন বন্ধু স্টুয়ার্টের। কিন্তু কোথায় স্টুয়ার্ট। লাউঞ্জের মধ্যেই মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বন্ধুর খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে ভাবলেন কোন কারণে বোধ হয় স্টুয়ার্ট লাউঞ্জের ভিড়ের মধ্যে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

ট্রলি নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন বনবিহারী। বাইরে লোকের ভিড়। সারি সারি গাড়ি দাঁড় করানো। প্যাসেঞ্জারেরা ওঠা নামা করছে। তাদের মধ্যে প্যান্ট কোট পরা যেমন ইউরোপীয় ও মিশরীয় রয়েছে। তেমনি রয়েছে সাদা জোব্বা ও মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা আরবের লোক। স্কার্টপরা মেমসাহেবের সঙ্গে বোরখা ঢাকা মুসলিম মহিলারও অভাব নেই।

গেটের কাছে প্ল্যাকার্ড হাতে কিছু লোকও দাঁড়িয়ে। প্ল্যাকার্ডে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা।

হঠাৎ একটা প্লাকার্ডের ওপর চোখ পড়তেই স্বস্তি বোধ করেন বনবিহারী। প্যান্ট ও হাওয়াই সার্টপরা সেই লোকটির হাতের প্লাকার্ডের ওপর লেখা—বি.বি.পাঠক। ফ্রম আঙ্কারা।

লোকটির চেহারায় তাকে মিশরীয় বলেই মনে হলো বনবিহারীর। ট্রলি নিয়ে বনবিহারী লোকটির দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটি একগাল হেসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে,—আপনিই বি. বি. পাঠক।

—হ্যাঁ।—মাথা নেড়ে সায় দেন বনবিহারী।

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বললো,—একটা দরকারী কাজে সাহেব আটকে গেছেন। তাই তিনি নিজে আসতে না পেরে আমাকে গাড়ি নিয়ে পাঠিয়েছেন আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যেতে। সাহেব হোটেল-ডি-প্যারিসে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত ফাইভ স্টার হোটেল এটা। ধনীরাই সাধারণত এখানে ওঠে। বন্ধু স্টুয়ার্টের বিবেচনায় মনে মনে খুশিই হন বনবিহারী। মিশরীয় লোকটি তাঁর একমাত্র স্যুটকেস্‌টি ট্রলি থেকে নামিয়ে গাড়ির দিকে যেতে যেতে সসম্মানে আহ্বান করে তাঁকে,—আসুন স্যার, এই কাছেই গাড়ি পার্ক করেছি।

বনবিহারী তাঁর কাঁধের সাইড্‌ ব্যাগটি নিয়ে অনুসরণ করেন লোকটিকে।

ভূমধ্য সাগরের পাড়ে বিরাট বন্দর-নগরী এই আলেকজান্দ্রিয়া। মিশরের রাজধানী কায়রোর পরেই নাম করতে হয় এই নগরীর। বলতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ক্ষেত্র এটা। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো শহর।

দামী মোটরগাড়ির পেছনের সিটে আরাম করে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছেন বনবিহারী। মসৃণ পিচের রাস্তায় নিঃশব্দে যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে গাড়িটি। রাস্তার দু'পাশের বিরাট বাড়িগুলোয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য স্থাপত্যের সংমিশ্রণ।

প্রায় আধঘন্টা চলার পরে বনবিহারীর মনে হলো তারা যেন শহরের কোন প্রান্তে এসে পড়েছেন। এদিকে লোকজন, গাড়ি ঘোড়াও যেমনি কম তেমনি বাড়িগুলোও যেন অনেকটা জৌলুসহীন।

একটু পরেই চুরুটের নেশায় পেয়ে বসলো বনবিহারীকে। পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করতেই তাঁর খেয়াল হলো বাক্স ফাঁকা। শেষ চুরুটটি তিনি প্লেনে বসেই খেয়ে এসেছেন। মনটা উসখুস করতে আরম্ভ করলো। হোটেলের কাছাকাছি তাঁর নিজের হাভানা ব্র্যাণ্ডের চুরুট পাবেন কিনা বুঝতে না পেরে তিনি ড্রাইভারের সিটে বসা মিশরীয় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোনা চুরুটের দোকান আছে?

—ইয়েস্‌ স্যার।—জবার দেয় লোকটি,—এই তো কাছেই একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে। এখানে আপনি সবই পাবেন।

কথা বলতে বলতে লোকটি একটা মাঝারি গোছের দোকানের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করায়। সাইড্‌ ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বনবিহারী ঢোকেন দোকানে।

বলতে গেলে ফাঁকাই দোকান। দু'চারজন মাত্র খদ্দের কাউন্টারের সামনে। বনবিহারীকে দেখে একজন কর্মী স্মিত মুখে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে,—কী দিয়ে আপনাকে খুশি করতে পারি স্যার?

—এক বাক্স চুরুট চাই।

—ওহ্‌ ইয়েস, এখনই দিচ্ছি।

—হাভানা ব্র্যান্ড আছে তো?

—ভেরি সরি, স্যার। ঐ ব্র্যান্ড আমাদের কাছে নেই। অন্য কোন ব্যান্ড কি আপনার চলবে?

—না-না। —তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন বনবিহারী,—একমাত্র ঐ ব্র্যান্ড ছাড়া অন্যকিছু আমার চলে না।

—তাহলে তো খুবই মুশকিল।—সমবেদনার সুরে বলতে লাগল কর্মচারিটি। এ তল্লাটে তো ঐ ব্র্যান্ড আপনি পাবেন না।

কর্মচারীটির কথায় একটু দমে যান বনবিহারী। একটা গোটা রাত চুরুট ছাড়া থাকতে হবে!

হঠাৎ কর্মচারীটির নজর পড়ে বনবিহারীর কাঁধের সাইড ব্যাগের সঙ্গে লাগানো প্লেনের স্টিকারের দিকে। সেই দিকে তাকিয়ে লোকটি জিজ্ঞাসা করে,—এক্সকিউজ মি, আপনি কি

এয়ারপোর্ট থেকে আসছেন?

বনবিহারী মাথা নেড়ে সায় দেন। লোকটি আবার বললো,—তাহলে তো আপনাকে ডাউন-টাউন দিয়েই আসতে হয়েছে। ওদিকে অনেক বড় বড় স্টোর্স রয়েছে। ওখানেই তো আপনার ব্র্যান্ড পেয়ে যেতেন।

আমতা আমতা করে বনবিহারী জবাব দেন,—আমি তখন ঠিক খেয়াল করিনি যে আমার চুরুট কেস ফাঁকা। তা ছাড়া, এই শহরে আমি প্রথম। কোথায় কি পাওয়া যায় তাও জানি না।

—কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করছি, আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

—আঙ্কারা থেকে। তুরস্কের ক্যাপিটাল আঙ্কারা।

—কোথায় যাবেন?

—হোটেল-ডি-প্যারিসে।

—হোটেল-ডি-প্যারিস! বিস্মিত কণ্ঠস্বর কর্মচারীর,—ঐ হোটেল তো সম্পূর্ণ অন্যদিকে। এদিকে কেন এসেছেন?

কর্মচারীটির প্রশ্নে কেমন যেন বিব্রত বোধ করেন বনবিহারী। তিনি কিছু জবাব দেবার আগেই লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে,—আপনি কি ট্যাক্সিতে এসেছেন?

—না।—মাথা নেড়ে জবাব দেন বনবিহারী, —আমার এক বন্ধু হোটেল থেকে গাড়ি পাঠিয়েছেন।

কর্মচারীটিকে এতক্ষণ একজন বিদেশী খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে দেখে দোকানের আরও কয়েকজন কর্মচারী এগিয়ে আসে সেইদিকে। তারপর আবার বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে,—আপনার গাড়ির ড্রাইভারকে আপনি চেনেন কি?

মাথা নাড়েন বনবিহারী। এদের কথাবার্তার ধরনে তাঁর মনের বিভ্রান্তি আরও বেড়ে ওঠে। কিছু একটা ঘটেছে কিংবা ঘটতে চলেছে অনুমান করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—কী ব্যাপার বলুন তো?

একটু ম্লান হেসে কর্মচারীটি বললো,—পৃথিবীর আর পাঁচটা বড় শহরের মতো এই আলেকজান্দ্রিয়াতেও ক্রিমিন্যালের অভাব নেই। শহরের বাইরের চাকচিক্যের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা ঠিক বোঝা যায় না। একজন অপরিচিত ড্রাইভার আপনাকে হোটেল ডি-প্যারিসে নিয়ে যাবে বলে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে নিয়ে চলেছে।

এতক্ষণে একটা শঙ্কার ছায়া নেমে আসে বনবিহারীর চোখে মুখে। কর্মচারীটি কাউন্টারের বাইরে এসে বনবিহারীকে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বললো,—চলুন তো। ড্রাইভারের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

বনবিহারীর ফিরে আসতে দেরি দেখে ড্রাইভারটি গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রেখে উশখুশ করছিল। অবশেষে আর একটি লোকের সঙ্গে তাঁকে আসতে দেখে লোকটি একটু নড়েচড়ে বসে।

কর্মচারীটি গাড়ির খোলা জানালায় স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে থাকে ড্রাইভারটির সঙ্গে। তাদের কথার একটা অক্ষরও বনবিহারী বুঝতে না পারলেও কর্মচারীটির গলার চড়া পর্দা ও সেই সঙ্গে হোটেল-ডি-প্যারিস, ফরেনার ইত্যাদি শব্দগুলোতে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর মতো একজন বিদেশীকে কেন এখানে আনা হয়েছে তা নিয়েই যেন কর্মচারীটি চার্জ করছে ড্রাইভারকে। কর্মচারীটির কথার জবাবে ড্রাইভার অনেকটা মিনমিনে কণ্ঠে কী যেন বোঝাতে চাইছে তাকে। এই সময় কর্মচারীটির মুখে পুলিশ শব্দটা উচ্চারণ হতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। কেউ কিছু বুঝবার আগেই চোখের পলকে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে

বোঁ করে উধাও হয়ে যায় ড্রাইভার। বনবিহারীর একমাত্র স্যুটকেসটি চলে যায় গাড়ির সঙ্গে।

ততক্ষণে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। বনবিহারী বুঝতে পারেন এখানে পা দিতে না দিতেই একটা ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু কী সেই ষড়যন্ত্র? কেনই বা ষড়যন্ত্র?

অবশেষে সেই কর্মচারীদের সাহায্যে হোটেল-ডি-প্যারিসে এসে যখন হাজির হলেন বনবিহারী তখন হোটেলের রিসেপশনে পায়চারি করতে করতে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন জন স্টুয়ার্ট। বনবিহারীকে দেখেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে তিনি বনবিহারীর হাত জড়িয়ে ধীর বিস্মিত কণ্ঠে বলেন,—কী ব্যাপার? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বনবিহারী কিছু জবাব দেবার আগেই সঙ্গের সেই দোকান-কর্মচারীটি ইংরেজিতে কিছু বলতে যায়। স্টুয়ার্ট সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে স্থানীয় ভাষায় গড়গড় করে কথা বলতে থাকেন তার সঙ্গে।

কর্মচারীটির কথা শুনতে শুনতে মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে স্টুয়ার্টের। অবশেষে কর্মচারীটিকে অজস্র ধন্যবাদের সঙ্গে বিদায় দিয়ে বনবিহারীকে নিয়ে হোটেলের লিফটের দিকে এগিয়ে যান তিনি।

হোটেলের চারশো এক ও চারশো দুই দু'খানা ঘর বুক করা হয়েছিল তাদের জন্যে। নিজের ঘরে না গিয়ে বনবিহারীকে নিয়ে তাঁর চারশো দুই নম্বর ঘরে এসে বসেন স্টুয়ার্ট। সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে মুখোমুখি বসে কথা বলতে থাকেন দুই বন্ধু। বলে ওঠেন বনবিহারী,—আমি তো বুঝতেই পারছি না, হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে এখানে এমন ষড়যন্ত্র কেন?

জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—না, তোমার একার বিরুদ্ধে নয়, এই ষড়যন্ত্র আমাদের দুজনেরই বিরুদ্ধে। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আমরা কিছু না জানলেও তারা আমাদের সম্পর্কে অনেককিছুই জানে। বেশ ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল তারা। আর সেই প্ল্যান মতোই এই হোটেলের সামনে একখানা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমার পক্ষে কিছু বোঝা সম্ভব ছিল না। আমি ঠিক সময়মতই ঐ ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্টে রওনা হয়েছিলাম তোমাকে রিসিভ করতে। হঠাৎ মাঝপথে গাড়ির টায়ার পাংক্‌চার। এখন বুঝতে পারছি আমাকে দেরি করিয়ে দিতে ওটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল। আর ঐ শহরতলীর পথে খালি ট্যাক্সি পাওয়াও দুষ্কর। অবশেষে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে আমার বেশ দেরিই হয়ে গেল। তার আগেই তোমাদের প্লেন ল্যাণ্ড করেছে। প্যাসেঞ্জারেরাও অধিকাংশই চলে গেছে। মনে মনে আশা করেছিলাম যে তোমাকে হয়তো ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখবো। কিন্তু পেলাম না তোমাকে। একবার মনে হয়েছিল, তাহলে কি তুমি কোন কারণে এখানে আসা ক্যান্‌সেল করে দিলে? গেলাম এয়ারপোর্টের অফিসে। সেখানে প্যাসেঞ্জার লিস্টে দেখলাম তোমার নাম। তখন নিঃসন্দেহ হলাম যে আমার দেরি দেখে তুমি সোজা হোটেলে চলে এসেছো। কিন্তু এখানেও তোমার দেখা না পেয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনছিলেন বনবিহারী। স্টুয়ার্ট থামতেই তিনি বলে ওঠেন,—দেখ স্টুয়ার্ট, আমি এখানে নতুন। এখানে কেউ চেনেই না আমাকে। সেই আমার বিরুদ্ধে কে এবং কেনই বা এমন ষড়যন্ত্র করবে?

ম্লান হেসে জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—দেখ বন, এখানে তোমাকে কেউ না চিনলেও আমাকে অনেকেই চেনে। সুয়েজে চাকরি করলেও এই আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার যাতায়াত আছে। তবে একথা ঠিক যে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান টার্গেট তুমি। তাই তোমাকে চুরি করার মতলবে ছিল তারা।

—কিন্তু কেন? —বনবিহারী বলে ওঠেন।

জবাব দেন স্টুয়ার্ট, — আমার তো মনে হয়, যে বিষয় নিয়ে তুমি গবেষণা করতে এখান হাজির হয়েছো সেটা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের পছন্দ নয়। তারা ভালই জানে আসল গবেষণা করবে তুমি। আমি কেবল তোমাকে সাহায্য করবো। হয়তো এরা ইতিমধ্যে আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমার বায়োডাটা পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলেছে।

—কিন্তু কেন? মমির ওপর এমন গবেষণা তো নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই তো এমন গবেষণা আগেও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই গবেষণায় কেউই সফল হতে পারে নি। আজও বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন নি, কী রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে সেকালের মিশরীয়রা হাজার হাজার বছর ধরে মৃতদেহ অটুট রাখতো।

একটু চিন্তা করে বনবিহারী আবার জিজ্ঞেস করেন,—তাহলে কি তোমার সন্দেহ আমরা সফল হতে পারবো মনে করে অন্য কোন বিজ্ঞানী আমাদের বাধা দিতে এভাবে ষড়যন্ত্র করছে?

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। হোটেলের রুম সার্ভিসের একটি কর্মী কফির ট্রে নিয়ে ঢোকে।

কফি খেতে খেতে বনবিহারীর আগের কথার জবাব দেন স্টুয়ার্ট, দেখ বন, বিজ্ঞান যতই সত্যের পূজারী হোক, বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে রেষারেষি নোংরামির অভাব নেই তা তো তুমি জানো। কাজেই এই মুহূর্তে তোমার এই সন্দেহ যে অমূলক তা বলি কী করে? তাছাড়া—

—তা ছাড়া কি?

—তুমি নতুন হলেও এই অঞ্চলে আমি অনেককাল আছি। মিশরীয়দের চরিত্র আমার অজানা নয়। এদের মধ্যে যেমনি প্রগতিশীল মানুষের অভাব নেই, তেমনি অনেক ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীও আছে। তিন হাজার বছরের পুরনো তাদের প্রিয় সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের মমি তোমার আমার মতো বিধর্মীর হাতের স্পর্শে যে অপবিত্র হয় তা হয়তো তারা চায় না।

—কিন্তু মিশরীয় সরকারই তো আমাদের সেই অনুমতি দিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে যে মৌলবাদীরা তা মেনে নেবে তার কোন মানে নেই।

—কিন্তু শুনেছি, আমাদের আগে নাকি একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই মমিটি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছ। তাঁর নাম ডক্টর ভন্ বিসমার্ক। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজে সফল তো হনই নি, মাঝখান থেকে পাগল হয়ে গেলেন।

—পাগল?

স্টুয়ার্ট বললেন,—হ্যঁ পাগল। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু বলে অন্য কথা। তারা বলে, সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের প্রেতাত্মা নাকি ডক্টর বিসমার্কের ওপর ভর করে তাঁকে পাগল করে দিয়েছে। এভাবেই নাকি বিধর্মীর হাতের স্পর্শে কলুষিত সম্রাটের প্রেতাত্মা ঐ জার্মান বিজ্ঞানীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

স্টুয়ার্টের কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন বনবিহারী। তারপর বলেন,—তিন হাজার বছর আগে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তিনহাজার বছর পরে প্রতিশোধ নিয়েছে, এ জাতীয় গালগল্প তুমি বিশ্বাস করো, স্টুয়ার্ট?

মৃদু হেসে জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—তোমার আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও, বন্। স্থানীয় মানুষের মধ্যে অনেকেরই তাই বিশ্বাস।

একটু থেমে স্টুয়ার্ট আবার বললেন, —যাইহোক্ এই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের ওপর একদল লোকের নজর রয়েছে। তারা আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। তাই

এখন থেকে আমাদের একটু সর্তক হয়ে চলতে হবে।

।। দুই।।

আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজ়িয়ামটিকে বড়ই বলতে হবে। একতলা দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। বিভিন্ন বিভাগ। তারই একটা ঘরে কারুকার্য করা সুদৃশ্য একটি টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে তিনি হাজার বছর আগের মিশরের এক ফারাও অর্থাৎ সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের মমি। মস্তবড় একটা কাঁচের আধারে ঢাকা সেই মমি। সেকালের প্রথা অনুযায়ী ধাতু নির্মিত একজন মানুষের মূর্তি খোদাইকরা একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে সেই মমি। সেকালের মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল ধাতুর ঢাকনায় ঢাকা থাকলে মৃতের আত্মা আর মৃতদেহের মধ্যে ঢুকতে না পেরে একসময় ঘুরে ঘুরে চলে যায়। দর্শকদের দেখার সুবিধার জন্যে মিউজিয়ামে সেই ধাতুর ঢাকনাটা অবশ্য সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। আপাদমস্তক অজ্ঞাত এক রাসায়নিকে মাখা কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের সেই মমি। হাত দু'খানা ক্রস্ করে রাখা বুকের ওপর।

দর্শকের সঙ্গে মিশে স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী প্রথমে ভাল করে দেখে নিলেন সেই মমি। তারপর নিজেদের পরিচয় দিয়ে এসে বসলেন মিউজিয়ামের মিশরীয় অধ্যক্ষ সালমান ওয়াদার-এর চেম্বারে।

সালমান ওয়াদার সুপুরুষ। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়স। পরিষ্কার দাড়ি কামানো। নাকের নিচে মিশরীয় কায়দায় কদমছাট মোটা গোঁফ। পরনে বিলিতি পোশাক। চোস্ত ইংরেজি বলেন।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে সালমান ওয়াদার বললেন,—গভর্নমেন্ট থেকে আপনাদের সম্পর্কে অর্ডার পেয়েছি।

তারপর খানিকটা বিরক্তির সুরে আবার বললেন,—দেখুন, গভর্নমেন্ট তো হুকুম দিয়েই খালাস। ঝক্কি-ঝামেলা তো আমাকেই পোয়াতে হবে।

স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করেন,—ঝামেলার কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?

—তা তো একটু আছেই। —জবাব দেন সালমান,—বুঝতেই তো পারছেন, মানুষের সেন্টিমেন্ট। তাই কাজটা আপনাদের করতে হবে খুব গোপনে ও সাবধানে। আমি চাই না, একমাত্র আমি ছাড়া আপনাদের এই কাপড়ের টুকরো কেটে নেবার কথা আর কেউ জানতে পারে। এমনকি মিউজিয়ামের অন্য কোন স্টাফও নয়। বছর পাঁচেক আগে এই মমি নিয়েই কত কাণ্ড হয়েছিল!

কী কাণ্ড সেদিন হয়েছিল তা জানার জন্যে সালমানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী।

—বেশ। তাহলে শুনুন। —বলেই সালমান সেই কাহিনীটা শোনায় যা নাকি এর আগে স্টুয়ার্টই বনবিহারীকে শুনিয়েছেন।

সালমান থামতেই স্টুয়ার্ট এবার জিজ্ঞেস করেন,—আচ্ছা মিস্টার ওয়াদার, এসব কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

মাথা নেড়ে জবাব দেন সালমান,— একদম না। তিন-চার হাজার বছর আগে মৃত এক ফারাওয়ের আত্মা এভাবে একজন বিজ্ঞানীর কাঁধে চেপে তাঁকে পাগল করে দেবে, এধরনের কথা এযুগে ঠিক বিশ্বাস করা চলে না। আসলে কি জানেন মিস্টার পাঠক, এসব হচ্ছে স্থানীয় মানুষের অনুমান কিংবা রটনা। বিজ্ঞানী ভন্ বিসমার্কের পাগল হওয়ার কারণ তাঁর গবেষণার অসাফল্য বা অন্য কিছু। একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

একটু থেমে সালমান আবার বললেন,—যাক গে, ওসব কথা। আপনারা যে কাজ করতে এখানে এসেছেন সেই কাজটুকু করে চলে যান।

—তা তো বটেই।

সালমান ওয়াদার বলেন,—তাহলে আপনারা কবে নাগাদ আপনাদের কাজ করতে চান?

জবাব দিতে গিয়ে একটু সময় নেন বনবিহারী ও স্টুয়ার্ট। আর সেই ফাঁকে সালমান আবার জিজ্ঞেস করেন,—মমির দেহ থেকে আপনারা কতটা পরিমাণ কাপড়ের টুকরো কেটে নিতে চান?

বনবিহারী জবাব দেন,—ধরুণ, এক ফুটের মতো।

—তার মানে বারো ইঞ্চি।—মনে মনে কী যেন হিসেবে করলেন সালমান। তারপর আবার বললেন,—মমির দেহের কোন্ জায়গা থেকে আপনারা কাপড় কেটে নিতে চান?

—যে কোন জায়গা থেকে।

—তাহলে আমি বলবো, মমির পিঠের দিক থেকে আপনারা কাপড় কাটবেন। তাতে সামনের দিক কোন রকম বিকৃত হবে না।

—বেশ।

—কবে আপনারা কাজটা করতে চান?

এবার জবাব দিতে একটু সময় নেন বনবিহারী। একবার তাকান স্টুয়ার্টের মুখের দিকে। তারপর বললেন,—দিন ও সময় ঠিক করে আপনাকে আমরা জানাবো, মিস্টার ওয়াদার।

—ঠিক আছে। সালমান বলেন,—তবে এবার আর আমি কোনরকম রিস্ক্ নিতে চাই না। একমাত্র আমি নিজে ছাড়া এই মিউজিয়ামের অন্য কোন স্টাফকেও কথাটা জানানো হবে না। মিউজিয়াম সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকে। ঐ বন্ধের দিনেই কাজটা করতে হবে। আমি নিজে থাকবো।

—ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ, মিস্টার ওয়াদার। দুজনে উঠে দাঁড়ান। ঠিক তখনই সালমান বলে ওঠেন,—ও—হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। হোটেল-ডি-প্যারিসের নাম করে কে নাকি আপনাদের অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল?

স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী পরস্পরের মুখের দিকে তাকান। তারপর বনবিহারীকে দেখিয়ে জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—আমাকে নয়, এনাকে। তো আপনি একথা জানলেন কেমন করে?

—আলেকজান্দ্রিয়ার পুলিশ চিফ্ ওমর রহমানের কাছ থেকে।

—সে কি? তিনি জানলেন কী করে? আমরা তো ঘটনাটা তাঁকে জানাইনি। এনিয়ে আমরা কোথাও কোন অভিযোগই করিনি।

মৃদু হেসে সালমান বলেন,—দেখুন খবর বাতাসে ভেসে আসে। বিশেষ করে মিস্টার পাঠকের মতো একজন বিদেশী বিজ্ঞানীকে এখানে কেউ বিপদে ফেলতে চেয়েছিল, এটা কি পুলিশের কানে না উঠে পারে? আমার তো মনে হয়, সেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের লোকেরাই খবরটা পুলিশকে জানিয়েছিল।

স্টুয়ার্ট বললেন,—পুলিশ চিফ যখন আপনাকে কথাটা জানিয়েছিলেন, তখন মনে হয় তিনি আমাদের সম্পর্কে সবকথাই জানেন। এমনকি আমাদের কাজ যে এখানে তাও তিনি জানেন।

—অবশ্যই. গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আপনাদের সম্পর্কে যে চিঠি আমি পেয়েছি তার কপি পুলিশ চিফও পেয়েছেন। এখানে আপনারা যাতে কোন বিপদে না পড়েন তা দেখার দায়িত্ব তো পুলিশ চিফের, নয় কি?

স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী মাথা নেড়ে সায় দেন। সালমান এবার উপদেশের সুরে বললেন,—

পুলিশ তো তাদের কাজ করবে। কিন্তু আপনারাও একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। কার মনে কী আছে কে জানে। এখন তো মনে হচ্ছে সরকারি মহল ছাড়া কোন কোন বে-সরকারি মহলও আপনাদের কথা জানতে পেরেছে। তাই কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে কেউ বা কোন গোষ্ঠী আপনাদের বিপদে ফেলতে প্রস্তুত।

—ঠিকই বলেছেন।

অবশেষে মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সালমান ওয়াদারকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে দুই বন্ধু বিদায় নেন।

হোটেলে ফিরে এসে বনবিহারী স্টুয়ার্টকে বললেন,—মিস্টার সালমান ওয়াদারকে তো খুব ভালো লোক বলেই মনে হলো। ওঁর কথাবার্তায় বুঝলাম ওঁর কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাবো।

বনবিহারীর কথায় স্টুয়ার্ট কোন মন্তব্য করেন না। কৌতূহলী বনবিহারী আবার জিজ্ঞেস করেন,—ওকি, তুমি চুপ করে আছ যে? মিস্টার সালমান ওয়াদার সম্পর্কে তোমার ধারণা অন্যরকম নাকি?

এতক্ষণে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফোটে স্টুয়ার্টের। বলেন,—দেখ বন, তোমরা ভারতীয়রা সবকিছুই মন দিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত। আমরা ব্রিটিশরা কিন্তু বিচার করি মস্তিষ্ক দিয়ে।

—মানে?

—মানে হলো, তোমরা বড়ই আবেগপ্রবণ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে তোমাদের মনের আবেগই বেশি কাজ করে। তাই তোমরা অতি সহজেই কাউকে বিশ্বাস করে ফেলো।

—এটা কি খারাপ?

—না, ভালো খারাপের কথা বলছি না। তবে এতে অনেকসময় ভুল মূল্যায়ন হয়। তাই বিপাকেও পড়তে হয়।

একটু সময় চুপ করে থেকে হেসে বনবিহারী বললেন,—স্টুয়ার্ট, আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে কাউকে অবিশ্বাস করে জেতার চাইতে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।

—খুবই উচ্চাঙ্গের কথা নিঃসন্দেহে। তবে পৃথিবীতে এমন বিশ্বাসের ফল সবসময় ভালো হয় না। এই মিস্টার সালমান ওয়াদারের কথাই ধরো না—

বনবিহারী বাধা দিয়ে বলেন,—কেন, তাঁর কথাবার্তার মধ্যে অবিশ্বাস করার মতো কিছু পেয়েছ কি?

—না বন, তেমন কিছু পাইনি ঠিকই। কিন্তু তাই বলে এখনই তাঁকে চোখ বুঁজে বিশ্বাস করে বসার মতোও কিছু পাই নি।

—তেমন কিছু বলছো কেন? তবে কি সামান্য হলেও কিছু পেয়েছে?

জবাব দিতে এবার সময় নিলেন স্টুয়ার্ট। তারপর বললেন,—বন্, আমরা দুজন বিদেশী এখানে একটা কাজে এসেছি। এখানে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিশেষ করে তোমাকে বিপদে ফেলতে কেউ বা কোন গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা নিশ্চয়ই একটা প্রধান বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখায় সালমান ওয়াদারের উচিত ছিল এই প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করা। কিন্তু তিনি তা না করে আমাদের কাজের কথা নিয়েই আলোচনা করলেন। আমরা বিদায় নেবার সময় এই প্রসঙ্গটা তাঁর মনে পড়লো। এটা একটু অদ্ভুত লাগছে না কি?

—উনি তো আমাদের সাবধান থাকতে বারে বারে উপদেশ দিলেন।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য দিলেন। তবে তোমার চেয়ে এই মিশরীয়দের আমি অনেক ভালো চিনি। এঁদের মুখের কথায় মনের ভেতরটা টের পাওয়া খুব কঠিন।

বনবিহারী সামান্য হেসে বলেন,—হুম্! এটাই স্বাভাবিক। মিশর অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশ, তাই বোধহয় এদের মুখের কথায় মনের কথা টের পাওয়া কঠিন। কোন্ মনীষী নাকি একবার বলেছিলেন, ঈশ্বর মানুষকে ভাষা দিয়েছেন মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে। কিন্তু সভ্য মানুষ মনের কথা লুকোবার জন্যে ব্যবহার করে সেই ভাষা।

স্টুয়ার্ট হো-হো করে হেসে ওঠেন। একটু পরে হাসি থামলে বললেন, বন্, অযথা আর দেরি না করে একটা দিন ঠিক করে সালমান ওয়াদারকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

—তা যা বলেছ।—বনবিহারী জবাব দেন,—কিন্তু তুমিই তো সেদিন বলেছিলে তার আগে একবার সেই হতভাগ্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর ভন বিসমার্কের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তাঁর সহকারী সেই চিনে কেমিস্ট ডক্টর ইয়াং মিনের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

স্টুয়ার্ট বললেন,—ঠিকই। তবে আমার সন্দেহ তাঁর কাছ থেকে তুমি কোন সাহায্য পাবে কিনা।

—কেন?

—তোমার কথাতেই বলি, চিনও মিশরের মতো একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। তাছাড়া পরীক্ষায় বিসমার্ক ও ইয়াং মিন্ সফল হতে পারেন নি। বিসমার্ক পাগলই হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় ইয়াং মিন্ কি তাঁদের পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন? তবে একবার যাওয়া যেতে পরে। চলো, কালই যাই।

।। তিন।।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একপ্রান্তে ভন্ বিসমার্কের বিশাল ল্যাবরেটরি। বাইরে থেকে দেখেই চমৎকৃত হন বনবিহারী ও স্টুয়ার্ট। এর আগে বনবিহারী ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিখ্যাত ল্যাবরেটরি দেখেছেন। কিন্তু তাও এমন নয়। বিরাট এলাকা নিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প-সৌন্দর্য পাশাপাশি সাজানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পরীতিতে তৈরি সুন্দর কোন সৌধ।

ল্যাবরেটরির বর্তমান পরিচালক ভন্ বিসমার্কের এককালের সহকারী ডক্টর ইয়াং মিনের চেহারা তাঁর নামের সঙ্গে বাস্তবিকই সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি তাঁর বয়স। এখনও ইয়ংম্যানের মতো দেখতে। এমনিতেই চিনাদের আসল বয়েস আন্দাজ করা একটু শক্ত। ছিপছিপে চেহারা। পরনে পুরোদস্তুর সায়েবি পোশাক। মাথার চুল পাতলা। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মোলায়েম কণ্ঠস্বর। কথা বলেন আস্তে আস্তে।

ডক্টর ইয়াং মিন্ তাঁর অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজে গাড়ি বারান্দায় স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীকে অর্ভ্যথনা করে নিয়ে গেলেন। টানা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে বনবিহারী বলেই ফেললেন,—কাজের কথা আলোচনার আগে আপনার এই সুন্দর ল্যাবরেটরি একটু ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছে, ডক্টর মিন্। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি!—একটু মিষ্টি হাসলেন মিন্। আবেগময় কণ্ঠে বললেন,—দয়া করে আমার ল্যাবরেটরি বলবেন না। যিনি এতবড় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন আমার সেই স্যার ভাগ্যের পরিহাসে আজ উন্মাদ হয়ে একটা নার্সিংহোমে আছেন। আমি তো কেবল তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ চালাচ্ছি মাত্র।

প্রায় আধঘন্টা ধরে ইয়াং মিন্ স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীকে ঘুরে ঘুরে ল্যাবরেটরির বিভিন্ন বিভাগ দেখালেন। প্রতিটি বিভাগে তন্ময় হয়ে কাজ করে চলেছেন গবেষকেরা। স্থানীয় মানুষ ছাড়া বিদেশীও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। অবশেষে তাঁরা এসে বসলেন ইয়াং মিনের খাসকামরায়।

একটু পরেই কফি এলো। কফি খেতে খেতে কথা বলতে লাগলেন তাঁরা। বনবিহারী বললেন,—মিস্টার মিন্, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য তো টেলিফোনে আপনাকে আগেই জানিয়েছি। এই ব্যাপারে আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

—অফ্‌কোর্স।—চোস্ত ইংরেজিতে জবাব দেন ইয়াং মিন্, যে কাজে এখানে আপনারা এসেছেন সেই কাজে আমার কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য আপনারা পাবেন। শুনেছি, আমাদের আগেও নাকি কেউ কেউ এই কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আমার স্যার এবং আমিও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। এবার আপনারা এসেছেন। বিজ্ঞান তো এভাবেই এগিয়ে চলে। বিফলতার ভিতের ওপরই তো একদিন গড়ে ওঠে সফলতার ইমারত। আপনাদের কাজের জন্য গোটা কেমিস্ট্রি বিভাগটি আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

—না মিস্টার মিন্। তার দরকার হবে না। মমির গায়ের কাপড়ের টুক্‌রো নিয়ে আমি আমার কর্মক্ষেত্র তুরস্কে ফিরে যেতে চাই। সেখানে আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেই আমি কাজ করবো।

—বেশ তো, যা ভালো মনে করেন। তা হলে আপনিই বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

বনবিহারী স্টুয়ার্টের দিকে একবার তাকাতেই তিনি বললেন,—আপনাদের গবেষণার কাগজপত্র একবার দেখতে চাই আমরা। এগুলো হাতে পেলে পরবর্তী গবেষণায় সুবিধে হবে।

—তা তো বটেই। কিন্তু—

একটু থামেন মিন্। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা দুঃখে ভরে ওঠে। ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে আবার বললেন—খুবই দুঃখিত। আমাদের গবেষণার তথ্যসমৃদ্ধ একটুকরো কাগজও আর আপনাদের দিতে পারবো না। কিছুই আজ আর নেই।

—নেই!

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নেন ইয়াং মিন্। তারপর বললেন,—সব—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মিনের মুখের দিকে।

হঠাৎ ইয়াং মিন্ জিজ্ঞেস করেন,—আচ্ছা, আপনারা মৃত মানুষের আত্মায় বিশ্বাস করেন?

স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী কোন জবাব দেন না।

ইয়াং মিন্ বলেন,—আমি বুঝতে পারছি আপনারা বিশ্বাস করেন না। বর্তমান বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস না করারই কথা। আমিও করতাম না। আমার স্যার ভন্ বিসমার্কও করতেন না। কিন্তু—

ইয়াং মিন্ বেশ কিছুক্ষণ চুপ্ করে রইলেন, তারপর টেনে টেনে বলতে থাকেন,—মিশরের সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের মমি গবেষণার জন্যে বেশ কিছুদিন ছিল আমাদের হেপাজতে এই ল্যাবরেটরিতে। মমির ওপর একটার পর একটা পরীক্ষা করে চলেছেন স্যার। ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল পরীক্ষা। আমি স্যারকে সাহায্য করে চলেছি। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমরা তখনও সফলতা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু স্যারের প্রচন্ড ধৈর্য। হার মানার মানুষ তিনি নন। ঠিক এমনি এক দিনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। দিন কয়েক ল্যাবরেটরিতেই আসতে পারি নি। আমার সেই অনুপস্থিতিতে স্যার একাই কাজ করে চলেছিলেন।

ইয়াং মিন্ আবার থামলেন। স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীর মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকেন। তারপর আগের মতই ধীরে ধীরে বলতে থাকেন,— সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দেখি ল্যাবরেটরির যে ঘরে মমিটা ছিল সেই ঘর তালাবন্ধ। শুনলাম, আগের দিন সন্ধ্যায় স্যার মমির ঘরে নিজের হাতে তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে উত্তেজিত ভাবে সেই যে চলে গেছেন,

আর ফিরে আসেন নি। কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করে ছুটলাম স্যারের ফ্ল্যাটে। স্যার অবিবাহিত। নিজের ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার চক্ষুস্থির।

কথা বলতে বলতে কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়েন ইয়াং মিন্। ঠিক সেই সময় আরেক প্রস্থ কফি এসে হাজির হয়। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে নিজেকে একটু সামলে নেন। তারপর বলতে থাকেন,—গিয়ে দেখি স্যার তাঁর ঘরের ডেক চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে ছট্‌ফট্ করছেন। উস্কো-খুস্কো চুল, চোখ দুটো টক্‌টকে লাল। সামনে এক্‌রাশ পোড়া কাগজ। দেখেই বুঝলাম সেগুলো আমাদের গবেষণার কাগজপত্র। মুখে তাঁর জার্মান ভাষায় একমাত্র কথা, 'আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই—'। স্যারের সঙ্গে থেকে থেকে আমি একটু আধটু জার্মান ভাষা বুঝতে পারলেও একেবারেই বলতে পারি না। স্যার নিজে অল্পস্বল্প ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। আমি যতই তাঁকে জিজ্ঞেস করি কোন্ ব্যাপারে তিনি দায়ী নন, ততই তার মুখে সেই একই কথা, 'আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই'।

—তারপর।—জিজ্ঞেস করেন স্টুয়ার্ট।

—অনেক প্রশ্নের পরে তাঁর অসংলগ্ন জবাবের মধ্য থেকে যা বুঝতে পারলাম তা এককথায় প্রায় অবিশ্বাস্য। ল্যাবরেটরির ঘরে একা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন স্যার। হঠাৎ নাকি ঘরের আলো আপনা আপনি নিস্তেজ হয়ে এলো। তারপর ঘরের মধ্যে আবির্ভাব ঘটলো একটা ছায়ামূর্তির। তার বিশাল চেহারায় একালের বদলে সেকালের মানুষের ছাপ। থুতনিতে সেকালে মিশরীয়দের মত লম্বা দাড়ি। পরনে রাজসিক পোশাক। চোখদুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছে। ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক সেই ছায়ামূর্তির ভাবভঙ্গি। সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড সাহসী আমার স্যার প্রায় জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেও সেই ছায়ামূর্তির কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। আমার স্যার একালের মিশরীয় ভাষা জানলেও ঐ ছায়ামূর্তির ভাষা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারছিলেন না। সম্ভবত তা ছিল প্রাচীন মিশরীয় ভাষা। তবে যতটুকু বুঝতে পারছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল সেই ছায়ামূর্তি যেন বলছিল—আমি মিশরের ফারাও পঞ্চম রামেসিস। তিন হাজার বছর আগে আমার মৃত্যু হলেও আমার আত্মা আজও এই মমির পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে আমার এই পবিত্র মমিকে তুমি অপবিত্র করেছো। এর শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। কথা বলতে বলতে সেই প্রেতাত্মা স্যারের দিকে এগিয়ে আসতেই সেই অর্ধচেতন অবস্থাতেই স্যার চিৎকার করে বলেছিলেন, না-না, আমি নিজে কিছু করিনি। আমি দায়ী নই। এই কাজের জন্যে এদেশের সরকার আমাকে নিয়োগ করেছে। আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই'।

ইয়াং মিনের কথা বলার ভঙ্গি ও বর্ণনা এমন চমৎকার যে সেই মুহূর্তে বনবিহারী ও স্টুয়ার্টের মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন নিজেদের চোখেই গোটা ঘটনা দেখছিলেন। ইয়াং মিন্ থামতেই বনবিহারী জিজ্ঞেস করেন,—তারপর?

বলতে বলতে শেষের দিকে ভন্ বিস্‌মার্কের করুণ পরিণতিতে কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে আসে ইয়াং মিনের। বনবিহারী ও স্টুয়ার্টও নিশ্চুপ। অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চাপা কণ্ঠে ইয়াং মিন্ আবার বললেন, আমার স্যারের মতো একজন পণ্ডিত ব্যক্তির যে শেষপর্যন্ত এই পরিণতি হবে তা কোনদিন কল্পনাও করিনি।

কিছুক্ষণ জমাট নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে। ভন্ বিস্‌মার্কের জন্যে ইয়াং মিনের দুঃখ যেন সেই মুহূর্তে বনবিহারী ও স্টুয়ার্টের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

এক সময় ইয়াং মিন্ নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন,—দেখুন ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব রহস্যময় ঠেকছে। তিন হাজার বছর আগে মৃত মানুষের আত্মা তিনহাজার বছর

পরে সশরীরে এসে হাজির হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। আবার দেখুন, এটা যদি কোন সাধারণ মানুষের বেলায় ঘটতো তাহলে নাহয় এটাকে চোখের ভ্রম বা মানসিক কোন ব্যাপার বলে ধরে নিতাম। কিন্তু ডক্টর ভন্ বিসমার্কের মতো একজন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীকে তো সাধারণের দলে ফেলতে পারি না। তাহলে?

ইয়াং মিন্ থামলেন। বনবিহারী ও স্টুয়ার্টের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলেন,—পঞ্চম রামেসিসের ঐ মমির সঙ্গে যে কী রহস্য জড়িয়ে আছে তাই বা কে জানে! স্যার ভন্ বিসমার্ক তবু প্রাণে বেঁচে গেছেন। শোনা যায় তাঁরও আগে অন্য কোন্ একজন বিজ্ঞানী নাকি এই মমি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মারাই পড়েছেন।

—তাই নাকি? কে তিনি?

—নামধাম জানি না। তবে এরকম একটা কাহিনী প্রচলিত। স্যার নিজেই একদিন বলেছিলেন।

—কী ভাবে তিনি মারা পড়লেন?

—সেই ঘটনাটা নাকি আরও বিচিত্র। ভয়ঙ্কর এক বিষধর সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি।

—সাপের কামড়ে! মমি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে সাপ এলো কোত্থেকে?

—সেটাই তো আশ্চর্যের। অ্যাস্প্ নামে এক জাতের সাপের কথা শুনেছেন?

—অ্যাস্প্।—

শব্দটা উচ্চারণ করে বনবিহারী চুপ করলেও স্টুয়ার্ট বলে ওঠেন,—হ্যাঁ, এই মিশরে এককালে একজাতের খুব ছোট কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ ছিল। শোনা যায় সেকালে মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা নাকি ঐ সাপের কামড় বুকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

ইয়াং মিন্ সপ্রশংস কণ্ঠে বলে ওঠেন,—বাঃ, আপনি তো দেখছি এদেশ সম্পর্কে অনেক খবরই রাখেন। অ্যাস্প্ জাতের সাপ কিন্তু আজও আছে মিশরের মরুভুমি অঞ্চলে। আর, পঞ্চম রামেসিসের ঐ মমি থেকে তেমন একটা সাপই নাকি বেরিয়ে এসে সেই বিজ্ঞানীকে কামড়েছিল।

—বাব্বা। কী আশ্চর্য।

—সত্যিই আশ্চর্য। আমি নিজে অবশ্য এইসব প্রচলিত কথায় বিশ্বাসী নই। তবে পরপর দুটো ঘটনায় এখন আমার মনে হচ্ছে, কোন কারণে এই মমিটা বোধহয় অভিশপ্ত। তাই এটা নিয়ে যাঁরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এগোবেন তাঁদেরই উচিত একটু সাবধান হওয়া। গোটা পৃথিবীতে অনেক দেশের মিউজিয়ামেই তো মমি সংরক্ষিত আছে। আমার তো মনে হয় এটার বদলে তেমন অন্য কোন মমি নিয়ে তাঁরা গবেষণা করতে পারেন।

ইয়াং মিন্ থামতেই বনবিহারী প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করেন,—আচ্ছা ডক্টর ভন্ বিস্মার্ক এখন কোথায় আছেন? ওঁর কোন চিকিৎসা হয় নি?

—হয়েছে। অনেক চিকিৎসা হয়েছে। প্রথমে কিছুদিন চিকিৎসা করানো হয়েছে বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্টদের দিয়ে। তারপরে কিছুদিন লুনাটিক অ্যাসাইলামে। কিন্তু কোন ফলই হয় নি। এখন এই শহরেই একটা নার্সিংহোমে আছেন। ওঁর নিজের বলতে কো কেউ নেই। আমিই দেখাশোনা করি।

একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না?—স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করেন।

একটু ভাবলেন ইয়াং মিন্। তারপর অনেকটা হতাশ কণ্ঠে বললেন, —আর দেখা করে কী করবেন? সেই তো জার্মান ভাষায় একই কথা—আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই। এর বাইরে আর কোন কথাই উনি বলেন না। তবে মাঝে মাঝে আপন মনে নিজের ভাষায় বিড়

বিড় করে কি যেন বলেন যার অর্থ কেউই বুঝতে পারে না।

স্টুয়ার্ট আবার বললেন, তবুও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

—না—না। —তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন ইয়াং মিন্, —এতে আপত্তির কি আছে? কবে আপনারা যেতে চান বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

।। চার।।

প্রায় ষাটের কোঠায় বয়স ভন্ বিসমার্কের। ছিপ্‌ছিপে চেহারা। মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। উস্কোখুস্কো মাথার চুল। চোখে মুখে কেমন এক ক্লান্তির চিহ্ন।

নিজের কেবিনে একটা ডেকচেয়ারে চোখ বুজে শুয়েছিলেন বিস্‌মার্ক। ইয়াং মিন্ বনবিহারী ও স্টুয়ার্টকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সাড়া পেয়ে চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই ইয়াং মিনের ওপরে চোখ পড়তেই কাঁচা পাকা ভ্রু যুগল কুঁচকে ওঠে তাঁর। কয়েক মুহূর্তে স্থির চোখে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। পরক্ষণেই পেছনে দুজন অপরিচিত লোক দেখে কুঞ্চিত ভ্রু খানিকটা সোজা হয়ে ওঠে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিচু কণ্ঠে ইয়াং মিন্ বললেন,—কেন যেন আজকাল স্যার আমাকে সহ্য করতে পারেন না। সবই আমার অদৃষ্ট!

তারপর দু'পা এগিয়ে বিসমার্ককে সম্বোধন করে বললেন,—স্যার ইনি ডক্টর পাঠক—ভারতীয় বিজ্ঞানী। আর ইনি মিস্টার স্টুয়ার্ট— প্রত্নতত্ত্ববিদ। এঁরা একটা বিশেষ কাজে এদেশে এসে আপনার নাম শুনে দেখা করতে এসেছেন।

ইয়াং মিনের কথায় বিস্‌মার্কের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটলো না। নির্বিকার ভঙ্গিতে তিনি কেবল করমর্দন করলেন তাঁদের সঙ্গে। পরমুহূর্তেই সবাইকে চম্‌কে দিয়ে জোরে বলে উঠলেন তাঁর মাতৃভাষায়,—আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই।

কথাগুলো বলতে বলতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিস্‌মার্ক আবার বসে পড়লেন তাঁর ডেকচেয়ারে। নবাগতদের নিয়ে ইয়াং মিন্ একটু দুরে সোফায় বসতে বসতে নিচু কণ্ঠে বললেন,—এমনিই চলছে আজ পাঁচ বছর ধরে।

এবার বনবিহারী চোস্ত জার্মান ভাষায় তাঁদের আলেকজান্দ্রিয়ায় আসার উদ্দেশ্য বলতেই কয়েকমুহূর্তের জন্যে বিস্‌মার্কের ক্লান্ত চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরক্ষণে আগের মতো ক্লান্ত ভঙ্গিতে আবার বলে ওঠেন,—আমি দায়ী নই—আমি দায়ী নই।

বনবিহারী জিজ্ঞেস করেন,—আমাদের কাজে আমরা কি আপনার কাছ থেকে কোন কিছু সাহায্য আশা করতে পারি?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জবাব দেন বিস্‌মার্ক,—সাহায্য? কিসের সাহায্য? আমি দায়ী নই।

—হ্যাঁ, আমরা জানি, আপনি দায়ী নন্। কিন্তু আপনার গবেষণা—

বনবিহারীর কথা শেষ হবার আগেই বিস্‌মার্ক বলে ওঠেন,—গবেষণা? কিসের গবেষণা। আমি কোন গবেষণা করিনি। আমি দায়ী নই।

—সম্রাট পঞ্চম রামেসিসের মমি নিয়ে আপনি গবেষণা করেছিলেন।

না—না—না। আমি নিজের ইচ্ছায় করিনি। আমি দায়ী নই।

এরপর বনবিহারী আরও কিছুক্ষণ বিসমার্কের সঙ্গে কথা চালালেও তাঁর কাছ থেকে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

জার্মান ভাষায় এই কথোপকথনের সামান্য কিছু বুঝতে পারছিলেন ইয়াং মিন্। কিন্তু স্টুয়ার্ট এক বর্ণও বুঝতে পারেন নি। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে ইয়াং মিন্ বললেন,—আমি আগেই জানতাম এমনি হবে।

ফেরার পথে গাড়িতে বসে বনবিহারী স্টুয়ার্টকে বললেন,—পারফেক্ট জেন্টলম্যান এই ইয়াং মিন। আমাদের সাহায্য করতে নিজে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

গাড়ির জানালা থেকে মুখ সরিয়ে এনে স্টুয়ার্ট একবার তাকান বন্ধুর মুখের দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন,—কে বলতে পারে, আমাদের সঙ্গে বিসমার্কের কী কথা হয় তা নিজের কানে শোনার জন্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে আসেন নি?

এবার একটু বিরক্তির সুরেই বনবিহারী বললেন,—তোমার দেখছি সবেতেই সন্দেহ।

স্টুয়ার্ট হাসেন,—এটাই আমার স্বভাব।

অবশেষে মমির কাপড় সংগ্রহের জন্যে একটা দিন ঠিক করে সালমান ওয়াদারকে টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হলো। সালমান বললেন,—ঠিক আছে। আমি উপস্থিত থাকবো। তবে ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।

আগের দিন সন্ধ্যায় হোটেলের লবিতে পাশাপাশি বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্টুয়ার্ট বলে ওঠেন,—বন্, আমার ভয় ভয় করছে।

—ভয়? বিস্মিত চোখে তাকান বনবিহারী।

জবাব দিতে একটু সময় নিলেন স্টুয়ার্ট। তারপর গলা নিচু করে বললেন,—ভয়টা যে কীসের, তা তোমায় বোঝাতে পারবো না। তবে একটা ভয়—দারুণ ভয়।

বনবিহারী কিছু না বলে কেবল অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন বন্ধুর মুখের দিকে।

একসময় অনেকটা আপন মনেই স্টুয়ার্ট বলে ওঠেন—মনে হচ্ছে আজ রাতে আমার ঘরে একা ঘুমোতে পর্যন্ত পারবো না।

—বেশ তো। তাহলে আজ রাতে তুমি আর আমি না হয় একই ঘরে শোব।

স্টুয়ার্ট একটু ভেবে বলেন,—সেটা মন্দ নয়। তবে তোমার ঘরটা আমার ঘরের চেয়ে ছোট। এক কাজ করা যাক। আজ রাতটা তুমি আর আমি আমার ঘরেই কাটাবো।

সেই ব্যবস্থা হলো। স্টুয়ার্টের ঘরে পাশাপাশি দুটো খাটে স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী। শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধু আলোচনা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল কামরার বাইরে তুমুল কোলাহলে। বনবিহারী ও স্টুয়ার্ট বেরিয়ে আসতেই হোটেলের একজন কর্মী ছুটে এসে বললো,—ন্যারোলি এস্কেপ্ড্ মিস্টার পাঠক। বরাত জোরে বেঁচে গেছেন।

—মানে। কী—কী ব্যাপার?

হোটেলের সেই কর্মী বললো,—ভাগ্যিস কাল রাতে আপনি আপনার নিজের ঘরে ঘুমোন নি। আপনার বদলে এখানকার একজন ঝাড়ুদার মারা গেছে আপনার ঘরে।

—সেকি।—দুজনেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে স্টুয়ার্ট,—বলুন, খুলে বলুন ব্যাপারটা।

স্থানীয় ভাষায় গড়গড় করে হোটেল কর্মীটি ঘটনাটা বলে গেল স্টুয়ার্টকে। বনবিহারী স্টুয়ার্টের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই স্টুয়ার্ট বললেন,—এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তোমার ঘরে। হোটেলের একজন ঝাড়ুদার ঘর সাফ করতে ঢুকেছিল তোমার খালি ঘরে। সেখানেই সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে মরার আগে সেও তার হাতের ঝাড়ুলাঠি দিয়ে সাপের মাথা থেঁতলে দিয়েছে। দুটো মৃতদেহই এখনও রয়েছে তোমার ঘরে।

কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বনবিহারী। তাঁর মনে পড়ে গেল কাল

রাতের কথা। তিনি স্টুয়ার্টের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, সত্যি কথা বলো তো ভাই। আমার ঘরে কাল রাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে জানতে নাকি তুমি? তাই কি ভয় পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে এসেছিলে তোমার ঘরে?

কোন জবাব না দিয়ে স্টুয়ার্ট বন্ধুকে নিয়ে আবার ঢোকেন নিজের ঘরে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—না, জানতাম না। তবে তুমি ঠিকই বলেছো। তোমার ওপর একটা অ্যাটাক হতে পারে অনুমান করেছিলাম।

বন্ধুর কথায় বিপন্ন বোধ করেন বনবিহারী। একটুকরো কাপড় সংগ্রহ করতে সুদূর আঙ্কারা থেকে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় ছুটে এসে এ কী বিপাকে জড়িয়ে পড়তে হলো তাঁকে? কেন তাঁর জীবন নিয়ে এমন টানাটানি?

বনবিহারীর মনের কথা যেন পড়ে ফেলেন স্টুয়ার্ট। গম্ভীরভাবে বললেন,—বন্, এখন বোধহয় তুমি বুঝতে পেরেছ যে কোন ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠী আমরা যে কাজের জন্যে এখানে এসেছি, সেই কাজে বারে বারে বাগড়া দিতে চেষ্টা করছে। তারা আরও জানে, এই কাজের আসল নায়ক তুমি। আমি কেবল তোমার সহকারী। তাই তুমি এই আলেকজান্দ্রিয়ায় পা দিতে না দিতেই তোমাকে গুম্ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর আবার কাল রাতে এই ঘটনা। তোমার ঘরে একটা সাপ ঢুকিয়ে দিয়ে তোমাকে মারতে চেয়েছিল।

—ওটা কি মিশরের সেই বিখ্যাত অ্যাসপ্ সাপ?

—কী জানি। আমি তো দেখিনি।

—দেখেশুনে আমার তো মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত পঞ্চম রামেসিসের মমির কাপড়ের টুকরো না নিয়েই আমায় এদেশ ছাড়তে হবে।

—শেষ পর্যন্ত কী হবে বলতে পারছি না। জবাব দেন স্টুয়ার্ট, তবে ব্যাপার যতদুর গড়িয়েছে তার শেষ না দেখে ছাড়ছি না।

একটু পরেই পুলিশ হোটেল থেকে সেই সাফাই কর্মীর মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ চিফ্ ওমর রহমানের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েই হোটেলের ম্যানেজার নক করেন স্টুয়ার্টের ঘরের দরজায়।

বনবিহারী ঘরের দরজা খুলে দিতেই ম্যানেজার ঘরে ঢুকে বললেন, এক্সকিউজ মি। আজ দুপুর দুটোয় এখানকার পুলিশ চিফ আপনাদের অনুরোধ করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। খুব জরুরি।

হোটেল ম্যানেজার বেরিয়ে যেতেই বনবিহারী স্টুয়ার্টকে বললেন,—তাহলে আজকের প্রোগ্রামের কী হবে? আজ দুপুর দুটোয় তো মিউজিয়ামে যাবার কথা।

স্টুয়ার্ট বলেন,—তোমায় যেভাবে টার্গেট করা হয়েছে তাতে তৈরি না হয়ে মিউজিয়ামে যাওয়া ঠিক হবে না। যারা আমাদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে তারা কিছুতেই চাইবে না তুমি আমি আজ এই ছুটির দিনে মিউজিয়ামে গিয়ে সেটাকে নাড়াচাড়া করি।

—তাহলে তো আজকের মিউজিয়ামের প্রোগ্রাম ক্যান্‌সেল করে সালমন ওয়াদারকে টেলিফোন করতে হয়।

—হ্যাঁ। তাই করা উচিত। আমি শুধু ভাবছি পুলিশ চিফ হঠাৎ আমাদের ডেকে পাঠালেন কেন?

জবাব দেন বনবিহারী, আমার তো মনে হয় আজ হোটেলে যে ঘটনাটা ঘটলো সেই সম্পর্কেই বোধহয় তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

—হয়তো তাই। তাছাড়া, আমাদের আজকের মিউজিয়ামের প্রোগ্রামটা অবশ্যই তাঁর জানা

আছে। সালমান ওয়াদারের কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন। ঐ ব্যাপারেই হয়তো তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন আমাদের।

মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সালমান ওয়াদারকে টেলিফোন করতে হলো না। তার আগে তিনিই টেলিফোন করলেন।

টেলিফোন ধরেন বনবিহারী,—ইয়েস বনবিহারী স্পিকিং।....ঠিকই ধরেছেন মিস্টার ওয়াদার, আজ সকালে আমার ঘরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আজকের প্রোগ্রাম ক্যান্সেল না করে উপায় নেই। কি বললেন? আপনি জানেন?....হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানাই স্বাভাবিক। এই বিখ্যাত হোটেলে এমন একটা মার্ডারের খবর চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে।....পুলিশ চিফ নিজে আপনাকে জানিয়েছেন?...ক্যান্সেল?...তিনি নিজেই আজকের প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করতে বলেছেন?...খুব ভালো কথা। ঠিক আছে দেখা হবে....বাই।

পুলিশ চিফ ওমর রহমানের অফিস আলেকজান্দ্রিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে। সুপুরুষ ওমর রহমানের সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ হতেই ওমর বললেন,—আপনারা বোধ হয় জানেন না, আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে সাধারণ পোশাকে দুজন পুলিশ অফিসার সর্বদাই ছায়ার মতো অনুসরণ করে আপনাদের। কিন্তু এ সত্ত্বেও আপনাদের ঘরে একটা জ্যান্ত সাপ পাচার করা হলো।

—কীভাবে সাপটাকে ঢোকানো হলো বলে আপনাদের ধারণা?—জিজ্ঞেস করেন বনবিহারী।

—তদন্ত করে আমার অফিসারেরা রিপোর্ট দিয়েছে, টয়লেটের একঝস্টের ফাঁক দিয়ে ঢোকানো হয়েছিল।

—ওটা কী সাপ মিস্টার রহমান? সেই ভয়ঙ্কর অ্যাসপ্ নাকি?

বনবিহারীর কথায় তাঁর মুখের দিকে একটু সময় কৌতুকের চোখে তাকিয়ে থাকেন পুলিশ চিফ। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন,—বইতে পড়েছেন বুঝি রানী ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার কাহিনী?

ভাবলেশহীন মুখে স্টুয়ার্ট চুপ করে থাকলেও পুলিশ চিফের সেই হঠাৎ হাসিতে বনবিহারী একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন। এবার হাসি থামিয়ে ওমর রহমান বললেন,—মিস্টার পাঠক, কয়েক হাজার বছর আগের সেই অ্যাসপ্ সাপের জাতি আজও টিকে আছে কি লুপ্ত হয়ে গেছে, আমার জানা নেই। অ্যাসপ্ না হলেও আপনাদের হোটেলের সেই সাপটা যে দারুণ বিষাক্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক ছোবলেই শেষ করে দিয়েছে লোকটাকে।

একটু থেমে ওমর রহমান আবার বলেন,—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশে এসেছেন একটা বিশেষ কাজে। আপনাদের এখানে দেখভালের যাবতীয় দায়িত্ব আমাদের। যদিও আমরা আপনাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছি, তবুও আপনাদের নিজেদের একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। এটা তো এখন জলের মতই স্বচ্ছ, কেউ বা কোন গোষ্ঠী আপনাদের কাজ আটকাতে চাইছে। অবশ্য তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন স্টুয়ার্ট। ওমর থামতেই বললেন,—মিস্টার রহমান, রসায়নবিদ ভন্ বিস্মার্ক সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

কয়েকমুহূর্ত পুলিশি চোখে স্টুয়ার্টের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওমর রহমান। তারপর বলেন,—তাঁর কথাও দেখছি আপনারা জেনেছেন। আপনাদের কাজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে কি?

—না সরাসরি হয়তো নেই।—বনবিহারী বলেন,—তবে আমরা যে কাজ করতে এসেছি সেই কাজ আমাদের আগে তিনিই করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই।—রহমান বলেন,—তবে আপনাদের তেমন পাগল হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। বলেই হো-হো করে হেসে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীও।

একটু থেমে রহমান আবার বলতে থাকেন,—বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যজনক। ভন্ বিস্মার্ক কেবল একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীই নন, এই শহরের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর এমন পরিণতি হবে কেউ ভাবতেও পারেনি। বছর পাঁচেক আগে যদিও আমি পুলিশ চিফ ছিলাম না, কিন্তু সবটাই আমি জানি। তাঁর পাগল হওয়ার সঠিক কারণ—

—পঞ্চম রামেসিসের সেই প্রেতাত্মা—বলে ওঠেন বনবিহারী।

—আজগুবি। সম্পূর্ণ আজগুবি। ওমর রহমান চেঁচিয়ে ওঠেন,—এর প্রমাণ আমাদের হাতেই আছে।

—ভন্ বিস্মার্কের ডাইরির সেই ছেঁড়া পাতাটার কথা বলছেন?—সরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন স্টুয়ার্ট।

ওমর রহমান চমকে ওঠেন,—আপনি জানলেন কেমন করে?

ঠোঁটের কোণে একটু রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—এতে বিস্ময়ের কী আছে, মিস্টার রহমান? কেবল আমি নয়, এদেশের অনেকেই তা জানেন। আপনারা যে বিস্মার্কের বাড়ি সার্চ করে জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর ডাইরির একখানা ছেঁড়া পাতা পেয়েছিলেন, সে খবর তো সেদিন খবরের কাগজেই ছাপা হয়েছিল। একটা ইংরেজি কাগজ তো সেই পাতার একটা ফটো কপিও ছেপে দিয়েছিল।

—আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

—বাঃ, আমার পক্ষে জানতে অসুবিধা কোথায়। আমি তো আজ বছর দশেক ধরে সুয়েজ ক্যানেল অথরিটির একজন কর্মী। আমি নিজে সেই খবর পড়েছি। ফটো কপির ক্লিপিংও রয়েছে আমার কাছে। অবশ্য আমি জার্মান পড়তে পারি না।

—পড়তে পারেন না, অথচ ক্লিপিং রাখলেন। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যের নয়?

—নট অ্যাট অল, মিস্টার রহমান। ফটো কপির পাশেই তার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছিল।

—আপনি কি সব খবরেরই ক্লিপিং রাখেন?

—রোমাঞ্চকর রহস্যময় হলে অবশ্যই রাখি।

—রহস্যময় বলছেন কেন?

—বলবো না? পঞ্চম রামেসিসের মমি—তিন হাজার বছর আগের প্রেতাত্মা—ভন্ বিস্মার্কের পাগল হওয়া—এই সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দারুণ রহস্যময় এবং ইন্টারেস্টিং।

ওমর রহমান কী যেন একটু চিন্তা করেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আলমারি থেকে মোটা একটা ফাইল নিয়ে এসে একটার পর একটা পাতা উল্টে ভন বিস্মার্কের ডাইরির সেই ছেঁড়া পাতাটা বের করে স্টুয়ার্টের সামনে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করেন,—আপনি এটার কথা বলছেন তো?

—পাতাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্টুয়ার্ট বলেন, একজ্যাক্টলি। এটাই সেই। বন্, তুমি তো জার্মান জানো। একবার পড়ে দ্যাখো তো।

পড়তে থাকেন বনবিহারী.........দুর্ভাগ্য। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম করেও সফল হতে পারলাম না। কতই না পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। কিন্তু না, হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরীয়রা যে বস্তু দিয়ে একটা মৃতদেহ সংরক্ষণ করতো তার হদিশ পেলাম না। যাক্, বিজ্ঞান সাধনায় সফলতা বিফলতা তো আছেই। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোন বিজ্ঞানী

হয়তো এ নিয়ে আবার চেষ্টা করে সফল হবে। এটুকুই কেবল আমার সান্ত্বনা। কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন পঞ্চম রামেসিসের মমিটা আর আমার ল্যাবরেটরিতে রেখে লাভ কি? আগামী কালই ওটা মিউজিয়ামে ফেরত পাঠাবো। ওখানকার অধ্যক্ষ সালমান ওয়াদারকেও তা জানিয়েছি। সহকারী ইয়াং মিন্‌কে নির্দেশ দিয়েছি মমিটা পাঠাবার সব ব্যবস্থা করতে।

সত্যি বলতে কি, এতদিন মমিটাকে নিজের কাছে রাখায় ওটার ওপর কেমন যেন এক মায়া পড়ে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে এই সেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মিশরের ফারাও পঞ্চম রামেসিস যিনি তিন হাজার বছর আগে মিশরে রাজত্ব করতেন। এটা নিয়ে আজ আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ ইচ্ছেমতো কতই না নাড়াচাড়া করছি।

ঘড়ির কাঁটায় এখন রাত ন'টা। ল্যাবরেটরিতে এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। পঞ্চম রামেসিসকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে কাপড়ে জড়ানো তাঁর দেহটাকে আর একবার স্পর্শ করতে। ঘরে ঢুকলাম। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। খুললাম মমির ঢাকনা। হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করলাম। কিন্তু এ কী—এ কী? একী দেখছি আমি? এ কে?....

ডাইরির পাতার এর পরের অংশ আর নেই।

।। পাঁচ ।।

সেদিন পুলিশ চিফের অফিস থেকে হোটেলে ফিরে এসে বনবিহারী বেশ শক্তভাবে চেপে ধরলেন স্টুয়ার্টকে। বললেন,—দেখো ভাই, এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সত্যি করে বলো তো ব্যাপারটা কী? তোমার উদ্দেশ্য কি কেবল মমির গায়ের কাপড় জোগাড় করায় আমাকে সাহায্য করা, নাকি অন্য কিছু?

স্টুয়ার্ট হেসে ওঠেন। তারপর বললেন, না ভাই আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার কাজে সাহায্য করতে গিয়েই তো আমি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পঞ্চম রামেসিসের মমির কাপড় জোগাড় করার অনুমতি আদায় করেছি। তবে সেই সঙ্গে খুচরো অন্য দু'একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

—যেমন?

স্টুয়ার্ট বলেন,—বিশ্বাস করো, তার সঙ্গে তোমার কাজের কোন সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা, শেষপর্যন্ত ঐ কাপড়ের টুকরো জোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

চমকে উঠেন বনবিহারী। চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,—তাহলে আঙ্কারা থেকে এতদূর ছুটে এসে এধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে থেকে লাভ কি?

—না—না।—তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন স্টুয়ার্ট,—এখনই নিরাশ হয়ো না। আমি যা বলছি তা আমার অনুমান। আমার আন্দাজ মিথ্যে হলেই আমি খুশি হবো।

বনবিহারী চুপ করে থাকেন। স্টুয়ার্ট বলেন, আর দেরি না করে মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সালমান ওয়াদারের সঙ্গে আগামী ছুটির দিনেই যাতে কাজটা হতে পারে তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

সেদিন বিকেলেই স্টুয়ার্ট একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। বললেন, চলো, একজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

শিল্পী! বনবিহারী আকাশ থেকে পড়েন, হঠাৎ— এই পরিস্থিতিতে?

স্টুয়ার্ট বলেন,—দেখো, যেরকম টেনশানের মধ্যে রয়েছি তা থেকে একটু মনটাকে সরানো যাবে তো। একটু রিল্যাক্স করা যাবে। চলো, ভালো লাগবে। ভারি সুন্দর সেই শিল্পীর হাতের

কাজ। অবশ্য লোকটির চালচুলো বলে কিছু নেই।

—নাম কী? কোথায় থাকে?

এই আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একটা এঁদো গলির মধ্যে তার স্টুডিও। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই চমকে যাবে, আর ইচ্ছে করবে শিল্পীর কিছু হাতের কাজ কিনে নিয়ে আসি। এর আগে আমি একবার গিয়ে দু'তিনটে জিনিস কিনে এনেছি। লোকটির নাম আবদুল্লা আজাম।

আধুনিক পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত নগরের মতো বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ারও একদিকে অর্থের প্রাচুর্য, আর অন্যদিকে দারিদ্র্যের অন্ধকার। শহরের বাইরে ভাঙাচোরা পাথরের ঝোপড়ি, সেখানে বাস করে হতদরিদ্ররা। সরু সরু গলি, নোংরা আবর্জনা ভরা খোলা ড্রেন। এমনি পরিবেশের মধ্যে একটা ভাঙা পাথরের দাঁত বের করা বাড়ির সামনে স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না বনবিহারীর। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে একজন আর্টিস্টের স্টুডিও!

বাড়িটার দরজা গলির ওপর নয়। একটা নিচু টানা বারান্দার ওপাশে সেই দরজা। বারান্দার চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ। দেখে মনে হয় অনেক দিন এখানে ঝাঁট পড়েনি। একপাশে গোটাকয়েক গাধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খড়ের টুক্‌রো ও সেই সঙ্গে গাধার মলমূত্র। একপাশে ডাঁই করা রয়েছে পুরানো পাথর চুন বালির স্তূপ।

নাকে রুমাল চেপে স্টুয়ার্টের পিছুপিছু বনবিহারী এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। দরজা হাট করে খোলা। ঘরের আবছা অন্ধকারে ভেতরটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। দরজার গোড়ায় একটা নিচু টুলে স্থির হয়ে বসে একজন নিচুশ্রেণীর লোক। ময়লা, ছেঁড়া স্থানীয় পোশাক তার পরনে। বনবিহারীর মনে হলো লোকটি বোধ হয় এই স্টুডিওর দারোয়ান। কথাটি মনে হতেই তাঁর হাসি পেল। এই স্টুডিওর আবার দারোয়ান!

লোকটিকে একরকম অগ্রাহ্য করেই বনবিহারীকে নিয়ে স্টুয়ার্ট গেলেন ভেতরে। লোকটি কিন্তু একেবারেই উচ্চবাচ্য করলে না। এমনকি কিছু জিজ্ঞেসও করলো না।

পুরোনো হলেও ঘরখানা বেশ বড়। ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে শিল্পীর হাতের তৈরি নানা ধরনের মাটির মূর্তি। কোনটা সম্পূর্ণ, আবার কোনটা অসম্পূর্ণ। এখানে ওখানে মূর্তি তৈরি করার সরঞ্জাম ছাড়াও ভাঙা চেয়ার, টুল, বাতিল ক্যানেস্তারা, কাপড়ের টুক্‌রো, জলের হাঁড়ি ইত্যাদিতে বোঝাই ঘরটি যেন এক মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা।

তারই মধ্যে একপাশে তক্তপোষের ওপর আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছিল একটি মধ্যবয়সী মানুষ। না কামানো দাড়ি ও না কাটা একমাথা রুক্ষ চুলে পাক ধরেছে। নিচের মোটা ঠোঁটখানা ঝুলে পড়েছে। গ্রিক্ ধাঁচের তীক্ষ্ণ নাক, চোখ। সারা মুখে অ-শিল্পী সুলভ এক জাতীয় তীক্ষ্ণতা। তক্তপোষের পাশে একখানা টুলের ওপর গোটাকয়েক মদের বোতল ও গেলাস।

স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীকে শাঁসালো খদ্দের মনে করে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ থেকে নেমে এগিয়ে আসে লোকটি। স্টুয়ার্ট তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় ভাষায় বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন, মিস্টার আজাম?

কয়েক মুহূর্ত স্টুয়ার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে তরমুজের কালো বিচির মতো একপাটি দাঁত বের করে আজাম হেসে জবাব দেন,—আপনি আগে একবার এখানে এসেছিলেন না?

মাথা নেড়ে সায় দেন স্টুয়ার্ট। আবদাল্লা আজাম উষ্ণ করমর্দন করতে করতে তেমনি হেসে বললেন,—আপনি সেবার আমাদের দেশের সেকালের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট তুতেন খামেনের একটা কাল্পনিক মূর্তি কিনে নিয়েছিলেন না?

—ইয়েস—ইয়েস।—এবার ইংরেজিতে জবাব দেন স্টুয়ার্ট। তারপর আবার বনবিহারীকে

দেখিয়ে স্থানীয় ভাষায় বললেন,—ইনি আমার ভারতীয় বন্ধু। এঁকে নিয়ে এসেছি আপনার শিল্পকর্ম দেখাতে।

—খুব ভালো—খুব ভালো। বলতে বলতে কেমন যেন একটু ম্লান হয়ে ওঠেন আবদাল্লা আজাম, তারপর খানিকটা উদাসীন সুরে বলতে থাকেন,—আর শিল্পকর্ম! এদেশের ক'জন লোক এসব শিল্পকর্মে উৎসাহী? এশিয়া-আফ্রিকার লোকেরা কি শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে পয়সা খরচ করে? তেমন মানুষ রয়েছে ইউরোপে। যান একবার প্যারিস। দেখবেন, সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যেও শিল্পকর্মের কত কদর। আর এখানে? নেহাত আপনাদের মতো কিছু বিদেশী এর কদর বোঝেন বলেই এখনও কোনরকমে বেঁচে আছি।

এরপর আবদাল্লা আজাম স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিজের শিল্পকর্ম দেখাতে থাকেন। দেখতে দেখতে চমৎকৃত হন বনবিহারী। তাঁর সেই প্রাথমিক অনীহা কেটে যায়। মূর্তিগুলো কেবল সুন্দরই নয়, মনে হয় জীবন্ত।

আবদাল্লা আজামের মুর্তিগুলোর বিষয়বস্তু অধিকাংশই পুরানো মিশরীয় সভ্যতার কাহিনী ও লোককথাকেন্দ্রিক। একটা ছোট মূর্তির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন বনবিহারী। একজন মহিলার মূর্তি। অপূর্ব সুন্দরী, যাকে বলে প্যারাগন অব বিউটি। তার চুলের বিন্যাস সাবেকি মিশরীয় ধাঁচের। সারা মুখে এক আশ্চর্য উদাসীনতার চিহ্ন। হাতে তার একটি ছোট সাপ।

বনবিহারীকে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবদাল্লা আজাম এগিয়ে এসে ভাঙা ইংরেজিতে বললেন,—ক্লিওপেট্রা, সুইসাইড বাই স্নেক ব্যইট।

অ্যাসপ্।—মনে মনে উচ্চারণ করেন বনবিহারী। মূর্তিটা তাঁর এতই ভালো লাগে যে তিনি কিনে নেন। দাম অবশ্য তেমন বেশি নয়।

ফিরতি পথে গাড়িতে বনবিহারী স্টুয়ার্টকে জিজ্ঞেস করেন,—সত্যি করে বলো তো, হঠাৎ এই শিল্পীর স্টুডিওতে এলে কেন?

—বললামই তো টেনশন কাটাতে। তা আবদাল্লা আজামের কাজ তোমার কেমন লাগলো?

—চমৎকার। তবে লোকটা যেন একটু কেমন কেমন।

—বড় শিল্পীরা একটু কেমন কেমনই হয়। আচার আচরণে সাধারণের চেয়ে এরা একটু অন্যরকম। এই আবদাল্লা আজামের কথাই ধরো না। মস্ত বড় শিল্পী। অথচ কেমন ভাবে থাকে দেখলে তো?

বনবিহারী জবাবে বললেন; অদ্ভুত শিল্পী। কিন্তু কী জীবনযাত্রা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আবার বলে ওঠেন,—একটা ব্যাপারে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। দরজার সামনে টুলের ওপর বসে থাকা ঐ লোকটা। আমরা গেলাম-এলাম, কিন্তু লোকটা একবার হাঁ-হুঁ পর্যন্ত করলে না। ঠায় বসে রইলো চুপ করে। আবদাল্লা লোকটাকে ওখানে শুধু শুধু বসিয়েই বা রেখেছে কেন?

বনবিহারীর কথায় স্টুয়ার্ট হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, —সেবার প্রথম যখন আসি, ঐ লোকটা আমাকে কী নাকালটাই না করেছিল। আমি সোজা লোকটার সামনে গিয়ে বললাম, আমি কি একবার স্টুডিওর মধ্যে যেতে পারি? লোকটা কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসেই রইলো। আমি আবার স্থানীয় ভাষায় সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা তখনও নিরুত্তর। আমার সন্দেহ হলো, লোকটা কালা নাকি? আর একটু কাছে গিয়ে লোকটাকে আবার জিজ্ঞেস করতে যাবো, হঠাৎ নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

—কেন?

হেসে জবাব দেন স্টুয়ার্ট,—ওটা কোন জীবন্ত মানুষই নয়। মাটির তৈরি একটা মূর্তিকে

জামা কাপড় পরিয়ে ওখানে ঐভাবে বসিয়ে রেখেছে।

—অদ্ভুত তো।—বলে ওঠেন বনবিহারী,—তা, এর পিছনে শিল্পীর উদ্দেশ্য কী?

—কিছুই না। স্রেফ খেয়াল। এ দিয়েই প্রমাণ হয় শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব। সেই গল্পের শিল্পীর মতো।

—গল্পের শিল্পী?

স্টুয়ার্ট বলেন,—সেই গল্পটা শোন নি? একবার কোন এক দেশে তিনজন শিল্পীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। প্রথম শিল্পীটি নিয়ে এলো একটা বড় ক্যান্‌ভাসে অতি সাধারণ একটা ছবি। একটা খুঁটির সঙ্গে জড়ানো একটা লতাগাছ। গাছটি এতই জীবন্ত যে কোত্থেকে একটা গরু গুটি গুটি সেখানে এসে লতাগাছটাকে চাটতে আরম্ভ করলে। দ্বিতীয় শিল্পী নিয়ে এলো একটা গোলাপ ফুলের ছবি। ছবিটা আনামাত্র একদল মৌমাছি ছুটে এসে ফুলের চারিদিকে গুণ গুণ করতে লাগলো। এবার তৃতীয় শিল্পীর পালা। সে নিয়ে এলো একখানা বড় ক্যানভাসে একখানা টাঙানো মশারির ছবি। হঠাৎ একটি লোক এগিয়ে এসে মশারিটা হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল। বলা বাহুল্য, এই শেষের শিল্পীই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হলো। প্রথম দুজন বোকা বানিয়েছিল পশু ও কীটপতঙ্গকে। শেষের জন খোদ মানুষকে। আমাদের আবদাল্লা আজামকেও শেষের জনের সারিতে ফেলতে হবে।

।। ছয়।।

রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেল। মনে আশার সঞ্চার হলো বনবিহারীর। গবেষণার ফলাফল যাই হোক না কেন, মমির গায়ের একটুকরো কাপড় নিয়ে গবেষণার সুযোগ পেলেই তিনি খুশি। অনেকদিন ধরে যে সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন তা আজ সফল হতে চলেছে। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। ঠিক বেলা দুটোয় তাঁরা গিয়ে হাজির হবেন মিউজিয়ামে।

নিজের অ্যাটাচি কেসে কাজের জন্যে টুকিটাকি জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে গুন গুন করে একটা টার্কিশ গানের কলি আওড়াতে থাকেন বনবিহারী। বন্ধুর ভাব-ভঙ্গি দেখে স্টুয়ার্ট বললেন,—আজ যে তুমি দারুণ মুডে রয়েছো।

হেসে ফেলেন বনবিহারী,—যা বলেছ, ভাই। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। সুষ্ঠুভাবে কাজটা মিটে গেলে কালই আমি আঙ্কারার প্লেন ধরবো। বাব্বাঃ যা চলছে!

নিজের কপালে ও কাঁধে ক্রশ এঁকে স্টুয়ার্ট বললেন,—তোমার সাফল্যের জন্যে আমি সবসময় যিশুর কাছে প্রার্থনা করছি। তবে কি জানো, দেয়ার ইজ মেনি অ্যা স্লিপ বিটুইন দ্য কাপ অ্যাণ্ড দ্য লিপ।

কাঁটায় কাঁটায় বেলা দুটো। স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী হাজির হলেন মিউজিয়ামে। ছুটির দিন। মিউজিয়াম সুনসান। কোথাও লোকজন নেই। এমনকি সিকিউরিটির কাউকেও দেখা গেল না। সালমান ওয়াদার একাই বেরিয়ে এলেন। মৃদু হেসে বললেন,—এমন ব্যবস্থা করেছি, যাতে কাক পক্ষীটিও কিছু টের না পায়।

—মেনি থ্যাঙ্কস্।

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দরজা খুলে স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকেন সালমান ওয়াদার। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন মমির ঘরে।

মাঝারি মাপের একখানি ঘর। একমাত্র মমি ছাড়া এই ঘরে আর কোন বস্তু নাই। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা একটা কারুকার্যময় মেহগনি কাঠের টেবিলে কাঁচের আধারের মধ্যে শায়িত তিন হাজার বছর আগের মিশরের এক পরাক্রমশালী ফারাও পঞ্চম রামেসিস।

টেবিলের একপাশে এসে দাঁড়ান বনবিহারী ও স্টুয়ার্ট। অন্যপাশে সালমান ওয়াদার। তিনজনের নিষ্পলক দৃষ্টিই নিবন্ধ মমির দিকে। বনবিহারী ভাবছিলেন, এই মানুষটির সামান্য অঙ্গুলি হেলনে কতশত মানুষের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, একটির পর একটি জনপদ মিশে যেত ধুলোয়। তিনি আজ মমি। কত কাল কত যুগ পেরিয়ে এখন এক দ্রষ্টব্য বস্তু।

নিস্তব্ধতাভঙ্গ করে একসময় স্টুয়ার্ট বললেন,—মিস্টার ওয়াদার, এবার কাঁচের আধারটা খোলার ব্যবস্থা করুন। আপনার নির্দেশ মতো মমির পিঠের কাছ থেকে একটুকরো কাপড় আমরা কেটে নেবো।

সালমান ওয়াদার বুঝি কথাটা শুনতে পাননি। তিনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন।

—মিস্টার ওয়াদার।—এবার একটু জোরেই বলে ওঠেন স্টুয়ার্ট। আগের কথাগুলিই ফের বলেন।

সালমান ওয়াদার মুখ তোলেন। তাকান স্টুয়ার্ট ও বনবিহারীর দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—এক্সকিউজ মি, মমির এই কাঁচের আধার খোলা চলবে না।

—সে কী।—বনবিহারী আর্তনাদ করে ওঠেন,—তাহলে কাপড়ের টুকরো কেটে নেবো কী করে?

—নেবেন না।

—মানে?

—মানে অতি সহজ। মমির কাপড় আপনারা পাবেন না।

—কী আজেবাজে বকছেন? স্টুয়ার্টের কণ্ঠে উত্তাপ,—মিশর সরকারের অনুমতি রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

—তাতে কিছু এসে যায় না। সরকারের সঙ্গে আমি যা বোঝার বুঝে নেবো। এদেশের মৌলবাদীদের কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। আজ সকালেই টেলিফোনে তারা বলেছেন, এই মমি যদি বিধর্মীদের স্পর্শ করতে দিই তাহলে একঘন্টার মধ্যেই আমার মৃতদেহ পড়ে থাকবে আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায়।

—কিন্তু মিশর সরকারের আদেশ পালন না করলে তো আপনার বিপদ ঘটবে।

—কিন্তু জীবন তো থাকবে।

সালমান ওয়াদারের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন স্টুয়ার্ট। এবার বনবিহারী বলেন,—তাহলে কেন আপনি আমাদের এখানে নিয়ে এলেন। একথা তো টেলিফোনেই বলতে পারতেন।

ওয়াদার বাঁকা হাসেন,—তাহলে তো এতক্ষণে আপনারা আমার বিরুদ্ধে সরকারি মহলে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিতেন।

স্টুয়ার্ট রাগত গলায় বললেন,—কিন্তু তা থেকে কি আপনি রেহাই পাবেন? আমরা তো বেরিয়ে গিয়েই সরকারি মহলে সব জানাবো।

সালমান ওয়াদারের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে—সে সুযোগ কি আপনারা পাবেন? এখান থেকে বেরোবার পথ যে বন্ধ।

—হোয়াট অডাসিটি ইউ হ্যাভ!—চিৎকার করে ওঠেন স্টুয়ার্ট। সঙ্গে সঙ্গে সালমান ওয়াদারের মুখের ভাব পাল্টে গেল। এক ঝটকায় পকেট থেকে একটা চকচকে ওয়েভলি স্কট রিভলবার বের করে দুজনের দিকে তাক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন। ঘরের অন্যপাশের একটা ছোট দরজা খুলে গিয়ে সেখানে এসে দাঁড়ায় বিরাট চেহারার একজন মিশরীয়।

—হ্যান্ডস আপ।

যন্ত্রচালিতের মতো হাত তোলেন স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী।

ওয়াদারের কণ্ঠে আবার আদেশ—একটি শব্দও উচ্চারণ না করে ঐ লোকটির পেছন পেছন যান।

—কোথায়?

—নিরুদ্দেশে।—সালমান ওয়াদারের কণ্ঠে শ্লেষ।

দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন স্টুয়ার্ট ও বনবিহারী। কী করবেন? রিভলবার নাচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে সালমান ওয়াদার আবার বলেন,—এখনই দরজার কাছে ঐ লোকটির পেছন পেছন চলে যান। নতুবা এই রিভলবারের ছটা গুলি আপনাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেব।

আচমকা স্টুয়ার্ট বিদ্যুৎগতিতে বনবিহারীর কাঁধে বাঘের মতো থাবায় তাঁকে চেপে মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়েন। মুহূর্তে গর্জে ওঠে ওয়াদারের হাতের রিভলবার। পরক্ষণেই স্টুয়ার্ট পা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি মেরে মমির সেই ভারি টেবিলটা উল্টে দেন সালমান ওয়াদারের ওপর। টেবিল চাপা পড়েন সালমান। ঝমঝম শব্দে ভেঙে পড়ে মমির কাঁচের আধার। মমিটা ছিটকে পড়ে দুটুকরো হয়ে যায়। ছিটকে যায় সালমানের হাতের রিভলবারটাও। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় জানলার কাঁচের শার্সি।

গুলির শব্দে হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকেন তিনজন পুলিশ অফিসার। হাতে তাদের উদ্যত রিভলবার। দরজার কাছের সেই বিশাল চেহারার লোকটা ততক্ষণে অদৃশ্য।

টেবিলের তলা থেকে সালমান ওয়াদারকে যখন টেনে বের করা হয়, তখন তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তাঁর একটা পা ভেঙে গেছে, ভাঙা কাঁচের টুকরোয় তাঁর সারা মুখ রক্তাক্ত।

ঘটনার আকস্মিকতায় বনবিহারী বিমূঢ়। স্টুয়ার্ট কিন্তু স্বাভাবিক। সময় নষ্ট না করে স্থানীয় ভাষায় তিনি পুলিশ অফিসারদের বললেন,—এখনি আমায় একবার মিস্টার ওমর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

একজন জবাব দেন,—বেশ তো চলুন।

একটু সময় কী যেন চিন্তা করেন স্টুয়ার্ট। তারপর বললেন,—শোন বন্, চিফের কাছে আমাদের দুজনের যাবার দরকার নেই। এদেশে আমাদের আর কোন ভয়ও নেই। নিশ্চিন্তে একটা ট্যাক্সি নিয়ে তুমি সোজা হোটেলে ফিরে যাও।

—মমি—?

—এ নিয়ে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। পুলিশ পাহারা থাকছে।

হোটেলে ফিরে বনবিহারী সেদিনের ঘটনার কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না সালমান ওয়াদারের মতো একজন উঁচুতলার সরকারি কর্মচারী হঠাৎ এমন আচরণ করলেন কেন? কী তার উদ্দেশ্য—কী তাঁর স্বার্থ? এটা স্পষ্ট, মমির কাপড় কেটে নিয়ে বনবিহারী গবেষণা করেন, সালমান ওয়াদারের তা পছন্দ নয়। স্টুয়ার্টের কথায় এটাও বোঝা গেছে, এই আলেকজান্দ্রিয়া শহরে পা দেবার পর থেকে যত ঘটনা ঘটেছে তার পিছনে ছিল এই সালমান ওয়াদারের হাত। সেই সঙ্গে আরও বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁর বন্ধু স্টুয়ার্টের আচরণ। গোটা ব্যাপারটা বনবিহারীর নিজের কাছে যতটা আকস্মিক ততটা যেন নয় স্টুয়ার্টের কাছে। স্টুয়ার্ট যেন এর অনেক কিছুই জানতেন।

হোটেলে নিজের ঘরে ডেকচেয়ারে শুয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন বনবিহারী। কতক্ষণ, জানেন না। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙলো দরজার শব্দে। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। পাক্কা দু'ঘন্টা ঘুমিয়েছেন। মনে মনে একটু লজ্জাবোধও করলেন। এখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন আর ওদিকে স্টুয়ার্ট বেচারী কোথায় কী করছে, ঠিক নেই।

দরজা খুলেই আশ্বস্ত বোধ করেন বনবিহারী। সামনে স্টুয়ার্ট। মুখখানা গম্ভীর।

ঘরে ঢুকে সোফায় ধপ করে বসে পড়েন স্টুয়ার্ট। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের কথা বোধ হয় পড়ে নিলেন। বললেন,—আমি জানি তোমার মনের মধ্যে এখন হাজারো প্রশ্ন। একটু অপেক্ষা করো। আগে হোটেলের ওয়েটারকে বলো কফি দিতে।

বনবিহারী টেলিফোনে হোটেলের রুম সার্ভিসে কফির কথা বলে এসে আবার বসতেই অনেকটা নিজের মনেই স্টুয়ার্ট বললেন,—আর কীই বা বলার আছে? আসল পাখি হাওয়া।

—তার মানে? সালমান ওয়াদার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে নাকি?

—না—না। তিনি এখন পুলিশের জিম্মায়। সালমান ওয়াদার ষড়যন্ত্রকারীদের একজন, তবে তিনি প্রধান নন।

—তবে আসল লোকটি কে?

স্টুয়ার্ট জবাব দেবার আগেই হোটেলের ওয়েটার কফি নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

কফিতে আরামে চুমুক দেন স্টুয়ার্ট। তারপর বলেন,—নামটা শুনে চমকে উঠো না। ষড়যন্ত্রের প্রধান হচ্ছেন ভন্ বিসমার্কের সহকারী ডক্টর ইয়াং মিন্।

বনবিহারী বললেন,—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? এ তো হতেই পারে। বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যাপারে পৃথিবীতে এ জাতীয় ঘটনা অনেকই ঘটেছে। বিজ্ঞানীরাও তো মানুষ। ঈর্ষা-দ্বেষ তাঁদের মধ্যেও থাকতে পারে।

স্টুয়ার্ট কফিতে চুমুক দিতে দিতে মৃদুমৃদু হাসছিলেন। বনবিহারী থামতেই তিনি বললেন,—ইয়াং মিন্ ও সালমান ওয়াদার ছাড়া এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আরও একজন আছে। তিনি শিল্পী আবদাল্লা আজাম।

এবার সত্যিই বনবিহারীর ভুরু কপালে ওঠে। আবদাল্লা আজাম! তিনি এই চক্রান্তের মধ্যে এলেন কেমন করে?

বনবিহারী কথাটা বলতেই স্টুয়ার্ট হাসলেন,—দেখো বন্, তুমি যা ভাবছো তা নয়। এর কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা—একধরনের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম। আর এই চক্রের মধ্যে পড়ে ডক্টর ভন্ বিস্মার্কের মতো অতবড় বিজ্ঞানী আজ উন্মাদ।

বনবিহারী ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে স্টুয়ার্ট বললেন,—মমির দেশ বলতে পৃথিবীতে কেবল মিশরকেই বোঝায়। তা সত্ত্বেও মিশরের পথেঘাটে মমি পাওয়া যায় না। হাজার হাজার বছরের পুরানো মমি খুব দামী বস্তু। ইন্টারন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির কাছে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে ছড়িয়ে থাকা মমির হিসেব আছে। এর বাইরে আর কোথাও কোন মমি থাকতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বছর খানেক আগে নিউইয়র্কের একজন ধনীর নিজস্ব মিউজিয়ামে একটা মমির খোঁজ পাওয়া গেল। সবাই অবাক। এই মমি এলো কোথা থেকে? তবে কি এক দেশের প্রাচীন শিল্পবস্তু অন্যদেশে পাচার করে যে সব চোরাকারবারীরা তেমন কোন কিউরিও স্মাগলারের কাছ থেকে নিউইয়র্কের ঐ ধনী ব্যবসায়ী এটা কিনেছেন? পুলিশের হাতে পড়ে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, একজন বিদেশীর কাছ থেকে গোপনে তিনি এটা কিনেছেন। কে সেই বিদেশী, কী তার পরিচয়, কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। প্রশ্ন হলো, এই মমিটা তাহলে এলো কোথা থেকে? পৃথিবীর সবক'টা মমির যখন একটা হিসেব আছে, তখন এই মমি অবশ্যই কোথাও থেকে চুরি করে এখানে আনা হয়েছে।

একটু থেমে আবার বলতে থাকেন স্টুয়ার্ট, সাধারণ পুলিশের হাত থেকে এবার তদন্তের ভার নিল আমেরিকার এফ.বি.আই অর্থাৎ ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। কিছুদিন তদন্ত করে তারাও কিন্তু খুঁজে পেলো না কোন সুত্র। এমনকি ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে উঠলো যখন ঐ ইন্টারন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে জানা গেল, কোন

দেশের কোন মিউজিয়াম থেকেই কোন মমি খোয়া যায় নি। তখন স্বভাবতই সন্দেহ এসে পড়লো এই মমির দেশ মিশরের উপর। মিশরের সরকার অস্বীকার করলেও সন্দেহ হলো, এখানকার কোন অঞ্চলের পিরামিড জাতীয় কোন কিছু থেকে কোন দুষ্টচক্র মমিটা জোগাড় করে আমেরিকায় পাচার করেছে।

এই পর্যন্ত বলে স্টুয়ার্ট আবার একটু থামেন। বনবিহারী চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকেন বন্ধুর দিকে। স্টুয়ার্ট বলেন,—ইন্টারপোল কথাটির অর্থ নিশ্চয়ই তুমি জানো?

মাথা নেড়ে সায় দেন বনবিহারী,—হ্যাঁ। ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন, যার সদর দপ্তর প্যারিসে।

—রাইট। বলতে থাকেন স্টুয়ার্ট, হালে পানি না পেয়ে শেষপর্যন্ত এফ.বি.আই দ্বারস্থ হলো ঐ আন্তর্জাতিক পুলিশ অর্থাৎ ইন্টারপোলের। নামে আন্তর্জাতিক পুলিশ হলে কী হবে, গোটা পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের নিজস্ব কোন নেট ওয়ার্ক কিন্তু নেই। তারা কাজ করে সেই সেই দেশের পুলিশের ওপর নির্ভর করে। সন্দেহের তীর যখন এই মিশরের ওপর পড়লো তখন এদেশের পুলিশও শুরু করলো তদন্ত। কিন্তু তদন্ত ঐ পর্যন্তই। কোন সূত্রই খুঁজে পেল না তারা।

স্টুয়ার্ট থামতেই বনবিহারী বলে ওঠেন, তুমি আবার এর মধ্যে জুটলে কেমন করে?

বন্ধুর প্রশ্নে হেসে ওঠেন স্টুয়ার্ট। হাসতে হাসতে বললেন,—স্বভাব, স্রেফ স্বভাব। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তুমি তো জানো প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার বরাবর ঝোঁক। সুযোগ পেলেই ঐ সব বস্তুর সন্ধানে আমি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। পঞ্চম রামেসিসের মমি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভন্ বিস্‌মার্কের পাগল হওয়ার খবর সংবাদপত্রে পড়ার পর থেকে ঐ বিষয়ে আমি প্রথম আকৃষ্ট হই। সে প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা। সেই থেকেই ব্যাপারটা ঘুরছিল আমার মাথার মধ্যে। তারপর প্রায় বছরখানেক আগে ইন্টারন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির একটা জার্নালে পেলাম নিউইয়র্কের সেই বে-ওয়ারিশ মমির খবর। সেই থেকে আমি লেগে আছি ব্যাপারটির পেছনে। অবশেষে হ্যাঁ, আজই ঐ বে-ওয়ারিশ মমির রহস্যের সমাধান হলো। তবে দুঃখের বিষয় এই রহস্যচক্রের যিনি পাণ্ডা সেই ইয়াং মিন্ একটুর জন্য হাতছাড়া হয়ে গেলেন। ওমর রহমানের পুলিশ যখন ল্যাবরেটরিতে হানা দেয় তার কিছুক্ষণ আগেই তিনি মিশর ছেড়ে পালিয়েছেন। অবশ্য সালমান ওয়াদার ও আবদাল্লা আজাম পুলিশের হেপাজতে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই খুলে গেল এই রহস্যের জট। তবে তোমার দুর্ভাগ্য। মমির কাপড়ের টুকরো আর জুটলো না তোমার ভাগ্যে। খালি হাতেই তোমায় আঙ্কারা ফিরে যেতে হবে।

—কেন? মমিটা তো এখনও ঐ মিউজিয়ামেই রয়েছে। ওটা থেকে একটুকরো কাপড়—

বনবিহারীকে কথার মাঝপথেই থামিয়ে স্টুয়ার্ট নিজের প্যান্টের পকেট থেকে ছোট একটা জিনিস বের করে বনবিহারীর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন,—বলো তো বন্, এটা কী?

পাথরের মতো শক্ত অথচ হাল্‌কা সেই বস্তুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখে তার ওপর নখের আচড় কেটে বনবিহারী বললেন,—দেখে তো মনে হচ্ছে প্লাস্টার অব প্যারিসে তৈরি কোন বস্তুর ভাঙা খণ্ড।

দ্যাটস রাইট। মিউজিয়ামের পঞ্চম রামেসিসের মমির ভাঙা খণ্ড এটা।

বিস্মিত কণ্ঠস্বর বনবিহারীর—বলছো কি?

—হ্যাঁ। ওটা পঞ্চম রামেসিসের আসল মমি নয়। নিপুণ শিল্পী আবদাল্লা আজামকে দিয়ে তৈরি করানো ওটা আসল মমির অবিকল নকল যা নাকি এখানকার মিউজিয়ামে এই পাঁচ বছর ধরে হাজার হাজার দর্শক রামেসিসের মমি বলে জেনে এসেছে। আসল মমিটা পাচার

হয়েছে ঐ নিউইয়র্কে। আর তা করেছে ইয়াং মিন্ ও সালমান ওয়াদার ষড়যন্ত্র করে।

—তাহলে ভন্ বিসমার্কের ব্যাপারটা?

—প্রেতাত্মার ব্যাপারটা স্রেফ ইয়াং মিনের রটনা। বিসমার্ক পাগল হয়ে গেছেন ঠিকই তবে প্রেতাত্মার ভয়ে নয়, দুশ্চিন্তায়। তিনি ইয়াং মিনের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলতেই ইয়াং মিন্ পাল্টা চাপ দিতে শুরু করলেন তাঁকে। বলতে লাগলেন, আপনি নিজেই ল্যাবরেটরিতে এই কাণ্ড করেছেন। ভয়ে কুঁকড়ে উঠলেন ভন্ বিসমার্ক। মানী লোকের মান যাওয়ার চাইতে মৃত্যুও ভালো। তাই তিনি না পারলেন সত্যি ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ করতে, না পারলেন মুখ বুজে সহ্য করতে। নিজের ডাইরিতে আসল ঘটনা লিখে রেখেছিলেন তিনি, যার একটি মাত্র অসম্পূর্ণ পাতা পাওয়া গিয়েছিল। অবশেষে ভাবনা চিন্তায় পাগলই হয়ে গেলেন। মুখে তাঁর কেবল একটা কথা, আমি দায়ী নই, আমি দায়ী নই।

স্টুয়ার্ট উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করেন,—আর কিছু তোমার জানার আছে, বন্? সব পরিষ্কার তো।

বন্ধুর মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বনবিহারী বলেন,—হ্যাঁ। আর একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর পাই নি।

—বলো। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে জবাব দেন স্টুয়ার্ট।

—আচ্ছা, তুমি নিজে কি ঐ ইন্টারপোলের কেউ?

হো হো করে হেসে বনবিহারীর পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে স্টুয়ার্ট বললেন, হবেও বা।